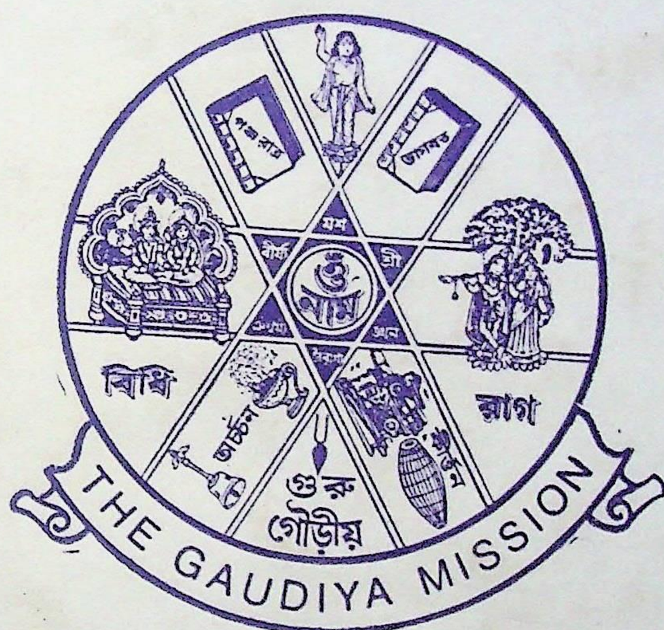
নদীয়া-প্রকাশের

প্রবন্ধাবলী

প্রথম খণ্ড



গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী

প্রথম খণ্ড



গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

প্রকাশক—

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশকাল—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসব

৮ হৃষীকেশ, ৫১৩ গৌরাব্দ

১৭ই ভাদ্র, ১৪০৬, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার কলিকাতা-৩

ও

মিশনের অন্যান্য শাখামঠ সমূহে

মুদ্রণ—

শ্রীভাগবত প্রেস

কলিকাতা—৩

প্রকাশকের নিবেদন

জগদ্‌গুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে ইংরাজী ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে পরমার্থ কথা প্রচার করবার উদ্দেশ্যে "নদীয়া প্রকাশ" পত্রটি প্রবর্ত্তন করেন। ইহা প্রথমে ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় সপ্তাহে দুইবার প্রকাশিত হতো। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ হতে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে ইহা দৈনিক পত্র রূপে প্রকাশিত হয়। সেই হতে পত্রিকার নাম 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' হয়। নদীয়াতে যিনি প্রকাশিত বা আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর কথা অর্থাৎ গৌর-হরির কথা প্রকাশ করাই এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য। নদীয়া প্রকাশের কথা "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" যদিও এই পত্রিকায় তাৎকালিক সমাজের খবর কিছু কিছু প্রকাশিত হতো মুখ্যতঃ কৃষ্ণ কথা, গৌরের কথাই এর মাধ্যমে প্রচারিত হতো। জগতের অন্য সকল প্রকার সংবাদপত্রে বিষয় কথার পরিবেশন হয়ে থাকে। হরিকথার কীর্ত্তন জগতে বিরল। অথচ তার দ্বারাই জীবের প্রকৃত মঙ্গল লাভ সম্ভব। আত্মপ্রসাদ লাভের অন্য কোন পথ নেই হরি কীর্ত্তন ছাড়া। কিন্তু বিষয় কথাতেই লোকের স্বাভাবিক রুচি, হরি কথায় অরুচি, তথাপি শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিশ্ববাসীর কাছে বাস্তব সত্যের কথা পৌছে দেওয়ার জন্য 'গৌড়ীয়' (পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রিকা) "ভাগবত" (হিন্দী ভাষায় পাক্ষিক পত্রিকা), 'পরমার্থী' (উৎকল ভাষায় পাক্ষিক পত্রিকা) আদি পত্রিকার প্রবর্ত্তন করে জীবের আত্মমঙ্গল করার চেষ্টা করেছিলেন। তৎ পূর্বে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পারমার্থিক পত্রিকার প্রথম প্রকাশক ছিলেন। 'অমৃতবাজার' পত্রিকার প্রবর্ত্তক শ্রীশিশির কুমার ঘোষ মহাশয় ঠাকুর মহাশয়ের বিশেষ অনুগত ছিলেন। তিনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইচ্ছায় 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ করেন। পরে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ১৮৮৬ সালে 'সজ্জনতোষণী' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ পূর্বক শুদ্ধ ভক্তির কথা আলোচনা শুরু করেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে বিপুল প্রচার শুরু করেন। 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ'—তারই এক নিদর্শন স্বরূপ। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি জীবকে বিরূপের ধর্ম্ম ছেড়ে স্বরূপের ধর্ম্মে স্থিত হওয়ার কথা, কুদর্শনের হাত হতে পরিত্রাণ লাভ করে সুদর্শনের কথা, অক্ষজ জ্ঞানে পারমার্থিক বিচারের পথ ছেড়ে অধোক্ষজের আনুগত্য করার কথা জানাতে চেষ্টা করেছেন। ইংরাজী ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত উহা প্রকাশিত হয়। ঐ সকল দৈনিক পত্রিকা পরবর্তীকালে মহাজনগণ গ্রন্থাকারে বাঁধিয়ে রাখেন। দৈনিক পত্রিকার কাগজ তত বেশী ভালো না হওয়ায় গ্রন্থগুলি জীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে যে সকল article রয়েছে সেগুলি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাযুক্ত এবং গভীর অর্থবোধক, এরূপ মূল্যবান কথা শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে চিন্তা করে মিশন কর্তৃপক্ষ উহা হতে মুখ্য মুখ্য article চয়ণ করে গ্রন্থাকারে ছাপানোর ইচ্ছা করেছেন। মিশনের বর্তমান আচার্য ও প্রেসিডেণ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজও এ বিষয়ে বিশেষ ইচ্ছা প্রকট করায় গ্রন্থটি দ্রুত প্রকাশ পাইলেন। এই গ্রন্থে ইং ১৯২৭, ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালের কিছু article প্রকাশ করা হলো। গ্রন্থ প্রকাশনে শ্রীপাদ বৈষ্ণব মহারাজ, নিত্যানন্দ দাস, দিলীপ দাস-এর সেবা প্রশংসনীয়। প্রকাশনে ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। সুহৃদয় পাঠকগণ গ্রন্থের ভাবার্থ গ্রহণ করিলে মিশন কর্তৃপক্ষ পরমানন্দিত হবেন।

শ্রীসজ্জনকিংকরাভাস

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী

সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

শ্রীগৌড়ীয় মঠ কি ?

শ্রীগৌড়ীয় মঠ-মহাকল্যাণকল্পতরুর প্রধান স্কন্ধ। পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের স্বরাজ্যপ্রচারের রাজসভা। সদ্‌গুরু-বৈদ্যরাজ, শ্রীকৃষ্ণনাম-মহৌষধ, মহাপ্রসাদ-পথ্যপূর্ণ ভামন্দোদয় দাতব্য চিকিৎসালয়। অক্ষজ বা আধ্যক্ষিক-অভিজ্ঞতাবাদোত্থ অধিরোহ-বাদধিক্কারী অধোক্ষজ অবরোহ-জ্ঞান-বিজ্ঞান-মহামন্দির। পঞ্চরাত্র-ভাগবত-সমন্বয়-প্রদর্শনী। ভক্তিবিনোদ-চিদ্‌রস-সাহিত্য ঐতিহ্য-সম্প্রদায়বৈভব-তত্ত্ব-ভাগবত-বেদান্ত-সারস্বত-একায়নাসন। স্বরাট্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের ধাম-নাম-কামসেবার অদ্বিতীয় শিক্ষক। শ্রীসজ্জনতোষণী গৌড়ীয় নদীয়াপ্রকাশ-বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহের উদয়াচল। অজ্ঞরূঢ়িপ্লাবিত বিশ্বে শব্দের বিদ্বদ্‌রূঢ়ির অবতার পীঠ। কলিস্থান-পঞ্চক পরিবর্জ্জনকারী শ্রেষ্ঠভক্ত্যঙ্গপঞ্চক সেবা-সদন। কলি-কোলাহলমুখর-বিশ্বে কৃষ্ণকোলাহলমুখর মন্দির। অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টানির্ম্মুক্ত অনুক্ষণ আনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনপর রূপানুগ সারস্বত-তীর্থ। কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদ্যাপীঠ। অকৈতব বাস্তব সত্যানু-সন্ধানের শ্রৌত গবেষণাগার। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছাহীন, নির্ম্মৎসর, নিষ্কপট সাধুগণের নির্গুণ নিবাস। কৃষ্ণার্থে অখিলোদ্যম বা অতিমর্ত্ত্য অর্থনীতি-শিক্ষার একমাত্র মহাবিদ্যালয়। শ্রীনাম-ভজনেই শ্রীরূপ-গুণ-লীলাদির স্ফুরণ, কীর্ত্তনাধীনই স্মরণ-ভাগবত-গোস্বামি-সিদ্ধান্তের মঞ্জুষা। শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর সহস্রধারার সার্ব্বকালিক প্লাবনক্ষেত্র। শ্রীগৌরবিহিত শুদ্ধনাম-রূপ-গুণ-লীলা-বিনোদ-কীর্ত্তনকুঞ্জ। ফল্গুবৈরাগ্য-নিষেধক যুক্তবৈরাগ্য-মূলমন্ত্রাঙ্কিত-মহাচূড়াযুক্ত মহামন্দির। শ্রীব্রহ্ম-নারদ-ব্যাস-মধ্ব-নিত্যানন্দাশ্রিত আশ্রয়জাতীয় সেবকগণের পূজাপীঠ।

—শ্রীল প্রভুপাদ

সূচী-পত্র

নদীয়া-প্রকাশের প্রবন্ধাবলী

৮ম বর্ষ। গৌরাব্দ ৪৪৭ বঙ্গাব্দ ১৩৪০ ইং ১৯৩৩। ১৫৮ তম সংখ্যা হইতে

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

'বেদান্তের তত্ত্ব ও প্রস্থান' সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদানের পর শ্রীল প্রভুপাদ সাধারণের আর্ত্তি অবগত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় উক্ত দিবস (২৭শে আগষ্ট ১৯৩৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠে যে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার যতটুকু লেখনীর সাহায্যে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে। অনেক কথাই অনুসরণ করিতে পারি নাই। তাই পাঠকগণকে সেই সকল কথা প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যদেব বেদান্তের যে বিচার ব'লেছেন, অদ্য সেই কথাই বলা হ'য়েছে। ভগবান্ পুরুষোত্তম পদার্থ, তাঁ'কে নির্ব্বিশেষ বলা উচিত নয়। চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ, কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া আমরা আমাদের ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা এই জগতের বিষয় গ্রহণ ক'রে থাকি। গ্রীক দেশের বিচার এক রকম, আবার চীন দেশের বিচার অন্য প্রকার। কেহ বা অগ্নিকে, কেহ বা সূর্য্যকে সেব্য বস্তু ব'লে বিচার করেছেন, আবার কেহ কেহ ভগবানে মানবের কোন কথা আরোপ করা উচিত নয় ব'লেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত 'অধোক্ষজ' ব'লে একটা কথা ব'লেছেন। ভগবান্ যিনি, তিনি আমাদের অক্ষজ জ্ঞানকে অতিক্রম ক'রে অবস্থান ক'রছেন। তিনি যদি আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হন, তা'হলে তিনি আমার সেব্য না হ'য়ে আমার ভোগ্য হ'য়ে গেলেন। তিনি তা'হলে আমার সেবা ক'রবেন। জগতের বস্তুমাত্রেই আমার সেবা করুক অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করুক, এইটাই জগদ্বাসী চাচ্ছে।

আমরা দেবতাদিগের উপাসনা করি কেন? তাঁ'দের সেবা বা তাঁ'দের সুখ বিধান করবার জন্যে কি? না, তাঁ'রা আমাদের সেবা করবে, আমাদের খিদ্‌মদ্‌গিরি না নকুরী করবে বলে? মার্কণ্ডেয় পুরাণে 'বরং দেহি, ধনং দেহি' প্রভৃতি প্রার্থনা দেখ্‌তে পাই। আমরা সকলে দেবতাদের দিয়ে নিজেদের সুখটা পাইয়ে নিতে চাই, তাঁদের সুখবিধান করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তা'তে কি হচ্ছে? আমরা চিরকাল থাকবো না বটে, কিন্তু আমাদের চেষ্টাটা হচ্ছে, বাদবাকী লোকের চাম্‌ড়া তুলে নিয়ে আমাদের জুতো তৈরী ক'রে আমরা সুখী হ'ব। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সুবিধার জন্যে কেবল চেষ্টা হচ্ছে।

জৈমিনীর দর্শনে নানা দেবদেবীর পূজার কথা আছে; ইহকালে ও পরকালে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যবস্থা আছে। একজন

যদি আর একজনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করতে না পারে, তাহ'লে অপর ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নিকট যায় না। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত হচ্ছি বটে, কিন্তু যাঁ'র কাছ থেকে ইন্দ্রিয়-গুলো পেয়েছি, তাঁর কথাটা একবারও ভাবি না। ইন্দ্র এবং বায়ুরও একদিন অহঙ্কার হ'য়েছিল। তাঁ'রা মনে করেছিলেন যে, তাঁ'রাও স্বতন্ত্র-শক্তিমান্। মূল বস্তু যাঁ'র কাছ থেকে ঐ শক্তি পেয়েছেন, তাঁ'র কথাটা ভুলে গিয়ে ঐরূপ অবস্থাটি হ'য়েছিল। তাই ভগবান্ একগাছি তৃণকে ভাসিয়ে দিতে বা উড়িয়ে দিতে ব'লে তাঁ'দের শক্তির পরীক্ষা ক'রেছিলেন, কিন্তু ইত্যবসরে তাঁ'দের সমস্ত শক্তি হরণ ক'রেছিলেন। তাতে ইন্দ্রদেব বা পবনদেব ঐ তৃণ গাছিটিকে ভাসিয়ে দিতে বা উড়িয়ে দিতে পারেন নি। মূল আকর থেকে যদি শক্তি না আসে, তবে সব্ ঠাণ্ডা। যেমন দেখুন, মূল আকর থেকে বিজ্‌লী আস্‌ছে, তাই এই আলো জ্বলছে, পাখা চলছে, কিন্তু মূলে উহা বন্ধ হইলেই সব ঠাণ্ডা। তাই মূল বস্তুর যদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করি, তবে সঙ্গে সঙ্গে সকলের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হবে।

নানান্ দেশের মতবাদ মীমাংসা করা আবশ্যক। আর সেই সব মীমাংসা দ্বারা মানবজাতির উপকার করা দরকার, তাতে আমাদেরও স্বার্থপরতা আছে। অশোক রাজার সময় পশুদিগের রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা হ'য়েছিল—প্রাণীদিগের প্রতি দয়া করবার চেষ্টা হয়েছিল। মানুষের রক্ত খাইয়ে 'খাট্‌মল' খেলানরও ব্যবস্থা দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কিন্তু ঐ সব ব্যবহারের মধ্যে মনুষ্যজাতির স্বার্থ-পরতা প্রচ্ছন্নভাবে লুকানো আছে। জন্তুর মাংস দিয়ে মানুষের শরীর পুষ্ট করবারও ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কোন্ শক্তিবশে আমরা কার্য্য করি, তাহার কোন ধার ধারি না —"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদির কোন চিন্তা আমাদের নাই।

সকলেরই চেষ্টা কেবল সুখান্বেষণ; কিন্তু ইহাতে খুব যথেচ্ছাচারিতা আছে। কিন্তু আমাদের সব সুবিধা হ'য়ে যা'বে যখন আমাদের আলোচ্য হবে—"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ। ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং সাধ্যং তৎ-প্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥" সেই বস্তুটি পরিপূর্ণ, তাঁ থেকে আমরা সমস্ত শক্তি লাভ ক'রেছি। সাকারবাদ বা নিরাকারবাদ একই জিনিষ। সাকার নিরাকারবাদের বস্তু যদি তিনি হন, তবে তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকারান্তরে আমাদের ভোগ্য বস্তুর সামিল হ'য়ে যান। তিনি মূল বস্তু, আমি তাঁ'র অংশ এই বিচার হ'লে তাঁর সেবা করা যাক এই রকম বিচার এসে যায়।

ইন্দ্রিয়গুলো সর্ব্বদাই ভোগপ্রবণ, অন্য লোকের কাছ থেকে ভোগ্‌টা নেবার জন্যে ব্যস্ত। যিনি আমাদের ভোগ করবার বাসনাটা হরণ করতে পারেন তিনিই হচ্ছেন 'হরি'। আমাদের এই ভোগবাসনাটাই অনর্থ, এই অনর্থটা যাবে কিসে? এই অভদ্র বা অমঙ্গলের হস্ত থেকে কিসে ছুটি পাওয়া যায়? ভাগবত ইহার উত্তর দিয়েছেন—'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চবিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥" ভগবান্ কৃষ্ণের স্মৃতি যদি হয়, তবে অমঙ্গলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, নতুবা নহে।

কিন্তু কোন্ কৃষ্ণের স্মৃতি দরকার? কৃষ্ণ-বস্তুটি ঐতিহাসিক নায়ক-বিশেষ, এ রকম বিচার এলে মঙ্গল হ'বে না। বঙ্কিম বাবুর 'কৃষ্ণ-চরিত্র' পড়ে কৃষ্ণকে নায়ক মনে করলে মঙ্গল হ'বে না। হাতীর লেজ্ দেখে হাতীর বিচার করতে গেলে আংশিক বিচার এসে যাবে। ঐরকম চিন্তাস্রোতের মধ্য থেকে পূর্ণতত্ত্বের বিচারে আস্‌তে হ'বে। সেই আকরবস্তুটি হচ্ছেন অখিলরসামৃতমূর্তি; তাঁ'তে পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। আংশিকভাব অপনোদন করবার জন্য হরিই একমাত্র আরাধ্য বস্তু। যাঁ'তে সর্বপ্রকার রসই লাভ হতে পারে, তাঁতে সব রকমের রসই আছে।

'রসের' সংজ্ঞাটা কি?

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং সদতে স রসো মতঃ॥"

সমস্ত মনোধর্ম্মকে অতিক্রম ক'রে যেটা নির্ম্মল চিত্তে আস্বাদিত হ'তে পারে, বহির্জ্জগতের কোন চিন্তাস্রোত এসে বাধা দিতে না পারে সেই নির্ম্মল চিত্তটা এ রকম ইন্দ্রিয় নয়। সেই বস্তুটি আবার 'সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট' ও রসাব্ধি। কাব্য-রস প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আংশিক রস, গরুর ক্ষুরের পরিমিত জলতুল্য। সমস্ত রসটা সেইখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

"তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ-জীবান্"—তাঁহা হ'তে আমরা ভিন্ন হ'য়ে পড়েছি। যদি তাঁ'কে জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে এনে ফেলি, তাহ'লে তাঁকে আমাদের সেবক ক'রে ফেলা হ'য়ে যায়। আমরা ক্ষুদ্র জীব যদি বড় হ'বার চেষ্টা করি, বৃহৎ বস্তুর সমকক্ষ হ'তে চেষ্টা করি, তা'হ'লে গোলকের (বলের) মত ফেটে যাবার চেষ্টা করা হয় মাত্র। অভেদ-বাদীর বিচার তাঁর সঙ্গে মিশে যাব। এ রকম বিচারে অস্থবিধার মধ্যে পড়তে হয়। ঘটাকাশ মহাকাশের বিচারে ঘটটা ভেঙ্গে দিয়ে ঘটাকাশ মহাকাশে মিশে, এ রকম বিচার থেকে অবসর পাবার দরকার হয়েছে।

একটা উদাহরণ দেই; সূর্য্যের উজ্জল পরিধি রশ্মি, ছায়া বা ছায়াভাস—এসব সূর্য্য না থাক্‌লে কিছুই থাকে না। একটা রশ্মিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, 'তুমি কি সূর্য্য' সে বল্‌বে 'না'। সূর্য্য না থাক্‌লে ঐগুলো থাকে না। চৈতন্যদেবের বিচারে সেই বস্তুর সঙ্গে জীবের ভেদও বটে অভেদও বটে। জীবের মধ্যেও আবার তারতম্য আছে, কেহ উন্মুখ, কেহ বিমুখ, কেউ পরোপকারী হ'য়েছে, কেউ হয়নি। এখন আমাদের যে সব কাজ পড়ে গিয়েছে, তা'তে মানুষের বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারা যায় না। মানুষ কখনও Zoomorphic কখনও phytomorphic হচ্ছে, সেবাটা ভুলে যাচ্ছে।

আমি যদি শ্রীবিগ্রহ দেখ্‌ছি বলি, তাহ'লে শ্রীবিগ্রহ দেখা হয় না। আমি তাঁ'কে দেখ্‌ছি যখন বলি, তখন তিনি আমার সেবক হ'য়ে যান্। শ্রীবিগ্রহ আমাকে দর্শন কর্‌বেন, এই বুদ্ধিতে তাঁ'র কাছে আমার আসা দরকার; এ রকম বিচারে ভগবানের কাছে যাওয়া যায়। জীবের মধ্যে কেউ বদ্ধ, কেউ মুক্ত; মুক্ত যাঁরা, তাঁরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবানের সেবা করেন।

অভেদ প্রকাশ কি? এতে দরিদ্র নারায়ণ বলে একটা কথা এসে পড়েছে। দরিদ্রতাকে নারায়ণ বলা, বা নারায়ণ বস্তুতে দরিদ্রতা আরোপ করা খুবই পাষণ্ডতা। বৈকুণ্ঠ-জগৎ সম্বন্ধে ইহজগতের কোন আরোপবাদ ক'রতে হ'বে না। সেখানে সকল বিচিত্রতা আছে, এখানে তার বিকৃত প্রকাশটা দেখা যাচ্ছে।

"সাধন—শুদ্ধভক্তি"। শরণাগতির ভাবটা আমাদের নিতে হ'বে। সেবা-প্রবৃত্তি হ'তে নির্ম্মলা ভক্তির উদয়; 'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥' কৃষ্ণবস্তুটি পূর্ণতার জ্ঞাপক, ব্রহ্ম বস্তুটি যদি ঐ রকম হয়, তাতে কোন বাধা নাই।

'প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ'। সমস্ত বস্তুর সহিত ভগবানের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ (trace) করা উচিত। পুষ্প ভগবানের সেবায় লাগ্‌তে পারে, তাঁ'র উচ্ছিষ্ট বোধে গ্রহণ করা যেতে পারে, আবার নিজের ভোগেও লাগ্‌তে পারে। ভগবদ্-অনুরাগক্রমে ইতর বস্তুতে বিরাগ উপস্থিত হ'তে পারে, নচেৎ হয় না। সমস্ত অর্থই ভগবানের কার্য্যে নিযুক্ত করা দরকার। প্রত্যেক বস্তুর সম্বন্ধটা জান্‌তে হ'বে। আমাদের ঠিক গৃহপালিত পশুর মত থাক্‌তে হ'বে; তিনি যদি খাওয়ান, তবে খাবো, নইলে নয়।

ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী প্রভৃতি ভাষায় শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় আমরা বুঝে নিতে পারি, কিন্তু 'কৃষ্ণ' শব্দটি সেরূপ নয়। তাঁ'কে নিজ চেষ্টায় বুঝে নেবার চেষ্টা না করে, সেবোন্মুখ হইয়া তাঁ'র কাছে অগ্রসর হ'তে হ'বে। আমরা প্রভু, আমরা যেরকমভাবে (Twist করবো) তাঁ'কে আকার দেবো, তিনি সেই রকম হবেন। বিচারে আমাদের সুবিধা হ'বে না। 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন' বিচার গ্রহণ ক'রতে হ'বে, কৃষ্ণের অনুশীলন করতে হবে। ইতর বস্তুর অনুশীলন করলে ভক্তি হবে না। মহাপ্রভুর মতে সমস্ত জিনিষটা

তাঁ'তে নির্বন্ধ করতে হ'বে। ভগবান্ অচেতন পদার্থ নন্, তাঁ'কে ডাক্‌লে পরে সব সুবিধা হ'য়ে যা'বে। তিনি যদি নায়কমাত্র হন, তাহ'লে তাঁকে ডাক্‌লে কি সুবিধা হবে? অতএব শুদ্ধভক্তিই একমাত্র পথ। ব্রহ্ম বস্তুর যদি আংশিক, খণ্ডিত-ভাব গ্রহণ করা হয় তাহ'লে মঙ্গল হবে না। ঐ রকম বস্তুর 'প্রীতিমেব চ' অর্থাৎ তাঁর যদি ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করি, তাঁর কথাটা চরিতার্থ করি, তা হ'লে মঙ্গল হবে। ঐ ব্যাপারটাই বেদান্তের বিচার্য্য বিষয় এবং মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত ঐ। চৈতন্যদেবকে যদি ৪০০ বৎসরের পূর্বে একটা মানুষ ব'লে মনে করি, তা'হ'লে বিপদ্ হ'বে।

শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণ

আমরা শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাই বৈকুণ্ঠবাসী সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীনারায়ণ ও মাধুর্য্যময়-বিগ্রহ বৃন্দাবনবাসী শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই একতত্ত্ব। উভয়ের মধ্যে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই কেবলমাত্র লীলারসগত পার্থক্য। একটি ঐশ্বর্য্যযুক্ত, চারি-হস্ত-বিশিষ্ট, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী; অপরটি মাধুর্য্যময়, দুই-হস্ত-যুক্ত, ত্রিভঙ্গভঙ্গিমারূপ মুরলীবদন। এখন বিচার্য্য কোন্‌টি মূল-বিগ্রহ। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেন,—"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। কৃষ্ণ হইতেই নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, পুরুষাদি অবতারত্রয়, বলদেব প্রভু, দশরথ-তনয় রাম, বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, সমস্ত অবতার ও দশাবতারগণ। কৃষ্ণই মূলপুরুষ বা অবতারী। আরও দেখিতে পাই, নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের চারিটি অধিক অসাধারণ গুণ যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

> সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ-বিলাস।
> ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহার অধিক উল্লাস॥

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু নিজকৃত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে লিখিয়াছেন,—

> সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
> রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গার-রস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। একটি সরল ভাষায় উদাহরণ দিলে এই বিষয়টি সহজেই বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। যদিও উদাহরণটি সর্বতোভাবে সামঞ্জস্য হইবে না তথাপি দিগ্‌দর্শনের নিমিত্ত দেওয়া হইতেছে। আশা করি সুধী পাঠকগণ ইহার ভাবার্থ যথাযথরূপে গ্রহণ করিবেন। যেমন আমাদের সম্রাট্ তাঁহার প্রজাদিগের নিকট দণ্ড, মুণ্ডের বিধাতা বলিয়া প্রতীয়মান হন এবং প্রজা বা সেবকগণ সর্ব্বদা সম্ভ্রমে দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার সেবা প্রার্থনা করেন, আবার সেই রাজাই তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের নিকট বিশ্বস্ত সহকারে আলাপাদি করেন এবং সেই রাজা তাঁহার পিতা-মাতার নিকট স্নেহের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হন ও সেই এক ব্যক্তিই তাঁহার স্ত্রীর নিকট স্বামী বলিয়া পরিচিত হন এবং তাঁহার স্ত্রী বা মাতা-পিতা, তিনি সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট্ হইলেও যেমন তাহা স্বীকার না করিয়া ঐ সম্রাট্‌কে নিজ-পুত্র বা স্বামী-জ্ঞানে তাড়ন ভর্ৎসন করেন, তদ্রূপ সেই একই কৃষ্ণ সেবকের সেবা ও ভাব-অনুযায়ী তৎ-তৎ বিষয়রূপে উদিত হইয়া তাঁহার প্রিয় সেবকের আনন্দ বিধান করেন। বোধ করি পাঠকগণ এখন সহজেই বুঝিতে পারিবেন কোন্‌টি সর্বোপরি ও পূর্ণানন্দদায়ক।

নারায়ণ আড়াইটি রসের উপাস্য বস্তু আর শ্রীকৃষ্ণ রস-পঞ্চকের ভজনীয় ধন। নারায়ণের পিতা মাতা নাই। যাঁহার মাতা-পিতা আছে তিনি কিরূপে বড় বা মূল হইতে পারেন? তাহা হইলে ত মাতা-পিতাই মূল বা বড় হইয়া গেল এরূপ পূর্বপক্ষ হইতে পারে। তাহার উত্তর এই—প্রেমের বশ, সেই নিমিত্ত তিনি স্বয়ং অনাদির আদি হইয়াও তাঁহার প্রেমময় ভক্তের নিকট বশ্যতা স্বীকার

করেন। বস্তুতঃ তাঁহা হইতে কেহ বড় হইতে পারে না। যশোমতী যখন মনে করিলেন আমি কৃষ্ণকে দড়ি দিয়া বাঁধিতে পারি তখন লীলাময় কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখাইলেন যে আমি দড়ির দ্বারা বন্ধনের বস্তু নহি অর্থাৎ কৃষ্ণকে একমাত্র নির্ম্মল-প্রেমযুক্ত ভক্তি ব্যতীত বাঁধা যায় না। কৃষ্ণ নিত্যকালই সবচেয়ে বড় হইতেও দুই আঙ্গুল বড়। কৃষ্ণ সবচেয়ে বড় শয়তান অপেক্ষা দুই আঙ্গুল বড় শয়তান। কৃষ্ণ সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমান্ অপেক্ষা দুই আঙ্গুল বেশী বুদ্ধিমান্। তাহার প্রমাণ এই—অতি বুদ্ধিমান্ হিরণ্যকশিপু মনে করিয়াছিলেন যে তাহাকে কেহ মারিতে পারিবে না, তিনি অমর। অতএব তিনি যাহা খুসী অবিচার করিতে পারেন। তখন ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টের দমন ও ভক্তের পালন নিমিত্ত অতি বুদ্ধিমান্ হিরণ্যকশিপুর বুদ্ধির অগোচর রূপ ধারণ করিয়া এক মুহূর্ত্তে তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া জগৎকে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠতা জানাইয়া দিলেন। এক সময় শিবভক্ত এক ব্যক্তি উপাসনার দ্বারা ভোলানাথ শিবকে সন্তুষ্ট করিলে শিব সেই প্রিয় সেবককে এমন একটি বর দিলেন যে, উক্ত বরলাভকারী যাহার মস্তকে হাত দিবে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। এই বর পাইয়া সেই ব্যক্তি গুরুকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিবার নিমিত্ত ঐ বরের প্রকৃত ফল পরীক্ষার উদ্দেশ্যে শিবেরই মস্তকে হাত দিতে গেলেন। শিব দেখিলেন উপায় নাই, তখন তিনি মনে করিলেন—কি অন্যায় কার্য্যই না করিয়াছি? চিন্তাকুল চিত্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে বিষ্ণুর নিকট ছুটিলেন। উপযুক্ত শিষ্যও পাছে পাছে মস্তকে হস্ত দিবার জন্য ছুটিতেছেন। এমন সময়ে কৃষ্ণ এক ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এরূপ দৌড়াইবার কারণ কি? তখন সেই ব্যক্তি সমস্ত ঘটনা বলিল। ব্রাহ্মণ-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আরে পাগল! তাও কি কখন হয়! তুমি বুদ্ধিমান্ হইয়া এই শ্মশানবাসী শিবের কথা সত্য বলিয়া মনে কর? তুমি ত' অনায়াসে উহা নিজের উপরই পরীক্ষা করিতে পার। এই বলিলে সেই ব্যক্তি ভাবিল, বটেই ত আমি ত অত্যন্ত বোকা এবং ঐ কথামত যেমনি সে নিজ মস্তকে হাত দিল অমনি একেবারে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তাই বলি শ্রীকৃষ্ণ সকলের চেয়ে দুই আঙ্গুল বড়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে বেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থান-কালে হাস্য-পরিহাসচ্ছলে ঐ লক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক ভট্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভট্ট, তোমার পতিব্রতা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী আমার ঠাকুর কৃষ্ণ-গোপের সঙ্গম করিবার জন্য চিরকাল সুখ-ভোগ ছেড়ে ব্রত তপ করে থাকেন, ইহার কারণ কি? ভট্ট কহিলেন, কৃষ্ণ ও নারায়ণ স্বরূপতঃ এক হইলেও কৃষ্ণেতে অধিক মাধুর্য্যময়-লীলা বর্ত্তমান। সে-কারণে লক্ষ্মী কৃষ্ণের সঙ্গম চাহেন, ইহাতে কি দোষ। কৃষ্ণসঙ্গে লক্ষ্মীর পতিব্রতা-ধর্ম্ম নাশ হয় না, আরও রাসবিলাসরূপ অধিক লাভ হয়। ইহাতে আপনি কেন পরিহাস করিতেছেন? প্রভু উত্তরে বলিলেন,—দোষ নাই তাহা আমি জানি, তবে শাস্ত্রে শুনা যায় তিনি রাস পান নাই। লক্ষ্মী রাস পাইল না, আর শ্রুতিগণ তপ করিয়া কিরূপে রাস পাইল? ভট্ট বলিলেন, ইহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রবেশ করিতেছে না। আপনি কৃপা করিয়া ইহার কি কারণ বলুন। তখন মহাপ্রভু বলিলেন,—

কৃষ্ণের এক সজীব লক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে সর্বচিত্ত করে আকর্ষণ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন॥
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদুখলে বাঁধে।
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কাঁধে॥
শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরী-সুত ভজে গোপীভাব লঞা॥
বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥
গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপী রাগানুগা হইয়া না কৈল ভজন॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাস-বিলাস।
অতএব 'নায়ং'-শ্লোক কহে বেদব্যাস॥

নারায়ণ কৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ। গোপীগণ নারায়ণকে দেখিলে দণ্ডবৎ, স্তুতি করিয়া আপন প্রিয়তম কৃষ্ণকে মিলাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করেন। নারায়ণ গোপীগণের মন হরণ করিতে পারেন না। নারায়ণের কথা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিয়া স্বয়ং নারায়ণরূপে প্রকাশ পাইলেও গোপীগণের তাহাতে অনুরাগ হয় নাই। ঐশ্বর্য্য যেখানে প্রবল সেখানে প্রীতি সঙ্কুচিত। সেজন্য গোপীগণ কৃষ্ণের লেশমাত্র ঐশ্বর্য্যও স্বীকার করিতে চান না অর্থাৎ নিজের কোন সম্বন্ধ স্বীকার করেন না।

'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই বিষয়টী আদৌ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, সেব্য বস্তু কিরূপে সেবকের নিকট ছোট সাজিয়া সেবকের সেবা গ্রহণ করিতে পারেন? সেব্য বস্তু নিত্যকাল সেবক হইতে উচ্চে অবস্থান করিবেন এবং আমরা সেবকগণ তাঁহাকে সম্ভ্রমযুক্ত হইয়া নিত্যকাল তাঁহার সেবা করিব। সেজন্য তাঁহারা দাস্য ও গৌরব সখ্যের অধিক আর বুঝিতে পারেন না। এজন্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বাল-গোপাল উপাসনার দ্বারা দেখাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মর্য্যাদারস অপেক্ষা বৎসলরসের মধুরিমা অত্যন্ত অধিক, সেখানে ভজনীয় বস্তুটি নিজ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে প্রেমভক্ত সেবকের নিকট পুত্র সাজিয়া দাস্য ও গৌরবসখ্য হইতে আরও অধিক ভালবাসাযুক্ত হওয়ায় সম্বন্ধটী ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িতেছে। নন্দ-যশোদার শুদ্ধ বৎসলরসের কৃষ্ণসেবা ও নারায়ণ-সেবকের গৌরবযুক্ত দাস্যরসে নারায়ণ-পূজা এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টি অধিক আনন্দযুক্ত তাহা এখন সহজেই অনুমেয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু এজন্য মধ্ব-সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে স্বীকার করিলেন ও বৎসলরস হইতে আরও উচ্চ রস বা সর্বশ্রেষ্ঠ রস জগৎকে বিলাইবার জন্য স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও আশ্রয়ের ভাব ও অঙ্গকান্তি গ্রহণপূর্বক জীবের দ্বারে দ্বারে সেই প্রেমধন অযাচকে বিলাইয়াছিলেন।

——::*::——

শ্রীকৃষ্ণভজন করিব কেন?

কৃষ্ণ-ভজনই জীবের সহজ ধর্ম্ম। কৃষ্ণেতর বিষয়ের সেবা জীবের সহজাত বা নিত্য ধর্ম্ম নহে, কোন না কোন হেতু মূলক। পঞ্চোপাসকগণের উপাসনামূলে আমরা দেখিতে পাই, তাহা নিষ্কাম সেবামূলা নহে, পরন্তু হেতু-ধর্ম্মে অবস্থিত। কোন না কোন জাগতিক অভীষ্ট সাধনের জন্যই এই সকল বিবিধ উপাসনার (?) অবতারণা। যথা, জীব যখন জাগতিক সুখের ক্ষণভঙ্গুরতা-দর্শনে জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিমুখ হইয়া তদপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী সুখের জন্য লালায়িত হন, তখন স্বর্গভোগের আশায় পুণ্য সঞ্চয় করিবার জন্য সূর্য্যপূজার আবাহন করেন। যখন জাগতিক কোন কর্ম্মের সিদ্ধি অথবা অর্থ-লাভের বাসনা হয়, তখন গণেশের পূজা করেন। যখন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন, তখন বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য শক্তি (?) পূজায় নিযুক্ত হন, আবার স্বর্গাদি সুখও নিত্যকাল স্থায়ী হয় না দেখিয়া এই সকল ধর্ম্ম অথবা অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া মোক্ষ-লাভের আশায় শিবের শরণাপন্ন হন। এ সমস্ত উপাসনাই হেতুমূলক, অহৈতুকী নহে এবং যে সকল আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল পূজার আবাহন, সে সকল বস্তু লাভ হইয়া গেলে, পূজার আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না বলিয়া তাহা অপ্রতিহতা নহে। এইরূপ হেতুপ্রযুক্ত ও সীমাবদ্ধ ধর্ম্ম পরধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। তিনিই সকলের প্রভু এবং আর সকলেই তাঁহার দাস। তাঁহার সেবা করিলেই সকলের সেবা করা হয়, স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার পূজা করিতে গেলে, তাহা অবিধিপূর্বক পূজা হইয়া পড়ে।

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

—(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

অর্থাৎ বৃক্ষের মূলে বারি সেচন করিলে যেমন তাহার শাখা-প্রশাখা সমস্তই তৃপ্ত হয়, সেইরূপ মূল-পুরুষ যে কৃষ্ণ তাঁহার সেবা করিলে সকলেরই তৃপ্তি হইয়া থাকে।

সুতরাং কৃষ্ণভজনই জীবের নিত্যা বৃত্তি। নিখিল জীবাত্মা তাহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

———

দুই বন্ধু

এক সময় দুই বাল্যবন্ধুর, বহুদিন পর সাক্ষাৎ হইলে, উভয়েই আনন্দিত হইয়া পরস্পর কিছুক্ষণ আলাপের পর একত্রে ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মণ-কুলে উদ্ভূত ছিলেন; কিন্তু তন্মধ্যে একজন গৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। দুইবন্ধু যাইতে যাইতে সম্মুখে একটি পুষ্পোদ্যান দর্শন করিলেন। পুষ্পোদ্যানটি দেখিয়া এক বন্ধু বলিলেন, বন্ধো! ঐ বাগানটিতে যাই চল, একটু বিশ্রাম করিগে। এরূপভাবে দুই বন্ধু বাগানটিতে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া উভয়েই বাগানটীর চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, বিভিন্ন রংয়ের ফুল বিভিন্ন গাছেতে ফুটিয়া রহিয়াছে, সুগন্ধে স্থানটি আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই বন্ধু পুনরায় বলিলেন—"দেখ দেখি বন্ধো, কি মনোরম স্থান! এখানে আসিয়াই যেন একটা আনন্দ বোধ হচ্ছে, এই আনন্দেই তো ভগবান্ আনন্দিত? এই বাগানটি যদি আমাদের হইত, তাহা হইলে নিত্যই এরূপ আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম। কেমন বন্ধো! তোমার কি মনে হয়?

(অন্য বন্ধুর উত্তর)—দেখ বন্ধু! তোমার এই বিচার-গুলি আমার মনে তত ভাল লাগ্‌লো না; কেন লাগ্‌ল না তাহা বলি, শোন।

দেখ, তুমি আমার বাল্যবন্ধু, সেই জন্য বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য বিচারে, আমি শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা পাঠ করে যেটুকু বুঝেছি তাহা কিছু বল্‌বো। একটু মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। আমরা এই পরিদৃশ্যমান জগতে যে বস্তুসমূহ দর্শন করি, এইগুলি সমস্তই অনিত্য। অর্থাৎ পূর্বে ছিল না বর্ত্তমানে কিছুকাল দৃষ্ট হইতেছে এবং কিছুকাল পরে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। সুতরাং চঞ্চল বস্তুতে নিত্য আনন্দ লাভ কখনই হইতে পারে না। যে-সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা আনন্দলাভ কর্‌তে চাচ্ছি, তাহারাও চিরস্থায়ী নহে।

এই যে আমাদের দেহেতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় রহিয়াছে, ইহারা প্রত্যেকেই জড়বিষয়ের দিকে প্রধাবিত হইতেছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ আর মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয়, ইহারা সকলেই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদি মায়িক বিষয়েতে মত্ত রহিয়াছে। মায়াবদ্ধ জীবের দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ জড়াভিনিবেশতাই স্বভাবে পরিণত হয়।

কোন ভক্ত আমাদের মঙ্গলের জন্য বলিয়াছেন :—

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥

—(ভাঃ ৭।৯।৪০)

জিহ্বা টানে রস প্রতি, উপস্থ কদর্থে।
উদর ভোজনে টানে বিষম অনর্থে॥
চর্ম্ম টানে শয্যাদিতে, শ্রবণ কথায়।
ঘ্রাণ টানে সুরভিতে, চক্ষু দৃশ্যে যায়॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়ে কর্ম্ম টানে, বহু পত্নী যথা।
গৃহপতি আকর্ষয় মোর মন তথা॥

সৎসঙ্গ-প্রভাবে জীব-স্বরূপে অর্থাৎ আত্মাতেই আত্মোপলব্ধি করিতে পারে। তখন মুক্ত-জীব আত্মচক্ষু দ্বারা সেই পরমাত্মা অর্থাৎ ভগবানেতে নিত্য বিষয়-বৈচিত্র্য দর্শন করেন; তখনই আমরা উপনিষদুক্ত মন্ত্রের সেবা করিতে পারি। অর্থাৎ বর্ত্তমানে যে আমাদের আত্মভোগের প্রবৃত্তি, তাহা আর থাকে না, তখন আমরা এই মন্ত্রে দীক্ষিত হই—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্॥

পরিদৃশ্যমান জগতের সমগ্র বস্তুই শ্রীভগবানের সেবোপ-করণ, এই বিচার হইলে সেই বস্তুসমূহ ভোগ কর্‌বার এবং ত্যাগ কর্‌বার দুর্বুদ্ধি আমাদের আর থাকে না। এই

শ্রীভগবানের সেবোপকরণেতে যে জীবের ভোগাকাঙ্ক্ষা এবং ত্যাগস্পৃহা—দুইটিকেই শাস্ত্রে কাম বলিয়াছেন।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

আমরা কামকেই প্রেম মনে করি। অর্থাৎ মনে করি আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইলেই, ভগবান্ সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল বিচার। দেখ, চৈতন্যচরিতামৃত কি বলিয়াছেন—

কাম-প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥

কামের তাৎপর্য্য নিজ-সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেমত প্রবল॥

তোমাকে আমি বন্ধু ব'লে এত কথা বললাম, আর একটি কথা—দেখ, সদ্‌গুরু অর্থাৎ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ গুরু ব্যতীত এসব তত্ত্ব কিছুতেই স্ফূর্তি পায় না। যা হোক্ তুমি সময়মত কিছুদিন শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পাঠ কর, তাহা হইলে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান ক্রমশঃ তোমার হৃদয়ে স্ফূর্তি পাইবে।" (তখন সেই বন্ধু বলিলেন ঃ—) আঃ বন্ধো! তুমি আমাকে মস্ত বড় একটা জ্ঞানের আলোক দিলে। ওঃ, আমি কি ঘোর অন্ধকারে যাচ্ছি! আচ্ছা চল এখন বাড়ী যাই, আজ হ'তে আমিও তোমার সঙ্গে গৌড়ীয় আলোচনা করিব, এবং সাধুসঙ্গ করিব।

—::○::—

পরস্পর আলাপ

কৃষ্ণদাস—আর ভাই ভাল লাগে না। তোমাদের ওই রোজ রোজ একঘেয়ে কথা—কৃষ্ণ-সেবা, কৃষ্ণ-সেবা আর কৃষ্ণ-সেবা। তোমাদের কি ভাই আর অন্য কথা নাই দুনিয়ায়, যার দ্বারা দেশের ও দশের উপকার হয়। তোমাদের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে তিক্ত-বিরক্ত হ'য়ে গেলাম। ঘাটে নাই, মাঠে নাই, ট্রেণে নাই, কাগজে নাই—সর্ব্বত্র ওই এক কথা। তোমরা কি ভাই কিছু যাদুবিদ্যা জান?

গৌরদাস—কেন বন্ধো, তোমার ত' একথা সাজে না। তুমি যে নিজেই কৃষ্ণদাস। দাসের কাজ হচ্ছে প্রভুর গুণ কীর্ত্তন, তা'র ত' এ'তে বিরক্তি হ'বে না, বরং আরও শুন্‌বার জন্য সে আগ্রহ প্রকাশ কর্‌বে। তবে কি জান্‌তে হ'বে, তুমি এর দ্বারা আরও শুন্‌বার জন্যে ইচ্ছা কর্‌ছ?

কৃষ্ণদাস—বেশ ভাই বেশ, ধন্য তোমাদের ক্ষমতা, তোমরা এরকম ক'রে কথাগুলিকে ঘুরিয়ে নিতে শিখলে কি করে? আমি বল্‌লাম এক, আর তুমি তার মানে কল্লে আর এক। তাই ত' বলি—তোমরা কি যাদুবিদ্যা শিখেছ? আর যে তুমি ভাই আমার নামের কথা বল্‌ছ—সে যদি আমি ভাই জানতাম সে সময়, তা'হলে কি আর ও-নাম রাখতে দিতাম? এখন যাক ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে বল দেখি—তোমরা সত্যি সত্যি দেশের জন্যে কি কোর্‌ছ।

গৌরদাস—দেশ বল্‌তে যেটাকে তোমরা বর্ত্তমানে ধরে নিয়েছ সেটা কতদিনের জন্য বল দেখি? কথাটা একবারও ভেবে দেখবার অবসর হ'য়েছে কি? আজ না হয় তুমি নিজেকে বঙ্গবাসী, বঙ্গের সুসন্তান বলে নিজেকে গৌরব মনে কোর্‌ছ। সেটা ত' মাত্র ভাই পঞ্চাশ, ষাট বছর পর্য্যন্ত! এর চেয়ে ত' আর বেশী নয়। তার পর যে তোমাকে আবার কোথায় যেতে হ'বে তার কি কিছু ঠিক আছে? তোমরা যে জাতীয়তা জাতীয়তা ক'রে অস্থির হ'য়ে সমস্ত জীবনটাকে বিসর্জ্জন করছ, তা'র ফলে বাস্তবিক তোমরা কি সুবিধা পাচ্ছ বল দেখি? তাই বলি ভাই, তোমরা মানুষ হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছ, বিচারশক্তি আছে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, বেশ বুঝতে পার, তবে কেন ভাই এ অসার ক্ষণস্থায়ী আলেয়ার পেছু পেছু ঘুরে মর্‌ছ? এতো তোমাকে কোনদিন শান্তি দিবেই না বরং দুঃখ হ'তে আরও অধিকতর দুঃখের মধ্যে নিয়ে যাবে।

কৃষ্ণদাস—ভাই, মনে কিছু ক'রো না, তোমাদের ঐসব আধ্যাত্মিক কথাগুলি শুনলে আমার পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে যায়। চাক্ষুস দেখছি লোক-সব না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে, দেশে সর্বত্র দুর্ভিক্ষ—সমস্ত লোক মহামারী, বন্যায় অস্থির হ'য়ে উঠেছে, হা অন্ন হা অন্ন ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছে, অঙ্গে বস্ত্র নাই, পরণে জীর্ণ মলিন শত-ছিদ্র-যুক্ত কাপড়, বিদেশীর অত্যাচারে আজ মানবজাতি প্রপীড়িত আর তুমি কিনা বলছ—এ রকম করে ঘুরে মরে কি হ'বে? আশ্চর্য্য! ধন্য তোমরা ভাই! তোমাদের ভগবান না জানি কি দিয়েই গড়েছিল! তোমাদের হৃদয়ে কি একটুও দয়ার লেশ-মাত্র নাই?

গৌরদাস—পূর্বেই বলেছি—ভাই, তোমরা মানুষ হ'য়ে জন্ম নিয়েছ, নিজেদের সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ব'লে বড়াই কর কিন্তু দুঃখেরবিষয় তোমরা এই সামান্য বিষয়টাকে একটু তলিয়ে বুঝতে চাও না। এই যে মানুষদের ত্রিতাপরূপ জ্বালা সর্বক্ষণ কষ্ট দিচ্ছে এর কারণ কি? এবং এর কি করেই বা উপশান্তি হয়, সে কথা একবার ভাল করে বিচার করেই দেখনা কেন? তোমার কথাগুলি ঠিক ঐ রোগ-অবস্থায় প্রলাপ বকার মত। যাঁরা সত্য সত্য ঐ রোগীর মঙ্গলকামী তাঁরা কখনও ঐ রোগীর কথামত চ'লবেন না। রোগী ব'লতে পারে—ডাক্তার বাবু, আমার বিষফোঁড়া হয়েছে আপনি দয়া করে ফোঁড়াটা না কেটে উপর উপর হাত বুলিয়ে ছেড়ে দিন, কাটবেন না। তা'হলে কষ্ট পাব। কিন্তু যেমন সদ্‌বৈদ্য তা'র কথা না শুনে রোগীর কাছে আপাত-নিষ্ঠুর সেজে ফোঁড়াটিকে বেশ করে কেটে সাফ করে দেন, যাতে করে ভবিষ্যতে আর বিপদের সম্ভাবনা না থাকে এবং রোগী যাতে বাস্তবিক শান্তি পায় তেমনি আমাদের সত্য সত্য নিত্য-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণব দয়া করে এই মায়ার সংসারের ত্রিতাপ জ্বালা থেকে চিরকালের মত শান্তি দেওয়ার জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সেই শান্তি সংবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু হায়! মন্দভাগ্য জীব আপাত-সুখান্বেষী মানব সে-সব কথার একবারও কর্ণপাত না করে মায়ার মিথ্যা-রূপের মোহে নিজেকে চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়ে ঐ ক্ষণজীবী বাদলে পোকার মত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরছে। নিজের চোখের সামনে দেখছে যে তার মত শত শত জীব ঐ মোহিনীরূপের আলোয় নিজেকে ডালি দিয়ে আর ফিরে আসছে না তথাপি সে দৌড়ে ছুটে চ'লেছে ঐরূপ ভোগ করবার জন্য, কিন্তু জানে না মূর্খ জীব, অবোধ প্রাণী, এ যে তার ভোগের বস্তু নয়, এ যে সাক্ষাৎ যম।

কৃষ্ণদাস—তুমি কি বোল্‌তে চাও, ভগবান্ এই বিশ্ব-সংসারটা বৃথা বৃথা সৃজন কোরেছেন? না, তা কখনই নয়, এর প্রত্যেক জিনিষটারই একটি ব্যবহার আছে। সেটা জেনে নিতে হ'বে। তুমি কি মনে কর, এ থেকে অতিরিক্ত একটা সুন্দর আলোকময় জগৎ আছে? না, তা নয়। মানুষের এখানেই স্বর্গ, আবার এখানেই নরক। ভগবান্ কোথায়? তুমি কি বিবেকানন্দের কথা আলোচনা করনি। "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"—এ কথাটি কি তোমার জানা নাই? বিবেকানন্দ আরও বলেছেন—এই যত দরিদ্র ভিক্ষুক, ক্ষুধাগ্রস্ত মানব তোমার চোখের সামনে দেখছ এরাই দরিদ্র নারায়ণ (?)। এদের সেবা করলেই তোমার মুক্তি। আমি ত ভাই আর কিছু বুঝি না। তোমাদের ও' কল্পনার মুক্তি বা ভগবানের সঙ্গে মিশে যাওয়া আমার দরকার নাই। এমন সুন্দর ভগবানের বন্দোবস্ত থাকতে তোমার ঐ বৃথা আশার মোহে ঘুরে কোন লাভ নাই। দেখ ভগবান কেমন ছয়টি ঋতু দিয়েছেন, ঠিক সময় মত তারা কেমন তাদের কাজ ক'রে যাচ্ছে, যার দ্বারা আমাদের ফসল উৎপন্ন হচ্ছে, আমরা খেতে পাচ্ছি। তা ছাড়া এই দেখ বড় বড় কবিরা কি গেয়ে গেছেন—

ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক
সকল দেশের সেরা।
স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাক তুমি।

সকল দেশের রাণী সে যে
আমার জন্মভূমি।
সে যে আমার জন্মভূমি।
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা
কোথায় এমন উজ্বল ধারা,
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ
এমন কালো মেঘে।
ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে ॥
এমন দেশটি ....
ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ,
ও মা তোমার চরণ-দুটি বক্ষে আমার ধরি।
(আমার) এই দেশেতে জন্ম যেন
এই দেশেতে মরি।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥

অতএব এর চেয়ে সুখের কথা আর কি থাকতে পারে। আমার ত' ভাই এ 'ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেই বল, আর বড় বুদ্ধিতেই বল,—এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কথা থাকে থাকুক, আমি বুঝতে পারি না। তা' ব'লে তোমারটাও আমি নিন্দা করি না। কেন না যাকে যেমন ভগবান মন দিয়েছেন সে সেইটাই করছে। আমার ও-রকম তোমাদের মত কোনও গোঁড়ামি নাই। আমি সকলকেই ভাল বলি। কারণ উদারতাই ভাল, সঙ্কীর্ণতা কোনও কাজের নয়।

গৌরদাস—তুমি কি ভাই আমাকে আমার কথাগুলি বলবার একবারও অবসর দেবে না? তুমি ত' দেখছি ঝড় ঝড় ক'রে অনেক কথাই ব'লে গেলে। এখন তা'হলে কিছু আমার কথা শুনতে হয়।

কৃষ্ণদাস—বল, ভাই বল। এখন আমার কোন আপত্তি নাই। আমি পূর্ব্বেই ব'লেছি, আমি কাকেও ঘৃণা করি না; সব ভাল।

গৌরদাস—তা'হলে দয়া ক'রে একটু মন দিয়ে শোন। তুমি যে গোড়া থেকে এ পর্য্যন্ত কথাগুলি ব'লে আস্‌লে এর ত' দেখছি কোনটিরও সঙ্গে কা'রও মিল খাচ্ছে না। এটা ঠিক যেন বিষয়গুলি ভাল ক'রে হজম না হ'লে যে অবস্থা হয়, তাই হ'য়েছে। প্রথমতঃ তুমি বললে—মানুষ আজ দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপস্থিত। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ইত্যাদির ক্রোড়ে আজ মানবজাতি নিষ্পেষিত হচ্ছে; তা'রা ক্ষুধায় কাতর, রোগে জর্জ্জর, সেজন্যে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত আজ অগ্নিতে বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। আবার এই মাত্র বললে এ জগৎটাই অতি সুখের আগার, শান্তির একমাত্র স্থান এবং এই বলে কত কি মনের উচ্ছ্বাসে গান গেয়ে ফেললে। আমি ত' এ দুটোর কোন সামঞ্জস্যই দেখি না। তার পর জ্ঞানীর মত একটি বেশ কথা বললে, 'ভগবান কি বৃথা বৃথা এই জগৎটা সৃষ্টি ক'রেছেন (?), না, তা নয়, এর প্রত্যেকটিরই এক একটি বিশেষ ব্যবহার আছে; কিন্তু তুমি এর সমাধান করতে যেয়ে একটা কিম্ভূত-কিমাকার ক'রে ফেলেছ। এই যা'কে বলে, "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।" তাই শাস্ত্র ব'লেছেন —ভগবৎ কথাগুলি সত্যি সত্যি ভক্তের মুখ থেকে শুনতে হবে। নামধারী বা নামজাদা ভক্তব্রুবের কাছে শুনলে বাস্তবিক কোন ফল দেবে না, বরং উল্টো হবে। তুমি ব'লছ—এই জগতে যে-সকল জীব কষ্টে দগ্ধীভূত হচ্ছে তা'রাই ভগবান। তা'দের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা হ'য়ে যা'বে। আবার বলছ এরা সব দরিদ্র-নারারণ! এই কথা দুটির ত আমি মাথা-মুণ্ডও খুঁজে পাই না। জীব যদি নারায়ণ হল তা হলে তাঁ'র আবার কি করে দরিদ্রতা আসতে পারে? আর তাঁ'র কি করেই বা দুঃখ কষ্ট আসতে পারে? নারায়ণ বলতে—যাঁর ছয়টি ঐশ্বর্য্য আছে। দরিদ্রতা ও ঐশ্বর্য্য দুটি শব্দ কখনো এক পদ-বাচ্য হ'তে পারে না। ঐশ্বর্য্যে দরিদ্রতা নাই বা দরিদ্রতায় ঐশ্বর্য্য নাই। দুইটি শব্দ সম্পূর্ণ বিরোধাত্মক—ঠিক যেন সোনার পাথরবাটী। যদি বলা যায়—এই লোকটি ধনী দরিদ্র, ইহা যেমন ঠিক হয় না, তেমনি দরিদ্রকে নারায়ণ বলিলে তাহাই হয়। তা ছাড়া জীবকে এরূপ বলা মহদপরাধ। যদি বল নারায়ণই জীবরূপে মায়ার দ্বারা আবৃত হ'য়েছেন এবং সাধন করতে করতে মায়া যখন কেটে যাবে তখন

জীবই আবার নারায়ণ হ'য়ে যাবেন। তোমার একথাও সঙ্গত হয় না। কারণ নারায়ণ কখনও মায়ার দ্বারা আবৃত হন না। মায়া নারায়ণের বহিরঙ্গা শক্তি। শক্তি কখনও শক্তিমান্‌কে আবৃত করিতে সমর্থ হয় না। শক্তিমান্ স্বরাট্ বস্তু। তাঁহার ইচ্ছাতেই শক্তিসমূহ কার্য্য করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ মায়াশক্তি অপাশ্রিতভাবে শক্তিমানের সেবা করিয়া থাকেন তাঁহার সম্মুখে যাইতে লজ্জা করেন। যথা—শ্রীমদ্ভাগবতে—২।৫।১৩—

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা-পথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥"

শক্তি যদি শক্তিমান্‌কে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিত তাহা হইলে শক্তিই শক্তিমান্ অপেক্ষা বড় হইয়া যাইত। কিন্তু ঘটনা তাহা নয়। নারায়ণ কখনও মায়াবশ হন না। যদিও ভগবান ইহজগতে অর্থাৎ এই মায়িক জগতে অবতীর্ণ হন তথাপি তিনি কর্ম্মফলবাধ্য জীবের মত মায়ার বশীভূত হন না। ইহাই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি বা ঈশ্বরতা। জীবগণ যদিও তাঁহার তটস্থা-শক্তি হইতেই সম্ভূত তথাপি অণুতা ও তটস্থধর্ম্ম-প্রযুক্ত মায়ার দ্বারা অভিভাব্য। গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাইবে। এ সব আমার বা তোমার মনের খেয়ালের কথা নয়। যে-শাস্ত্রকে এই ত্রিভুবন ত্রিকাল ধ'রে মেনে আসছেন তাঁ'রই কথা।

এইত গেল তোমার দরিদ্র-নারায়ণের উত্তর। এখন তোমার মুক্তির কথা। মুক্তি বলতে তুমি কি বুঝে রেখেছ? আর এক কথা এই যে তুমি বললে—'তোমাদের ঐরূপ ভগবানের সঙ্গে মিশে যাওয়া আমার দরকার নাই।' এ কথাটি তুমি কোথায় পেলে? সেই জন্যেই বলি কারও বিষয়ে কথাগুলি বলবার পূর্ব্বে তার কথাগুলো আগে জানা দরকার। ভক্ত কখনও ভগবানের সঙ্গে মিশে যেতে চান না। এটা ঐ মায়াবাদী বা অদ্বৈতপন্থীদের আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তু।

ভগবদ্ভক্তগণ ভুলেও তা প্রার্থনা করেন না। ভগবান্ সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বস্তু। দুই বা ততোধিক বস্তুর অবস্থান-ব্যতিরেকে আনন্দ জিনিষটা সম্যগ্ উপভোগ করা যায় না। যেখানে ভক্তের পৃথক্ অবস্থান নাই, সেখানে ভক্তি বলে কোন জিনিষ থাকতে পারে না। ভক্ত বলতেই—ভক্ত, ভক্তি, ভগবান্ এই তিনটীর নিত্য অবস্থান বুঝায়। ভক্তিই জীবের নিত্য স্বাভাবিক বৃত্তি; ইহাই আত্মধর্ম্ম। ভক্তিহীন মানবের প্রাণ-ধারণ বৃথা। যেরূপ অজাগলস্তন। বাহিরের দিকে স্তন দেখাইলেও ফলকালে উহা বাস্তবিক কোনও কার্য্যকরী হয় না। যা হোক্, এ সব কথা তুমি একেবারে টপ করে বুঝে উঠতে পারবে না, একটু সময় লাগবে। কেন না তোমার মগজ এখন এই ব্রহ্মাণ্ডের কথাতেই পরিপূর্ণ। তোমার আজ আর বেশী সময় নোব না। কেবলমাত্র তোমার শেষ কথাটির জবাব দো'ব।

তুমি যে আলোকময় জগতের কথাটি বললে,—সে-সম্বন্ধে যে তোমার কি ধারণা তা' বেশ বোঝা গেল না—যতটা বোঝা যায়, ঐ নির্বিশেষ, নিরাকার, নিরঞ্জন বেদের ও শ্রুতির একদেশিক বিচার—যা শঙ্কর এক সময়ে সাময়িক আবশ্যকবোধে প্রচার করেছিলেন তা'রই একটা বিকৃত ছায়া তোমার হৃদয়কে আশ্রয় করেছে। ভগবদ্ভক্তগণ তোমার ঐ সকল চঞ্চল মনের কল্পনার রাজ্যের গল্প বলেন না। যেটা বলেন, সেটা এই জড়-ভোগময় জগতের কথা নয়, এই জগতের কথা তুমি তোমার ঐ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ দ্বারা পরীক্ষা ক'রে নিতে পার এবং ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মনের বিচার দ্বারা ঠিক করতে পার। কিন্তু বাস্তব-সত্যের উপাসকগণ সর্ব্বক্ষণ নিত্য বৈকুণ্ঠ জগতে বিচরণ করছেন। সেটা তোমাদের এই জড়বিজ্ঞান-মন্দিরের সাহায্যে জানবার বস্তু নয়। সেই জিনিষটি তুরীয়। শ্রুতিতে বলেছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তোমরা যেটাকে স্বর্গ বল সেটাও এই দুঃখময় ভোগময় জগতেরই আর একটা দিক্; যেমন লৌহ-শৃঙ্খল আর স্বর্ণশৃঙ্খল। এই জগতে ভোগের কালটি কিছু অল্প এবং অত্যন্ত দুঃখকর, স্বর্গলোকে সেই ভয়যুক্ত ভোগ-কাল কিছু অধিক এবং সেই ভোগ-সুখ থাকার দরুণ ভগবানের কথা স্মরণ-পথে আসে না। মোটের উপর স্বর্গেও নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই, সেখান হইতেও পুণ্যক্ষয়ে এই জগতে পুনরায় আসিতে হইবে। অতএব যে সুখেতে ভয় আছে, সে সুখ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনও চান না। বৈকুণ্ঠে ঐ প্রকার কোন ভয়ের বা দুঃখের কথা নাই। সেই স্থান

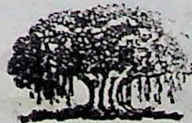
সর্বক্ষণই আনন্দময়। সেখানে ভগবদ্ভক্তগণ প্রেমময় ভগবানের সহিত নিত্যকাল লীলা-বিলাস করিতেছেন। যেখানে লক্ষ্মীগণ দ্বারা সেই একমাত্র পরম-পুরুষ কৃষ্ণ সেবিত হইতেছেন, যেখানে বৃক্ষমাত্রই কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণি, জলমাত্রই অমৃত, কথামাত্রই গান, গমনমাত্রই নাট্য, যে-স্থলে কোটী কোটি গাভী হইতে মহা-ক্ষীর-সমুদ্র নিরন্তর আপনা হইতে নির্গত হইতেছে, আর যেখানে ভূত, ভবিষ্যৎ-কালের খণ্ডত্ব-রহিত চিন্ময়কাল নিত্য বর্ত্তমান সেই আনন্দময় বৈকুণ্ঠে কোন জীবের যাইবার জন্য প্রাণ উৎসুক না হয়? মনুষ্য ততদিনই গুড়ের আদর করিয়া থাকে, যতদিন না সে পরম উপাদেয় রসগোল্লার আস্বাদন পায়। ঠিক সেই প্রকার এই দুঃখময় ও হেয়তা-পূর্ণ জগৎকে সে পর্য্যন্তই ভাল বোধ হয়, যে পর্য্যন্ত না সে আর একটি অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ, দুঃখলেশ-হীন জগতের কথা জানে।

এক সময়ে স্বয়ং স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রদেব নিজগুরু বৃহস্পতির অবজ্ঞাফলে শূকর-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই শাপগ্রস্ত যোনি লাভ করিয়া ইন্দ্র শূকরী ও শাবকগণের সহিত বিহারাদি আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। সে এখন বিষ্ঠাকে অমৃতজ্ঞানে ভোজন করিতে লাগিল এবং সে যে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র তাহা ভুলিয়া গেল ও তাহার ঐসকল শূকর-শাবকগণকে এবং শূকরীকে অত্যন্ত আত্মীয়বোধে এক মুহূর্ত্তও কোথাও ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। একদিন জগৎপিতা ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া দয়া করিয়া ঐ শূকররূপী ইন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিলেন—"ওহে শূকর, তুমি বাস্তবিক শূকর নও তুমি স্বর্গের রাজা ইন্দ্র। তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে। তুমি সে-সব ছাড়িয়া এই অতিশয় জঘন্য শূকরীর সহিত বিলাস ও বিষ্ঠা ভোজন করিয়া নিজেকে আনন্দিত ও ধন্য মনে করিতেছ কেন? তুমি নিজ রাজ্যে ফিরিয়া চল।" কিন্তু হায়! মায়ামোহিত ইন্দ্র ব্রহ্মার ঐসকল সদুপদেশ শুনিয়াও একটুকুও কর্ণপাত করিলেন না। তখন ব্রহ্মা দেখিলেন—যতক্ষণ না ইহার আসক্তির বস্তুগুলি নষ্ট করা যাইবে ততক্ষণ এই মায়ামুগ্ধের চেতন হইবে না। এই বলিয়া ব্রহ্মা ইন্দ্রের ঐ সকল পরমপ্রিয় শাবকগুলিকে এক একটি করিয়া উঁহার সম্মুখে কাহাকেও আছাড় দিয়া, কাহাকেও বা ত্রিশূলদ্বারা বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিলেন। এতদ্দর্শনে ইন্দ্র অতিশয় কাতর হইলেন বটে কিন্তু তথাপি ঐ প্রাণাধিকপ্রিয়-শূকরীর মায়ায় প্রাণ-ধারণ করিয়া রহিলেন। ব্রহ্মা তখন তাহার শেষ আসক্তির বস্তুটীকেও শেষ করিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্রের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং ব্রহ্মার চরণে প্রণিপাত করিয়া তিনি নিজ রাজ্যে চলিয়া গেলেন।

এই প্রকার ঐ মায়ামোহিত ইন্দ্রের আমরা বর্ত্তমানে ইহ জগতের ভোগকেই শান্তির আগার ভাবিয়া ত্রিগুণ-তাড়িত হইয়া চৌরাশী-লক্ষ যোনি ভ্রমন করিতেছি। আর মনে করিতেছি, ভগবান অতিশয় দয়ালু, কেন না তিনি এই সকল দ্রব্য আমাদের ভোগের নিমিত্ত দিয়াছেন কিন্তু আবার পরক্ষণেই সেই সব হিতকর বস্তুগুলি নষ্ট হইয়া গেলে শোক করিতেছি এবং ভগবান্‌কে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলিয়া তাহার সুষ্ঠু বিচারে দোষ প্রতিপাদন করিতেছি। দুঃখের বিষয় মূঢ় জীব আমরা বুঝিতেছি না যে তিনি কি প্রকার দয়ালু। তিনি সর্বক্ষণ আমাদের জন্য চিন্তা করিতেছেন। তিনি পরম দয়ালু বলিয়াই আমাদিগকে স্বাধীনতা বলিয়া একটি পরম উপাদেয় বস্তু দান করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় আমরা ঐ স্বাধীনতার অপ-ব্যবহার করে তাঁ'কে ভুলে গিয়ে অহঙ্কারের উর্দ্ধ সীমায় আরোহণ করে ডিগ্রি ডিস্‌মিস্ করি, আর পাগলের মত বলি—ভগবান বলে কিছু নাই, উলুক যেমন সূর্য্য নাই বলে প্রতিপন্ন করতে চায় এবং সেটা যেমন তার বৃথা হয়ে যায়, তেমনি আমাদেরও ঐ উলুকের মতই অবস্থা। কিন্তু ঐ সব লোক পাষণ্ড হলেও দয়াময় ভগবান সেকথা ভুলে যেয়ে ঐ ভীষণ মায়ার কবল থেকে তা'দের উদ্ধার করবার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'য়ে জানিয়ে দেন—"ওরে মূঢ় জীব, তুমি অমৃতের পুত্র—তুমি ম'রে যাওয়ার বস্তু নও। ফিরে চল সেই অমৃতের দেশে—যেখানে এ সব কষ্টদায়ক জরা, ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি নাই। সেখানে নিত্য আনন্দ; তোমার সে আনন্দের কথা এখন ধারণায়ই নাই। তুমি

কেন তা' হতে বঞ্চিত হ'বে।" কিন্তু হায়! ক্ষুদ্র-বুদ্ধি বিশিষ্ট আমরা সে কথা বুঝতে না পেরে ঐ অল্প-বুদ্ধি-বিশিষ্ট গুন-টানা মাঝির কথা মনে করি। মাঝি যেমন মনে মনে ভেবেছিল—আমি যদি বড়লোক হো'তাম তা'হলে নদীর দুই পার্শ্বে বেশ করে তুলোর গদী বিছিয়ে দিয়ে তার উপর গুন টানতে টানতে যেতে পারতাম এবং আর আমার পায়ে কাঁটা খোঁচা ফুটত না। কিন্তু ঐ বোকা মাঝি জানে না, সে ধনী হ'লে তার কি অবস্থা হ'বে। আমরাও ঠিক ঐ মাঝির মত অল্পবিস্তর বুদ্ধিমান। আজ যদি ঘোড়া-জাতি, গাধা-জাতি, কুকুর-জাতি, ছাগ-জাতি, মৎস্য-জাতি বলে উঠে—এস ভাই সকল, আমরা আজ থেকে একটী সুন্দর যুক্তি করি, যাতে করে আমরা এই সংসারে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারি। কেননা এই যে দেখছ মনুষ্য সম্প্রদায়—এরা বড়ই নিষ্ঠুর। কি করে এ'দের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, তার একটা উপায়ের কালচার করা আশু দরকার হয়ে পড়েছে। নতুবা এ'দের সঙ্গে বাস করা দায়। অতএব আর কালবিলম্ব না করে, কাপুরুষতা ত্যাগ করে কোমর বেঁধে লেগে পড়া যাক। এই সব উপরিউক্ত বাক্যগুলি যেমনি তাদের পক্ষে অসম্ভব হয় তেমনি মনুষ্য-জাতিও কখনও ঐ দুষ্পারা মায়ার হাত হ'তে নিষ্কৃতি পান না যতক্ষণ না সেই ভগবানের নিজজন সত্য সত্য নিষ্কিঞ্চন সাধু-বৈষ্ণবপদে লুটিয়ে যেয়ে বলেন—হে করুণাময় প্রভো! আমি অতিশয় দীন ও অপরাধী, আমায় অমায়ায় কৃপা করুন। আপনার কৃপা ব্যতীত এ দুরাচারের আর গতি নাই। তখন ঐ দয়ার্দ্র হৃদয় বৈষ্ণব ঠাকুর তার ঐ কাতরোক্তি শুনে দয়া করে সেই নিত্য আনন্দময় ধামে নিয়ে যান—যেখানে মানুষকে হা অন্ন হা অন্ন করে ক্ষুধায় কাতর করে না, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায় না, কষ্টের কোন কথা নাই, কেবল আনন্দ—আনন্দ—আর—আনন্দ।

আর একটা কথা ভাই না বলে থাকতে পারলাম না। তুমি যে ঐ উদারতা, সঙ্কীর্ণতা আর গোঁড়ামীর কথা বললে তাঁ'র একটু বিচার শোন। তুমি বললে,—সব ভাল। এটা কি ঐ 'পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ'র কথা? তাঁ'দের বিচার তোমার জানা নাই। তাঁ'দের ঐ কথা—আত্মদর্শনের কথা। তা না হ'লে তাঁ'রা কি করে হাতী আর পিপড়ে সমান দেখেন? তুমি কি বল, আলো—অন্ধকার, সতী স্ত্রী—বেশ্যা, দুধ—খড়িগোলাজল, মা—স্ত্রী, ভাই—সম্বন্ধী এদের এক মনে করার নাম উদারতা? না তা নয়, এটা উদারতা ত নয়ই বরং ঘোরতর পাপ ও যুক্তিহীন। বৈষ্ণবেরা কখনও গোঁড়ামীর কথা বলেন না। গোঁড়ামী কোনটি। ভগবানকে—ভগবান, ভক্তকে—ভক্ত, দুর্গাকে দুর্গা, কালীকে—কালী, শিবকে শিব, এসব বলা গোঁড়ামী নয় বরং এদের সব এক করে খিঁচুড়ী তৈরী করার নামই সঙ্কীর্ণতা। কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোক যদি বলেন—আমি অতিশয় উদার, যেহেতু আমি সকলকেই স্বামী ব'লে বলি' তা'হলে সেটি যেমন নীতি বিগর্হিত, তেমনি সব দেবতাকে যার যেটা প্রকৃত স্থান সেইখানে না বসালে ঐ স্ত্রীলোকের মত ভুল হ'য়ে যাবে। যে বস্তুটি যা ঠিক—সেই বস্তুটিকে যদি তা না বলে সব একাকার করে দিই তা'হলে জগতে ভীষণ জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হ'বে। সূর্য্যকে কখনও অন্ধকার বলা যাবে না এবং অমাবস্যা-রাত্রিকে আলোকময় বলে উদারতা দেখালে কোন ফল হবে না। সত্যের সেবক হওয়ার নাম গোঁড়ামী নয় বরং কোনটাই মানব না অথচ সবটাকেই ভাল বলে বেড়াব (অর্থাৎ সত্য—অসত্য সব ভাল) এইরূপ তথাকথিত উদারতাটি উদারতা নহে, উহা আত্মবঞ্চনেচ্ছারূপ কপটতা। এই কপটতার হাত হ'তে মানব-জাতি উদ্ধার লাভ না করলে তাদের বাস্তবিক কোন মঙ্গলের আশা নাই। প্রকৃত সৎ বা সাধুর সঙ্গ না হ'লে মানুষ এসব কথা জানতে পারে না। অতএব প্রকৃত সাধুসঙ্গই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয়।



সুখী কে ?

সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ অচিন্ত্য-শক্তি দ্বারা অনন্ত জগৎ ও অনন্ত জীব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক জীবই সুখান্বেষী। চিজ্জগৎ ও মায়াজগতের মধ্যস্থ তটস্থা শক্তি জীব সুখান্বেষণ করিতে গিয়াই ভ্রমে বিবর্ত্ত-গর্ত্তে পতিত হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ আমাদের সুখ জিনিষটা কি জেনে নেওয়া দরকার। সুখ বলিলেই জানতে হবে যে দুঃখ মিশ্রিত কোনো একটা বস্তু নয়। দুঃখ মায়িক জগতেই লক্ষিত হয়; চিজ্জগতে দুঃখ বলিয়া কোনো বস্তু দেখা যায় না। সুখ চিজ্জতের চিন্ময় বস্তু। অতএব সুখ জড়জগতে থাকতে পারে না। সুখ কৃষ্ণের সেবক। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সুখের ভোক্তা। কৃষ্ণেচ্ছায় জীব সুখ লাভ করিয়া থাকেন। অক্ষজজ্ঞানদ্বারা আমরা জড়জগতে যেটা সুখ বলিয়া গ্রহণ করছি সেটা প্রকৃত সুখ নয়, সুখের ছায়া-মাত্র।

জীব স্বতন্ত্রেচ্ছায় মায়াবদ্ধ। মায়াবদ্ধজীব মায়ামোহে পতিত হইয়া ছায়া-সুখেতেই আবদ্ধ। তাহারা মনে করে যে দেহ ও মনের সুখ হইলেই সুখী হওয়া যায়। কিন্তু দেহ ও মন অনিত্য ও প্রাকৃত। মন যদিও চিদাভাস কিন্তু মন মায়ামুগ্ধ হওয়ায় জড় হইয়া পড়িয়াছে। জড় বস্তুগুলি অপ্রাকৃত বস্তু নয়। এবং অপ্রাকৃত বস্তু জড়বস্তুর দ্বারা লব্ধ হইতে পারে না। জড় বস্তু অনিত্য। অনিত্য বস্তু কিরূপে নিত্য বস্তুর ভোক্তা হয়? জড় বস্তুই জড় বস্তুর ভোক্তা সেজে ভোগ-বুদ্ধি করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র নিত্য ও সমস্ত বস্তুর ভোক্তা। অতএব নিত্য-চেতন বস্তু ছাড়া জড় মায়াবদ্ধ জীব কখনও সুখ ভোগ করিতে পারিবে না।

পিত্তাধিক্যবতাং যথৈব রসনা খণ্ডস্থিতাং মাধুরীং
শঙ্খস্থাং বিলকাচ কামলবতাং নেত্রে যথা শুক্লতাম্।
মাত্রাচিন্তিতচেতসামিব মনঃ স্বচ্ছং হরেঃ কীর্ত্তনং
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুমবৈতুমত্র খলু নো যাতা যথৈব ক্রমাৎ॥

—(তত্ত্বমুক্তাবলী ৭২)

পিত্তাধিক্য বশতঃ জিহ্বা যেরূপ মিশ্রির মাধুরী-আস্বাদনে অসমর্থ, কাচ-কামলরোগ-পীড়িত ব্যক্তির নেত্রদ্বয় যেরূপ শঙ্খস্থ শুক্লতা দর্শনে অসমর্থ, বিষয়মাত্রা চিন্তাযুক্ত চিত্ত যেমন বিশুদ্ধি-লাভে অসমর্থ, সেইরূপ মায়াবদ্ধজীব ভগবদ্ভজনসুখ-লাভে অসমর্থ।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্ম্মের চারিটি প্রশ্নের উত্তরে "সুখী কে?" প্রশ্নের উত্তরে এই বলিয়াছিলেন—

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যদ্‌গৃহে।
অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥

—(মহাভারত বনপর্ব)

যদিও দিবসের শেষভাগে শাকান্ন খায়, কিন্তু সে যদি অঋণী, অপ্রবাসী হয় তাহলেই সে সুখী। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে—একটি লোক যদি দিবসের শেষভাগে শাক-অন্নই খায় এবং অঋণী, অপ্রবাসী হয় কিন্তু সে যদি জরা-রোগগ্রস্ত হয় তা'হলে সে কিরূপে সুখী হইবে?

এই প্রশ্নতে জড়বাদিগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভুল ধরিয়া থাকেন। জড়বাদিগণের পক্ষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উত্তরটা ভুলই হইয়াছে বটে, কেননা দেহ ও মনে আমিত্ব-বুদ্ধি থাকায় তাহারা মনে করে যে, অঋণী শব্দের অর্থে—টাকা পয়সার ঋণ-শূন্য, এবং অপ্রবাসী শব্দের অর্থে—বিদেশে অতিথি না হওয়া। কিন্তু আত্মজ্ঞান-বিচারে এই বিচারটা নিতান্ত ভুল ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আত্মজ্ঞানিগণ বলেন অঋণী শব্দের অর্থে—যাবতীয় ঋণ-শূন্য। মানব জন্মিবামাত্রই ঋণী হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

—(ভাঃ ১১।৫।৩৭)

মানব জন্মিবামাত্রই দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, ভূতঋণ ও মনুষ্যঋণে ঋণী হইয়া থাকেন; কিন্তু যিনি সেই অখিল-লোকশরণ্য শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্মে সর্বান্তঃকরণে শরণ গ্রহণ

করিয়াছেন তিনি সমস্ত ঋণ মুক্ত হন। আর তাঁহাকে কাহারও নিকট ঋণ-পাশে বদ্ধ হইতে হয় না।

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ-ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী॥
—(চৈঃ চঃ মঃ ২২)

এখান থেকে বুঝা গেল যে—মায়াবদ্ধ জীবগণ ঋণ-মুক্ত হইতে পারে না ; একমাত্র কৃষ্ণভক্ত-গণই ঋণ-মুক্ত।

অপ্রবাসী অর্থে—অস্থায়ী প্রবাসী না হওয়া। অর্থাৎ নিত্যভূমিতে নিত্যকাল অবস্থান করা। মায়াবদ্ধ জীব অপ্রবাসী হইতে পারে না। কারন কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা বশতঃ মায়ার নফর হইয়া—

কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট, ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥
—(প্রেমবিবর্ত্ত)

এইরূপ পুনঃ পুনঃ এই সংসার কারাগারে যাতায়াত করায় তাহাদের স্থিরতা নাই। অতএব পথিক অতিথি-গণের ন্যায় মায়াবদ্ধজীব অপ্রবাসী হইতে পারে না।

জন্মমৃত্যুরহিত ভগবদ্ভক্তই একমাত্র অপ্রবাসী ; গোলোক-বৃন্দাবনই একমাত্র জন্মমৃত্যু-রহিত স্থান। কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তগণই ঐ গোলোক-বৃন্দাবনের নিত্য অধিবাসী।

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্ত-সর্ব-পরিক্লেশঃ পান্থঃ স্ব-শরণং যথা॥
—(ভাঃ ২।৮।৬)

যখন কোনও পথিক পরিপূর্ণ অর্থ-সংগ্রহ করিয়া প্রবাস হৈতে নিজ গৃহে আগমন করেন, তখন তাহার সর্ব আশা নিবৃত্ত হওয়াতে তিনি আর নিজ গৃহ-শান্তি ছাড়িয়া অন্যত্র যান না। তদনুরূপ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণকথা-শ্রবন সংস্পর্শে যাঁহার অন্তঃকরন পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি আর কৃষ্ণ-পাদমূল পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র যান না। নিত্য-নবায়মান সেবা-সুখে মত্ত হইয়া থাকেন।

বৈষ্ণবগণই গৌরপ্রিয় শাক সেবন করিয়া পরমানন্দিত হন।

বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণের ন্যায় চিদানন্দময়, এবং কৃষ্ণের ন্যায় চিদানন্দ সুখভোগ করিয়া থাকেন।

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত-সমস্ত-কর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকির্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপাদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥
—(ভাঃ ১১।২৯।৩২)

অর্থাৎ মরনশীল জীব যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক আপনাকে আমার (ভগবানের) প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া আমার ইচ্ছায় ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তখন অমৃতত্ত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত একযোগে চিৎস্বরূপ সুখভোগে যোগ্য হন।

এতৎ প্রমান দ্বারা জানা গেল যে সমস্ত বিশ্বের মধ্যে বৈষ্ণবগণই একমাত্র পরম সুখী।

——::০::——

আমি ও আমার

যখন জীব বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত দ্বারা চালিত হয়, সেই সময় ভগবদ্-বিমুখ জীবের দণ্ডপ্রদায়িনী দশভুজ-বিশিষ্টা শ্রীদুর্গাদেবী জীবকে তাঁহার প্রকৃত আমি ও প্রকৃত মৎ-সম্বন্ধীয় বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া অপর একটী জড়বস্তুকে আমি ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তুকে আমার বলিয়া জীবের ভ্রম উৎপাদন করায়। জড়বস্তুকে আমি বলা ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তুসমূহকে আমার বলাই জীবের ভববন্ধনের প্রধান কারণ, জীবের ভোক্তৃত্ব অভিমান-সূত্রেই স্থুল জড়দেহকে আমি ও

এই জড়-দেহ-সম্বন্ধীয় অপর জড়বস্তুসমূহকে আমার বলিয়া ভ্রম বা বিবর্ত্ত হয়, এই ভ্রমবশতঃই জীব অনন্তকোটী কাল ধরিয়া মায়ার জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হইতেছে। মায়া বা যোষিৎ-সংসর্গ ই জীবের পতনের একমাত্র কারণ হইলেও যোষিতের সঙ্গলাভ করিবার জন্য জীব সর্বদা উদ্‌গ্রীব। ভববন্ধনযুক্ত জীব যোষিতের ভোক্তৃত্ব অভিমান করিয়া তাহাকে ভোগ করিতে গমন করে ও তৎকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। ক্ষণিক মনের আনন্দের আশায় জীব বাস্তব আমি ও বাস্তব আমার বস্তুসমূহকে ভুলিয়া যায়। এইভাবে জীব আপন-নির্ম্মিত জালে আপনি আবদ্ধ হইয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। মায়া তখন তাহার ক্রীড়া-কন্দুক-সদৃশ সেই জীবকে তাহার ভোগ-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত পদদ্বারা নিষ্পেষিত করিতে থাকে, জীব সেই অসহ্য যন্ত্রণায় উন্মাদের ন্যায় ইতস্তত: ধাবিত হইতে থাকে, প্রথমে মায়ার প্রভু হইতে যাইয়া জীব ক্রমে ক্রমে মায়ার ক্রতদাস হইয়া যায় ও নির্ম্মম যন্ত্রণা ভোগ করে। এই মর্ম্মান্তিক তাপ বা যন্ত্রনার কবল হইতে চির পরিত্রাণ লাভের আশায় জীব শুভকর্ম্মকে আবাহন করে ও সেই শুভ কর্ম্মের ফলে স্বর্গে গমন করে, কিন্তু সেখানেও মায়ার দশভুজ-মূর্ত্তি দেখিয়া জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাইতে বা ব্রহ্ম-সাযুজ্য-লাভে চেষ্টিত হয় এবং আত্মনাশ-মন্ত্রে আত্মঘাতী বাণকে আবাহন করে; কিন্তু সে-স্থানেও অনলসদৃশ মায়ার লকলকি জিহ্বার দর্শনে জীব যোগ দ্বারা অনিমা লঘিমাদি মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু সে-স্থানেও অসীম পরাক্রম-শালিনী মায়ার কবলে পড়িয়া যোগ-ভ্রষ্ট হয় ও চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে থাকে। এইরূপে সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব অধোক্ষজ-জ্ঞান-বিশিষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুর সঙ্গ পায়। পূর্ব পূর্ব জন্মের সুকৃতির ফলে, সেই গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকীকৃপা-বলেই জীব আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। তখন সে বুঝিতে পারে যে আমি এই শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য মলমূত্রপূর্ণ পচা জড় হাড়মাংসের থলি নহি। আমি আত্মা, আমি চেতনবস্তু, চৈতন্য আমার গঠন এবং জগতের সর্ব চেতনের একমাত্র অধীশ্বর বিভু-চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার প্রিয় সেবক বৈষ্ণবগণই আমার। আমি কৃষ্ণদাস এবং শ্রীকৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রাণবল্লভ বস্তু, এই উপলব্ধিকে স্বরূপ উপলব্ধি এবং আমি এই দেহ বা মন এবং জাগতিক সমুদয় বস্তুই আমার ভোগ্য, এই উপলব্ধিকে বিরূপ বা মায়িক উপলব্ধি বলে।

এই স্বরূপোপলব্ধি উত্তম-পুরুষের সঙ্গেই পুরুষোত্তম বস্তুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধই অদ্বয়জ্ঞানের সম্বন্ধ; যতদিন পর্য্যন্ত এই অদ্বয়জ্ঞানের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট করিতে না পারা যায় ততদিন পর্য্যন্ত প্রীতি বলিয়া কোন ব্যাপার প্রকাশিত হয় না বা হইতে পারে না। তুমি বা আপনি, তিনি বা সে দূরের কথা—অত্যন্ত সান্নিধ্য বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত নহে। যে ভৃত্য, যে বন্ধু, যে মাতাপিতা বা যে কান্তা আপনাকে তাঁহার প্রভু, তাঁহার সখা, তাঁহার পুত্র বা তাঁহার পতির সহিত প্রগাঢ়ভাবে বা প্রগাঢ় প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তিনিই বা তাঁহারাই প্রভু, সখা, পুত্র বা প্রাণবল্লভ পতিকে ও তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তুকে 'আমার' বলিতে পারেন। এই 'আমার' বস্তুর অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব মদনমোহনের চিদিন্দ্রিয়-তোষণে 'আমি' বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করার নামই আত্ম-নিবেদন, ইহাই "হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনম্ ভক্তিরুত্তমা"।

এই উত্তম পুরুষের প্রগাঢ় প্রীতির মধ্যেই অতিমর্ত্ত্য চমৎকারিতার সহিত ফুটিয়া রহিয়াছে, অদ্বয়জ্ঞানের মধ্যে পুরুষকে সংশ্লিষ্ট করিবার কথা—"অহং ব্রহ্মাস্মি", শ্রুতির মন্ত্রটি। আবার এই "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রটিই মহাবদান্য কলিপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।



মায়ার স্বরূপ

গতকল্য আমরা চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম শ্লোক—'অহমেবাসমেবাগ্রে' শ্লোকে শ্রীভগবৎস্বরূপতত্ত্বের বিষয় আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু স্বরূপ হইতে ইতর-তত্ত্বের জ্ঞান দ্বারা স্বরূপ-তত্ত্বের জ্ঞানকে যতক্ষণ দৃঢ় না করা যায়, ততক্ষণ বিজ্ঞান হয় না। স্বরূপতত্ত্ব হইতে ইতর-তত্ত্বের নাম 'মায়া'। শ্রীভগবান্ সেই 'মায়া'-তত্ত্ব চতুঃশ্লোকী ভাগবতের দ্বিতীয়-শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥"

—"বাস্তব-প্রয়োজন-তত্ত্ব ব্যতীত যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, সত্তাবিশিষ্ট হইলেও আমার অধিষ্ঠানে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। দৃষ্টান্ত—যে-প্রকার দুইটি চন্দ্রের অধিষ্ঠান না থাকিলেও কাচাদিতে দ্বিচন্দ্রাদির প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হয়, অথবা যে প্রকার রাহু গ্রহ-মণ্ডলে থাকিলেও তাহা দৃষ্ট হয় না তদ্রূপ।"

উক্ত শ্লোকটীর ভাবার্থ এই যে, আভাস ও অন্ধকার-দর্শন কিছু জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর দর্শনকালে ঘটে না এবং জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর দর্শনও আভাস ও অন্ধকারের দর্শনকালে ঘটে না। অথচ, আভাস ও অন্ধকারের কর্ত্তৃসত্তায় জ্যোতির্ম্ময় বস্তু ব্যতীত স্বতন্ত্রত্ব নাই। তদ্রূপ শ্রীভগবান্ ও তাঁহার মায়া। ভগবান্ জ্যোতির্ম্ময় বস্তু; তাঁহার মায়া দ্বিবিধা—আভাস-স্থানীয়া জীব-মায়া ও তমঃ-স্থানীয়া গুণ-মায়া। উভয়েই ভগবদাশ্রিত হইলেও শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ প্রতীতিতে জীব ও মায়া-প্রতীতির অভাব, আবার জীব ও মায়ার প্রতীতিতেও ভগবৎ প্রতীতি নাই।

ঠাকুর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের 'ভাগবতার্ক-মরীচিমালা'য় বিষয়টি সংক্ষেপে অতি সুন্দর-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন মতবাদিগণ শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিকে বুঝিতে না পারিয়া তৎসম্বন্ধে 'অস্তি', 'নাস্তি' ইত্যাদি নানা প্রকার জল্পনা করেন, তাহাও শ্রীভগবানেরই প্রভাব। এক পরা-শক্তি মায়াই শ্রীভগবানের অচিন্ত্যাশক্তি। তাহাতে দুইটি অবস্থা আছে—স্বরূপ-অবস্থা ও তটস্থ-অবস্থা। জগৎসৃষ্টিতে তটস্থ-অবস্থাই 'অণু' ও 'ছায়া'-রূপে দ্বিপ্রকার। অণু-তটস্থশক্তিকে কোন কোন শাস্ত্রে 'জীব-শক্তি' বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে পরা প্রকৃতির অন্তর্গত। 'ছায়া'-তটস্থশক্তি অচিন্মাত্র-শক্তি বলিয়া বিখ্যাত। তাহার এক নাম 'বহিরঙ্গা-শক্তি'।

চিদ্ধামাদি-প্রকাশক স্বরূপশক্তিকে চিৎশক্তি বা অন্তরঙ্গশক্তি বলা হয়। 'মায়া' বলিলে প্রধানতঃ শ্রীভগবানের পরা-শক্তিকেই বুঝায়। এই মায়িক-সংসারে স্বরূপ-শক্তির পরিচয় গূঢ়। অচিন্মায়াশক্তির পরিচয় ব্যাপ্ত বলিয়া 'মায়া' বলিতে অচিন্মায়া অর্থাৎ ছায়া ও তটস্থ-শক্তিকেই বুঝায়।

এখন মূল মায়াশক্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা পুরুষ। অষ্টবিংশতি-তত্ত্বের মধ্যে পুরুষ, প্রকৃতি ও অর্থ—তিন প্রকার তত্ত্ব-বিভাগ। আত্মা ও প্রকৃতি ছাড়া ষড়্‌বিংশতি সমস্ত তত্ত্বকেই 'অর্থ' বলা হয়। 'অর্থ'কে ছাড়িয়া দিলে যাহা আমা হইতে পৃথক্ চিন্তনীয় হয় অথচ আত্মতত্ত্বে তাহার স্বরূপ-প্রতীতি হয় না, তাহাই মায়া। আত্মবস্তু ও মায়া ব্যতীত আর যতগুলি তত্ত্ব আছে সকলই বস্তুপ্রায়। কিন্তু মায়া বস্তু নহে—বস্তু যে আত্মা, তাহার প্রতীতি মাত্র। বস্তু মধ্যে ইহার দুই প্রকার পরিচয়—'আভাস' ইহার প্রথম পরিচয় এবং 'তমঃ' ইহার দ্বিতীয় পরিচয়। জীবই আভাস-পরিচয়। চিচ্ছক্তি অণু বা তটস্থ-অবস্থায় আভাস রূপ জীব। সুতরাং তাহার চিৎপরিচয়। অচিন্মায়ার তমঃ-পরিচয়, তাহাতে জড়জগৎ। এই প্রকার শক্তিতত্ত্বের উপলব্ধিক্রমে পরব্রহ্মস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের নাম 'বিজ্ঞান'।

এখন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা হইতে কিছু আলোচনা করিতেছি। জীবের পরমাত্মজ্ঞান ও পরমাত্ম-বিজ্ঞানের প্রতি মায়া কিছু অনুকূলা ও কিছু প্রতিকূলা।

কিন্তু পরমাত্মরূপী শ্রীভগবানের বিজ্ঞান-লাভ হইলে যোগমায়াই জীবকে অধিকার করেন এবং তাহার অনুকূলেই থাকেন। মায়া যখন জীবের কৃষ্ণসেবার উন্মুখ ও সহায়-কারিণী তখনই তিনি যোগমায়া, আর জীবকে আবৃত ও কৃষ্ণসেবা হইতে বিক্ষিপ্ত করিলেই তাঁহার মহামায়া সংজ্ঞা।

এখন যোগমায়া ও মহামায়ার স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইতেছে। 'অর্থ' অর্থাৎ সত্য বস্তু ব্যতীত যাহার স্বতন্ত্র-প্রতীতি হয় না বা নাই কিন্তু সত্য বস্তুরূপেই যাহা প্রতীত হয়, আবার 'অর্থ' (বিষ্ণু)-প্রতীতি না হইয়া যাহার অনর্থ প্রতীতি হয়, তাহাকে মুক্ত ও বদ্ধ—উভয় জীবের নিজ-স্বরূপে পরমাত্মরূপী শ্রীভগবানের বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই দ্বিবিধা বৃত্তিময়ী শক্তি বলিয়া জানা উচিত। তন্মধ্যে বিদ্যার দৃষ্টান্ত—যেমন আভাস অর্থাৎ দীপের প্রকাশ। দীপালোকের-জন্য যেমন গৃহস্থিত ঘটপটাদিকে বস্তু বলিয়াই প্রতীত হয় কিন্তু দীপ আনয়নের পূর্বে ঘটপটাদির অভাব সম্ভবে না, তদ্রূপ সর্প-বৃশ্চিকাদি আগমনশীল হিংস্রপদার্থ ও ভয়ের কারন অনর্থ বলিয়া প্রতীত হয়। এইরূপ বিদ্যার জন্যই মুক্ত জীবের নিজ-স্বরূপে সম্বন্ধহীন জ্ঞানানন্দাদিরই প্রতীতি হয়—অবিদ্যা-দশার ন্যায়, জ্ঞানাভাব প্রতীতি হয় না, আর স্বরূপে সম্বন্ধহীন দেহ ও দৈহিক শোকমোহাদিরও প্রতীতি ঘটে না।

অবিদ্যার দৃষ্টান্ত—যেমন তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার। স্বগৃহস্থিত ঘটপটাদিকে অন্ধকারের জন্য যেমন বস্তু বলিয়া বুঝা যায় না, কিন্তু সর্প, চোর প্রভৃতি অনিষ্টকারী বস্তু না থাকিলেও তাহাদের আকার সম্ভাবনা-হেতু ভয়ের কারণ অনর্থ বলিয়া মনে হয়, ঠিক তদ্রূপ বদ্ধজীবের অবিদ্যার জন্য নিত্য-সম্বন্ধিরূপে বর্ত্তমান জ্ঞানানন্দাদিরও প্রতীতি ঘটে না, কিন্তু স্বরূপে না থাকিলেও বদ্ধজীব সম্বন্ধিরূপে বর্ত্তমান দেহ ও দেহ-সম্পর্কিত শোকমোহাদিরই প্রতীতি ঘটে। তন্নিমিত্ত পুষ্প-শৃঙ্গাদির অস্তিত্ব থাকিলেও আকাশ-শশকাদির যেমন তৎসহ সম্বন্ধাভাবহেতু আকাশকুসুম ও শশকশৃঙ্গ মিথ্যা বলিয়া কথিত হয়, তদ্রূপ দেহেরও শোক-মোহ-সুখ-দুঃখাদি দৈহিকধর্ম প্রভৃতির প্রধান (জড়) সম্বন্ধীয় বলিয়া অস্তিত্ব থাকিলেও জীব-স্বরূপের সহিত সম্বন্ধাভাব-হেতু শাস্ত্রসমূহে দেহাদি মিথ্যাভূত বলিয়া কথিত হয়। জীবের পক্ষে দেহ-সম্বন্ধ মিথ্যাভূত হইলেও উহা অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত এবং বিদ্যা দ্বারা বিনষ্ট হয়—ইহাই বিদ্যা ও অবিদ্যার দৃষ্টান্তদ্বয় আভাস ও তমঃ। অষ্টম-স্কন্ধের (৫।২৭) নিম্নলিখিত শ্লোকে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে—

বিপশ্চিতং প্রাণমনোধিয়াত্মনা-
মর্থেন্দ্রিয়াভাসমনিদ্রমব্রণম্।
ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্র পক্ষৌ
তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ব্রজামহে॥

—যিনি প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার জ্ঞাতা, অর্থেন্দ্রিয়-প্রকাশক, অজ্ঞানরহিত, কর্মায়ত্ত, শরীরশূন্য, যঁাহাতে জীব-পক্ষপাতিনী ছায়া (অবিদ্যা) ও আতপ (তন্নিবর্ত্তিকা বিদ্যা) কিছুই নাই, যিনি ত্রিযুগেই আবির্ভূত হন আমরা সেই নিত্য ও আকাশবৎ সর্বব্যাপী ত্রিযুগ শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হই।

কেহ কেহ বলেন, তমের এই দৃষ্টান্ত আবরণাংশমাত্র, আবরণ ও বিক্ষেপের দৃষ্টান্ত—সর্প, ব্যাঘ্র ও ভূতাবেশ প্রভৃতি জানিতে হইবে। অপরে বলেন, উহাদিগের তামসত্বহেতু তমঃ-শব্দে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ জীবপক্ষে সর্বত্র বিদ্যমান বস্তুর অপ্রত্যাগমন ও অবিদ্যমান বস্তুর অপ্রত্যাগমন—অবিদ্যারই আবরণ ও বিক্ষেপ শব্দদ্বয়ে কথিত।

'অর্থ' শব্দের ধন-বাচকত্বহেতু, শ্লেষতঃ তদ্দ্বারা বহু-ভাগ্যবলে স্বীয় প্রচুর অর্থপ্রাপ্ত বণিকের ন্যায় বিদ্যাবলে লব্ধজ্ঞানানন্দ মুক্তপুরুষ ধনবান্ বলিয়া নিরূপিত হন, আর ভাগ্যহীনতাবশতঃ অপ্রাপ্ত-ধন বণিকের ন্যায় বদ্ধজীবের জ্ঞানানন্দ অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হওয়ায় তাহাকে দরিদ্র বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ বিদ্যা দ্বারা 'ত্বম্'-পদার্থ জীবাত্মারই অনুভব হয়, কিন্তু 'তৎ'-পদার্থ পরমাত্মার অনুভব হয় না। তাঁহার নির্গুণত্ব-হেতু নির্গুণা ভক্তি-দ্বারাই অপরোক্ষানুভব হয়, যথা শ্রীভগবদুক্তি (ভাঃ ১১। ১২।২১)—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

—"শ্রদ্ধাজনিত অনন্যভক্তি-প্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। একাগ্রভাব-সম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও পবিত্র করিয়া থাকেন।"

এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।২৫।২৪) "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানম্" এই ভগবদুক্তি হেতু দেহাদির ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞানরূপিণী যে এই বিদ্যা, তাহার সত্ত্বগুণ থাকায় তদ্দ্বারা গুণাতীত পরমাত্মার অনুভব হয় না, প্রত্যুষে ঐ বিদ্যার লোপই সাধিত হয়। শ্রীভগবান্‌ও ভাগবতে তাহাই কহিয়াছেন, যথা (ভাঃ ১১।২৫।৩০-৩২)—

দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম চ কারকঃ।
শ্রদ্ধাবস্থাকৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব এব হি॥
সর্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষা ব্যক্তধিষ্ঠিতা।
দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ॥
এতাঃ সংস্থতয় পুংসো গুণকর্মনিবন্ধনাঃ।
যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে॥

—"আমাতে নির্গুণা ভক্তি ও শ্রদ্ধাদি ব্যতিরেকে পবিত্র হিতকর দ্রব্য, বন ও গ্রাম প্রভৃতি দেশ, সাত্ত্বিক-সুখ প্রভৃতি ফল, নিরপেক্ষভাবে নিজ কর্ম্মদ্বারা কর্মমিশ্রা ভক্তির সহিত আমার ভজন দ্বারা সত্ত্বগুণ-কর্ত্তৃক রজস্তমোগুণের ক্রিয়া তিরোহিত হইলে জ্ঞান, শম, দম ও সুখাদি সংবৃদ্ধির কাল, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ জ্ঞান আমাতে অর্পণরূপ কর্ম, সঙ্গ-বিরহিত সাত্ত্বিক কর্ত্তা, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—ত্রিবিধা শ্রদ্ধা, জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—ত্রিবিধ অবস্থা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি স্থাবর-পর্য্যন্ত আকৃতি, সত্ত্বাদি এক এক গুণের আধিক্য-প্রযুক্ত স্বর্গ, নরক প্রভৃতি গতি—ইত্যাদি সমুদয়ই ত্রিগুণাত্মক। হে প্রিয়দর্শন, পুরুষের গুণকর্ম্ম-নিবন্ধন এই সকল কামক্রোধাদি-রূপ সংসারে কারণসমূহ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যে-জীব আমাতে ঐকান্তিক-নিষ্ঠাবশতঃ কেবল ভক্তিযোগদ্বারা ঐ চিত্ত-সমুত্থিত গুণসকলকে জয় করিতে সমর্থ হন, সেই জীব আমার পার্ষদত্ব-রূপ মোক্ষ লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।"

যদি বল, তাহা হইলে মুক্ত-জীব পরমাত্মার অপরোক্ষানুভবের জন্য কোথায় ভক্তিলাভ করিবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞানাধিকারীর ভক্তিমিশ্র সাংখ্যযোগ-তপাদি-জনিত অবিদ্যাবিলাসিনী বিদ্যাদ্বারা প্রথমে 'ত্বম্'-পদার্থের অনুভব হয়। তৎপর ইন্ধনাভাবে অগ্নি যেমন নির্বাপিত হয় তদ্রূপ সেই অবিদ্যাবিমুক্তজনের বিদ্যাও নিবৃত্ত হইয়া যায়। সেই নিবৃত্ত-তারতম্যক্রমে গ্রহণ-নির্ম্মুক্ত চন্দ্রকলার উদ্গমের ন্যায় পূর্ব-সিদ্ধ ভক্তির ক্রমশঃ বৃদ্ধি ঘটে। পুনঃ পুনঃ অনুশীলিত সেই ভক্তিদ্বারাই 'তৎ'-পদার্থ পরমাত্মার অনুভব-তারতম্য ঘটে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৪-৫৫ শ্লোকদ্বয়ে এই বিষয়টি সুন্দররূপে বিবৃত রহিয়াছে।

—::•::—

ভাগ্যবান্ জীব

এই সংসারে অনাদিকাল হইতে আমরা দুই প্রকার জীব অবস্থান করিতেছি—এক প্রকার নিত্যমুক্ত, অন্য প্রকার নিত্যবদ্ধ। নিত্যমুক্তগণ কৃষ্ণোন্মুখ; আর নিত্য-বদ্ধগণ কৃষ্ণ-বিমুখ। নিত্যবদ্ধগণ, 'স্থাবর' (অর্থাৎ যাহারা অচল; যথা—বৃক্ষাদি) ও 'জঙ্গম' (অর্থাৎ যাহারা সচল —চলিতে পারে) ভেদে দ্বিবিধ।

ত্রিবিধ জঙ্গম

১। তির্য্যক্ অর্থাৎ খেচর পক্ষিগণ, ২। জলচর, অর্থাৎ মৎস্যাদি ও ৩। স্থলচর অর্থাৎ মনুষ্য ও পশ্বাদি। সেই স্থলচর মধ্যে মনুষ্য জাতির সংখ্যা অতি অল্প।

মনুষ্য জাতির উচ্চাবচাবস্থা

এই মনুষ্য-জাতি-মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ ও শবর

প্রভৃতি কদাচার ও নাস্তিক-শ্রেণী বাদ দিলে বেদ-নিষ্ঠ-মনুষ্য অবশিষ্ট থাকে। সেই বেদনিষ্ঠগণের মধ্যে অর্দ্ধেকে বেদ মুখে মানেন, কিন্তু কার্যতঃ বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করিয়া থাকেন। যাঁহারা বেদ মানেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই কর্ম্মনিষ্ঠ-ধর্মাচারী, অথবা কেহ কেহ জ্ঞাননিষ্ঠ-ধর্ম্মাচারী।

কর্ম্মনিষ্ঠ কাহারা?

নিজ নিজ ভোগ-কামনায় যাঁহারা পুণ্যাদি-সৎকর্ম অনুষ্ঠান করেন, স্বর্গাদি-প্রাপ্তির জন্য বা ইহ জীবনের ভোগোপকরণ ধন, জন ও যশাদি-লাভাকাঙ্ক্ষায় যাঁহারা সৎকর্মাদি করেন, তাঁহারাই কর্মনিষ্ঠ।

জ্ঞানী কে?

ঐরূপ কোটী সংখ্যক কর্মনিষ্ঠের মধ্যে যিনি সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াও রজস্তমোগুণ নিরসন জন্য পাপপুণ্য উভয়াবস্থা হইতে বিরত হইয়া আত্মার নির্মলত্ব অনুসরণার্থে প্রকৃতির অতীত নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে রত হন তিনিই জ্ঞানী।

জীবন্মুক্ত জ্ঞানী

ঐ প্রকার অসংখ্য নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে রত জ্ঞানি-মধ্যে যিনি সত্ত্বগুণাশ্রিত মিশ্র ও বিদ্ধভক্তিমূলক কর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে দ্বৈতবুদ্ধিতে নিজাশ্রয়ীভূত উপায়-সমূহকে অসম্পূর্ণবোধে পরিত্যাগপূর্বক মুক্তাভিমানে ব্রহ্মস্বরূপ-লাভ-অভিমানে দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য অথবা জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ত্রিবিধ বিষয়ের বৈশিষ্ট্য লোপ করেন, তিনি জীবন্মুক্ত জ্ঞানী।

কৃষ্ণভক্তের দুর্ল্লভত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব

যাঁহারা জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত, কেবল চিন্মাত্রবাদী জ্ঞানী, তাঁহাদিগকেই মুক্ত বলা হয়। সেই সকল মুক্তদিগের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধালু হইয়া কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত হন তিনিই কৃষ্ণভক্ত। "কোটি-মুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।" কৃষ্ণভক্তই ভাগ্যবান্।

বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্-কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন। এই শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ শ্রীব্রহ্মসংহিতায় এইরূপ পাওয়া যাইতেছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্বকারণকারণম্॥

অর্থাৎ কৃষ্ণই একমাত্র পরম ঈশ্বর। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি সমস্ত কারণের কারণ। তিনি অনাদিরও আদি এবং তাঁহার নাম গোবিন্দ। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাই—

"এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"

অর্থাৎ রাম-নৃসিংহাদি বিভিন্ন অবতারসমূহ কৃষ্ণেরই অংশ বা কলা। কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। কৃষ্ণ জড় জগতের কোনও বস্তু নহেন; তিনি অধোক্ষজ। অধোক্ষজ কৃষ্ণের কীর্ত্তনের কথা বলা হইতেছে। কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের লীলা ও কৃষ্ণের পরিকর বৈশিষ্ট্যের আলোচনা-মুখেই কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্ভব। মনে রাখিতে হইবে যে, যেহেতু কৃষ্ণ অধোক্ষজ-তত্ত্ব তাই দেহ ও মনোধর্ম্মে আবদ্ধ-থাকাকালে কৃষ্ণকীর্ত্তন যে কি বস্তু তাহা বুঝা যায় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনের অধিকার একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায়ই লভ্য। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু তদীয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের বিষয়ে বলিয়াছেন—

"গুরুপাদাশ্রয়ঃ তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-গ্রহণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥"

সর্ব প্রথমই গুরুপাদাশ্রয় ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে কৃষ্ণ-দীক্ষাদি-গ্রহণের কথা। একমাত্র গুরুপাদাশ্রয়কারীরই কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকার। যাহার যাহা আছে তাহাই তিনি অপরকে দিতে পারেন। যেহেতু শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট এবং সর্বদাই কৃষ্ণকীর্ত্তনে রত, তাই

একমাত্র তিনিই কৃষ্ণকীর্ত্তনের অধিকার দিতে সমর্থ। তাই সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রয়াসী হন তাঁহাদের কৃষ্ণকীর্ত্তন হয় না। তাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তন মনে করিয়া মায়ার কীর্ত্তনই করিয়া থাকেন।

বস্তুর নিত্যানিত্যত্ববিচারে আমরা জানিতে পাই—কৃষ্ণই একমাত্র নিত্য বস্তু এবং কৃষ্ণের কীর্ত্তনকারী ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনও নিত্য। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম। বিরূপ অবস্থায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের বহুবিধ অন্যান্য ধর্ম্মের—যথা, দেহ-ধর্ম্ম, মনো-ধর্ম্ম, দেশ-ধর্ম্ম, পৈত্রিক-ধর্ম্ম, জাতীয়-ধর্ম প্রভৃতির উদয় হইয়াছে। মুক্ত আত্মার একমাত্র কৃত্য হইতেছে—কৃষ্ণের কীর্ত্তন। 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন'—একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, একমাত্র কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের জয়গান দ্বারাই জীবের পরম প্রয়োজন লাভ হইবে। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মধ্যেই নিজের উপকার ও পরের উপকার নিহিত রহিয়াছে। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই সাধন; কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই—সাধ্য। বদ্ধজীব কৃষ্ণ-কীর্ত্তনরূপ সাধন অবলম্বন করিয়াই মুক্তাবস্থায় বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অধিকার লাভ করিতে পারেন।

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়, ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হয় এবং প্রতিপদেই আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধিত হয়। অতএব কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের জয়গানই আমাদের একমাত্র কৃত্য।

"কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি
ধাই তব পাছে পাছে॥

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অধিকার পাইতে হইলে আমাদিগকে তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইতে হইবে। একথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জাগতিক কোনও ব্যাপার নহে এবং কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারীর ক্রিয়াকলাপ একমাত্র তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত জাগতিক-বিদ্যা-বুদ্ধি-দ্বারা জ্ঞাতব্য নহে। তাই মহাজন বলিয়াছেন—

"বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।"

কিন্তু আমরা যদি ভোগ অথবা ত্যাগের বিচারে আবদ্ধ না হইয়া সেবোন্মুখ হই, তাহা হইলে বৈষ্ণবের কৃপা উপলব্ধিকারীর সৌভাগ্য বরণ করিতে পারি ও কৃষ্ণকীর্ত্তন যে কি বস্তু, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। নিজে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারীর আনুগত্যে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে প্রবিষ্ট হওয়া, অপরকে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ত করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার, তাই আবার বলিতেছি—

"কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন"।

আশা মরু

জাগ্রদ্দশায় রাজাদি-দর্শন ও ইন্দ্রাদি-শ্রবণ জন্য সংস্কার মনোমধ্যে আহিত হইলে, নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সেই মনের দ্বারা ঐ দৃষ্ট ও শ্রুত-বিষয় চিন্তা করিতে করিতে লোকেরা যদ্রূপ জাগ্রদ্দশায়—দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের সদৃশ অনির্বচনীয় রাজাদিরূপ স্বপ্নেও মনোরথ-যোগে দর্শন করে, তাহাতে জাগ্রদ্দেহ হইতে তাহার স্মৃতি অপগত হইয়া যায়। আমার মনের তুলিতে আঁকা বস্তুগুলির ধ্যান করিতে করিতে, যেমন গমনকারী পুরুষ অগ্রে নিহিত একপদে ভূমি আশ্রয়-পূর্বক দেহ ধারণ করিয়া, পরে অন্য পদকে পূর্বস্থান হইতে উত্তোলন পুরঃসর সম্মুখে নিহিত করিয়া গমন করে, তদ্রূপ কর্ম্মপথে বর্ত্তমান জীব আমিও প্রারব্ধ কর্ম্ম সমাধানের জন্য পঞ্চভূত-নির্মিত অন্য একটা দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। দেখিতে দেখিতে আমার চেতনবৃত্তি যেন লোপ হইয়া গেল, বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ জ্ঞান আর রহিল না। ক্ষণকাল

পরে যখন ঐ ভীষণা অমা আমার অক্ষিগোলকের অন্তরালে আস্তে আস্তে অপসারিত হইয়া গেল, কোথা হইতে যেন পুরীষ-পূয়-ভোজী-কৃমিকুল আমাকে ছিঁড়িয়া খাইতেছে অনুভব করিলাম! কোথায় দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা, সুরম্য সৌধাবলী, নব-দারার মৃদুহাস্য কলভাষ, কোষাগার, দাস-দাসী আর বিষ্ঠা-ক্লেদপূর্ণ তপ্ত পিঞ্জরের মধ্যে কৃমিকুলের ভীষণ দংশন। যে পুত্র-কলত্রের সেবা অশেষ বিধর্মে করিলাম, তাহারা ত' এ বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছে না! তখন সকল সময়ের বান্ধব শ্রীহরি ব্যতীত সে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার কেহই নাই দেখিয়া তাঁহাতেই শরণাপন্ন হইলাম। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে যেন সেই নবনীরদকান্তি দিব্যকিশোরমূর্তি আর্ত্তবন্ধু আমার কাছে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যদিও আমি সেই ভীষণ উত্তাপ এবং কীটকুলের দংশনে নিপীড়িত হইতে-ছিলাম, তথাপি যেন আবার একটা নবশক্তির উদয় হইল, বড়ই শান্তি পাইলাম। কিন্তু আমার দুরদৃষ্টক্রমে অল্প সময়ের মধ্যে ঐ শান্তিময় ছবিখানি মুছিয়া গেল। তখন নিরাশ হৃদয়ে শান্তির আশায় আশা-মরুভূমির দিকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে, এক ভীষণ জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। তথায় পাঁচজন দস্যু বাস করিতেছে; শুধু তাই নয়, ক্রূরস্বভাব-বিশিষ্ট বৃকগণ তথা শৃগাল, মশকাদি আমার রক্তমাংস ভক্ষণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ঐ পাঁচজন দস্যু আমাকে প্রাপ্ত জানিয়া আমার পূর্ব-সঞ্চিত অর্থগুলি অপহরণ করিল। অবশেষে এক চক্রবাতের মধ্যে ফেলিয়া আমাকে সংহার করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। ঐ চক্রবাতোত্থিত কন্দর্প ধূলি-কঙ্কণে যখন আমার চক্ষুকে আবৃত করিল, তখন আর দিক-দেশ-কাল-বিচারে অসমর্থ হইয়া বহুদিন ধরিয়া অন্ধের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অফুরন্ত আশা-ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী-বক্ষে তৃণাচ্ছাদিত গহ্বরটীই চিরবাসস্থান হইল।

সে-সময় বসন্তের মৃদুমন্দ সুশীতল মরুতের আগমনে যেন প্রাণটা মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। তখন তৃণাবৃত গহ্বরটীর এক পার্শ্বে বসিয়া বিহঙ্গ-কুলের ঝঙ্কার মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিতে লাগিলাম। কখনও বা পথভ্রান্ত বণিকের ন্যায় অর্থের আশায় গ্রাম, নগর পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ অরণ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছিলাম, তখন কত রং-বেরঙের আশার ছবিগুলি মানস-কেতনে শোভা পাইতে লাগিল। আবার যখন অভাবরূপী সিংহের গর্জ্জনে ভীত হইয়া পড়িতাম, তখন আশ্রয়ের আশায় কৃপণ উলুকের দ্বারদেশে আসিয়া আর্ত্তনাদ করিতাম। প্রত্যক্ষ অপ্রিয়ভাষী উলুকের তীব্র মর্মভেদী বাক্যবাণে যখন আমার হৃদয়টা বিদ্ধ হইয়া যাইত তখন ঐ দুঃখ দূর করিবার আশায় আমার সমশীল দুঃখীর কাছে কত কাতর-কণ্ঠে মনোভাব ব্যক্ত করিতাম। আবার সুবৃহৎ কর্মকাণ্ড-পর্বতে উঠিতে বাসনা হইলে, অভাবরূপী রিপুগণের দ্বারা প্রহৃত হইয়া যখন ম্রিয়মাণ হইয়া যাইতেছিলাম, তখন আমার স্বজনাখ্য দস্যুগণকে প্রতিকূল বুঝিয়া বহু কটুকথার দ্বারা ভর্ৎসনা করিতে লাগিলাম। অন্যদিকে মশকরূপী তস্করগণ বিনয় বাক্যে আমার সঞ্চিত অর্থগুলি লুণ্ঠন করিতেছিল। ঐ শৃগালগুলি যখন "খা'ব খা'ব" করিতেছিল, অন্যদিকে ভীষণাকৃতি বাঘিনীর জিহ্বা লেলিহান করিতে করিতে আগমন করিতেছিল তাই দেখিয়া ভয়ে উধাও হইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে একটা ক্ষুদ্র বকের শরণ গ্রহণ করিলাম। অল্পসময়ের মধ্যে ঐ কপট কর্ম্ম-জ্ঞানগর্ত্তে বিচরণশীল বকের সামর্থ্যহীনতা দেখিয়া, আশা-নদী পার হইয়া নিরাশ-হৃদয়ে একটা নূতন দেশে আসিয়া গেলাম। সে-দেশটা কেমন জানেন? সে-দেশটা নিরাশা-কল্পদ্রুমে আবৃত হইয়া যেন কি এক অলৌকিক শান্তি দিবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছে। আমি তখন বিশ্রামের আশায় ঐ বৃক্ষের নীচে বসিলে, একজন মহাপুরুষ যেন আমার হাত ধরিয়া তাঁ'র নির্জ্জন শান্তিময় কুটীরে লইয়া যাইতেছিলেন। যেস্থানে আমাকে লইয়া যাইতেছিলেন, সে স্থানটার নাম কি জানেন? সে স্থানটার নাম "মঠ"। মঠ কাহাকে বলে জানেন? মঠের অন্য নাম পরমার্থ-বিদ্যালয়। কলেজের অথবা স্কুলের সমস্ত ছেলেই কি পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে? সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় সকলেই পারঙ্গত হইবে না। দুষ্টমন তুমি তজ্জন্য চিন্তা করিও না। মা

আশারানি! তুমি আজ তোমার পতির গৃহে আসিয়াছ। এখনও তোমার পতির সেবা করিতে পার না? আবার বাহাদুরী দেখিয়ে, খুব ভাল হইতে চাও? মা লেখনি! তুমি বক্রগতিতে প্রবন্ধের রূপ ধারণ করিয়া নাচিতে নাচিতে বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতেছ অশান্তির আশায়? না ধর্মটাকে যমের দক্ষিণ-দ্বারে পাঠাইতে? আশার মুখে ছাই দিয়া নিত্যপতির গুণকীর্ত্তন করিতে কি তোমার মাথায় বাজ্ পড়ে? ভূতে পাওয়া রোগীর ন্যায় বাচালতা ত্যাগ করত সতর্ক হইয়া প্রাণ ঢালিয়া সেবা কর। গৃহ ও মঠ এক মনে করিও না। ভাই পথিক! বৈষ্ণবকে পূজ্যবুদ্ধি করিবে, তাঁ'দের ঘৃণা করা উচিত হয় না।

বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব

"ব্যাপ্নোতীতি বিষ্ণুঃ"। যিনি সর্বব্যাপী তিনিই বিষ্ণু। তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহই থাকিতে পারে না। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন "সর্বে বিষ্ণুজাঃ বৈষ্ণবাশ্চ" অর্থাৎ সকলেই সেই পরম-পুরুষ বিষ্ণু হইতে জাত এবং বৈষ্ণব। স্বরূপতঃ সকলেই বৈষ্ণব হইলেও যিনি মহামায়ার অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহাকে অবৈষ্ণব বলা হয়। পরমেশ্বর বিষ্ণুর ভক্তগণই বৈষ্ণব।

"তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" এই ঋঙ্-মন্ত্র আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে বিষ্ণুর পরমপদ সূরিগণ সর্বদাই দর্শন করেন। বিষ্ণুপাদ-পদ্মের সেবার নিত্যত্ব এখানে সূচিত হইয়াছে। বিষ্ণুর সেবক বৈষ্ণবগণ নিত্য এবং তাঁহাদের সেবাকার্য্যও নিত্য। বৈষ্ণবের বিচার "বিষ্ণুরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ" অর্থাৎ একমাত্র সমস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বর বিষ্ণুই সর্বদা আরাধ্য।

ইহজগতে মানবের দেশ-কাল প্রভৃতির বিচারে যে বিভাগ আছে সে সকলই অনিত্য। প্রকৃত প্রস্তাবে মানব-সমাজকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে; এক ভক্ত ও অপর অভক্ত। 'ভজ'—সেবায়াম্। ভজ্ ধাতুর অর্থ—সেবা। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন বা সেবা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সেই সেবালাভের জন্য যত্ন-বিশিষ্ট হন তাঁহারাই ভক্ত আর যাঁহারা ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া ভগবৎসেবার প্রয়োজন অনুভব করেন না তাঁহারাই অভক্ত। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিষ্ণুভক্তের বিচারে সেব্যবস্তু শ্রীভগবান্ নিত্য, তাঁহার সেবকগণ নিত্য ও সেবা নিত্যা। যাঁহারা সেবার নিত্যত্ব স্বীকার করেন না ও মনে করেন সাধনকালে ভক্তি অবলম্বন করিয়া পরে সিদ্ধাবস্থায় আর ভজনের প্রয়োজন থাকিবে না তাহারা অভক্তি-পথাবলম্বী। তাই কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি ভক্ত নহেন। ভক্তি দেহ বা মনের কোনও ব্যাপার নহে। দেহ বা মনের নিত্যত্ব নাই। ভক্তি আত্মার নিত্যা বৃত্তি। সাধারণ জগতের লোকে ভক্তিকে যে ভাব প্রবণতা বা Emotion মনে করিয়া মনেরই বৃত্তি বলিয়া বিচার করেন তাহা সত্য নহে। বর্ত্তমানকালে সর্বদেশে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোচনা হইতেছে এবং প্রায় সকলেই গীতাকে প্রমাণ-রূপে স্বীকার করেন। সমগ্র গীতা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে ভক্তিই যে গীতার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় ইহা বুঝিতে আর বাকী থাকে না। কেহ যদি 'কর্ম্মণ্যেবাধি-কারস্তে' পর্য্যন্ত পড়িয়াই গীতা পাঠ শেষ করিয়া দেন তাহ'লে তাহার পক্ষে কর্মই গীতার উদ্দেশ্য একথা বলা অন্যায় নহে। আবার যিনি 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে' দেখিয়াই জ্ঞানই গীতার উদ্দেশ্য বিচার করেন তাঁহার বিচারও অসম্পূর্ণ। আবার গীতায় যখন "তপস্বি-ভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥" দেখিয়া যোগী যোগই গীতার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া স্থির করেন তখন তাহার সে-ধারণাও ভ্রম-পরিপূর্ণ বলা

যাইতে পারে কারণ গীতার পরবর্ত্তী শ্লোকেই পাই "যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।" অতএব দেখা যাইতেছে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ। তাই গীতার শেষ কথা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নির্গত ঐ সকল বাস্তব সত্যের কথা যে অভক্ত-সমাজে আদৃত হইবে না ও তাহারা যে উহাকে উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনে করিতে পারিবেন না তাহা গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি আলোচনা করিলে সহজেই বোধগম্য হয়।

দ্বৌভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥

শ্রেয়ঃসন্ধানে মানবই সমর্থ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীন-তারণম্॥

অদ্য আমাদের সাপ্তাহিক অধিবেশনের দ্বাদশ অধিবেশন-দিবস, আমরা এ যাবৎকাল পরম পূজ্যপাদ সুযোগ্য বক্তা শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর নিকট হইতে প্রতি অধিবেশনেই প্রচুর মঙ্গলের কথা শুন্‌বার সৌভাগ্য পেয়েছি। সর্বপ্রথমে তাঁ'র কৃপাই আমাদের অদ্যকার অধিবেশনের সম্বল হউক। তাঁ'র কৃপা হইলেই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা লাভ করিতে পারিব।

শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন করেন শ্রীগুরুদেব—তাঁ'র যাবতীয় ইন্দ্রিয় সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত, আর তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ—যাঁ'রা তাঁ'র বাণীকে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ ক'রেছেন। মাদৃশ নিতান্ত প্রাকৃত অভিমান-বিশিষ্ট মূঢ় ব্যক্তির দ্বারা শ্রীহরিকীর্ত্তন সম্ভব হ'তে পারে না। তবে সে উদ্দেশ্যে চেষ্টা করা ব্যতীত বিষয়-তরঙ্গের আক্রমণ হ'তে নিজেকে রক্ষা করিবার উপায়ও নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং তদীয় পার্ষদবৃন্দ এ অযোগ্য ব্যক্তিকে এই চেষ্টায় সর্বতোভাবে কৃপা করুন, তাঁদের কৃপাই সর্বতোভাবে আমার সম্বল হউক।

উপনিষৎ আলোচনা করিয়া দেখিলে "শ্রেয়ঃ" ও "প্রেয়ঃ"—এই দুইটি শব্দ আমরা পা'ব। রোগীর বিচারে যাহা ভাল তাহাই "প্রেয়ঃ" এবং রোগীর বিচারে ভাল বোধ না হইলেও যাহাতে রোগীর উপকার হইবে তাহাই শ্রেয়ঃ। রোগী চায় সর্বদা কুপথ্য খেতে অথবা সময় সময় অত্যন্ত রোগ-যন্ত্রণা হ'লে তাহাতে একটু স্থিরভাবে থাকতে। এ দুটিই তা'র ভাল লাগে, এটা হচ্ছে প্রেয়ঃ; তা'র রুচির বিরুদ্ধে রয়েছে—ঔষধ ও সুপথ্য। তাহা সে কিছুতেই গ্রহণ করিতে চাইবে না। এইরূপে শ্রেয়ঃপন্থা সে সর্বদা ত্যাগ করতে চায়।

আমরা সকলেই ভবরোগগ্রস্ত রোগী, এখানে আমাদের

যে ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগ চেষ্টা অর্থাৎ যাহা কিছু আমার ভাল লাগে সেইটাই হচ্ছে প্রেয়ঃ ; তাহার পেছনে ছুটলে আমরা শ্রেয়েঃর সন্ধান আদৌ পাব না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

'ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত।
কৃষ্ণ-ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত ॥"

প্রেমের সন্ধান যদি আমরা চাই তাহ'লে আপাত-মোহনকারী ঐ যে ভুক্তি-মুক্তি বা কর্ম্মজ্ঞানপন্থা তাহা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। জগতে যাঁ'রা কর্ম্মের বাহাদুরী দেখাতে পারেন তাঁ'রা লোকের নিকট প্রচুর পরিমাণে বাহবা পেলেও সত্য সত্য শ্রেয়েঃর সন্ধান দিতে পারেন না। মাতালকে মদের গ্লাস সংগ্রহ ক'রে দিলে বাহবা পাওয়া যায়, রোগীর কুপথ্যের ব্যবস্থা করলে রোগী সন্তুষ্ট হ'য়ে ডাক্তার বাবুকে অনেক সময় অধিক পরিমাণে অর্থাদি দেন, কিন্তু ঐরূপ বাহবা-প্রয়াসী ব্যক্তি এবং অর্থগৃধ্নু চিকিৎসক কি জগতের কোন মঙ্গল করেন? মাতাল যা'তে তা'র দুষ্কার্য্যের সহায়তা না পেয়ে নিজেকে নিঃসহায় মনে ক'রে অনুতপ্ত হ'তে পারে, যা'তে তা'র চরিত্র সংশোধনের উপায় হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তির কি তাহাই করা উচিত নয়? রোগীর তিরস্কার সহ্য করিয়া রোগীর নিকট হইতে অর্থগ্রহণ-লিপ্সা পরিত্যাগ করত তাহাকে ঔষধ এবং সুপথ্য-দান করাই কি সহৃদয় চিকিৎসকের কার্য্য নয়? গরীব-দুঃখীকে অন্ন-বস্ত্রাদি দ্বারা সহায়তা করাটাকেই আমরা খুব বড় কাজ ব'লে মনে করি এবং যাহাতে ঐ কার্য্য প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয় তাহাকে আমরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ব'লে মনে করি ; এমন কি, সময় সময় অবতার বলিতেও দ্বিধাবোধ করি না। কোন একটী বৃক্ষকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতে হইলে তা'র মূলসহ তা'কে উৎপাটন করা প্রয়োজন, তা' না ক'রে যদি কেবল তা'র ডালপালাগুলি ছাট্‌তে থাকি তাহ'লে কিছু পরে দেখব—আবার নূতন নূতন শাখা-প্রশাখা প্রকাশিত হচ্ছে ; রোগের দুটি একটি উপসর্গ লক্ষ্য ক'রেই যদি চিকিৎসক মহাশয় একটি একটি উপসর্গ ধ'রে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন, তাতে তিনি দেখতে পাবেন প্রথম উপসর্গটি আবার প্রকাশিত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হয়ত আরও দু'চারটি উপসর্গ লক্ষ্য করতে পারবেন। কেন? এর কারণ কি? এই সমস্ত উপসর্গের মূলে যে একটি রোগ আছে সেই মূল ধরে চিকিৎসা না করার দরুণ, কারণের স্থায়িত্বে কার্য্যের বার বার প্রকাশ। আমাদের যে অনন্ত দুঃখ-দারিদ্র্য—এর মূল বা কারণ হচ্ছে আত্মজ্ঞানের অভাব—ভগবদ্-বিস্মৃতি।

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭—১১৮)

আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-শাস্ত্র আলোচনা করলেও দেখতে পাই—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥"
—(গীঃ ৮।১৬)

সর্বতোভাবে শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত—আত্মজ্ঞানের পূর্ণবিকাশ ব্যতীত যাওয়া আসার হাত হ'তে উদ্ধার পাবার উপায় নাই। প্রাচীনকালে অপরাধীদিগকে জলে ডুবিয়ে রেখে শাস্তি দেওয়া হ'ত, যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করলে একটু উঠিয়ে ধরা হ'ত মাত্র। স্বর্গ এবং নরক এইরূপ ব্যাপার-বিশেষ, অনন্ত-দুঃখের মধ্যে মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য একটু সুখ-ভোগকেই আমরা স্বর্গ বলিয়া জানি।

"তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণ-পুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥"
—(ভাঃ ১১।১০।২৫)

এই হচ্ছে কর্ম্মমার্গের অবস্থা। কর্ম্মের ন্যায় জ্ঞানও প্রেয়ঃ পন্থায় মানুষকে চালিত করে, উহা রোগীর যন্ত্রণার ছট্‌ফট্‌ হ'তে একটু স্থিরভাবে অবস্থান মাত্র, কিন্তু তা'তে তা'র রোগ নষ্ট হয় না, আবার যন্ত্রণার সম্ভাবনা রয়েছে। জগতের বিলাস-বৈচিত্র্যের অভিজ্ঞতায় মানব যে ক্লেশ পেয়েছে নিজের ভাল লাগার পেছনে প্রধাবিত হ'য়ে তা হ'তে নির্ণয় করলেন, বিলাস-বৈচিত্র্য-রহিত নির্ব্বিশেষত্ব—

শান্ত ভাবই হচ্ছে শান্তি কিন্তু আমরা একটু স্থির হ'য়ে ধৈর্য্য ধ'রে আলোচনা করলে দেখতে পাই, এখানে শান্তির অর্থ 'অশ্ব-ডিম্ব' অর্থাৎ যার বাস্তবতা কিছু নাই।

ব্রহ্মজ্ঞানযোগে আনন্দ-বৈভব।
জড়ের বিচ্ছেদ সুখে ছায়া অনুভব ॥
অভেদ্য কৈবল্য সুখ স্বল্প বলি' জানি।
কৃষ্ণনামানন্দ সুখ ভূমা বলি মানি ॥
—(হরিনাম-চিন্তামণি)

জ্ঞানযোগের সাধনকালে সুখের ছায়ামাত্র অনুভূত হ'লেও সিদ্ধিতে তা'র কোন অস্তিত্ব নাই। কেননা সেখানে সেব্য-সেবক এবং সেবার বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য ধ্বংস হ'য়ে সব নির্ব্বিশেষত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছে। কে সেখানে সুখ-আস্বাদন করবে এবং আস্বাদন-আস্বাদ্যই বা কি থাকবে। সেব্য, সেবক এবং সেবা—এই ত্রিবিধ বৈচিত্র্য স্বীকার ব্যতীত আনন্দের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তদ্ব্যতীত শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ দেখিয়েছেন, ব্রহ্ম-সাযুজ্য বা নির্ব্বিশেষত্ব লাভ ক'রে জীব কল্পকাল অবস্থান করে; কিন্তু তাহাতে তাহার কর্ম্মফল নষ্ট হয় না, কল্পান্তে তাহাকে সৃষ্ট-জগতের মধ্যে এসে পূর্বের কর্ম্মানুযায়ী নরক এবং স্বর্গের নাগর-দোলায় চড়্‌তে হয়, তাই আমরা ঠাকুর নরোত্তমের ভাষায় জানতে পারি—

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥
—(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

কর্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড—নানা-যোনি ভ্রমণের হস্ত হ'তে উদ্ধার করতে পারে না। চিন্ময়-বস্তু শ্রীভগবৎ-মহাপ্রসাদ বঞ্চিত হ'য়ে যে সকল বস্তু তাঁহারা গ্রহণ করেন সেগুলি অখাদ্য মাত্র। অত্যন্ত বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিদের নিকট যাহা ভাল, প্রকৃতিস্থ যাঁ'রা তাঁ'রা তাহা ভাল ব'লে গ্রহণ করতে পারেন না। জ্ঞান-কর্ম্মাদি-বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের অবস্থা চিন্তা ক'রে ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ হয়। আলোকের পূর্ণ প্রকাশে তমোরাশির সর্ব্বতোভাবে বিলুপ্তির ন্যায়, জীব-স্বরূপের নিত্যবৃত্তি ভগবদ্ভক্তিতেই জন্মজন্মার্জ্জিত যাবতীয় কর্মফল এবং কর্ম্ম চেষ্টা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। ভক্তিবৃত্তি আমাদিগকে নিত্য বাস্তব-সত্য সূর্য্যের পূর্ণালোকে স্থান দান করেন, ইন্দ্রিয়তর্পণকারী প্রেয়ঃরুচির বিরোধী—এই ভক্তিবৃত্তিই একমাত্র শ্রেয়ঃপন্থা। শাস্ত্রে জীব-স্বরূপের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তির পূর্ব পর্য্যন্ত, জীবকে চেতনের বিকাশ তারতম্যে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; আচ্ছাদিত-চেতন, সঙ্কুচিত-চেতন, মুকুলিত-চেতন, বিকচিত-চেতন এবং পূর্ণ-বিকচিত চেতন। বৃক্ষ-প্রস্তরাদিতে যে চেতন রয়েছে তাহার অবস্থা আচ্ছাদিত বা সুপ্তপ্রায়, পশু-পক্ষীতে তদপেক্ষা চেতনের বিকাশ ঈষদুন্নত, উহারা সঙ্কুচিত-চেতন-শ্রেণীভুক্ত; মানবের মধ্যে কেহ কেহ অনৈতিক—যথেচ্ছাচারে ইন্দ্রিয়তর্পণই তাহাদের একমাত্র কার্য্য, কেহ কেহ নিরীশ্বর-নৈতিক অর্থাৎ কিছু কিছু জড়নীতির দিকে লক্ষ্য আছে কিন্তু সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-নীতি যে ভগবৎ-কৃতজ্ঞতা তাহা আদৌ স্বীকার করেন না।

যারা কল্পিত সেশ্বর নৈতিক তাঁরা নীতিকেই প্রবল রেখেছেন এবং সেই নীতিকে রক্ষা করবার জন্য একটি কল্পিত ঈশ্বরকে খাড়া করেছেন। সত্য সত্য ঈশ্বরের বাস্তব অবস্থান সম্বন্ধে তা'দের কোন বিশ্বাস বা কৃতজ্ঞতা নাই। পূর্ব্বোক্ত দোষে দুষ্ট হইয়া তাহাদেরও নীতি সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা অসম্ভব, কিছু কিছু তারতম্য থাকলেও তাহাদিগকে পশুপক্ষী অপেক্ষা বিশেষ উচ্চ আসন দেওয়া যায় না; কেননা ইন্দ্রিয়তর্পণই তাদের একমাত্র কার্য। যাহা আমরা পশুপক্ষীর মধ্যে সর্ব্বতোভাবে দেখতে পাই, নিজে ইন্দ্রিয়-তর্পণ-কামী বলে অপর ইন্দ্রিয়-তর্পণকামীর ইন্দ্রিয়তর্পণে কিছু ব্যাঘাত করলে আমরা তাহার, ইন্দ্রিয়তর্পণ কার্য্যে সহায়তা করবার জন্য যে চেষ্টা বা নীতি দেখাই উহা পশু পক্ষ্যাদিতেও দৃষ্ট হয়, এক বানরের দল হ'তে একটী বানরকে হত্যা বা প্রহার করিলে দলের সমস্ত বানরগুলি উক্ত প্রহৃত বা নিহত বানরটির প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়া থাকে। বায়স সম্বন্ধেও আমরা এরূপ লক্ষ্য করি, সুতরাং এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে উত্তম পশু ব'লে শাস্ত্রে আখ্যা দিয়েছেন।

উক্ত তিন শ্রেণীকেই মুকুলিত-চেতন বা চেতনের ঈষৎ পরিচয় মাত্র শ্রেণীভুক্ত ক'রেছেন। তারপর হ'চ্ছে বাস্তব সেশ্বর নীতির কথা, এখানে চেতন-পুষ্প বিকাশোন্মুখ, ভগবানের অস্তিত্ব, ভগবৎ কৃতজ্ঞতা সর্ব্বতোভাবে তাঁরা অবলম্বন ক'রেছেন, তবে নীতির দিকে কিছু দৃষ্টি আছে, এখান থেকেই শ্রেয়ঃ সন্ধানে জীবের গতি পরিলক্ষিত হয়। এর পরের অবস্থাই হ'চ্ছে সাধনভক্তি অবস্থা, এখানে চেতন-পুষ্প বিকশিত হ'য়েছে, তবে তার পাপড়িগুলি পূর্ণরূপে বিকাশ ক'রে পূর্ণ সৌগন্ধ বিকিরণ করতে পারেনি, সাধন-ভক্তের জড়নীতির দিকে আদৌ লক্ষ্য নাই; সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরম নীতিই যে ভগবৎসেবা তাঁহাকেই তিনি সযত্নে সর্বদা রক্ষা করবার জন্যে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

এই হ'চ্ছে তাঁহাদের মূলমন্ত্র। বাস্তব সেশ্বর নৈতিক ও সাধন ভক্তকেই বিকচিত চেতন শ্রেণীতে ভুক্ত ক'রেছেন।

ভাবভক্ত জীবন হ'চ্ছে তার পরের অবস্থা, এখানেই চেতন-পুষ্প পূর্ণ বিকশিত হ'য়ে, পূর্ণ সৌগন্ধ-বিস্তার করে। নিখিল চেতনের অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীভগবানের পাদপদ্ম চুম্বনে স্বাভাবিক গতি লাভ করেছে। এই অবস্থাকে পূর্ণ-বিকচিত চেতনাবস্থা বলে। তথায় আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের পূতিগন্ধ সর্বতোভাবে বিদূরিত হইয়া স্বরাট্ পূর্ণবস্তু শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধানই একমাত্র তাৎপর্য্য। ইহারই গাঢ় অবস্থা বা চেতনের সর্বপূর্ণতম বিকাশকে 'প্রেম' বলে, উহাই জীব-স্বরূপের চরম প্রয়োজন বা শ্রেয়ঃ সন্ধানের পূর্ণতমসিদ্ধি।

শ্রীরূপ শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদকে লক্ষ্য ক'রে জগতে যে মহামূল্য শিক্ষামৃত রেখে গিয়েছেন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উহা সম্পুটিত হয়েছে ;—

এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশি-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমন॥
কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তা'র সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি॥
তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তীর্য্যক—জল-স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটি মুক্ত-মধ্যে 'দুর্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধি-কামী, সকলি 'অশান্ত'॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামৃতে আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মেরই সদ্ব্যবহারে শ্রেয়ঃ সন্ধানে সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু চেতনের বিকাশ তারতম্য পরিচয়ে পূর্বোক্ত ন্যায়ে অবস্থার তারতম্য দেখিয়েছেন।

শ্রেয়ঃ সন্ধানে ব্রতী না হ'লে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব আছে স্বীকৃত হ'তে পারে না, মানব শ্রেয়ঃপন্থী না হ'লে পশু পক্ষী অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাতে পারলেও উহা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ তাৎপর্য্যে নিযুক্ত হওয়া হেতু শোক, মোহ, ক্লেশ আহার বিহার ভয় মৈথুন ইত্যাদি ধর্ম্ম; যাহা পশু-পক্ষ্যাদিতেও দৃষ্ট হয়, তা' হ'তে পরিত্রাণ লাভ করতে পারেন না। তাদের এই শ্রেষ্ঠত্বই বা কয়দিনের? কালের অনন্তত্ব বিচারে উহার স্থিতি অতি অল্প দিন। শ্রীমদ্ ভাগবতের বিচারে তাঁ'দের এই শ্রেষ্ঠত্ব শীঘ্রই ধ্বংস হ'য়ে সর্ব্বতোভাবে আবার পশু জীবন লাভ করতে হয়।

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃস্যাৎ॥
—(ভাঃ ১১।৯।২৯)

মনুষ্য জন্মকে দেবদুর্লভ জন্ম ব'লেছেন। আমরা

জগতে দেখতে পাই, যা'দের মধ্যে জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রী অধিক পরিমাণে র'য়েছে তা'দের পক্ষে হরিভজন বা শ্রেয়ঃ অনুসরণ অতি দুরূহ। গরীব লোকদের মধ্যে ভগবানে একটা সাধারণ রুচি দেখা যায়। মানুষ পুণ্য কর্ম্মাদি ক'রে স্বর্গে গিয়ে দেবত্ব লাভ করেন। সেখানকার জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রী এখান হ'তে অনেক শ্রেষ্ঠ, সেখানকার নন্দন-কানন, পারিজাতপুষ্প, অপ্সরাদের নৃত্য—শ্রেয়ঃসন্ধান হ'তে একেবারে বঞ্চিত ক'রে দেয়। তারপর আবার "কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"—ন্যায়ানুসারে ভূতলে এসে সাধারণ জীবের ন্যায় দশা প্রাপ্ত হতে হয়। পশুপক্ষী জীবনে বিবেক অভাব হেতু শ্রেয়ঃসন্ধানে বঞ্চিত থাকতে হয়। বিবেকবান্ অতি ভোগাভাব মনুষ্য জন্মই হ'চ্ছে শ্রেয়ঃসন্ধানের জন্ম তাই তাহাকে সুদুর্লভ বলা হইয়াছে।

জলজাঃ নবলক্ষাণি, স্থাবরাঃ লক্ষ বিংশতি।
কৃময়ঃ রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষীণাং দশলক্ষ্যকম্॥
ত্রিংশ লক্ষাণি পশুবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বিচারেও আমরা দেখতে পাই মনুষ্য জীবন কত দুর্লভ ও বহু যোনী ভ্রমণান্তে লাভ ক'রতে পারা যায়। এই যে দুর্লভ এবং শ্রেয়ঃ সন্ধানের যোগ্য একমাত্র মনুষ্য জন্ম লাভ ক'রে আমরা জগতে কতদিন অবস্থান করতে পারি জগতের ইতিহাস তাহার বহু সাক্ষ্য প্রদান ক'চ্ছে। শ্রীল পরীক্ষিত মহারাজের সপ্ত-দিবসমাত্র মৃত্যুর বাকী আছে ইহা তিনি নিশ্চিত জেনে উক্ত সময়ের মধ্যে পরমশ্রেয়ঃ লাভে কৃত নিশ্চয় হইলেন। আমাদের এ মৃত্যু সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই, যে কোন মুহূর্ত্তে প্রাণবায়ু বিয়োগ হইতে পারে। শিশু এবং যুবক সারাজীবন ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় অতিবাহিত ক'রে তাহার দুর্ব্বল অবস্থায়—বার্দ্ধক্যে শ্রেয়ঃ-সন্ধান করবেন এরূপ মনে করেন, কিন্তু তিনি যে বার্দ্ধক্য-দশা পর্য্যন্ত মনুষ্যদেহ ধারণ করে থাকবেন তা'র কিছু নিশ্চয়তা আছে? তা-ছাড়া আমরা দেখতে পাই যে অভ্যাস আমাদের মধ্যে যত দৃঢ়মূল হয় সে অভ্যাস আমাদের তত বেশী অপরিত্যাজ্য হয়ে পড়ে, শৈশব বা যৌবনে ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ থাকে তখন অভ্যাসের ত্যাগ বা গ্রহণ সম্ভব হয়, কিন্তু বার্দ্ধক্যে সারা-জীবনের অভ্যাসে যে ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল ও দুর্বল হইয়া গিয়াছে, সে অভ্যাস আর ছাড়া যায় না। আমরা গীতা শাস্ত্রে শুনেছি মৃত্যুর সময় যে যে রূপ ভাব নিয়ে মরে তার তদনুযায়ী গতি হয়; সে বিচারে আমরা ঠিক দিয়ে রেখেছি সারাজীবন ইতর কার্য্যে কাটিয়ে মৃত্যু সময় কিছু শ্রেয়ঃসন্ধান করবো; কিন্তু জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। সারাজীবন ইন্দ্রিয়তর্পণে কাটিয়ে মৃত্যু সময়ও কেবলমাত্র সেই ইন্দ্রিয়তর্পণ চেষ্টাই উদিত হয়, তখনও কোথা পুত্র, কলত্র, কোথা ভ্রাতা বন্ধু, কোথা টাকা, কোথা বাড়ী, ঘর, এই স্মৃতিই অস্থির করতে থাকে। জীবনের প্রথম হ'তেই ভগবদ্-ভজনে নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন, তবেই যদি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমরা সর্ব্বদা হৃষিকেশের স্মৃতিতে জাগরূক থাকতে পারি, তবেই যদি আমরা—অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষীণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ত্বশ্চ শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥ (ভাঃ ১২।১২।৫৫)—বিচারে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে পর-বিশেষ জ্ঞানের আশ্রয়ে যাবতীয় বিষয় চিন্তা হ'তে বিমুক্ত থেকে নিত্য বর্দ্ধমান আনন্দ সমুদ্র বিন্দুর স্পর্শ লাভ করতে পারি। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

কৌমার আচারেৎ প্রাজ্ঞঃ ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥

সুতরাং নিশ্চিত শ্রেয়ঃলাভে আমাদের এই মনুষ্যজন্মে কালবিলম্ব করা উচিত নয়। আহার, বিহার, মৈথুনাদি বিষয় পশুপক্ষ্যাদি জন্মে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে নিঃশ্রেয়স মঙ্গলের পথ রুদ্ধ।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকুলেন নভস্বতেরিতং পুমান্
ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥
—(ভাঃ ১১।২০।১৭)

শ্রেয়ঃ সন্ধানে উপযুক্ত গুরুপাদপদ্মের প্রয়োজন, মনুষ্য জীবন সুদুর্লভ হ'লেও আমাদের নিকট এখন সুলভ হ'য়েছে কেননা আমরা এটি বর্ত্তমানে পে'য়েছি। কোটী টাকা

দরিদ্রের নিকট দুর্লভ হ'লেও যা'র আছে তা'র কাছে সুলভই হ'য়েছে। এই মনুষ্য জীবনকে সুপটুতর নৌকা বলা যায়, নদী পার হ'তে হ'লে যেমন সুপটুতর নৌকার প্রয়োজন তেমন আবার সুযোগ্য কর্ণধারও দরকার, সেই কর্ণধার হ'চ্ছেন শ্রীগুরু-পাদ-পদ্ম। অনভিজ্ঞ মাঝি যেমন ঘোলায় প'ড়ে নৌকাসহ প্রাণ হারায়; লঘু বা অগুরুর আশ্রয় নিয়ে আমাদেরও সেই গতি হয়। আশ্রয় আশ্রিত উভয়েই ঘোলায় প'ড়ে ম'রতে হয়। ভগবানের ন্যায় শ্রীগুরু-পাদ-পদ্ম সকলের পূজ্য। তিনি সকলের গুরু তবে ব্যক্তি বিশেষে ভগবানকে অস্বীকার করার ন্যায় তাঁহাকে কেহ কেহ অস্বীকার ক'রতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের মতের দ্বারা যেমন ভগবানের অস্তিত্ব লোপ হয় না, শ্রীগুরু-পাদপদ্মও তদ্রূপ ব্যক্তি-বিশেষের মতের দ্বারা গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেন না। 'আমার গুরু', 'তোমার গুরু', আমার কাছে যিনি মানুষ; 'তোমার কাছে তিনি গুরু' এবং আমার কাছে যিনি গুরু তোমার কাছে তিনি মানুষ' এইরূপ বিচার গুরু-বস্তু সম্বন্ধে বিকৃত বিচার মাত্র। যিনি গুরু তিনি সকলের গুরু, তবে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে মাত্র প্রকাশ হ'তে পারেন, কিন্তু সেখানে কোন ভেদ বা মতানৈক্য বা পরস্পর পরস্পরের গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি থা'কতে পারে না। শ্রীগুরু-পাদ-পদ্ম আমাদিগকে কৃপা করুন আমরা যা'তে এ দুর্লভ মনুষ্যজন্মকে সার্থক-মণ্ডিত করতে পারি, তাঁর শ্রীপাদ-পদ্মের বলে বলীয়ান হ'য়ে সংসার সমুদ্র তরণে সমর্থ হই। শ্রেয়ঃ আলোক আমাদের নিত্য-স্বরূপ উদ্ভাসিত করুক।

ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

——::*::——

ভক্ত ও ভগবানের পরস্পর সেবা

কর্ম্মাধিকার বা জ্ঞানাধিকারে শুদ্ধ ভগবদ্-ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা ভগবানের চরণে প্রপন্ন হইতে পারেন না বা ইচ্ছা করেন না, তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়াই ভগবান্ জগতে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বদ্ধ জীবগণ এই কর্ম্ম ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে। তাহাদের ভগবদ্ভক্তিতে অধিকার লাভ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। তবে কর্ম্ম-মিশ্রাধিকারী বা জ্ঞান-মিশ্রাধিকারীর কর্ম্ম ও জ্ঞানবাঞ্ছা অর্থাৎ বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা ক্রমশঃ সমূলে বিনষ্ট হইলে কেবলাভক্তির প্রভাবে তাহাদের নিত্য পরম মঙ্গল লাভ হইতে পারে।

প্রপত্তি ব্যতীত কর্ম্মী বা জ্ঞানী কাহারও ভগবৎসেবার অধিকার নাই। ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই ভগবানের নিত্য ও উপাদেয় কৈঙ্কর্য্য লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি ভগবদিতর কোন নশ্বর বস্তুর দাস্য লাভ করিবার জন্য কখনও প্রস্তুত নহেন।

যিনি যেরূপভাবে ভগবৎসেবায় প্রপত্তি-বিশিষ্ট, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সেই প্রকার সেবাতেই অনুরূপ যোগ্যতা প্রদান করেন। ইহাতে এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ভগবানকে স্বীয় ভৃত্য-পর্য্যায়ে পরিগণিত করিয়া বদ্ধজীব যে কোন প্রকারে তাহার অবৈধ কামনা পূরণ করিবার অধীন যন্ত্রবিশেষ জ্ঞানে স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিবে এবং সেইরূপ পাষণ্ডীর দাস হইয়া শ্রীভগবান তাহার সেবা করিবেন। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, অনাদি বিমুখ অক্ষজ জ্ঞানী জীবের এই আসুরিক প্রবৃত্তি-মূলক জড়কাণ্ড-বশ্যতারূপ নির্ব্বুদ্ধিতার প্রশ্রয় দিবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নাস্তিক জীবকে মোহিত ও বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকেই তাদৃশ জীবের পরিচর্য্যা করিবার ছলনায় নিযুক্ত করিয়াছেন। মায়াবদ্ধজীব ভ্রান্তিবশতঃ নিজের ভোগ্যা মোহিনী ভগবন্মায়াকেই প্রিয়, আত্মীয়, আরাধ্য ও সেব্যবস্তু জ্ঞানে ভ্রমক্রমে ভগবৎস্বরূপ মনে করে। ফলে ভগবৎভজনের পরিবর্ত্তে তাহাদের হৃদয়ে কর্ম্মফল ভোগের স্পৃহা উদিত হয়।

নিত্য সেবা মায়াধীশ অধোক্ষজ ভগবানকে অহৈতুকী, অপ্রতিহতা বা অব্যবহিতা সেবা করিলেই সৌভাগ্যবান জীবের ভগবান ব্যতীত অন্য খণ্ড-জড়বস্তুর সেবায় আর বাঞ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকে না। সেই কালে ঐকান্তিক ভক্তের সেবা গ্রহণ ব্যপদেশে শ্রীভগবানও নিজভক্তের সেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে নিষ্কপট প্রপন্ন ভগবদুপাসক ভক্তগণেরই ভগবদ্ভজনে একমাত্র অধিকার এবং শ্রীভগবানও তাহাদিগকে মুক্তকুলের সুদুর্লভ নিজ প্রেম-ভক্তিযোগ প্রদান করেন। ইহাই তাঁহার ভক্তের সেবা। কিন্তু কপট অভক্ত মুমুক্ষুগণ কখনই শ্রীভগবানের তাদৃশ অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয় না।

যথা শ্রীমদ্ভাগবত (৫।৬।১৮)—

অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো।
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥

শ্রীভগবানের ভক্তের প্রতি ঐ প্রকার অনুগ্রহ দর্শন করিয়া কেহ কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন, তাহা হইলে ত' দেখিতেছি ভগবানেও বৈষম্য রহিয়াছে। কারণ তিনি একমাত্র তাহার শরণাগত জনগণকেই নিজ ভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, অন্য কাহাকেও ত' তাহা প্রদান করেন না। ইহার উত্তরে শ্রীধরস্বামীপাদ বলিয়াছেন যে, সকাম বা নিষ্কাম যে ভাবে যাঁহারা শ্রীভগবানের ভজন করেন, শ্রীভগবান তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ভজনানুরূপ ফলই প্রদান দ্বারা তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সকাম ভাবে ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া ফল-ভোগ কামনা করেন তাঁহারা শ্রীভগবানের নিত্য শান্তিপ্রদ শ্রীপাদপদ্মদায়ক শুদ্ধাভক্তি কি প্রকারে লাভ করিবেন? সুতরাং শ্রীভগবানের কার্য্যে বৈষম্য নাই; বৈষম্য মায়াবদ্ধ জীবগণের দৃষ্টির অন্তরালেই অবস্থিত।

ভগবদ্ভক্তগণ স্ব স্ব অধিকারানুসারে পঞ্চবিধ মুখ্যরসে বাস্তব সত্য বিষয়-জাতীয় অপ্রাকৃত তত্ত্বের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান উক্ত পঞ্চবিধ ভক্তিরসের বিষয়রূপে যে কোন প্রকার সেবা অনুকূল ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন। বৈধ ভক্তগণের নিকট শান্ত, দাস্য ও গৌরবসখ্যের বিষয় শ্রীনারায়ণ-স্বরূপে সেবা গ্রহণ করেন, আবার অনুরাগ পথের ভক্তগণের নিকট উক্ত আড়াই প্রকার রসের উন্নত বিশ্রম্ভ-সখ্য ও মধুর রসের বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণস্বরূপে সেবা গ্রহণ করিয়া অনুরাগপথের সেবককে উক্ত পঞ্চরসের কোনও একটি গ্রহণ করাইয়া স্বীয় ভক্তবাৎসল্য বা ভক্ত-প্রেমাধীনত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন।

মর্য্যাদা পথে যে প্রকার সেবাচিত্র অঙ্কিত আছে, তাহাতে ভজনীয় বিষ্ণুবস্তুর প্রতি মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে ঐশ্বর্য্য অথবা বিশ্রম্ভময় অনুরাগের পরিবর্ত্তে বৈধ সম্ভ্রমময় ঈশ্বর ভাবেই প্রবল। কিন্তু মাধুর্য্যপর কৃষ্ণসেবায় ভগবানের ঐশ্বর্য্যপরতার মধুরিমা আচ্ছন্ন হয় না; সেখানে সেবক-বাৎসল্য অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় বিশ্রম্ভসেবকগণেরই সেবক-সূত্রে মর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে এইরূপ মনে করিতে হইবে না যে, ভগবানের ঐশ্বর্য্যের অণুতাক্রমে মাধুর্য্যের দুর্বলতা বা অনাদ্রিত বশ্যতা অবস্থান করিতেছে। মাধুর্য্যময় শ্রীভগবানে ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ মাত্রায় আছে, কিন্তু মাধুর্য্যের উজ্জ্বল রশ্মির নিকট ঐশ্বর্য্য আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে না।



ব্রাহ্মণ কে ?

ব্রাহ্মণ-শূদ্র নিয়ে ভারতবর্ষে এক ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে। ব্রাহ্মণ-ব্রুব বলেন, আমি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেতরগণ বলেন, তুমি কিসের ব্রাহ্মণ ? যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছে তিনিই ব্রাহ্মণ। তোমার কি দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছে ? এইরূপ মাৎসর্য্যে আবদ্ধ হইয়া উভয় দলই বাকচতুরতার বাহাদুরী প্রকাশ করিতেছে। আমরা বলি যে, ঐরূপ বৃথা মৎসরতা না ক'রে স্থিরচিত্তে শাস্ত্র বচার দ্বারা বিচার করিলেই ত বেশ বুঝা যাইবে 'কে ব্রাহ্মণ'।

মানব জন্মিবামাত্রই শূদ্র। সংস্কার-লাভে দ্বিজ, বেদাধ্যয়নে বিপ্র, বেদাধ্যয়ন ফল—ব্রহ্মজ্ঞানলাভে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মজ্ঞান অর্থে—যে জ্ঞান হইতে আর বৃহৎ জ্ঞান নাই অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয় ও ভগবদ্-কৃপালব্ধ দিব্যজ্ঞান। এই দিব্যজ্ঞান দ্বারাই একমাত্র দিব্য-বস্তুর আধার শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-রস আস্বাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায়; ইহা কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বংশগত জাতির অধিকারভুক্ত নহে। ইহাতে মনুষ্য-মাত্রেরই অধিকার আছে।

ভগবানের সৃষ্ট অনন্ত জীবের মধ্যে মানবই শ্রেষ্ঠ। মানবের মধ্যেও অসংখ্য জাতি। সমস্ত জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি জাতিকেই মুখ্য বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ চারি জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই ব্রাহ্মণ-তনুলাভ সুদুর্লভ। ব্রাহ্মণ-তনু-অভাবে ভগবান ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অধিকার হয় না।

ব্রাহ্মণতা জাগতিক কোন বংশ-পরম্পরাগত শৌক্র-জাতিগত নহে। জাগতিক জ্ঞানরহিত ত্রিগুণাতীত অচিন্ত্য দিব্যজ্ঞানলাভেই ব্রাহ্মণতা। ভোগী, মোহান্ধ, প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ব্রাহ্মণ-ব্রুবগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে নরতনু লাভ করিয়া বেদাধ্যয়ন ও ভগবজ্‌ জ্ঞানশূন্য হ'য়েও ব্রাহ্মণাভি-মানে মত্ত। ইহা কেবল অজ্ঞান-শূদ্রতারই পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এখন কাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় তাহা বিচার করা দরকার। জীব, দেহ, জাতি, জ্ঞান, কর্ম ও ধার্মিক ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ কে ? প্রথমতঃ জীবকে ব্রাহ্মণ বলিলে বিচারে ভুল হয়। কারণ অতীত অনাগত অনেক শরীর-সম্বন্ধে জীবের একরূপত্ব-হেতু, এক রূপেরও কর্ম্মবশে অনেক দেহ সম্ভাবনা এবং সর্বদেহের সম্বন্ধে জীবের একরূপত্ব-নিবন্ধন, জীব ব্রাহ্মণ নহেন।

তাহা হইলে কি দেহ ব্রাহ্মণ ? তাহাও নহে। জড়-পাঞ্চভৌতিক দেহের নিত্যতা নাই। চণ্ডালাদি সমস্ত মানবগণেরই দেহের একরূপত্ব হেতু, জরামরণ ধর্ম্মাধর্ম্মের সমানতা-দর্শন-হেতু, ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ এইরূপ দেহের কোন বর্ণের নিয়ম না থাকায় দেহ ব্রাহ্মণ নহে। যদি দেহ ব্রাহ্মণ হইত তা'হলে মৃত ব্রাহ্মণের শরীর-দাহনে দাহকের ব্রহ্ম-হত্যা পাপ হইত। কিন্তু ইহাতে দাহককে পাপ আশ্রয় করে না; সেজন্য দেহ ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি জাতিই ব্রাহ্মণ, তাহাও নহে। অন্য জাতি প্রাণী মধ্যে অনেক জাত্যুদ্ভুত মহর্ষিগণ উৎপন্ন। যথা মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে জাম্বুকঋষি, বল্মীক হইতে বাল্মীকি, কৈবর্ত্ত কন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ, কলস হইতে অগস্ত্য এবং যবনকুল হৈতে হরিদাস ঠাকুর উদ্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহা সজ্জন ও সর্বশাস্ত্র-সম্মত। এতদ্‌ব্যতীত ভিন্নজাত্যুৎপন্ন লব্ধজ্ঞান বহু ঋষি আছেন ; তজ্জন্য জাতিই ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি জ্ঞানই ব্রাহ্মণ ? তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়াদিও অনেকেই অভিজ্ঞ পরমার্থদর্শী। সেজন্য জ্ঞান ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি কর্ম্মই ব্রাহ্মণ তাহাও নহে।

সকল প্রাণীগণের প্রারব্ধ-সঞ্চিত কর্ম্ম সাধর্ম্ম্য আছে। কর্ম্মাভিপ্রেরিত হইয়া মানবগণ কর্ম্মসমূহ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য কর্ম্মই ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি ধার্ম্মিকই ব্রাহ্মণ ? তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়গণও অনেকে হিরণ্যদাতা

ও অনেক ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেজন্য ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কে? আত্ম অদ্বিতীয়, জাতি-গুণ ক্রিয়াহীন ষড়ূর্মি ষড়্ভাব ইত্যাদি সর্বদোষ-রহিত, সত্য-জ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপ, স্বয়ং নির্ব্বিকল্প, অশেষ কল্পাধার, অশেষ প্রাণী অন্তর্য্যামীরূপে বর্ত্তমান, আকাশের ন্যায় অন্তর্বাহ্য-অনুস্যূত, অখণ্ড-আনন্দ-স্বভাব-সম্পন্ন, অপ্রমেয় অনুভবৈক-বেদ্য এবং অপরোক্ষ-প্রকাশময় জানিয়া করতলস্থিত অমল ফলের ন্যায় সাক্ষাৎ অপরোক্ষী-করণ পূর্বক কৃতার্থ হইয়া কামরাগাদি দোষশূন্য- শমদমাদি-বিশিষ্ট, ভাবমাৎসর্য্য-মোহাদিরহিত এবং দম্ভ অহঙ্কারাদি দ্বারা অসংস্পৃষ্ট-চিত্ত হইয়া বাস করেন। এই প্রকার কথিত লক্ষণ-বিশিষ্ট যিনি তিনিই ব্রাহ্মণ; ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদির অভিপ্রায়। অন্যথা ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না।

ভগবদ্দর্শন

শ্রীভগবান্ আদি-কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই তত্ত্ব চারিটী শ্লোকে সংরক্ষিত; ইহাই চতুঃশ্লোকী ভাগবত। এই আদি শ্লোক চতুষ্টয় হইতেই দ্বাদশ-স্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতের বিস্তৃতি। শ্লোক-চতুষ্টয়ের প্রথমটিতে বিষয়, দ্বিতীয়টিতে আশ্রয়, তৃতীয়টিতে আশ্রয়ের প্রয়োজন এবং চতুর্থটিতে আশ্রয়ের প্রয়োজন-লাভোপায় অভিধেয়-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

বিষয় ও আশ্রয়ের বোধ-রহিত অবস্থায় যে নির্ব্বিশিষ্ট কেবল-জ্ঞান অবস্থিত, তাহা ব্যতিরেক-ভাব নিরসন-কল্পে স্থান-বিশেষে বর্ণনযোগ্য; তাদৃশ বর্ণন পাঠ করিয়া জড়-জগতের বিচিত্রাকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা-রহিত হইয়া বাস্তব-জ্ঞানে বিভাসিত হইলেই চিদানন্দময় সেবকানুভূতিতে জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বাস্থ্য-প্রাপ্তি ঘটে। নশ্বরপ্রতীতি ঈশ্বর-সেবাবিমুখ ভোগরাজ্যে জীবের বদ্ধানু-ভূতিকে অধোগতি লাভ করায়; তাহাকেই তিনি তৎকালে উর্দ্ধগতি বলিয়া বহুমানন করেন। এই কার্য্যটি চিদ্ধর্ম্মের অপব্যবহার বা অচিদ্ধর্ম্মের উদ্দাম নৃত্য।

বিষয়-তত্ত্ব-বিচারে শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় জানিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ—জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র স্বতঃকর্ত্তৃত্বময় 'অহং-তত্ত্ব'। 'ত্বং-তত্ত্ব' ও 'তৎ-তত্ত্ব' সেই 'অহং-তত্ত্বে'র অন্তরালে বিচিত্রতা পোষণ করিতেছে মাত্র। 'ত্বং'-তত্ত্বের অধীন পূর্বপুরুষ ব্রহ্মা শ্রীগুরুদেবস্বত্রে অথর্ব্বা বা শ্রীনারদকে সেই 'ত্বং'-তত্ত্বের স্বরূপ ও 'তৎ'-তত্ত্বের স্বরূপে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচার কৃপাপূর্বক প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীনারদ আবার সেই বিচার শ্রীব্যাসকে, শ্রীব্যাসদেবের মুক্ত বিষ্ণুভক্তাভিমানে বর্ণন করেন। শ্রীব্যাস সংসারার্ণবতরণী শ্রীমধ্ব-মুনির হৃদয়ে 'অহং-তত্ত্ব', 'ত্বং-তত্ত্ব' ও 'তৎ-তত্ত্বে'র নিত্যবৈচিত্র্যভেদ প্রকাশিত করেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব তদীয় আশ্রিত-জনের হৃদয়ে স্বীয় লীলা-বৈচিত্র্যে প্রকটিত করিয়াছেন।

অবিমিশ্র, অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-বৈচিত্র্যে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ-তত্ত্বের নিত্য-চিদানন্দময় সংস্থিতি বর্ত্তমান। এই বিশ্বে নশ্বর-প্রতীতির অভ্যন্তরে বদ্ধজীবের হৃদয়ে ভোগ-বাসনা-দাস্যে সেই তত্ত্বই মলিনভাবে প্রতিফলিত। কিন্তু চিদ্-রাজ্যে ভাবের নিত্যতার পরিদর্শনে ভোগ ও ত্যাগপ্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে সেবোন্মুখতা-রূপ আত্মবৃত্তি অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত। ভগবৎসেবারহিত জীবের অভক্তিবৃত্তিতে দৃষ্ট বিশ্ব সত্য হইলেও নশ্বর-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। নিত্যভূমিকায় চিদ্বৃত্তির অভিব্যক্তিতে হৃষীকেশের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কার্য্যই 'নিত্যভক্তি' বা সুষ্ঠুভাষায় 'প্রেমা'-শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। ভগবদ্দাস্য-বঞ্চিত-বুদ্ধিতে নশ্বর-বিশ্বের অনুশীলনে যে-চেষ্টা, তাহা ফলভোগময় অনাদি-'কর্ম'; ভগবদ্দাস্য স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া হৃষীকেশের সেবার জন্য ঐ চেষ্টা প্রদর্শিত হইলেই তাহা 'ভক্তি'-সংজ্ঞায় অভিহিত হয়।

'অহং-তত্ত্ব' শ্রীভগবৎস্বরূপকে বিশ্বের নশ্বর-সত্তান্তর্গত 'সৎ' বলিয়া ধারণা দ্বারা তাঁহাতে সঙ্কীর্ণতা আরোপ যাহাতে না হইতে পারে তন্নিমিত্ত তাঁহাকে (শ্রীভগবান্‌কে) 'সৎ' ও 'অসৎ' বস্তু হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। অচিৎ-সৎ ও অচিৎ-অসৎবিচার জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তিতে স্থান পাইতে পারে না; অভক্তিতেই তাহার বহুমানন। ভজনীয় বস্তু হৃষীকেশ অণুচিতের অভিধেয়-ভক্তিদ্বারাই অনুকূল-ভাবে অনুশীলিত হন, কর্ম্ম বা জ্ঞান তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে না। ভগবদ্দর্শন-ব্যতীত যাহা কিছু অন্য পরিদৃশ্যমান অনীশ্বর-প্রতীতি, তাহাও ভগবদ্ব্যতিরিক্ত ভাব-বিশেষ নহে; আবার উহা ভগবদ্ভাবমাত্রও নহে। উহা ভগবদ্ভাবান্তর্গত হইয়া অবৈধভাবে নশ্বর-বিশ্বে প্রতিভাত, তজ্জন্য তাদৃশ নশ্বর-দর্শন ভগবদ্দর্শন নহে। শ্রীভগবান্ চিদ্রাজ্যে অবস্থিত; সুতরাং চিদ্ধর্ম্ম শুদ্ধভক্তিতে অবস্থিত হইতে পারিলে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন-দ্বারা তাঁহার চিদ্বিগ্রহ-দর্শনের ও সেবার যোগ্যতা হয়।

'নাস্তিকতার' জীবনী

আস্তিকতার সহিত নাস্তিকতা পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন। নাস্তিকতা এই জগতের বস্তু, জগতে ইহা ছিল এবং কখন কখন ইহা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই জগতে মানুষকে দুই প্রকার চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট দেখা যায়—(১) শ্রেয়ঃপন্থী—যাঁ'রা নিজেদের নিত্য-মঙ্গল অনুসন্ধান ক'রে থাকেন, আর (২) প্রেয়ঃপন্থী, যাঁ'রা কেবল তাঁ'দের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিজনক বিষয়ের অনুসন্ধান করেন, তা'তে তাঁ'দের মঙ্গল হউক, চাই নাই হউক। ইহ জগতে প্রথম শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অতি অল্প। এই জগৎটি আবার কি রকম? না, যে-সকল ব্যক্তি তা'দের ভোগলালসার বশবর্ত্তী হ'য়ে প্রেয়ঃপন্থী হ'য়েছিল, তা'দের সংস্কার করবার জন্যে এটা একটা কারাগার-স্বরূপ।

মোটের উপর নাস্তিকতা এই জগতের চল্‌তি-ধর্ম্ম। ইহাকেই জোর পূর্ব্বক ধর্মের মুখোস পরাইয়া ধর্মের সজ্জায় চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, যখনই বড় বড় চিন্তাশীল নেতা নাস্তিকতার জয়ঢাক বাজাইয়া তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আস্তিকতাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই ভীষণ-বেগে বাধাপ্রাপ্ত আস্তিকতার স্রোত অতি মাত্রায় উদ্বেলিত হইয়া নাস্তিকতার বর্ত্তমান ও ভাবি-কালের যুক্তিসৌধকে বিধ্বস্ত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া স্বীয় গৌরব-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে এইরূপ ঘটনা অজ্ঞাত নহে। এইরূপ নাস্তিকতার বিরোধের ফলে আস্তিকতার ক্রম-ব্যাখ্যানটা দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

নাস্তিকতার পক্ষপাতী জনগণ আস্তিকতার দ্বারা যদিও পরাভূত হয়ে থাকেন, তা' হ'লেও তাঁ'রা যে সকল-ক্ষেত্রেই আস্তিকতা গ্রহণ করেন, এটা ঠিক নয়; কেউ কেউ গ্রহণ করতেও পারেন। তাঁ'দের মধ্যে কেহ কেহ জাগতিক-বিচারে বাস্তব সত্যের প্রতি ক্ষণিক, কাপট্যপূর্ণ বশ্যতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু একবারে আস্তিক হ'য়ে যান না। এই সকল কপট ব্যক্তিগণ পরিশেষে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের শত্রু-রূপে পরিগণিত হ'য়ে থাকেন এবং কপটতার ফলস্বরূপে এরূপ জগজ্জঞ্জাল আনয়ন ক'রে থাকেন যে, ভাবিকালে অল্পসংখ্যক ভগবদ্-বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য ও প্রকৃত আস্তিকতা স্থাপনের জন্য প্রবল উদ্যোগ ও চেষ্টার আবশ্যক হইয়া পড়ে।

জন্মের পর জড়জগতের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিতে মানুষের কিছু সময় লাগে। যে-সকল বস্তু আমাদের জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাকেই জড়বস্তু (matter) বলা হয়। বালক ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জড়বস্তু সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিতে থাকে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা সেই সকল বস্তু ভোগ করিবারও সুযোগ প্রাপ্ত হইতে

থাকে। সে ঐ সমস্ত জড়বস্তুর গুণ যতই ভোগ করিতে থাকে, ততই তাহার ভোগ-পিপাসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে; অবশেষে এইরূপে মানুষের এমন অবস্থা হয় অর্থাৎ জড়-ভোগে এতই আসক্ত হইয়া পড়ে যে, ঐপ্রকার জড়েন্দ্রিয়-চরিতার্থ করা ব্যতীত তা'দের আর অন্য রুচি থাকে না। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি বিষয়সুখ তা'দের মনের উপর ক্রিয়া করিয়া এমন অভিভূত করে যে, ঐ অবস্থাটাই বদ্ধজীবের স্বভাব বলিয়া মনে হয়।

জীব একবার মনোধর্মের আবরণে আবদ্ধ হইলে, এই জড়জগতের হেয়তা বা অনিত্যতার ভাব উপলব্ধি করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠে। অনিত্য জড়জগতের সহিত তাহার ক্ষণিকের জন্য সম্বন্ধের বিষয়, জন্ম-মৃত্যু দ্বারা এই জগতের সহিত সম্বন্ধের বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয় তাহাকে বুঝাইয়া দিলেও সে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না এবং ক্রমাগত তাহা ভুলিয়া যায়। যদি কোন সৌভাগ্যবশে এই জগতের অনিত্যত্ব-সম্বন্ধে কোন দিন তাহার চৈতন্য উদয় হয়, তাহা হইলে সে জড়ভোগ হইতে বিরত হইয়া তাহার নিজ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য চিন্তাশীল হয়। সংসারে ভোগ করিতে করিতে যাহার ঐ রকমের সৌভাগ্য কোনদিন উদিত হইয়া তাহাকে এই জীবনের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করাইয়া দেয়, সেই ব্যক্তির অন্তঃকরণে তখন নিম্নলিখিত তিন প্রকার প্রশ্ন উদিত হয় যথা—(১) এই যে আমি জগৎ-ভোগ করছি, সেই 'আমি' কে? (২) এই প্রকাণ্ড জড়জগৎই বা কি? (৩) এই জগতের সঙ্গে আমার প্রকৃত সম্বন্ধটাই বা কি?

জীব যখন এই জগতের চিন্তার দিকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া উপরিউক্ত প্রশ্ন-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, তখন তাহার উদিত চৈতন্যে সে ঐসকল প্রশ্নের সমাধান দেখিতে পায়। এইরূপভাবে অনুসন্ধিৎসু জীব প্রশ্ন-সকলের যে মীমাংসা লাভ করে, তাহা যখন নিয়মিতভাবে সংগৃহীত করা যায়, তখন উহা 'দর্শন' ও 'বিজ্ঞান' নামে অভিহিত হয়। জীব যে উত্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা বিধিবদ্ধ হ'তে পারে কিম্বা এলোথেলোও হ'তে পারে। কিন্তু একটা প্রশ্ন হ'তে পারে যে, জীবকুল যখন সকলে স্বরূপে এক, তখন সকলেই একই প্রকারের উত্তর পায় না কেন?

জীব স্বরূপে চেতন; অতএব জীব স্বরূপে অবস্থানকালে যে উত্তর পাইয়া থাকে তাহা সকলের পক্ষেই সমান। এই জড়জগৎ তাহার প্রকৃত অবস্থান নহে। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা জড় উপাদানে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; ইহা চেতন জগতের মত দেখাইলেও স্বরূপে ইহা জড়মাত্র। ঐ বহিরঙ্গা শক্তি ভগবানের ছায়াশক্তি মাত্র। জীব শ্রীভগবানের অণুচিৎ অংশ বলিয়া বিভুচিতের স্বভাব তাহাতে কিছু বর্ত্তমান আছে। এই জগতে অবস্থানকালে জীব নিজেকে জড়-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত বলিয়া এবং মায়ার সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করে, যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে সেরূপ কোন কিছু নাই। ইহা অস্বাভাবিক সংযোগ মাত্র। মায়াবদ্ধ জীবের প্রকৃত স্বভাব মায়ার দ্বারা আবরিত হওয়ায়, প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ঐ জীব নিজেকে এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়া-কলাপের সহিত একতত্ত্ব বলিয়া মনে করে।

প্রত্যেক জীব স্বরূপে চেতনময় হইলেও মায়িক শক্তির সংযোগে জড়মনের দ্বারা চালিত হইয়া আকস্মিক অস্বাভাবিক একটি দ্বিতীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে থাকে। স্বতঃপ্রকাশ জীবচৈতন্য এইরূপভাবে বদ্ধজীবের মনরূপে পরিণত হইয়া সীমাবিশিষ্ট জড়ে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। মায়ার আশ্রয়ে ঐরূপ জড়বদ্ধাবস্থায় জীব প্রাগুক্ত প্রশ্নের যে-সকল উত্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা বিভিন্ন-জাতীয় এবং বিরুদ্ধধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই রকম উত্তরের মধ্যে বদ্ধজীবের অবস্থান-ভেদে আচার, পোষাক, পরিচ্ছদ, আহার, ভাষা, দেশের চিন্তাস্রোত প্রভৃতির বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে উত্তর-সমূহ প্রত্যেকের সম্বন্ধে বিভিন্ন হইবেই হইবে। বদ্ধজীব স্থূল ও সূক্ষ্ম-রূপ দুই প্রকারের উপাধিমণ্ডিত হওয়ায় দেশ, জাতি, ভাষা প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে বিভিন্ন-জাতীয় উত্তর পাওয়া যায়।

সম্যগ্‌প্রকারে এই সকল বিভিন্ন জাতীয় উত্তর আলোচনা করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইয়া তৎ-তৎ

দেশের ভাষা ও তাহাদের সঙ্গে আলাপাদি করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু সে-সমস্ত বিচার বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য না হইলেও সংক্ষেপে তাহাদের সম্বন্ধে একটা সাধারণ বিচার দেখাইলেই এই প্রসঙ্গে যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়।

উপরে যে দুই প্রকারের উত্তরের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যেটি সত্য; সেইটিই সমীচীন। আর বিভিন্ন জাতীয় উত্তর সকলের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য থাকিলেও মোটামুটি তাহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—(১) জ্ঞান ও (২) কর্ম্ম।

———

রাস-যাত্রা

আজ রাস-পূর্ণিমা। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানসমূহ লোকে লোকারণ্য। যাত্রিগণের উদ্দেশ্য—শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা-দর্শন। স্বরূপ-উদ্বুদ্ধ জনগণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবা আর নাই এবং এই সেবায় অধিকার-লাভে যত্নপর হওয়া প্রত্যেকের কর্ত্তব্য তদ্বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তবে "গাছে না উঠিতেই এক কান্দি" চেষ্টায় যত গোলযোগ। শ্রীকৃষ্ণ কি তত্ত্ব, আমাদের স্বরূপের পরিচয় কি, শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণ কি তত্ত্ব, তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি এবং রাসলীলা ব্যাপারটা কি না জানিয়া যদি আমরা রাস-দর্শনের জন্য প্রধাবিত হই তাহা হইলে আমাদের দর্শনে জড়ভোগের তৃপ্তিসাধন হয় মাত্র, প্রকৃত বস্তুর সন্ধান কিছুই হয় না। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত বস্তু; প্রাকৃতজ্ঞানে তাঁহার ধারণা করা কখনও সম্ভবপর নহে। কর্মেন্দ্রিয়ই বলুন, আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ই বলুন, কেহই স্ব-স্ব চেষ্টায় কৃষ্ণজ্ঞান-লাভে সমর্থ নহেন। যাঁহাদের সহিত তাঁহার রাসলীলা হইয়াছে সেই ব্রজবালাগণও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় প্রাকৃত-বুদ্ধির অগম্য; যে-পর্য্যন্ত চিত্তে কামের লেশমাত্র থাকে সে-পর্য্যন্ত রাস দর্শনের অধিকার কাহারও নাই। একনিষ্ঠ কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে কাম কখনও স্থান লাভ করিতে পারে না। যদি কোন সময় কাম স্মরণের গবাক্ষ দিয়া উঁকি মারে তাহা হইলেও কৃষ্ণভক্তের নিষ্ঠীবন-লাভই তাহার ভাগ্যে ঘটে; তাই কোন মহাজন গাহিয়াছেন—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে
নব-নব-রসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি রত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমানে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠুনিষ্ঠীবনঞ্চ॥

বদ্ধজীব-মাত্রেরই ভোগপর অনুসরণ-প্রিয়তা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন,—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

—ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ (রাসলীলাদি) আচরণ কেহ মনের দ্বারাও কখনও করিবে না। রুদ্র ভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ বিষ পান করিলে যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হয়, মূঢ়তা-প্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বর-লীলার অনুসরণ করে তাহা হইলে সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলায়ও দেখিতে পাই—তিনি বহিরঙ্গ-সঙ্গে নামসঙ্কীর্ত্তন এবং অন্তরঙ্গ-সঙ্গে রস আস্বাদন করিতেন। উক্ত অপ্রাকৃত রস রাসেই সম্যক্ প্রস্ফুটিত এবং অন্তরঙ্গ অর্থাৎ মুক্তকুল-শিরোমণি-গণেরই তাহা আস্বাদ্য। এখন আমার ন্যায় বদ্ধভূমিকায় আবদ্ধ জনগণ রাস-দর্শনের জন্য প্রধাবিত হইয়া স্ব-স্ব হিত কি অহিত সাধন করিতেছেন তাহা সুধীগণেরই বিবেচ্য।

বদ্ধভূমিকায় যে সকল ব্যক্তি রাস-দর্শনে প্রধাবিত হয় তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, একশ্রেণী নিরীশ্বর-নৈতিক, অপর শ্রেণী নীতিহীন-কামুক। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণী শ্রীকৃষ্ণের রাস-দর্শন করিয়া যে-প্রকারে বিপদগ্রস্ত হ'ন তৎপ্রদর্শন-কল্পে মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখে রাসলীলা-শ্রবণান্তর নিজকে ঐ শ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়া

অভিনয় করিয়া একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। প্রশ্নটি এই,—

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥
স কথং ধর্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্॥

হে ব্রাহ্মণ, জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম-সংস্থাপন ও অধর্মবিনাশ-কল্পে স্বীয় অংশ সহ অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে ব্রাহ্মণ, ধর্মমর্য্যাদা-সংরক্ষক স্বয়ং অনুষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে পরদারাদি-আলিঙ্গন প্রভৃতি প্রতিকূল আচরণ করিলেন ?

যে-পর্য্যন্ত আমাদের হৃদয়ে কাম-বাসনা বিদ্যমানা, সে-পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণই যে সর্বভোক্তা, তাঁহার নিত্যা সেবিকা গোপীগণ যে অপর কাহারো ভোগ্যা হইতে পারেন না কেবল রসপুষ্টির নিমিত্তই যে পারকীয়-ভাবের সৃষ্টি, কৃষ্ণ-ভজনে প্রতিকূলাচরণকারী পতি-পুত্রাদির সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া বা তাহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া যে-কোন প্রকারেই হউক কৃষ্ণভজনই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কৃত্য প্রভৃতি শিক্ষা যে গোপীগণের প্রকট-লীলায় রহিয়াছে তাহা নিরীশ্বর-নৈতিকগণের মস্তিষ্কে কিছুতেই প্রবেশ করে না, কারণ নিরীশ্বর-নৈতিকতাও জড়ভোগাগারের একটি রসায়ন-বিদ্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীকৃষ্ণকে লাম্পট্যের আসামী করিবার দুষ্প্রবৃত্তি-মূলে নিরীশ্বর-নৈতিকগণের যে-প্রশ্ন উদিত হইতে পারে মহারাজ পরীক্ষিৎ ভাগবত হইয়াও পূর্বোক্ত প্রশ্নটি করিয়া তাহার সমাধান মহাভাগবত নিত্যমুক্তকুলশিরোমণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী দ্বারা করাইয়াছেন। শুকদেবের উত্তরটি আমরা পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি।

নীতিহীন কামুকগণ রাস-লীলা শ্রবণ করিতে যায় স্ব-স্ব-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য। আর কলির চেলাগণ দু'পয়সা রোজগারের নিমিত্ত কিছু জড়-পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া—কিছু অনুঃস্বার-বিসর্গের জ্ঞান লাভ করিয়া কাম-কলুষ-চিত্তে রাসলীলার পাঠক সাজেন। ভাবের আবেগে অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিয়া যায়। আবার সঙ্গে সঙ্গে "কা'ল কিন্তু পাঠ সমাপ্ত, সুতরাং টাকা বস্ত্রাদি যেন সময় মত পাই" প্রভৃতি উক্তি! ধন্য কলি তেরি তামাসা!

নীলাচলে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে অবস্থানকালে দিনাজপুরের স্বনামধন্য জমিদার কায়স্থ-কুলতিলক রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় (এম, এ) প্রাজ্ঞ বেদান্তভূষণ মহাশয় এক সময় আমার নিকট উক্ত শ্রেণীর জনৈক পাঠকের সুললিত-স্বরে রাস-পঞ্চাধ্যায়-পাঠের কথা জ্ঞাপন করিলে আমি তাঁহার নিকট "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু" শ্লোকটির মর্মার্থ প্রকাশ করিয়া মাদৃশ বদ্ধজীবের রাস-লীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধিকার নাই এই কথাটি নিবেদন করি। তিনি আমার কথা পাঠক-পুঙ্গবকে জানাইলে, তাঁহার রাসলীলা-পাঠের আর তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর তাহা শ্রবণের অধিকার আছে, এইটি প্রতিপাদন-কল্পে একটি শ্লোক বলিলেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

—ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাস-ক্রীড়া যে ধীরব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গুরুমুখে শ্রবণ-পূর্বক অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন, তিনি ভগবানে অচিরে পরা ভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগ-কাম অনতিবিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হন।

শ্লোকটি বিচার না করিয়া যদি শ্রবণমাত্রই আমরা মনে করি, তাহা হইলে ত' কাম-কলুষ-চিত্তগণেরও রাসলীলাই আস্বাদ্য, তাহা হইলে আমরা বিষম ভ্রমে পতিত হইব। দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্বোক্ত পাঠক মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার বাবাজীর বেষ। একদিন পুরী ষ্টেশনে দেখিতে পাইলাম, তাঁহার পদদেশে বেশ এক জোড়া 'পামসু' শোভা পাইতেছে। তখন আমি একটু বিশেষ সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, তাঁহার দুই তিনটি মাতাজীও আছেন। অবশ্য শিষ্যবাড়ী যাইবার সময় মাতাজীগণ বাবাজী মহারাজের সঙ্গের সারথী হন না, আখড়ার নিকটেই থাকেন। বাবাজী প্রায় বৃদ্ধ; অনেক

দিন যাবত ভাগবত-পাঠ করিতেছেন, অথচ তাঁহার হৃদ্‌রোগ-কাম বিনষ্ট না হইয়া ক্রমশঃ যযাতির দশা হইতেছে কেন ?

পাঠকগণ পূর্বোক্ত শ্লোকে **'ধীর'** শব্দটি লক্ষ্য করিবেন। রাসলীলা ধীরব্যক্তিই শ্রবণ ও নিরন্তর পাঠ করিবেন। কাম-কলুষ-ব্যক্তির তাহা আলোচ্য নহে। শুদ্ধবৈষ্ণব ব্যতীত অপরে 'ধীর' হইতে পারে না। কারণ তাহাদের চিত্ত জড়-বিষয়াদির জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হওয়ায় তাহারা অধীর। সুতরাং তাহাদের রাসলীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধিকার নাই। 'ধীর' ব্যক্তি কাহার নিকট রাসলীলা শ্রবণ করেন ?—কাম-কলুষ ব্যক্তির নিকট নহে, নিষ্কাম শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিকট। কাহার নিকট কীর্ত্তন করেন ?—অনধিকারী ব্যক্তির নিকট নহে, অধিকারী ব্যক্তির নিকট, তদভাবে নিজে নিজে। কিসের জন্য নিরন্তর কীর্ত্তন করেন ?—টাকা-পয়সা উপার্জ্জনের জন্য নহে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত। ফল কি হয় ?—ফল, ধীর ব্যক্তি কৃষ্ণ-সুখ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রার্থী না হইলেও তাঁহার হৃদয়ের কোথাও যদি কামের লেশমাত্রও লুক্কায়িত থাকে তাহা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় অপসারিত হইয়া যায় আর ধীর ভক্তপ্রবর সেবানন্দে নিমগ্ন থাকেন। সুতরাং রাসলীলা-দর্শন বা শ্রবণের অধিকার লাভ করিতে হইলেও ধীর হইতে হইবে। ধীর হইয়া সদ্‌গুরুর-পাদপদ্ম-সেবা এবং অধিকার-লাভের জন্য ধৈর্য্যধারণ করিতে হইবে। 'গাছে না উঠিতেই এক কান্দি'র চেষ্টা নিষ্ফল।

আমি কি কালিয় হইতে শ্রেষ্ঠ ?

গতকল্য আমরা কালিয়নাগের স্তব প্রকাশ করিয়াছি। তাহার প্রার্থনায় করুণাময়ের হৃদয়-গগনে সংরক্ষিত কারুণ্য-ঘন আশীর্বাদ বারিরূপে বর্ষিত হইতে লাগিল। তিনি কালিয়নাগকে সজাতি, পুত্র ও স্ত্রীগণের সহিত সমুদ্র-পথে তাঁহার পূর্বনিবাস 'রমণক'-দ্বীপে গমন করিতে আদেশ করিলেন এবং অভয় দিয়া বলিলেন, শ্রীভগবানের চরণ-চিহ্ন কালিয়ের মস্তকে দর্শন করিয়া গরুড় আর তাহাকে ভক্ষণ করিবে না। শ্রীভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কালিয় দিব্যবস্ত্র, মাল্য, রত্ন, উত্তমভূষণ, দিব্যগন্ধ ও উৎপল মাল্য দ্বারা গরুড়ধ্বজ শ্রীভগবানের পূজা করিল এবং পূজা দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা উৎপাদন পূর্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া স্বজনগণ-সহ 'রমণক' দ্বীপে গমন করিল। সেই মুহূর্ত্তেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে সেই যমুনার জল বিষহীন হইয়া অমৃত-তুল্য হইল এবং ব্রজবাসিগণের সুপেয়রূপে ব্যবহৃত হইতে থাকিল।

এখন আমরা একবার যমুনা-তীরবর্ত্তী বিরহ ব্যথা-জর্জ্জরিত নন্দাদি গোপবৃন্দের শ্রীচরণ অনুসরণ করিব। আমরা দেখিয়াছি তাঁহারা কালিয়-হ্রদকূলে কৃষ্ণবিরহে মূর্চ্ছিত অবস্থায় আছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন কালিয়-নিবেদিত দিব্যমাল্য, গন্ধবস্ত্র ও সুবর্ণে বিভূষিত হইয়া হ্রদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন তখন গোপগণের কি-প্রকার আনন্দ হইল, তাহা মুক্ত-কুলেরই সম্যক্ বোধগম্য। শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা লব্ধপ্রাণ ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় উত্থিত হইয়া আনন্দপূর্ণ চিত্তে প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। যশোদা, রোহিণী, নন্দ ও অপরাপর গোপ-গোপীগণ, এমন কি শুষ্ক বৃক্ষগণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া পুনর্জীবন লাভ করিলেন। কৃষ্ণপ্রভাববিৎ শ্রীবলদেবও শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্বক হাস্য করিতে লাগিলেন এবং অনুরাগ-বশতঃ তাঁহাকে নিজক্রোড়-দেশে গ্রহণ করিয়া বারম্বার তাঁহার মুখমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিলেন। ধেনু, বৃষ ও বৎসগণ তখন পরমানন্দে নিমগ্ন হইল। গুরু-বিপ্রগণ সপত্নীক সমাগত হইয়া আনন্দভরে নন্দ মহারাজকে বলিতে লাগিলেন—"হে নন্দ মহারাজ, তোমার পুত্র কালিয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও কেবলমাত্র ভাগ্যবলেই

নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে, অতএব তাঁহার মুক্তির জন্য ব্রাহ্মণগণকে ধনাদি প্রদান কর। মুক্তি যাঁর সেবকগণের সেবা করিবার জন্য স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া সময় প্রতীক্ষা করে আজ সেই নিত্যমুক্ত ভূমিকার একচ্ছত্র অধিপতির মুক্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ, ইহা মাধুর্য্যময়-বিগ্রহের এক অচিন্ত্যলীলা—তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছায়ই তদীয় মাধুর্য্যপর ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল। শ্রীনন্দ মহারাজ সেই হিল্লোলে ভাসিয়া হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, ধেনু ও ভূমি দান করিলেন। মা যশোমতী নষ্ট সন্তানকে (!) পুনরায় লাভ করিয়া আলিঙ্গন এবং ক্রোড়দেশে গ্রহণ পূর্ব্বক বারম্বার আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাতরপরিশ্রান্ত ব্রজবাসিগণ ধেনুগণসহ সেই রাত্রি কালিয়তীরেই অতিবাহিত করিলেন।

আবার হর্ষে বিষাদ! মধ্যরাত্রে গ্রীষ্মকালীন শুষ্কবন সম্ভূত দাবানল ব্রজজনগণকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল তখন তাহারা সন্ত্রস্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"হে মহাভাগ কৃষ্ণ, হে অমিত-বিক্রম বলরাম, এই ঘোরতর দাবানল আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে। হে প্রভো! এই দুস্তর কালাগ্নি হইতে সুহৃদ্‌গণকে রক্ষা কর। আমরা তোমার অভয় চরণ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইব না।" নিজজনগণের এই প্রকার করুণ-প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া করুণাময় এক নিমেষে তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। ব্রজবাসিগণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন —আর কোথাও অগ্নির লেশ মাত্র নাই। ঐশ্বর্য্য দর্শন দিয়াও মাধুর্য্যপর ব্রজবাসিগণের হৃদয়ে স্বীয় আসন রক্ষা করিতে পারেন না ইহা লীলাময়ের এক চমৎকারিণী লীলা।

কালিয়নাগের চরিত্র আলোচনা করিলাম; তাহার নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। তাহার ভগবদ্বিদ্বেষ ভাব দেখিয়া অবাক্ হইলাম! কিন্তু একবার আমার নিজের কথা চিন্তা করিলাম কি? একবার নিজের অন্তঃকরণকে কালিয়ের পাশে রাখিয়া মিলাইয়া দেখিলাম কি, আমি কালিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার সমজাতীয় বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট? যদি নিরপেক্ষভাবে আমার চরিত্র অঙ্কন করিতে যাই, তাহা হইলে দেখিতে পাই, ইহা কালিয়ের চরিত্র অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। কালিয়ের কালকূটে আমার অন্তর-প্রদেশ আচ্ছাদিত। অভিমান, খলতা, পরোপকারিতা, ক্রূরতা, দয়া-শূন্যতা প্রভৃতি পাদপবৃন্দ ঐ কূটে বদ্ধমূল হইয়া বিরাজিত। কালিয় ভগবদ্ভক্ত গরুড় ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা না জানিয়া তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু আমার পাষণ্ড মন জানিয়া শুনিয়াও সর্ব্বদাই ভগবদ্-ভক্ত ও শ্রীভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ অহৈতুক-দয়া-প্রকাশে কত প্রকারে আমার মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীভগবান্ আমার চিত্ত-শোধনের জন্য কত প্রকার সুযোগ প্রদান করিতেছেন, কিন্তু আমার দুষ্ট মন তৎপ্রতি উদাসীন থাকিবে, জাগিয়াও ঘুমাইবে। সুতরাং নিরপেক্ষ বিচারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে—আমি কালিয় অপেক্ষা অনন্তগুণে নিকৃষ্ট। মন আমার জড়-রমণদ্বীপের অধিবাসী। সুতরাং অপ্রাকৃত কামদেবের সেবা-রাজ্যে প্রবেশে অধিকার আমার কোথায়? কালিয় ভাগ্যবশতঃ যে-প্রকারেই হউক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম শিরে ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমার মন জড়কামের চরণকে শিরে ধারণ করিয়া আছে। এইখানেই কালিয়ের সহিত আমার মূল পার্থক্য। কালিয় শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিয়াছে, ব্রজবাসিগণের দ্রোহ হইতে বিরত হইয়াছে, তাঁহাদের পানীয়ের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় তন্নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের আদেশ শিরে ধারণ করিয়া যমুনা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি শ্রীকৃষ্ণের আদেশ, সাধুশাস্ত্র ও গুরুবাক্য নিয়ত প্রাপ্ত হইয়াও তৎপ্রতি কর্ণপাত করিতেছি না। পক্ষান্তরে নিজের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য বৈষ্ণবগণকে নানাপ্রকার উদ্বেগ দিয়া সজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি। আমার গতি কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে বলিয়াছেন—

য এতৎ সংস্মরেন্মর্ত্ত্যস্তুভ্যং মদনুশাসনম্।
কীর্ত্তয়নুভয়োঃ সন্ধ্যোর্ন যুষ্মদ্ভয়মাপ্নুয়াৎ॥

যোঽস্মিন্ স্নাত্বা মদাক্রীড়ে দেবাদীংস্তর্পয়েজ্জলৈঃ।
উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চ্চেৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

—যে ব্যক্তি প্রাতঃ ও সায়ংকালে তোমার (কালিয়-নাগের) প্রতি আমার (শ্রীকৃষ্ণের) এই আদেশ-বাক্য স্মরণ ও কীর্ত্তন করিবেন তিনি তোমা হইতে ভয়প্রাপ্ত হইবেন না। যিনি আমার (শ্রীকৃষ্ণের) বিহার-স্থান এই হ্রদে স্নান করিয়া জল দ্বারা দেবতা প্রভৃতির তর্পণ এবং উপবাস পূর্বক আমার (শ্রীকৃষ্ণের) স্মরণ ও পূজা করিবেন তিনি সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণের কালিয়-দমন ও কালিয়ের প্রতি অনুগ্রহ সর্বদা আমার স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিয়া আমাকে গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় প্রণোদিত করুক্। তাহা হইলে আমার খলতা বিদূরিত হইবে এবং আমি ভক্তিরসে আর্দ্র হইতে পারিব। গুরুবৈষ্ণবগণ আশীর্বাদ করুন।

সুদর্শন

জগতে আমরা বহু প্রকার অস্ত্রের নাম ও প্রয়োগ দেখিতে পাই, উক্ত অস্ত্রসমূহ আত্মরক্ষা-ভনিতায় পরহিংসা পরপীড়ন উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মরক্ষার নিমিত্ত কয়জন যত্নপর?

শাস্ত্রে আমরা বরুণ, বজ্র, পাশুপত, ব্রহ্ম ও সুদর্শন প্রভৃতিকে অস্ত্র-আখ্যায় দেখিতে পাই। যদি ঐগুলি অস্ত্রই হয় তাহা হইলে তাহাদিগের ব্যবহারের যোগ্যতা বিচারে কে কোন্ প্রকার অস্ত্র গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে আত্মরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেকের আলোচ্য বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমরা এস্থলে সুদর্শনের বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তনে জাগতিক-জনের ও দেবতাগণের, এমন কি পাশুপত ও ব্রহ্মাস্ত্রের হেয়ত্ব উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইব। যাহারা জাগতিক অস্ত্র-বলে বলীয়ান্ হইয়া নিজ নিজ স্বার্থ-সাধনে বাধা-প্রদানকারী-পরিকল্পনায় বৈরবোধে তন্নির্য্যাতনে লম্ফ-ঝম্প প্রদান করেন এবং শত্রুদমনে নিযুক্ত হন, তাহারা একটু নিরপেক্ষ দর্শনে সুক্ষ্ম-দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিতে পারিলে বুঝিবেন, দৈবাস্ত্রে ত্রিতাপের তাপ, এমন কি স্বীয় দেহাভ্যন্তরস্থ কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যাদি রিপুষট্‌ককে পর্য্যন্ত দমন করা যায় না। যতই কেন বীরদর্পে বাক্-বৈখরীতে আকাশ-পাতাল প্রকম্পিত করি না, আমাদের কোন অস্ত্রই অন্তঃশত্রু-দলনে যোগ্য নহে। দৈবী-মায়ার প্রেরিত ছায়ার একটিমাত্র কটাক্ষ-পাতে আমাদের যাবতীয় বল-বিক্রম লুপ্ত হইয়া অস্ত্রধারণ-শক্তি শ্লথ হয় ও ঐ কটাক্ষরূপ উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া নিজস্ব ভুলিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া দেই। আমাদের অন্তঃ ও বহিঃশত্রু-বিজয়াশার ঐখানেই যবনিকা-পাত। বিশ্ব-বিজয়কামী নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তাহার জলন্ত উদাহরণ; ইতিহাস বর্ণে বর্ণে তার সাক্ষী দিতেছে।

জগদ্দর্শী কুদার্শনিকের শিরচ্ছেদন করাই সুদর্শনের কার্য্য। পাশুপত ও ব্রহ্মাস্ত্র পর্য্যন্ত তদাশ্রিত জনের রক্ষায় সমর্থ নহেন; এক সুদর্শনের কৃপায় তাহা সম্ভব হয়। এ সম্বন্ধে দুইটী পৌরাণিক আখ্যান উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। ইহাতে আমরা সুদর্শনাশ্রিত বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবাস্ত্রের মহিমা অবগত হইতে পারিব।

প্রাচীনকালে দুর্ব্বাসা নামে এক ঋষি ছিলেন, তিনি উগ্রতপা ঋষি। 'দুর্ব্বাসা'-শব্দের অর্থ—দুঃ অর্থাৎ মন্দ বাসনা দ্বারা দৃপ্ত যিনি। এবম্বিধ ঋষি দুর্বাসা জ্ঞানী-জীবন্মুক্তাভিমানী ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধাভিমানী হইয়া যোগবলে ব্রহ্মাস্ত্রের কৃপালাভে বলীয়ান্ ছিলেন। তাই তিনি সিদ্ধাভিমানে ত্রিভুবন-বিজয়-দর্পে আত্মম্ভরিতা-প্রকাশের জন্য সর্বত্র স্বেচ্ছাপূর্বক বিচরণ করিতেন। স্বীয় বিজয়-পতাকা উড্ডীন-মানসে যেথানে সেথানে অপরকে নানা-প্রকারে পীড়ন করিয়া নির্য্যাতন করিতেন। এই প্রকারে

যখন সাহস বাড়িয়া উঠিল, তখন একদিন, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কুরুগণের পক্ষ হইয়া একনিষ্ঠ-বৈষ্ণব পাণ্ডবদিগকে নির্য্যাতন-মানসে বহু মুনি-ঋষি লইয়া দরিদ্র-বেশধারী পাণ্ডবগণের আশ্রমে ভোজনপ্রার্থী ক্ষুধার্ত্ত অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর বিপদ্‌তারণ ভক্তৈকরক্ষক কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের কাতর-আহ্বানে কৃপা-পূর্ব্বক সেই আশ্রমে আসিয়া রন্ধনপাত্রে অবশিষ্ট এক কণা শাক সেবন করিবা-মাত্রই দুর্বাসাদির উদর পরিপূর্ণ হওয়ায় তিনি নিজের ওজন বুঝিলেন। আর একবার বিষ্ণুভক্ত মহারাজ অম্বরীষের প্রতি ব্রহ্মশাপ প্রয়োগ করিয়া বৈষ্ণব-রক্ষক ও বৈষ্ণব-পালনকারী বৈষ্ণবাস্ত্র সুদর্শনের অমিত তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সন্ত্রস্ত অবস্থায় ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর নিকট স্থান না পাইয়া অবশেষে দুর্বাসা বিষ্ণুর আদেশে বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষেরই শরণাগতি লাভ পূর্ব্বক রক্ষা পান।

কোন সময় বিষয়-ভোগের একচ্ছত্রাধিপত্য-লাভপ্রয়াসী কাশীধামের কাশীরাজ সর্ব্ববিষয়ের একমাত্র ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের নিধন-মানসে কঠোর তপস্যায় শিবের আরাধনা করেন। আশুতোষ শিব সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিলেন। 'আমি যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি' কাশীরাজ এই বরটি শিবের কাছে প্রার্থনা করিলেন। শিব "তথাস্তু" বলিয়া প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। কাশীরাজ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, শিব তাহার সহগামী ও সহায়। প্রথমেই সুদর্শন, কাশীরাজের জগদ্দর্শন-কুদর্শন ও প্রাকৃত-দর্শন-যোগ্য নেত্র-বিশিষ্ট মস্তক (অর্থাৎ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-দর্শনে অযোগ্য, কৃষ্ণ-কার্ষ্ণে প্রাকৃতবুদ্ধি, সম বা হেয় বুদ্ধিই জগদ্দর্শীর কু-দর্শন) ছেদন করিয়া ফেলিলেন ও কাশীধাম পোড়াইয়া ভস্ম করিলেন। তৎপর বিজয়ে উদ্যত পাশুপতধারী শিব নিরুপায় দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ, অভিন্ন-বিগ্রহ বৈষ্ণবরাজ শিবকে গুপ্তবাসের জন্য শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে স্থান দান করিলেন। তথায় তিনি একাম্রক তীর্থে—ভুবনেশ্বর ও পুরীতে ক্ষেত্রপাল নামে খ্যাত।

——::*::——

অদ্বৈত-তত্ত্ব

বিশ্বহিতকারী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বিশ্বের হিতের নিমিত্ত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে বিশ্বে অবতরণ করাইয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্যে যে যজ্ঞের প্রয়োজন হইয়াছিল সেই প্রেমভক্তি যজ্ঞের উপায়ন—গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র। যে প্রভু বিশ্বের হিতের নিমিত্ত এই সুমহতী সেবা প্রকাশ করিয়াছেন, বিশ্বের কয়জন অধিবাসী তাঁহার সন্ধান রাখেন? সন্ধান রাখা দূরের কথা, কয়জন তাঁহার নাম জানেন? যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছেন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের মধ্যেই বা কয়জন তাঁহার তত্ত্ব অবগত আছেন? অন্যের কথা কি, যাঁহারা আচার্য্য-প্রভুর বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশই ন্যূনাধিক মায়াবাদীর বিচার গ্রহণ পূর্ব্বক আচার্য্য-চরণ হইতে অনন্ত যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত। তাঁহারা নিজদিগকে ভক্তির প্রচারক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেও সুদার্শনিকগণের দর্শনে তাঁহাদের অন্তঃস্থিত মায়াবাদ-গহ্বর প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শৌক্র-বংশধারায় বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আসিবার প্রয়োজন নাই, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর তনয়গণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ শ্রীঅচ্যুতানন্দের বিচার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা ব্যতীত কমলাকান্ত, বলরাম, স্বরূপ, জগদীশ প্রভৃতি সকলেই দৈবপরতন্ত্রতা-প্রযুক্ত উৎকট পিতৃভক্তি দেখাইতে যাইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে স্বতন্ত্র-ঈশ্বর বলিয়া স্থাপনপূর্ব্বক গৌরবিরোধিতামূলে আচার্য্যের বিরোধিতাই করিয়াছেন। নিম্নে আমরা আচার্য্যতনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ও গোপাল—এই মহাভাগবতত্রয় আচার্য্য-

সম্বন্ধে যে সৎসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সেব্য-বিগ্রহ বলিয়া জানেন, তাঁহারাই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রকৃত ভক্ত। তাঁহাদেরই সেবা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু গ্রহণ করেন, আর যাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতের উদ্দেশে সেবা করিতে গিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু-জ্ঞান পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী জ্ঞান করা রূপ মতবাদ প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে কখনই শ্রীঅদ্বৈতের অনুগত সেবক বলা যায় না। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে শান্তিপুর গ্রামে ঐপ্রকার নবোদ্ভাসিত ঘৃণিত মতবাদের প্রচার হইয়াছিল। কালনা-বাসিগণের কেহ কেহ ঐ নব্য মতবাদ গ্রহণ পূর্বক নিরয়গামী হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। সবই কলির খেলা।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু উপাদান-কারণ বিষ্ণুতত্ত্ব। তাঁহার সেবা অক্ষয়া। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত-সেব্য শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বসেব্য, এই কথা স্বীকার না করিয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে মহাপ্রভুর সেব্য বিচার করিতে গেলে অপরাধ হয় এবং শ্রীঅদ্বৈত-সেবার নিরর্থকতা প্রতিপাদিত হয়। শ্রীঅচ্যুত বলিয়াছেন,—

চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য-গোসাঞি।
তাঁ'র গুরু অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই॥
চৈতন্য-রহিত দেহ শুষ্ককাষ্ঠ সম।
জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম॥

দশানন 'শিব-ভক্ত' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শিবভক্ত হইলেও শিবের আরাধ্য রঘুনাথের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার সেবিকা সীতাদেবীকে হরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন। উক্ত পাষণ্ড রাবন শ্রীরঘুনাথের বিদ্বেষ-পোষণরূপ অপকার্য্য করিবার ফলে নিজবুদ্ধি-দোষে মস্তক-দশটি হারাইয়াছেন। রঘুনাথই শিবের মূল-কারণ ও আরাধ্য, দশাননের দশদিক্‌দর্শী মস্তিষ্কে তাহা প্রবিষ্ট না হওয়ায় রুদ্রদেব বস্তুতঃপক্ষে তাহার সেবা গ্রহণ করেন নাই। যাঁহারা শিবের প্রীতি উৎপাদন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের মঙ্গল হয়। কিন্তু রাবণের শিব পূজায় রুদ্র সন্তুষ্ট না হওয়ায় তিনি তাঁহার সেবা গ্রহণ করেন নাই, তাই রাবণ সবংশে বিনষ্ট হইয়াছিল। সেইরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বংশে অদ্বৈতসেবা-প্রবৃত্তিতে বিপর্য্যয় ঘটায় তাঁহার অধস্তনগণের ও অধস্তনের অনুগত জনগণের অনেকেই বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে গিয়া অতিবাড়ীগণের ন্যায় বৈষ্ণব-সমাজ হইতে নিত্য-কালের জন্য বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নিন্দা করিয়া যে-সকল অদ্বৈতাধস্তন ও তদনুগ-ব্যক্তি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীচৈতন্যসেবাবৃত্তি বুঝিতে পারেন না, তাহাদিগের বিষ্ণুভক্তিতে অবস্থিতি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রকৃত দাসগণ তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য আশ্রিত বলিয়াই জানেন। এই সকল সেবকগণই বস্তুতঃ-পক্ষে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রিয়পাত্র।

শ্রীল স্বরূপগোস্বামী প্রভুর কড়চায় শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর যে বন্দনা আছে তাহা আলোচনা করিলে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। আমরা দুইটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

মহাবিষ্ণুর্জ্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতারঃ এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥

—যে মহাবিষ্ণু মায়া দ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্ত্তা; ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার; হরি হইতে অভিন্ন-তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম 'অদ্বৈত'; ভক্তি-শিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলে; সেই ভক্তবতার অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।

উপরে আমরা যাহা আলোচনা করিলাম তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাবিষ্ণু। মহাবিষ্ণু মায়ার নিমিত্ত ও উপাদান বৃত্তিদ্বয়ে দুইরূপে বিরাজমান। মহাবিষ্ণু একস্বরূপে প্রকৃতিস্থ হইয়া জগতের নিমিত্ত-কারণ, তাহাই পুরুষাবতার বা বিষ্ণুরূপ; দ্বিতীয়-স্বরূপে প্রধানস্থ হইয়া রুদ্ররূপে অদ্বৈত; সুতরাং পুরুষ হইতে শ্রীঅদ্বৈতের কিছুমাত্র ভেদ নাই, কেবল শরীর-ভেদ।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু—আচার্য্য। বিষ্ণুর আচরণ কর্ত্তৃসত্তায়

মঙ্গলময় ; তাঁহার মঙ্গলময়ী লীলা ও বস্তুত্বে মাঙ্গল্য দর্শন করিলে জীবের মঙ্গল হয়। তিনি যাবতীয় মঙ্গলের আকর। তাঁহার সেবোন্মুখ আচরণ জগতে সকলেরই মঙ্গলবিধান করে। জগজ্জঞ্জালগণ এই শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত ও পূর্ণ মঙ্গল বুঝিতে না পারিয়াই আত্মবৃত্তি 'ভক্তি' হইতে বিচ্যুত হয়। ভোগবুদ্ধিমূলক কর্ম্মানুষ্ঠান, নির্ব্বিশিষ্ট মুক্তি-লাভ প্রভৃতি কোন অমঙ্গলের কথা চিন্ময়গুণে গুণী শ্রীঅদ্বৈতে স্থান পায় না। তাঁহাকে অদ্বয়-বিষ্ণুতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া ভক্তিহীন ও কেবলাদ্বৈতবাদি-জ্ঞানে যে-সকল মায়ামোহিত অসুর-স্বভাব জীবগণ তাঁহার অনুগমনের ছলনা করিয়াছিল, নিজ মায়া দ্বারা তাহাদিগের আত্মম্ভরিতা পোষণ করাইবার ছলনায় আচার্য্যের সেই অভক্তগণকে যে দণ্ডবিধান, তাহাও মঙ্গলাচরণ মাত্র। বিষ্ণুবস্তু অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে জীবের মঙ্গলই উৎপন্ন করে। অমঙ্গলকে মঙ্গলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে বিষ্ণুমায়ার ঔপাদানিক আকর বুঝিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলেন, অদ্বৈত প্রভুর অপর নাম 'মঙ্গল' ছিল। তিনি নৈমিত্তিক অবতাররূপে প্রকৃতিতে উপাদান-শক্তির সঞ্চার করিয়া থাকেন ; তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত বস্তু নহেন বা তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত-গুণের আশ্রয় নহেন। তাঁহার চরিত্রানুসরণেই জীবের মঙ্গলোদয় হয়। তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে জীবের সকল অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। বিষ্ণু-বস্তুতে কোন প্রকার অনুপাদেয়, অবর, পরিচ্ছিন্ন, নির্ব্বিশেষ-ধর্ম্ম আরোপ করিতে নাই। তাঁহার বাস্তবসত্তা যাহা, তদ্বিষয়ে অপ্রাকৃত-জ্ঞান-লাভ দ্বারাই জীবের নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয়।

অপরাধ-মোচন

কোন কোন সময়ে আমরা এরূপ দুই একজন মহাপুরুষের বিষয় জানিতে পারি, যাঁহারা শাপভ্রষ্ট বা বৈষ্ণবচরণে কোন কারণে অপরাধগ্রস্ত হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সাংসারিক মানবের মত সমস্ত কার্য্য নির্বাহ পূর্বক সাধারণ মানবের নিকট তাঁহাদের পরিচয় গোপন রাখেন ও গোপনে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সজ্জনতোষণী ৭ম খণ্ড ৫৫ (পঞ্চান্ন) পৃষ্ঠায় আমরা এইরূপ একজন মহাপুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত হই। ১৭৮২ শকাব্দের ১৮ই ভাদ্র তারিখে তিনি উৎকল দেশের অন্তর্গত ভদ্রক নামক স্থানে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল-মহাপুরুষ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের তনয়-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। নবজাত শিশুর নাসিকার উপরে একটি তিলক দেখা যাইত, তাহা দেখিয়া অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিলকটি অদৃশ্য হইল। এই বালকের দশ মাস বয়সে তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ ঘটে। তৎপর ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। বালকটির নাম অচ্যুত। অচ্যুত ক্রমশঃ বিমাতা ও পিতামহী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। তাঁহার বিমাতা শ্রীভগবতীদেবী স্নেহের প্রতিমূর্ত্তিরূপে জগতে বিরাজিতা ছিলেন। তিনি অচ্যুতকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিতেন। সুতরাং বালক অচ্যুতকে মাতৃ-বিয়োগ-ব্যথা মোটেই ভোগ করিতে হয় নাই।

শ্রীঅচ্যুত বাল্যকালে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট-চাকুরী গ্রহণ করেন। অষ্টাদশ-বর্ষ বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। ক্রমশঃ তাঁহার তিনটি কন্যা ও একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। প্রায় দুই বৎসর চাকুরী করিবার পর চাকুরী উপলক্ষে রংপুর জেলায় অবস্থিতিকালে শ্রীঅচ্যুত বিকৃত মস্তিষ্ক হইবার লীলা প্রকাশ করেন এবং এই অবস্থায় তিনি ১১ বৎসর অবস্থিতি করিয়া ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

অচ্যুতের বেশ প্রতিভা ও কবিত্বশক্তি ছিল। তিনি

বিকৃত-মস্তিষ্ক হইবার পূর্বেই 'মাধবীলতা' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন, যে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যশোহর জেলায় ছিলেন, তিনি তখন 'তারা' নামে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইংরাজী ভাষায় হাওড়া জেলার বিবরণ লিপিবদ্ধ এবং 'পাণ্ডব'-নামক একখানি পদ্য রচনা করিয়াছেন। তিনি স্বভাবতঃ উদার ও লোকপ্রিয় ছিলেন।

বাহিরে শ্রীঅচ্যুতের কোন প্রকার ভজন-প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই। তবে বিকৃত-মস্তিষ্ক লীলা প্রকাশকালে যাহা আহার করিতেন, তাহাই 'প্রসাদ পাইতেছি'—এই কথা বলিতেন এবং সময়ে সময়ে "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" ও "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" এই দুইটি নাম ও পদ্য উচ্চারণ করিতেন।

অপ্রকট সময় অচ্যুতের মহাপুরুষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে এবং তিনি যে কোন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ করিয়া সেই অপরাধ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্তই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ আলোচনা করিলেই অনায়াসে বুঝা যাইবে এবং আরও জানা যাইবে যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গগনে বর্ত্তমানে যে আচার্য্য-ভাস্কর বিরাজিত আছেন তাঁহার শ্রীমুখে শুদ্ধ কৃষ্ণনাম শ্রবণ-ফলেই তিনি মুক্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

চিত্তপীড়াগ্রস্ত মানবের শেষ-দশায় যে অবস্থা হয়, শ্রীঅচ্যুতেরও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। প্রায় এক যুগ উক্ত রোগে আক্রান্ত থাকিয়া অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়েন। বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে তাঁহার 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' জ্বর হয়। জ্বর ভাল হইল কিন্তু দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। একদিন একাকী বাহিরে যাইয়া দুর্ব্বলতাক্রমে ভূমিতে পতিত হইলেন। সেই দিন হইতেই তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহার জন্য বিশেষরূপে চিন্তিত হইয়া অধিকতর যত্ন করিতে লাগিলেন। প্রথমে এলোপ্যাথিক, তৎপর আয়ুর্বেদীয় মতে চিকিৎসা হইল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। অলৌকিক অপ্রকট লীলাটি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায় নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"২৪শে বৈশাখ রাত্রে যখন তাঁহার জীবন-ভরসা বিগত হইল, তখন তাঁহার ভ্রাতা ভগিনীগণ তাঁহার নিকট বসিয়া মধুর স্বরে হরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নামগান এরূপ হইয়া উঠিল যে, যেন তাঁহার ঘরে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠের উদয় হইল। লক্ষনাম উচ্চারিত ও গীত হইলে সেই মৃত্যুগৃহ পরমানন্দ-পরিপূর্ণ ভগবদ্ধাম-রূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল; শুদ্ধ হরিনামের মাহাত্ম্য যে কি, তাহা সেই গৃহমধ্যস্থিত সকলেই জানিতে পারিলেন।

"শাস্ত্রে কথিত আছে যে, শুদ্ধকৃষ্ণনামে কৃষ্ণের সর্বশক্তি নিহিত আছে। যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানে সেরূপ বল নাই। এই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শেষরাত্রে সকলেই প্রত্যক্ষ করিলেন। অচ্যুতের বিমাতা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহ-ভাবে শ্রীগিরিধারীর চরণামৃত, ব্রজরজঃ, শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ ও শ্রীচরণ-তুলসী মিলিত করিয়া অচ্যুতকে সেবন করাইলেন, সে-সময়ে অচ্যুতের কোন তরল-দ্রব্য পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ হইতেছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চরণামৃত তিনবার পান করিতে করিতে উদরমণ্ডল হইতে একটি তেজঃ উত্থিত হইয়া কণ্ঠপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলে অচ্যুত অনায়াসে "হরেকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় মুদিত-চক্ষুদ্বয় হইতে ঘন ঘন অশ্রুধারা বাহিত হইতে লাগিল। লক্ষাবধি শুদ্ধ হরিনাম শ্রবণ করিয়া এবং রজঃতুলসী ও মহাপ্রসাদ মিশ্র চরণামৃত-পানে তাঁহার কপালে, বাহুমূলে, উদরে, বক্ষে ও কণ্ঠদেশে বৈষ্ণব-তিলক উজ্জ্বলিত হইল। অচ্যুতের **চতুর্থ ভ্রাতা** সেই সময়ে মহাপ্রেমে হরিনাম করিতে লাগিলেন, তাহাতে অচ্যুতের মুখ হইতে স্বীয় পরিচয়-সূচক অনেকগুলি তত্ত্ব-কথা বাহির হইল। আবার অনেকগুলি মাল্য-তিলকধারী চিন্ময়-বৈষ্ণব-মূর্ত্তিও সেই গৃহ-মধ্যে দেখা দিয়াছিলেন। গৃহস্থিত প্রদীপের জ্যোতিঃ বৈষ্ণব-জ্যোতিঃতে পরাজিত হইয়া পড়িল।

"শ্রীঅচ্যুত যে তত্ত্বকথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রকাশ-যোগ্য এই একটা কথামাত্র আছে। অচ্যুত কহিলেন—"আমি শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের উপদিষ্ট তত্ত্বে আমার কিছু অপরাধ ছিল, সেই অপরাধ

মঙ্গলময়; তাঁহার মঙ্গলময়ী লীলা ও বস্তুত্বে মাঙ্গল্য দর্শন করিলে জীবের মঙ্গল হয়। তিনি যাবতীয় মঙ্গলের আকর। তাঁহার সেবোন্মুখ আচরণ জগতে সকলেরই মঙ্গলবিধান করে। জগজ্জঞ্জালগণ এই শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত ও পূর্ণ মঙ্গল বুঝিতে না পারিয়াই আত্মবৃত্তি 'ভক্তি' হইতে বিচ্যুত হয়। ভোগবুদ্ধিমূলক কর্ম্মানুষ্ঠান, নির্ব্বিশিষ্ট মুক্তি-লাভ প্রভৃতি কোন অমঙ্গলের কথা চিন্ময়গুণে গুণী শ্রীঅদ্বৈতে স্থান পায় না। তাঁহাকে অদ্বয়-বিষ্ণুতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া ভক্তিহীন ও কেবলাদ্বৈতবাদি-জ্ঞানে যে-সকল মায়ামোহিত অসুর-স্বভাব জীবগণ তাঁহার অনুগমনের ছলনা করিয়াছিল, নিজ মায়া দ্বারা তাহাদিগের আত্মম্ভরিতা পোষণ করাইবার ছলনায় আচার্য্যের সেই অভক্তগণকে যে দণ্ডবিধান, তাহাও মঙ্গলাচরণ মাত্র। বিষ্ণুবস্তু অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে জীবের মঙ্গলই উৎপন্ন করে। অমঙ্গলকে মঙ্গলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে বিষ্ণুমায়ার ঔপাদানিক আকর বুঝিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলেন, অদ্বৈত প্রভুর অপর নাম 'মঙ্গল' ছিল। তিনি নৈমিত্তিক অবতাররূপে প্রকৃতিতে উপাদান-শক্তির সঞ্চার করিয়া থাকেন; তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত বস্তু নহেন বা তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত-গুণের আশ্রয় নহেন। তাঁহার চরিত্রানুসরণেই জীবের মঙ্গলোদয় হয়। তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে জীবের সকল অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। বিষ্ণু-বস্তুতে কোন প্রকার অনুপাদেয়, অবর, পরিচ্ছিন্ন, নির্ব্বিশেষ-ধর্ম আরোপ করিতে নাই। তাঁহার বাস্তবসত্তা যাহা, তদ্বিষয়ে অপ্রাকৃত-জ্ঞান-লাভ দ্বারাই জীবের নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয়।

———

অপরাধ-মোচন

কোন কোন সময়ে আমরা এরূপ দুই একজন মহাপুরুষের বিষয় জানিতে পারি, যাঁহারা শাপভ্রষ্ট বা বৈষ্ণবচরণে কোন কারণে অপরাধগ্রস্ত হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সাংসারিক মানবের মত সমস্ত কার্য্য নির্বাহ পূর্বক সাধারণ মানবের নিকট তাঁহাদের পরিচয় গোপন রাখেন ও গোপনে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সজ্জনতোষণী ৭ম খণ্ড ৫৫ (পঞ্চান্ন) পৃষ্ঠায় আমরা এইরূপ একজন মহাপুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত হই। ১৭৮২ শকাব্দের ১৮ই ভাদ্র তারিখে তিনি উৎকল দেশের অন্তর্গত ভদ্রক নামক স্থানে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল-মহাপুরুষ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের তনয়-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। নবজাত শিশুর নাসিকার উপরে একটি তিলক দেখা যাইত, তাহা দেখিয়া অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিলকটি অদৃশ্য হইল। এই বালকের দশ মাস বয়সে তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ ঘটে। তৎপর ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। বালকটির নাম অচ্যুত। অচ্যুত ক্রমশঃ বিমাতা ও পিতামহী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। তাঁহার বিমাতা শ্রীভগবতীদেবী স্নেহের প্রতিমূর্ত্তিরূপে জগতে বিরাজিতা ছিলেন। তিনি অচ্যুতকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিতেন। সুতরাং বালক অচ্যুতকে মাতৃ-বিয়োগ-ব্যথা মোটেই ভোগ করিতে হয় নাই।

শ্রীঅচ্যুত বাল্যকালে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট-চাকুরী গ্রহণ করেন। অষ্টাদশ-বর্ষ বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। ক্রমশঃ তাঁহার তিনটি কন্যা ও একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। প্রায় দুই বৎসর চাকুরী করিবার পর চাকুরী উপলক্ষে রংপুর জেলায় অবস্থিতিকালে শ্রীঅচ্যুত বিকৃত মস্তিষ্ক হইবার লীলা প্রকাশ করেন এবং এই অবস্থায় তিনি ১১ বৎসর অবস্থিতি করিয়া ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

অচ্যুতের বেশ প্রতিভা ও কবিত্বশক্তি ছিল। তিনি

বিকৃত-মস্তিষ্ক হইবার পূর্ব্বেই 'মাধবীলতা' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন, যে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যশোহর জেলায় ছিলেন, তিনি তখন 'তারা' নামে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইংরাজী ভাষায় হাওড়া জেলার বিবরণ লিপিবদ্ধ এবং 'পাণ্ডব'-নামক একখানি পদ্য রচনা করিয়াছেন। তিনি স্বভাবতঃ উদার ও লোকপ্রিয় ছিলেন।

বাহিরে শ্রীঅচ্যুতের কোন প্রকার ভজন-প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই। তবে বিকৃত-মস্তিষ্ক লীলা প্রকাশকালে যাহা আহার করিতেন, তাহাই 'প্রসাদ পাইতেছি'—এই কথা বলিতেন এবং সময়ে সময়ে "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" ও "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" এই দুইটি নাম ও পদ্য উচ্চারণ করিতেন।

অপ্রকট সময় অচ্যুতের মহাপুরুষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে এবং তিনি যে কোন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ করিয়া সেই অপরাধ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্তই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ আলোচনা করিলেই অনায়াসে বুঝা যাইবে এবং আরও জানা যাইবে যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গগনে বর্ত্তমানে যে আচার্য্য-ভাস্কর বিরাজিত আছেন তাঁহার শ্রীমুখে শুদ্ধ কৃষ্ণনাম শ্রবণ-ফলেই তিনি মুক্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

চিত্তপীড়াগ্রস্ত মানবের শেষ-দশায় যে অবস্থা হয়, শ্রীঅচ্যুতেরও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। প্রায় এক যুগ উক্ত রোগে আক্রান্ত থাকিয়া অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে তাঁহার 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' জ্বর হয়। জ্বর ভাল হইল কিন্তু দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। একদিন একাকী বাহিরে যাইয়া দুর্ব্বলতাক্রমে ভূমিতে পতিত হইলেন। সেই দিন হইতেই তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহার জন্য বিশেষরূপে চিন্তিত হইয়া অধিকতর যত্ন করিতে লাগিলেন। প্রথমে এলোপ্যাথিক, তৎপর আয়ুর্বেদীয় মতে চিকিৎসা হইল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। অলৌকিক অপ্রকট লীলাটি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায় নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"২৪শে বৈশাখ রাত্রে যখন তাঁহার জীবন-ভরসা বিগত হইল, তখন তাঁহার ভ্রাতা ভগিনীগণ তাঁহার নিকট বসিয়া মধুর স্বরে হরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নামগান এরূপ হইয়া উঠিল যে, যেন তাঁহার ঘরে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠের উদয় হইল। লক্ষনাম উচ্চারিত ও গীত হইলে সেই মৃত্যুগৃহ পরমানন্দ-পরিপূর্ণ ভগবদ্ধাম-রূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল; শুদ্ধ হরিনামের মাহাত্ম্য যে কি, তাহা সেই গৃহমধ্যস্থিত সকলেই জানিতে পারিলেন।

"শাস্ত্রে কথিত আছে যে, শুদ্ধকৃষ্ণনামে কৃষ্ণের সর্বশক্তি নিহিত আছে। যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানে সেরূপ বল নাই। এই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শেষরাত্রে সকলেই প্রত্যক্ষ করিলেন। অচ্যুতের বিমাতা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহ-ভাবে শ্রীগিরিধারীর চরণামৃত, ব্রজরজঃ, শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ ও শ্রীচরণ-তুলসী মিলিত করিয়া অচ্যুতকে সেবন করাইলেন, সে-সময়ে অচ্যুতের কোন তরল-দ্রব্য পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ হইতেছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চরণামৃত তিনবার পান করিতে করিতে উদরমণ্ডল হইতে একটি তেজঃ উত্থিত হইয়া কণ্ঠপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলে অচ্যুত অনায়াসে "হরেকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় মুদিত-চক্ষুদ্বয় হইতে ঘন ঘন অশ্রুধারা বাহিত হইতে লাগিল। লক্ষাবধি শুদ্ধ হরিনাম শ্রবণ করিয়া এবং রজঃতুলসী ও মহাপ্রসাদ মিশ্র চরণামৃত-পানে তাঁহার কপালে, বাহুমূলে, উদরে, বক্ষে ও কণ্ঠদেশে বৈষ্ণব-তিলক উজ্জ্বলিত হইল। অচ্যুতের চতুর্থ ভ্রাতা সেই সময়ে মহাপ্রেমে হরিনাম করিতে লাগিলেন, তাহাতে অচ্যুতের মুখ হইতে স্বীয় পরিচয়-সূচক অনেকগুলি তত্ত্ব-কথা বাহির হইল। আবার অনেকগুলি মাল্য-তিলকধারী চিন্ময়-বৈষ্ণব-মূর্ত্তিও সেই গৃহ-মধ্যে দেখা দিয়াছিলেন। গৃহস্থিত প্রদীপের জ্যোতিঃ বৈষ্ণব-জ্যোতিঃতে পরাজিত হইয়া পড়িল।

"শ্রীঅচ্যুত যে তত্ত্বকথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রকাশ-যোগ্য এই একটা কথামাত্র আছে। অচ্যুত কহিলেন—"আমি শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের উপদিষ্ট তত্ত্বে আমার কিছু অপরাধ ছিল, সেই অপরাধ

ক্ষয় করিবার জন্য আমি এযাবৎ এই গৃহে বর্ত্তমান ছিলাম। সকল ভজনের সার কৃষ্ণনাম। যেই নাম, সেই কৃষ্ণ। নিরপরাধে নাম করিলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়। ভ্রাতৃগণ, তোমাদের উচ্চারিত নিরপরাধ নাম মরণ-সময়ে শ্রবণ করিয়া আমার অপরাধ ক্ষয় ও সর্বসিদ্ধি হইল। তোমরা একথা স্মরণ রাখিবে।"

শ্রীঅচ্যুতের চতুর্থ ভ্রাতার মুখে শ্রীহরিনাম-শ্রবণের ফলে তাঁহার (অচ্যুতের) মুখে ঐসকল তত্ত্বকথা প্রকাশিত হইল। এই চতুর্থ ভ্রাতাই বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব গগনের আচার্য-ভাস্কর জগদ্গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। শ্রীঅচ্যুতের নির্য্যাণ সময়ে ঐ গৃহে অবস্থিত কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিয়াছি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরণেই শ্রীঅচ্যুতের অপরাধ ছিল। শ্রীঅচ্যুতের অপরাধ ক্ষালনের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের চরণধূলি প্রার্থনা করেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ যখন নামপ্রেমে বাহজ্ঞানহীন অবস্থায় ছিলেন, সেই সময় শ্রীঅচ্যুত স্বীয় অভীষ্ট ধন লাভ করিয়া অপরাধমুক্ত হন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উল্লিখিত বিষয়েও ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

শ্রীঅচ্যুতের কপালের তিলক প্রথমতঃ চারিটি দণ্ড-বিশিষ্ট উর্দ্ধপুণ্ড্ররূপে দেখা দিয়াছিল, অপরাধক্ষয়ের পর তাহা শুদ্ধ হরিমন্দির উর্দ্ধপুণ্ড্র হইল। অবশেষে প্রণব-মূর্ত্তি হইয়া পড়িলে কপালের উর্দ্ধভাগে একটি ব'সে যাওয়ার চিহ্নের সহিত প্রাণবিয়োগ হইল। ইহাতে অনুমিত হইল যে, সিদ্ধযোগীদের মৃত্যুর ন্যায় তাঁহার আত্মা সুষুম্না-নাড়ী ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন। শ্রীরামানুজের মতে সিদ্ধি প্রাপ্তির লক্ষণও এইরূপ। উত্তরায়ণ শুক্লপক্ষ, আপূর্য্যমানচন্দ্র, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ এবং চিত্রানক্ষত্র এই সমস্ত যোগই যোগীদিগের মৃত্যুকাল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিতেছেন—

"আমরা সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া ভালরূপে অনুভব করিলাম যে, অচ্যুতানন্দ একপ্রকার অলৌকিক বৈষ্ণব-গতি লাভ করিলেন। এত দিবস বিষয়ী ও পাগলের ন্যায় থাকিয়া কেবল বৈষ্ণব-অপরাধ ক্ষয় করিবার উপায়-মাত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন।"

শ্রীঅচ্যুত আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমি যেন তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তা চতুর্থ ভ্রাতার সেবা-লাভে জীবন সার্থক করিতে পারি।

খৃষ্টধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মে পার্থক্য

বিগত ১৭ই অক্টোবর লণ্ডনের ৩২ নং রাসেল ষ্ট্রীটে খৃষ্টীয় ছাত্রগণের পরিচালন-সমিতিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ছাত্রগণের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-মতের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশুদ্ধ-সত্যের নিম্নলিখিত ভেদসমূহ বর্ত্তমান। শ্রীপাদ বন মহারাজও সেই সমিতিতে উপস্থিত থাকিয়া উত্তর-প্রদান-ছলে ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

(১) মহান্ত-গুরু যে কেবলমাত্র একবারই জগতে আসেন, তাহা নহে—ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সর্বদেশে ও সর্বকালে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব সম্ভব এবং শ্রীগুরুদেব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও জড়-শরীরধারী বলিয়া আপাত-প্রতীত হইলেও তাঁহার অপ্রাকৃত চেষ্টা প্রাকৃত-দেহধারী মানবের ভোগপরা চেষ্টা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

(২) শ্রৌতসিদ্ধান্ত মানবে ঈশ্বরত্বারোপ বা ভগবানে মানবীয় হেয় সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মারোপ স্বীকার করেন না এবং এই বিশ্বকে চিজ্জগতের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব জ্ঞান করেন।

(৩) ভগবান্ কেবল পুরুষত্বে আরোপিত হইবার পরিবর্ত্তে তিনি স্বরূপশক্তিমান্ বলিয়া চিজ্জগতে ভোক্তৃ-

ভোগ্যভাবান্বিত বিষয়াশ্রয় ঈশ্বর ও ঈশ্বরীরূপে নিত্য বিলাস-পরায়ণ।

(৪) জড়দেশ কালের অতীত বৈকুণ্ঠরাজ্যে বিধিমার্গে পরমেশ্বর গৌরবের সহিত সার্দ্ধময়রসে অর্চ্চনীয় এবং তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবনে রাগমার্গে বিশ্রম্ভময় পঞ্চবিধরসে প্রীতির সহিত সেবনীয়।

(৫) গৌরবময় বিধিমার্গে অর্চ্চনীয় তত্ত্ববস্তু ভগবান্ নারায়ণ। আর যখন রাগমার্গে বিশ্রম্ভময় পঞ্চরসে ভজনীয় হন, তখন তিনিই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ। তিনি—শ্রীকৃষ্ণ, যেহেতু তিনি নিখিল চিদচিদীশ্বর সকলের চিত্তাকর্ষক, তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা এবং চিজ্জগতের একচ্ছত্রাধিপতি।

(৬) জগতের সকল ধর্ম্মই ঐতিহাসিকতা বা ন্যূনাধিক প্রাচীনতার অর্থাৎ কালের অভ্যন্তরে সৃষ্ট হইবার দাবী করে, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত নিরুপাধিক প্রেম ধর্ম্ম সার্বদেশিক ও সার্বকালিক। অতএব কালান্তর্গত সৃষ্ট বস্তু নহে অর্থাৎ নিত্য বা সনাতন; কোনও কাল-বিশেষে তাহা সৃষ্ট হয় নাই। ভগবান্ যখন এক ও অদ্বিতীয় তখন তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম অর্থাৎ তাঁহার প্রাপ্তির উপায় ও উপেয় প্রয়োজন-ধর্ম্মও একই হইবে এবং সেই ধর্ম্ম—সেই এক অদ্বিতীয় বস্তুর প্রীতির সহিত সর্বকালে সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা সেবন ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে। ইহাই সুবিমল জীবাত্মার নিত্যা বৃত্তি।

(৭) শ্রীচৈতন্যদেবই বাস্তববস্তু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; তিনি ঐতিহাসিক বা মানবের মনঃ-কল্পিত কাল্পনিক রূপক বস্তু নহেন। শ্রীকৃষ্ণে মর্ত্ত্য-জীবোচিত হেয়ত্ব-পরিচ্ছিন্নতাদির আরোপ বা মর্ত্ত্যজীবে ঈশ্বরত্বের আরোপ উভয়ই অপরাধ, সুতরাং কর্ত্তব্য নহে। মানবের বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়াদির গোচর হওয়া বা না হওয়া তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-সাপেক্ষ। জীবের বিকৃতি-যোগ্য জড়ীয় জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা ভগবানের স্বরূপ জানা যায় না; যেহেতু তিনি অধোক্ষজ।

(৮) সর্ব্ববিধ সাধনের মধ্যে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন; তবে কীর্ত্তনের পূর্বে শ্রীনাম-পরায়ণ মুক্ত-সাধুর মুখে কীর্ত্তিত ভগবন্নামের শ্রবণ অর্থাৎ গুরুপাদাশ্রয় একান্ত প্রয়োজনীয়।

(৯) শ্রীভগবানের নামই সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্। তদীয় নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা শ্রীনামেই অভিন্ন-ভাবে যুগপৎ বিদ্যমান। কর্ণপুটে বৈকুণ্ঠ-শ্রীনাম-শ্রবণের ফলে চক্ষুরাদি অপরাপর ইন্দ্রিয়সকল ও মন নিয়ন্ত্রিত হয়। জড়জগতের ভোগপর শব্দে ও বৈকুণ্ঠ শ্রীনামে সম্পূর্ণ ভেদ বর্ত্তমান। জাগতিক শব্দ কলিজাত বৈষম্য ও প্রেম-রাহিত্যের সৃষ্টিকারী।

(১০) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শয়তান বা মায়াকে ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথগ্‌বস্তুরূপে স্বীকার করেন না। মায়া শ্রীভগবানেরই অন্যতমা বহিরঙ্গা শক্তি এবং তাঁহার সান্মুখ্য হইতে দূরে থাকেন এবং যে-সমস্ত অপরাধী জীব নিজ নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের ফলে ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়াছে মায়া তাহাদের বঞ্চনে ও শাসনে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্তা।

(১১) মানব যে ভগবানেরই মূর্ত্তির অনুরূপ এ ধারণাও নিরপেক্ষ যুক্তি-সিদ্ধ নহে। চিৎকিরণ-কণ জীবাত্মাসমূহ বিভু-চিৎসূর্য্য ভগবানের সেবকসূত্রে নিত্য-আনন্দময়, ইহা মুক্তাবস্থা; কখনও ভোক্তৃসূত্রে মায়ারূপ অন্ধকারে মিশ্রিত হইয়া নিরানন্দময়, ইহা বদ্ধাবস্থা।

(১২) পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরকাদি দেশ ও কালের অধীন এবং উহাদের সহিত সাপেক্ষ ধর্ম্মযুক্ত। ঐগুলি স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরে অনুষ্ঠেয়, সুতরাং অনিত্য; ঐগুলি বহুবিধ যেহেতু বিভিন্ন ব্যক্তির দেহ ও মন বিভিন্ন। পাপ-পুণ্যাদি জীবের জড়োপাধিরই প্রয়োজনীয় বিষয় হইতে পারে, কিন্তু মুক্ত-পুরুষের পাপ পুণ্যাদির অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা ও অবকাশ নাই। এখানে ভগবৎ-প্রীতির অভাব জন্য যে বিসদৃশ ভাব জন্মে, উহা পাপাপেক্ষা বহু গুণে গুরুতর 'অপরাধ'-নামে ইহজগতে কথিত।

(১৩) মানব-সৃষ্ট বিধি বা বিধি-বাধ্য মানবতা শ্রীভগবানের উপর চাপানো যুক্তিবিরুদ্ধ। তিনি কাহারও বিধি-নিষেধ-বাচ্য নহেন। তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা ও নিরঙ্কুশতা নিত্যকাল সিদ্ধ ও বিদ্যমান। ইহা সম্পূর্ণরূপে

স্বীকার না করায় ক্ষীণসেবা-বুদ্ধি জনগণের নিকট ভগবান্ স্বীয় শ্রীরামলীলা প্রকট করিয়া মানবোচিত দৈন্যে আপনাকে প্রকাশ করেন। তাহাতে ভগবদ্‌বস্তুর সর্ব-স্বাতন্ত্র্য-ধর্মের অভাব কল্পিত হয়; সুতরাং স্বেচ্ছা লীলাময়ত্ব-স্বীকারের ব্যাঘাত হয়।

(১৪) পরিণামশীল জগতে বদ্ধজীবের জড়ীয় সম্বন্ধ থাকায় উহা অনিত্য, কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মার জন্ম বা মৃত্যু নাই। শুদ্ধ মুক্তজীবাত্মগণের প্রতি তাহাদের তাৎকালিক বদ্ধাবস্থার জড়মিশ্র-সম্বন্ধ আরোপ বা মিশ্রিত করা যুক্তি-বিরুদ্ধ।

ভক্তির ফল

ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ

পূর্ণতম শ্রীভগবদ্বস্তু সর্বৈশ্বর্য্য ও সর্বমাধুর্য্য পরিপূর্ণ এবং পরমপ্রেমাস্পদ। তিনি এক অত্যাশ্চর্য্য-লীলা দ্বারা চরাচরবিশ্ব আকর্ষণ করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণনামে অভিহিত। এই শ্রীকৃষ্ণের সেবার অনুকূল অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণে কোনও প্রকার উপাধি নাই। যে-পর্য্যন্ত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসেবায় অরুচি বিদ্যমান, তৎকাল পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তি তাহাতে স্থান পায় না। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত যাবতীয় অভিলাষকেই শাস্ত্রকারগণ অন্যাভিলাষ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

উত্তমা ভক্তির বিভিন্ন অভিধান

সোপাধিকী ও নিরুপাধিকীভেদে ভক্তি দ্বিবিধা। সোপাধিকী ভক্তির দুইটি উপাধি বিদ্যমান—একটি অন্যাভিলাষ, অপরটি অন্যমিশ্রণ। ভোগবাসনা ও মোক্ষ-বাসনাকেই প্রধানতঃ 'অন্যাভিলাষ' সংজ্ঞা প্রদান করা হয়; আর জ্ঞানকর্ম্মাদির আবরণ 'অন্যমিশ্রণ'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুশীলন যদি 'অন্যাভিলাষশূন্য' ও 'অন্যমিশ্রণ' শূন্য হয়, তাহা হইলে তাহা নিরুপাধিকী বা উত্তমা ভক্তি। এক কথায় শ্রীকৃষ্ণানুশীলন যদি ভুক্তি-মুক্তি-কামনারহিত হইয়া কেবল-ভক্তিকামনাযুক্ত হয় এবং জীব ব্রহ্মের ঐক্য প্রভৃতি জ্ঞাপক-জ্ঞানাদির সম্বন্ধ শূন্য হইয়া কেবল-শ্রবণকীর্ত্তনাদিময় হয় তাহা হইলে তাহাকে উত্তমা ভক্তি বলা হয়। এই উত্তমা ভক্তি নির্গুণা, শুদ্ধা, কেবলা, মুখ্যা, অনন্যা, অকিঞ্চনা, স্বরূপসিদ্ধা প্রভৃতি নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন।

সগুণ ও নিষ্কাম-ভক্তি

ভোগবাসনাযুক্ত ভক্তির নাম সকামভক্তি আর মোক্ষ-বাসনাযুক্ত ভক্তির নাম নিষ্কাম-ভক্তি। সকামভক্তি হয় তমোগুণ, না হয় রজোগুণোত্থ, সুতরাং উহাকে সগুণ-ভক্তিও বলা যাইতে পারে। আর্ত্ত ও অর্থার্থী ব্যক্তিসকল সকাম-ভক্তির অধিকারী। তাঁহাদের প্রাপ্যফল—স্বর্গাদিভোগ। এই সকামা ভক্তিই সাত্ত্বিকী হইলে মোক্ষবাসনাযুক্ত হয়। তখন আর ইহাকে সকামা না বলিয়া নিষ্কামা বলা হয়। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ইহার অধিকারী। এই মোক্ষবাসনাযুক্তা নিষ্কাম-ভক্তি জ্ঞান, যোগ বা কর্মমিশ্রিতা। কর্ম দ্বারা মিশ্রিত হইলে ইহাকে কর্ম্মমিশ্রা, যোগদ্বারা মিশ্রিত হইলে যোগমিশ্রা, আর জ্ঞানদ্বারা মিশ্রিত হইলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা হয়। কর্মমিশ্রা ভক্তির ফল—চিত্তশুদ্ধি, যোগমিশ্রা ভক্তির ফল —পরমাত্মসাক্ষাৎকারলাভের পর ক্রমমুক্তি এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফল—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর সদ্য মুক্তি।

আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি

কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির অঙ্গীভূত নিষ্কাম-কর্ম্মসকল সাক্ষাৎ ভক্তি না হইলেও ভক্তির ফল চিত্তশুদ্ধির উৎপাদন দ্বারা ভক্তিত্বের আরোপে ভক্তিরূপে সিদ্ধ তাই ইহাকে আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি বলা যাইতে পারে। এইরূপ যোগমিশ্রা

ভক্তির অঙ্গীভূত আসন ও প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াসকল এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অঙ্গীভূত আত্মৈক-জ্ঞান সাক্ষাৎ ভক্তি না হইলেও ভক্তির সঙ্গবশতঃ সিদ্ধ অর্থাৎ ভক্তির ফল মোক্ষ উৎপাদন দ্বারা ভক্তির আকারে পরিচিত হয় বলিয়া উহাদিগকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলা হইয়া থাকে।

শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ

শুদ্ধা ভক্তি গুণসম্বন্ধ-রাহিত্যহেতু নির্গুণ এবং উক্ত আরোপসিদ্ধা বা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি হইতে সম্পূর্ন পৃথক্ ও স্বতন্ত্র। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ ইহার মুখাপেক্ষী। ইনি কর্ম-জ্ঞানাদির অধীনা বা মুখাপেক্ষিণী নহেন; পরন্তু সম্পূর্ন স্বাধীনা। ইনি স্বাধীনভাবেই কর্মের ফল চিত্তশুদ্ধি, যোগের ফল ক্রমমুক্তি ও জ্ঞানের ফল সদ্য মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন এবং সেই সঙ্গেই নিজের মোক্ষফল ভগবৎ-সাক্ষাৎকার প্রভৃতি সমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন। যদিও শুদ্ধা ভক্তির শ্রবণাদি অঙ্গসকলকে আপাততঃ কর্ম্ম, যোগ বা জ্ঞান বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে উহা কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগ নহে। শুদ্ধা ভক্তি শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি।

শুদ্ধা ভক্তির আবির্ভাব-পন্থা

সিদ্ধ ও সাধকের একত্র সম্মিলনের ক্ষেত্ররূপেই সাধকের শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাঁহার ইন্দ্রিয়-সমূহ ঐ প্রকারে নির্মিত না হইলে অযোগ্য সাধকের পক্ষে সিদ্ধত্ব-লাভের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। নিত্যসিদ্ধ স্বরূপশক্তির বৃত্তিসকল অসিদ্ধ সাধকের আকর্ষণার্থ তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে অবতীর্ণ হন এবং উহার সহিত একীভূত হইয়া তত্তদ্-আকার লাভ দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। আনন্দময়ী বৃত্তির অবতার-ফলেই শ্রবন কীর্ত্তনাদিতে সাধকের বিমল আনন্দ হইয়া থাকে। স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিসকলকে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে প্রকাশিত দেখিয়াই আমরা শ্রবণকীর্ত্তনাদিকে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-রূপে মনে করিয়া থাকি। বস্তুতঃ ঐ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জ্ঞান-কর্মাদির অতীত চিন্ময় বস্তু। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি চিন্ময় বস্তু বলিয়াই শুদ্ধা ভক্তি ক্লেশ-নাশিনী, শুভদায়িনী, মোক্ষলঘুতাকারিণী, সুদুর্লভা, সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী।

ভক্তির আভাসে পাপ-নাশ

জগতে ক্লেশের মূলে তিনটি বস্তু দৃষ্ট হয়—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। পাপ আবার প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ ভেদে দুই প্রকার। যাহা অদৃষ্টরূপে আত্মাতে অবস্থান করে এবং যাহার ফলভোগকাল উপস্থিত হয় নাই তাহাই অপ্রারব্ধ পাপ, আর যাহার ভোগ আরম্ভ হইয়াছে তাহা প্রারব্ধ পাপ। বাসনাই পাপবীজ। অবিদ্যা শব্দের অর্থ স্বরূপ ভ্রম। শুদ্ধা ভক্তির আভাসেই পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥
—(ভাঃ ১১।১৪।১৯)

—হে উদ্ধব! অগ্নি যেরূপ পাকাদি কার্য্যান্তরের উদ্দেশ্য প্রজ্জলিত হইলেও প্রবৃদ্ধশিখাযুক্ত হইয়া কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, সেইরূপ আমার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতা ভক্তিও সম্পূর্নরূপে পাপরাশি বিনষ্ট করিয়া থাকে।

ভক্তির অপরাপর গুণ

শ্রীভক্তিদেবী যে শুভ প্রদান করেন, তাহার ফলে সাধক কর্তৃক সর্বজগতের প্রীতি বিহিত হইয়া থাকে এবং সর্বজগৎ সাধকের প্রতি অনুরাগ-বিশিষ্ট হ'ন। ঐ শুভ অর্থে সর্বসদ্‌গুণ ও সুখকেও লক্ষ্য করে। সুখ তিন প্রকার—বৈষয়িক সুখ, ব্রহ্ম সুখ ও পারমেশ্বর সুখ। সকল সুখের আকর পারমেশ্বর সুখ ভক্তিতে অনায়াস-লভ্য, অপর কিছুতেই তাহা হয় না। ভক্তির উদয়ে মোক্ষও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং ভক্তি—মোক্ষলঘুতাকৃৎ; শ্রীভগবান্ বা তদীয় ভক্তের কৃপা ব্যতীত ভক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই বলিয়া এবং শ্রীভগবান্ উহা শীঘ্র প্রদান করেন না বলিয়াই ভক্তিকে সুদুর্লভা বলা হয়। শুদ্ধা ভক্তি ব্রহ্মানন্দ হইতেও উৎকৃষ্টা ও গাঢ়-আনন্দ-স্বরূপা বলিয়া তাঁহার 'সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা' বিশেষণ। শ্রীভক্তি-দেবীর প্রভাবে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকেও প্রেমে মুগ্ধ করিয়া তৎপার্ষদ বৃন্দসহ আকর্ষণ করেন বলিয়া শুদ্ধা ভক্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী।

———

শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী

প্রেমবশ্য ভগবান্

"ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খায়"

শ্রীভগবান্ অজিত হইয়াও প্রেম-বশ্য। তিনি ভক্তের প্রেমে সর্বদা বাঁধা। ভক্তের দর্শনে, স্পর্শনে, শ্রবণে, ঘ্রাণে, নর্ত্তনে, কীর্ত্তনে, আলিঙ্গনে প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার আনন্দ। অভক্তের বহুমূল্য নৈবেদ্য সম্ভারাদি ভক্তি-চন্দনে চর্চ্চিত না হওয়ায় তাঁহার প্রীতিপ্রদ হয় না, তিনি তৎপ্রতি একবার দৃষ্টিপাতও করেন না; পক্ষান্তরে ভক্তের ক্ষুদ-কণাও তাঁহার বড় আদরের জিনিষ, ভক্ত তাহা দিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেও তিনি জোরপূর্বক তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের সেবার উপযোগী জিনিষ প্রস্তুত করিতে উচ্চ-কুলে জন্মগ্রহণের, বিশ্ববিদ্যালয়ের বা টোলের বড় বিদ্বান্ অথবা সুন্দর দেহ-বিশিষ্ট হইবার প্রতীক্ষা নাই, আছে কেবল শুদ্ধ-ভক্তির প্রতীক্ষা। বিদুর, সুদামা বিপ্র, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তটি বিশেষ-রূপে দেখিতে পাই। অদ্য আমরা শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী মহোদয়ের পূত-চরিত্রানুসরণে যত্নপর হইব।

ভগবদ্-বশকারী শ্রীশুক্লাম্বর

যে-সময়ের কথা বলিতেছি, তাহা আজ-কালের কথা নয়, দুই চারি বৎসরের কথা নয়, চারিশত বৎসরেরও উর্দ্ধ-কালের কথা—কোলদ্বীপে বর্ত্তমান নবদ্বীপ-সহর স্থাপিত হইবারও তিন শত বৎসরেরও পূর্বের কথা—যখন পতিত-পাবনী সুরধুনী বর্ত্তমানে নবদ্বীপ-মণ্ডলের যে-স্থানে প্রবাহিত হইতেছেন তাহার আরও পূর্বদিকে, শ্রীধাম মায়াপুরের প্রান্তদেশ বিধৌত করিয়া স্বীয় বক্ষে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-রজঃ ও তাঁহার জলকেলি-লাভের সৌভাগ্য পাইতেন—যখন সপার্ষদ মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-বন্যায় সমগ্র নদীয়া-নগরী টলমল। এই সময়ে—পরমার্থ-লগ্নের এই মহেন্দ্রক্ষণে নদীয়া নগরীতে গঙ্গার তটদেশে একজন নৈষ্ঠিক ভগবৎ-পরায়ণ ব্রহ্মচারীর নিবাস ছিল। আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে সর্বাবস্থায়ই কৃষ্ণধ্যান, কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণচিন্তা ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই ছিল না। তিনি স্বগৃহে বসিয়া সুরধুনীর কল-কল-নাদে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া প্রেমে আপ্লুত হইতেন আর মহাপ্রভুর পদরজোলাভে কৃতার্থা সুরধুনীর তীরে বাসের সুযোগ লাভ করিয়া নিজের ভাগ্যের প্রশংসা করিতেন। যাঁ'র শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ঈদৃশ প্রেম, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেম-বাধ্য হইবেন না ত' কা'র বাধ্য হইবেন? এই ভগবদ্-বশকারী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীই আমাদের পূজ্যপাদ শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।

শুক্লাম্বরের গৃহে মহাপ্রভুর মহাভাব

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন ঈশ্বর পুরীপাদের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ লীলাভিনয়ের পর শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্বক মহাপ্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন নগর-ভ্রমণমুখে শ্রীবাস-শ্রীমান্-গদাধর-সদাশিবাদি ভক্তবৃন্দসহ তিনি ভাগ্যবান্ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের গৃহেই সর্বপ্রথম সম্মিলিত হইয়া তাঁহার গয়া-দর্শনের প্রেমময়ী কাহিনী বিশদরূপে বর্ণন করেন। এই বৈষ্ণব সভায় উপস্থিত হইয়াই তিনি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা॥
অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

আবার পরক্ষণেই সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান-হারা হইয়া বিপ্রলম্ভভরে গাহিতে লাগিলেন,—

"পাইলুঁ ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা"

এই কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রেমের আবেগে মহাপ্রভু ভাগ্যবান্ শুক্লাম্বরের গৃহে একটি স্তম্ভ আলিঙ্গন করিলেন; আবার—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

—এই বিপ্রলম্ভ-প্রেম-সূচক শ্লোকটী পাঠ করিতে করিতে প্রেমে মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হইলেন। মহাপ্রেমে ভক্তগণেরও ঐপ্রকার অবস্থা হইল।

সবে হৈলা কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দে মূর্চ্ছিত।
হাসেন জাহ্নবী দেবী হইয়া বিস্মিত॥

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান প্রকাশ পাইল। তিনি পুনরায় 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আবার মহাপ্রেম-ভরে,—

'কৃষ্ণরে, প্রভুরে, মোর কোন্ দিকে গেলা'

—বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, ভক্তগণও তখন বাহ্য হারাইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তখন,—

'উঠিল কীর্ত্তন-রোল প্রেমের ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল শুক্লাম্বরের ভবন॥

মহাপ্রভু এই প্রকারে ভাগ্যবান্ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর-গৃহে শ্রীগদাধরাদি ভক্তবৃন্দসহ আরও অনেকক্ষণ মহাপ্রেমলীলা প্রকাশ করিলেন।

শুক্লাম্বরের মহিমা

শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। তিনি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি কৃষ্ণকে অর্পণ করিয়া তদবশেষ দ্বারা দেহরক্ষা-পূর্ব্বক অহর্নিশ কৃষ্ণনামগুণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং দুঃখ-দারিদ্র্যের লেশমাত্র অনুভূতিও তাঁহার ছিল না। কিন্তু বহির্ম্মুখ জনগণ কৃষ্ণ-ভক্তের পরানন্দ-দর্শনে অসমর্থ হইয়া শ্রীল শুক্লাম্বরকে একজন সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান করিত। কিন্তু যে যাহাই বলুক, ভক্তের মহিমা শ্রীভগবানের নিকট অপরিজ্ঞাত নহে। একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর-আবেশে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় শুক্লাম্বর ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া মহাপ্রভুর সমীপে আগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিয়াই নিকটে ডাকিলেন এবং তাঁহার গুণ প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

"দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম।
আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষু-ধর্ম্ম॥
আমিত তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই।
তুমি না দিলেও আমি বল করি' খাই॥
দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি' খাইলু তো'র।
পাসরিলা? কমলা ধরিল হস্ত মোর॥"

আমরা মহাপ্রভুর উক্ত বাক্য হইতে সহজেই বুঝিতে পারিতেছি, এই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীই দ্বাপর-যুগে শ্রীকৃষ্ণের সহাধ্যায়ী সুদামা বিপ্র ছিলেন। সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াও ইঁহার গৃহপতি হইবার বাসনা নাই। ইনি ব্রহ্মচারিরূপে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ভৈক্ষ্য দ্রব্য শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করেন। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী; গৃহস্থের ও বানপ্রস্থের যে প্রাকৃত শাব্দিক অহঙ্কার, তাহা হইতে শ্রীশুক্লাম্বর সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত। তিনি পারমহংস্য-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া অকিঞ্চন তুর্য্যাশ্রমের বর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং তিনিই বস্তুতঃ-পক্ষে পূর্ণ শরণাগত ত্রিদণ্ডিভিক্ষু; কায়মনোবাক্যে ভগবৎ-সেবা ছাড়া তাঁহার অন্য কৃত্য নাই। তাই শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার নৈবেদ্য সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। শ্রীশুক্লাম্বরের ভগবানে সমর্পণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে ভোগপর অভিনিবেশ নাই। সুতরাং শ্রীভগবান্ বল প্রকাশ করিয়াই তাঁহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করেন। ভগবান্ গৌরসুন্দর কৌতুক-ভরে বলিলেন—"আমি তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছি বলিয়া তুমি দরিদ্র।" এই কথা বলিয়াই তিনি শুক্লাম্বরের ঝুলি হইতে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া চিবাইতে লাগিলেন।

ভক্ত ভগবান্‌কে কখনও নিকৃষ্ট দ্রব্য দান করিতে পারেন না। তাই শুক্লাম্বর মহাপ্রভুকে ভিক্ষার নিকৃষ্ট কণাযুক্ত চাউল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। মহাপ্রভু তদ্দৃষ্টে শুক্লাম্বরকে বলিলেন,—

* * তোর খুদ কণা মুই খাঙ।
অভক্তের অমৃত উলটি নাহি চাঙ॥

এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু আরও উল্লাসের সহিত ভক্তের দ্রব্য চিবাইতে লাগিলেন। শুক্লাম্বরের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা দর্শনে ভক্তগণ আনন্দিত চিত্তে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। আর মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,—

* * শুন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
তোমার হৃদয়ে আমি সর্বদা বিহরি॥
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
তুমি ভিক্ষায় চলিলে আমার পর্য্যটন॥
প্রেমভক্তি বিলাইতে মোর অবতার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-সেবক আমার॥
তোমারে দিলাম আমি প্রেমভক্তি দান।
নিশ্চয় জানিহ প্রেমভক্তি মোর প্রাণ॥

শ্রীশুক্লাম্বরের আদর্শ

বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীভগবান্‌কে কোনও দ্রব্য নিবেদন করিতে হইলে মুদ্রার সহিত নিবেদন করিতে হয়। "অস্ত্রায় ফট্"—এই মন্ত্রদ্বারা জপ্তজলযোগে নৈবেদ্য প্রোক্ষণ-পূর্বক চক্রমুদ্রা ভ্রমণ দ্বারা রক্ষণ করিতে হয়। তৎপর বায়ুবীজ 'যং' দশধা জলে জপ করত সেই জল নৈবেদ্যে সেচন করিতে হইবে। উহাদ্বারা নৈবেদ্য-দ্রব্যের শুষ্কত্ব-দোষের বিশুদ্ধি করিয়া দক্ষিণকরে বহ্নিবীজ 'রং' ভাবনা করিবে এবং দক্ষিণ হস্ততলের পৃষ্ঠভাগে বামকর সংলগ্ন করত প্রদর্শন করিবে। তদুক্ত বহ্নি-দ্বারা নৈবেদ্য-দ্রব্যের শুষ্কত্ব-দোষ মনে মনে দহন করিতে হইবে। তৎপর বামকরে অমৃতবীজ 'ঠং' চিন্তা করিবে। অনন্তর দক্ষিণ-হস্তের তলদেশ বামকরের পৃষ্ঠভাগে লগ্ন করিয়া দেখাইবে এবং উক্ত মুদ্রা হইতে জাত সুধাধারা দ্বারা সেই নৈবেদ্য দ্রব্য সেচন করিবে। পরে মূলমন্ত্র-যোগে অভিমন্ত্রিত জল দ্বারা ঐ নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করত তৎসমস্ত সুধাময় চিন্তা করিবে। তদনন্তর উহা দক্ষিণ-কর দ্বারা স্পর্শপূর্বক অষ্টধা মূলমন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে ধেনুমুদ্রাযোগে উক্ত নৈবেদ্যকে পরিপূর্ণ জ্ঞান করত গন্ধ জলাদিদ্বারা উহার এবং শ্রীহরির অর্চ্চন করিবে। অনন্তর কুসুমাঞ্জলি লইয়া শ্রীহরিকে এই বলিয়া অর্চ্চন করিবে, "হে ভগবন্, নৈবেদ্য গ্রহণার্থ তদীয় শ্রীবদনপদ্ম হইতে তেজঃ বহির্গত হউক।" এই প্রকারে পূজা করিয়া যেন প্রভুর বদন হইতে তেজঃ বিনির্গত হইয়া নৈবেদ্যে মিলিত হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবে। তৎপর বামকরে নৈবেদ্য পাত্র স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ করে গন্ধ-পুষ্পসহ্ জল লইবে এবং স্বহস্তে মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া "শ্রীকৃষ্ণায় ইদং নৈবেদ্যং কল্পয়ামি" বলিয়া গন্ধপুষ্পাদিসহ দক্ষিণকরস্থ তজ্জল ভূতলে পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে তুলসীদলসহ নৈবেদ্য-প্রদানের মন্ত্রদ্বারা প্রভুকে নিবেদন করিয়া দিবে। নিবেদনের মন্ত্র —"নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে॥" পরে "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" মন্ত্র পাঠ করত বাম-কর-দ্বারা যথা-বিধানে প্রভুকে বারিগণ্ডুষ প্রদান করিবে এবং বিকসিত-কমল-সদৃশ গ্রাস মুদ্রা দেখাইবে। ফলতঃ, প্রথমে প্রণববিশিষ্ট এবং শেষে চতুর্থী বিভক্তি ও স্বাহাযুক্ত প্রাণাদি মন্ত্রদ্বারা দক্ষিণ-করে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা-প্রদর্শন কর্ত্তব্য। তৎপরে করদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠযুগলদ্বারা স্ব-স্ব অনামীকাদিযুগল স্পর্শ করত নৈবেদ্য দ্রব্যের মন্ত্র জপপূর্বক নৈবেদ্য-মুদ্রা দেখাইবে। নৈবেদ্যমুদ্রার মন্ত্র "ঠোঁ নমঃ পরায় অবাত্মনেঽনিরুদ্ধায় নিবেদ্যং কল্পয়ামি।"

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন, ভগবদ্ভক্তিপরায়ণগণ নিজ অভীষ্ট-মন্ত্র নিবেদ্য-পদার্থের মন্ত্ররূপে জপ করেন এবং গ্রাসমুদ্রা দেখাইয়া থাকেন। শ্রীহরিমুখপদ্ম হইতে যে তেজঃ বিনিষ্ক্রান্ত হয়, তাঁহারা তদ্রূপ চিন্তা করেন না; ফল-কথা, শিক্ষাচারানুসারে প্রফুল্ল মনে শ্রীহরিকে ভোজন করাইয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ বেদাদি-শাস্ত্রে বলিয়াছেন, নৈবেদ্য পূর্বোক্ত মুদ্রাদি-যোগে প্রদত্ত হইলে গ্রহণ করেন, নতুবা গ্রহণ করেন না। আমরা গতকল্য শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর উদাহরণে দেখিতে পাইয়াছি, শ্রীশুক্লাম্বর পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাদি কিছুই প্রদর্শন করেন নাই, তাঁহার চাউল শুধু আতপও

নহে, ভিক্ষালব্ধ বলিয়া আতপোক্ষ-মিশ্র, শুক্লাম্বর কোনও-প্রকার তাহা নিবেদন করেন নাই, অথচ শ্রীভগবান্ তাঁহার খুদকণা কাড়িয়া খাইলেন। ইহার কারণ কি? তাঁহার বেদের প্রতিজ্ঞা রহিল কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে গৌরলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুর বলিতেছেন—

"সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে।"

শ্রীভগবান 'অজ' হইয়াও ভক্তের বাৎসল্য-প্রেমের পুত্রত্ব এবং অজিত হইয়াও প্রেমিক ভক্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন, তিনি স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তপরতন্ত্র। তাই ভক্তের দুয়ারে তাঁহার প্রতিজ্ঞা চূর্ণ হয়। এই লীলায়ই তাঁহার ভগবত্তার বৈশিষ্ট্য। পরস্পর বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ তাঁহাতে আছে বলিয়াই তিনি সর্বশক্তিমান্। যে-ভক্তের প্রেমদ্বারে শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা ঐ প্রকারে চূর্ণ হইল, ভক্ত প্রার্থনা না করা সত্ত্বেও ভগবান্ স্বেচ্ছায় স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন, সেই প্রেমিক শুক্লাম্বরের চরণে অসংখ্য দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার সৌভাগ্যের কীর্ত্তন করিলে ভবভয় ত' দূর হইবেই, অধিকন্তু কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমভক্তির উদয়ও হইবে। তিনি আমাদের চিত্তে নিত্য জাগরিত থাকিয়া, তাঁহার আদর্শ সেবার অনুসরণে আমাদিগকে অনুপ্রেরণা প্রদান করুন।

শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে হরিসেবার্থ নানাস্থান হইতে মাধুকরী সংগ্রহ করিবেন। যিনি কায়মনোবাক্যে হরি-সেবা করেন, তাঁহার মাধুকর-ভৈক্ষ্য অনন্ত ঐশ্বর্য্যপতি শ্রীভগবান্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করেন। এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণই বস্তুতঃপক্ষে ত্রিদণ্ডি। ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুগণ নিজের উদরপূর্ত্তি বা ইন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশে কোন মাধুকরী সংগ্রহ করেন না; পরন্তু তদ্দ্বারা কৃষ্ণসেবাই করিয়া থাকেন। ত্যাগী বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর রূপরসাদি যাবতীয় বিষয় গ্রহণ নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নহে; পরন্তু তাঁহারা তদ্দ্বারা কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের সেবা তাৎপর্য্য ব্যতীত অন্য কোন কুযোগি-বৈভবে আবদ্ধ থাকেন না।

শ্রীচৈতন্যমঠে দীক্ষিত বা দিব্যজ্ঞানলব্ধ জনগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে বাস করিয়া শ্রীল শুক্লাম্বরের ব্রহ্মচর্য্যের অনুসরণ মাত্র করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেব মঠবাসিগণের যাবতীয় ভৈক্ষ্য দ্রব্য কাড়িয়া খান বলিয়াই তাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরহরির অপহরণ কার্য্যের সহায়তা করিতে সমর্থ। সর্বস্ব শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় নিযুক্ত করাই ভক্তিমঠবাসিগণের একান্ত কর্ত্তব্য। ঐ বৃত্তিই 'প্রেম'-শব্দবাচ্য। প্রেমার অনুসরণ করিতে হইলে মঠবাসীর পবিত্র চরিত্র দর্শন করাই সুকৃতিমন্ত জীবগণের একমাত্র বিধেয়। চারি আশ্রমে থাকিয়া, চারিবর্ণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পঞ্চম আশ্রম বা পঞ্চমবর্ণের অনুপযোগিতা-দর্শনে অকৃতকার্য্য হইয়া যে সমদর্শন, তাহা ভক্তিমঠবাসিগণের চিন্ময় চরিত্রে প্রতিভাত হয়। সুতরাং ভক্তিমঠবাসী পরম-সুচতুর রসজ্ঞ মহাভাগবত-সকলই এই সকল কথা বুঝিতে পারিয়া জগতের সকল কার্য্য পরিত্যাগ পূর্বক প্রতি গৃহে নাম-প্রেম-প্রচার-কার্য্য-দ্বারা ভাগ্যবন্ত গৃহস্থগণের সেবা করিতে সর্বদা উদ্গ্রীব।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশুক্লাম্বরের নিকট হইতে আতপ ও উষ্ণের বিচার-রহিত হইয়া সমগ্র নৈবেদ্য-দানবিধি অতিক্রম পূর্বক অনুরাগবশে ভৈক্ষ্য খুদকণা গ্রহণ পূর্বক যে লীলা প্রকাশ করিলেন, উহাই সকল পাঞ্চরাত্রিক বৈধ-ভক্তির অর্চ্চন পথের একমাত্র পরমফল। বৈদিক যাবতীয় বিধি-নিষেধ সকলই ভক্তির অনুকূল-চেষ্টা মাত্র। সুতরাং অনুরাগপথের ভক্তগণ "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।" এই মূলবিধি প্রতিপালন করেন বলিয়া তাঁহারা প্রতিকূলা চেষ্টা হইতে অনন্তযোজন দূরে অবস্থান করেন। তাঁহারা কোন দিনই বিধিপথের উল্লঙ্ঘনকারী নহেন। পক্ষান্তরে বিধিভক্তির সাধ্য ব্যাপারে নিরন্তর অবস্থান করিয়া অনুরাগ-পথে কৃষ্ণসেবা-রত থাকেন। যাহারা আধ্যক্ষিক বিচার অবলম্বন পূর্বক অনুরাগ-পথের সেবা বুঝিতে অসমর্থ, সেই মূঢ়-আধ্যক্ষিকগণ কৃষ্ণসেবা বৈমুখ্য-লাভের দুর্ভাগ্য বরণ করে। অনুরাগ-মার্গের প্রেমিক ভক্তগণের চেষ্টা আধ্যক্ষিক বিচারে বুঝিতে পারা যায় না বলিয়াই সর্বসাধারণকে সাবধান করিয়া শ্রীভগবান্ স্বয়ং তারস্বরে গাহিয়াছেন—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"

—যিনি অনন্যভাবে আমার (শ্রীভগবানের) ভজন করেন, তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে সুদুরাচার বলিয়া প্রতিভাত হইলেও তিনিই বস্তুতঃপক্ষে সাধু।

উপরিউক্ত শ্লোক হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, পাপজীবন বা উচ্ছৃঙ্খলতাময় অপস্বার্থপরতার দ্বারা ভক্তি সহজে লাভ করা যায়। কৃষ্ণে প্রেমগন্ধহীন ব্যক্তির পূর্বোক্ত বৃত্তিদ্বয় তাহাকে নিরয়গামী করে। বিষয়াসক্ত প্রাকৃত-সহজিয়া ইহা বুঝিতে না পারিয়া শুদ্ধভক্ত ও ভক্তির প্রতি বিদ্রোহ করিয়া নরকপথের যাত্রী হন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে পরম উচ্চ রাগানুগবিচার-ধারা বিধিভক্তির চরম ফলরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে অনুরাগ-পথের মহিমা ও মধুরিমা অর্চ্চন-মার্গের সকল ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। যাঁহারা আধ্যক্ষিক বিচারে আপনাদিগকে অত্যুন্নত মনে করিয়া বৈষ্ণবে প্রাকৃত-বুদ্ধি করেন তাঁহারা নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করেন মাত্র। সেই সকল বিষয়-মদান্ধ ব্যক্তি বহু পুত্র লাভ করিয়া, প্রচুর ধনবন্ত হইয়া, মর্য্যাদাসম্পন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া 'বৈষ্ণবই যে একমাত্র গুরু' তাহা বুঝিতে পারেন না। শৌক্র-বিচার-পদ্ধতিতে যে কৃত্রিম অর্চ্চন ও দীক্ষা-প্রদান প্রভৃতি বংশোচিত ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত আছে উহা মদান্ধতা মাত্র। তজ্জন্যই জাতি-গোস্বামিবাদের বিচারসমূহ বৈষ্ণব-নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হয়। পণ্ডিতকুল প্রচুর পরিমাণে স্বাধ্যায়-নিরত হইয়া বৈষ্ণবকে অনভিজ্ঞ মূর্খ, দরিদ্র ও উপহাসের পাত্র মনে করে; কিন্তু তাদৃশ দাম্ভিকের পূজা শ্রীকৃষ্ণ কখনই স্বীকার করেন না। দরিদ্র বৈষ্ণবের সর্বস্ব সমর্পণ প্রাপঞ্চিক ইতর-বস্তু-সমূহে লোভহীনতার পরিচায়ক। সুতরাং ঐকান্তিক বৈষ্ণবতা না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণের তুষ্টি হইতে পারে না। শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদের নিকট শ্রীভগবানের লীলাবতার-সমূহের কর্ম, প্রয়োজন ও বিভূতি বর্ণনপূর্বক ভক্তমাহাত্ম্য-বর্ণনমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলিকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥

সর্বপ্রকারে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে অনন্তস্বরূপ ভগবান্ যাঁহাদের প্রতি অকপট দয়া করেন, তাঁহারাই ভগবানের দুষ্পারা দৈবী মায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য এই প্রাকৃত শরীরে যাহাদের 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি আছে, ভগবান্ তাহাদিগকে দয়া করেন না।

শ্রীভগবান্ স্বমুখে বলিয়াছেন—"যস্যাহং অনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" অর্থাৎ শ্রীভগবান্ যাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করেন তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের ধন হরণ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধরকেও এই কথা বলিয়াছেন। সুতরাং ভক্ত দরিদ্র হইলে তাহা তাঁহার প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফল নহে—তাহা শ্রীভগবানের অনুগ্রহ। সেই অনুগ্রহ লাভ করিয়া ভক্ত পরানন্দে নিমগ্ন থাকেন। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ তাহা পরানন্দসুখ॥"

স্বপ্নকালীন প্রতীতির ন্যায় প্রাকৃতবস্তু-লাভ-প্রতীতি অকিঞ্চিৎকর—এই বিচারটি বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক থাকে। সুতরাং প্রাকৃত-সাহজিকের ন্যায় ভোগিকুল হইতে তাঁহারা সর্বদা দূরে থাকেন। কিন্তু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায় রামানন্দ প্রমুখ ভক্তাধিরাজগণের সম্পত্তি-দর্শনে যে বিষয়-চেষ্টার প্রাপঞ্চিকতা আধ্যক্ষিকের নয়ন-পথে পতিত হয়, উহা তাহাদের বিড়ম্বনা বৃদ্ধির জন্য। কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয় নাই—এরূপ প্রতীতি বিষ্ণুভক্তের একমাত্র লোভনীয় বস্তু। এই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণের রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলাদিতে যাঁহাদের উৎসাহ বর্ত্তমান, তাঁহারাই প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রাক্তন শত শত জন্মে বাসুদেবের অর্চ্চন-

পূর্ব্বক নিজ মঙ্গল লাভ করিয়া ও নামাশ্রিত হইয়া অনুরাগ পথে স্বীয় আদর্শ ভজন-প্রণালী প্রদর্শন করিবার সুযোগ লাভ করেন।

উপরে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই দেখা গেল, জগতে যাঁহার কোন বস্তুতে আসক্তি নাই, কৃষ্ণ এরূপ অকিঞ্চনেরই প্রাণ-সদৃশ। এই কথা সকল-বেদ-শাস্ত্র ও বেদানুগ শাস্ত্র গান করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই বৈদিক নিগূঢ় সত্যের একমাত্র আচার্য্য ও প্রচারক। তিনি তাঁহার অনুগত দাসগণের দ্বারা আধ্যক্ষিকের অকিঞ্চিৎকরতা ও তাঁহার সেবকগণের বেদার্থ-সংগ্রহ-কার্য্যে সুনিপুণতা প্রকাশ করেন। যাঁহারা শুক্লাম্বর-গৌরসুন্দরের লীলা-কথা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের চিন্ময়-কর্ণবেধ-সংস্কার লাভ ঘটে এবং তাঁহারা চৈতন্যদেবের চরণে প্রেম সেবা করিতে যাইয়া ভক্তিমঠের ভিক্ষুরূপে 'গৌড়ীয়' নামে পরিচিত হন। কিন্তু তাঁহারা আপনাকে গৌড়ীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া চৈতন্যচরণ সেবা হইতে বহু দূরে অবস্থান পূর্ব্বক গোবিন্দ-সেবা-বিমুখ হইয়া আত্মপাতের চেষ্টা করিতে যান না।

শ্রীকপিলের উপদেশ

বালিয়াটি গদাই-গৌরাঙ্গমঠে শ্রীঊর্জ্জাব্রতের ১০ম দিবস হইতে ১২ দিবস পর্য্যন্ত দিবসত্রয় যে-সকল শিক্ষণীয় বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে কহিলেন,—ঈশ্বরই জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কর্ম্মবশে জীব পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া কামিনীর গর্ভে প্রবেশ করে।

তথায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া সপ্তম মাসে সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন হয়; তখন তাহার জ্ঞানের উদয় হয়, সে গর্ভমধ্যে বিবিধ দুঃখ অনুভব করে, এই সময় তাহার পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণ হয় এবং তাহাতে সে অনুতপ্ত হইয়া জগন্নাথ শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে থাকে।

তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলে,—প্রভো, আর আমি তোমার সেবা ছাড়িয়া বিষয়-সেবা করিব না; আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর; আর যেন আমার এইরূপ গর্ভবাস না হয়।

তাহার পর সে দশম-মাসের দশদিনে ভূমিষ্ঠ হইয়া সকল স্মৃতি হারাইয়া ফেলে—তাহার সে প্রতিজ্ঞা আর মনে থাকে না। ক্রমে যে অজ্ঞান-অবস্থায় নানাবিধ ক্লেশ, পৌগণ্ড অবস্থায় অধ্যয়নাদির ক্লেশ সহ্য করিয়া, যৌবনে দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া কুটুম্ব-ভরণার্থ ধনোপার্জ্জনে বিপুল-কামী হইয়া পড়ে।

জীব সৎপথে থাকিয়াও যদি উদর ও উপস্থবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া অসাধু ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গ করে এবং তাহাদের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে পূর্ব্বেরই ন্যায় নরকে প্রবেশ করিতে হয়।

সত্য, বাহ্যাভ্যন্তরের পবিত্রতা, দয়া, মৌন, পরম-পুরুষার্থ-বিষয়ামতি, লজ্জা, হরিসেবাময়ী শোভা, কীর্ত্তি, ক্ষমাগুণ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, চিত্তের প্রশান্ত ভাব, উন্নতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল অসদ্ ব্যক্তির সংসর্গে একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়। ঐসকল অশান্ত, দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত, মূঢ় ও অতীব শোচ্য অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ কখনও করা কর্ত্তব্য নহে।

স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির সংসর্গে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয় অন্য কোন বস্তুর সংসর্গ দ্বারা সেইরূপ হয় না।

স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত নিজের দুহিতাকে দর্শন করিয়া তাঁহার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন কি ব্রহ্মা মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক ভয়ে মৃগরূপধারিণী নিজ

কন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নির্লজ্জের ন্যায় ধাবমান হইয়াছিলেন।

অতএব কামিনীরূপ-দর্শনে ব্রহ্মার পর্য্যন্ত যখন মোহ উপস্থিত হইয়াছিল তখন তৎ-সৃষ্ট মরীচ্যাদি, মরীচ্যাদি-সৃষ্ট কশ্যপাদি, কশ্যপাদি-সৃষ্ট দেব-মনুষ্যাদি কিরূপে স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গিগণের সংসর্গে অবিচলিত থাকিতে পারিবেন ? এক নারায়ণ-ঋষি-ভিন্ন এমন কোন্ পুরুষ আছেন যিনি প্রমদা-রূপিণী মায়ায় বিমুগ্ধ না হইয়া স্থির থাকিতে পারেন ?

মাতঃ, আমার (ভগবানের) স্ত্রীরূপিণী মায়ার প্রভাব দেখুন, এই প্রমদা-রূপিণী মায়া একটিমাত্র ভ্রূভঙ্গে দিগ্বিজয়ী বীরগণকে পর্য্যন্ত পদানত করিয়া থাকে।

যিনি যোগের পরপারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখনই কামিনীর সঙ্গ করিবেন না। কারণ যোগিগণ বলেন যে, কামিনীকুল মুমুক্ষু-ব্যক্তিগণের পক্ষে নরকের দ্বার-স্বরূপ।

দেবনির্ম্মিতা যোষিৎরূপিণী মায়া শুশ্রূষাদি ছলে ধীরে ধীরে পুরুষের নিকট গমন করে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ পুরুষ তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় তাহাকে স্বীয় মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া অবলোকন করিবেন।

জীব স্ত্রীসঙ্গ-নিবন্ধন অন্তিমকালে স্ত্রীধ্যান দ্বারা স্ত্রীত্বই প্রাপ্ত হইয়া পুরুষের ন্যায় আচরণকারী আমার (ভগবানের) স্ত্রীরূপা মায়াকে মোহবশতঃ বিত্ত, পুত্র ও গৃহাদির প্রদাতা পতিরূপে মনে করিয়া থাকে।

ব্যাধের সঙ্গীত মৃগের পক্ষে যেরূপ মৃত্যুর কারণ, তদ্রূপ পতি, পুত্র ও গৃহ-স্বরূপ মায়া আপাততঃ অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত জীব যদি বুদ্ধিমান্ হন তবে উহাদিগকে দৈব-প্রেরিত মৃত্যু-স্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় করিবেন।

প্রকৃত নেতা কে ?

মনুষ্য-জাতি সমাজবদ্ধ হইয়া সুশৃঙ্খলাবস্থায় শান্তিতে অবস্থান করিতে চায়। সেইজন্য মনুষ্যজাতি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া একজন নেতার আনুগত্য স্বীকার করে। এইটিই হইল চিরকালের চিরন্তন ব্যবহার।

এই নেতা-নির্বাচনে বিভিন্ন রুচির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যাইয়া মনুষ্য-সমাজের বিস্তীর্ণতার লাঘব ঘটে। তদ্দ্বারা শান্তিপ্রিয়তার বিনিময়ে অনেক সময় অশান্তির করাল-কবলে গ্রস্ত হইতে হয় এবং সেই অশান্তিই শান্তি বা ভগবানের আশীর্বাদ অথবা অভিশাপ-জ্ঞানে মানব-সমাজ বরণ করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে সংসার দুঃখের আগার বা নরকের জ্বলন্ত কুণ্ড স্বরূপে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। মায়াবদ্ধ মানব যখন নিজের চেষ্টায় নিজের মঙ্গলের দিকে প্রধাবিত হয়, তখন তাহাকে ঐপ্রকার দুর্দ্দশায় পড়িতেই হইবে।

মনুষ্যজাতির সর্বপ্রধান ব্যবহারিক নেতা দেশ-পালক, প্রজারঞ্জক ও রাজা। রাজার নিয়ামকত্বে সকল প্রাণী সুনীতির অশ্বত্থ-বিটপি-ছায়ায় শান্তিসুখ অনুভব করে। ব্যবহারিক জগতে ইনিই সর্বপ্রধান অধিনায়ক।

এই রাজাকেও কোন সুযোগ্য ব্যক্তিকে নায়কত্বে বরণ করিতে হয়; তিনিই ধর্ম-গুরু। সেই ধর্ম-গুরু সমগ্র জগতের নেতা বা জগদ্গুরু। জগদ্গুরুর গুরুত্ব জগদপেক্ষা অধিক হওয়া চাই। এক পাল্লার ওজনে, মায়িক চতুর্দ্দশ ভুবনাপেক্ষা গুরুর গুরুত্ব যদি অনেক গুণে অধিক প্রমাণ হয়, তবেই তিনি গুরু। এই গুরুবস্তুটি বিশ্বম্ভরের অভিন্ন কলেবর ভিন্ন অসম্ভব, ইহাও নিঃসংশয়িত প্রমাণ।

আমরা কয়জনে এই বাস্তব নীতির অনুসরণ করি ? আমরা চাই ধর্ম-গুরু-বাদ দিয়া কর্মবীর সাজিতে। তাহাও যদি সর্বেন্দ্রিয়ের অনুশীলন হইত তবুও কতকটা; কিন্তু একমাত্র বাগেন্দ্রিয়ের বাক্‌পটুতায়ই যাবতীয় কর্ম পর্য্যবসিত দেখা যায়। ইহা অদৈব সমাজের ধর্মবিপ্লব-চেষ্টা মাত্র।

বাস্তবপক্ষে যিনি আচার্য্য বা ধর্ম্ম-গুরু তিনিই জগতের নেতা ; শুধু ইহজগতের নহেন, পারমার্থিক জগতেরও একমাত্র জগদ্গুরু। তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা যে-কাল-পর্য্যন্ত দেহ-মনের বহির্ম্মুখিণী প্রজ্ঞা লইয়া অখণ্ড জগৎকে খণ্ড করিয়া সংকীর্ণ বিচারে স্বদেশ-বিদেশ কল্পনা করিব, স্বজাতি-বিজাতি স্বধর্ম্মী-বিধর্ম্মী প্রভৃতি প্রাকৃত দর্শনে আবদ্ধ থাকিব, অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত-তত্ত্বে বিভেদ না জানিয়া সর্বধর্মসমন্বয় ও সার্বজনীন বিচার প্রচার করিতে যাইব, সেই পর্য্যন্ত আমরা পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইয়া অস্থির-সিদ্ধান্তের সু-উচ্চ চূড়া হইতে ভৃগুপাত করিতে থাকিব। খণ্ড-বিচারে কখনও সার্বজনীন ভাব থাকিতে পারে না ; উহাতে পরিপূর্ণতার অভাব। তবে কি—অখণ্ড জগতের কোন খণ্ডে বসিয়া, খণ্ডদলের নেতা হইয়া, সার্বভৌমিক, সার্ব্বজনীন, সর্বধর্মসমন্বয় প্রভৃতি পূর্ণ দর্শন সুদার্শনিকের বাণী আওড়াইলে জগদ্গুরু বা নেতা হওয়া যায় ? তাহা কখনই নহে।

একমাত্র আত্মারামগণই আত্মারামেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণ আকৃষ্ট থাকিয়া খণ্ড জগদ্দর্শন হইতে মুক্ত। সেই আত্মারামগণ সকলেই এক পরমাত্মার আশ্রিত বলিয়া তাঁহারা দেহমনের বিচার হইতে ছুটি প্রাপ্ত হওয়ায় বিভিন্ন রুচি হইতে মুক্ত। সুতরাং আত্মারামগণই সকলের নেতা হইতে পারেন। আত্মারামগণের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষ নাই। দেহারামীর তাহা পূর্ণভাবে আছে ; কারণ তাহারা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে না পারিয়া যখন যাহা মনে উদয় হয়, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান জগতে এরূপ উদাহরণের নেতার আদর্শ বিরল নহে।

যাঁহারা জানেন—মনুষ্য জন্ম দুর্লভ, মনুষ্য জন্ম ব্যতীত এ ভব-সমুদ্র উদ্ধারের অন্য জন্ম নাই, অথচ এই মনুষ্য জন্ম ক্ষণস্থায়ী, কখন জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হইয়া যাইবে তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, তৎপর আবার কোন্ দেশে কোন্ জন্মলাভ করিতে হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই, তাঁহারাই শাস্ত্রে 'সুমেধা' আখ্যায় স্থান লাভ করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা ইহজন্মেই একমাত্র ঐহিক ও পারমার্থিক নেতা জগদ্গুরুর শ্রীচরণান্তিকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর যাহারা, ইহজগতে ঐহিকগুরু, জাগতিক নেতার আনুগত্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া, যিনি ইহজগতেই পরমার্থদাতা-রূপে অবতীর্ণ, সেই পারমার্থিক গুরুর কোন বাণী শ্রবণ করে না, তাহারা কুমেধা নামে পরিচিত। তাহাদের আনুগত্যে শাশ্বত-শান্তি কখনও লব্ধ হইতে পারে না।

——::*::——

বৈষ্ণব—'নিষ্কাম'

আমরা মহাজন-বিরচিত গ্রন্থে দেখিতে পাই—

"কৃষ্ণভক্ত-নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥"

যিনি অহংগ্রহোপাসনামদে মত্ত নহেন, যিনি স্বীয় কর্ম্মফল-লাভের জন্য ব্যস্ত নহেন এবং যিনি ভগবৎ-সেবা ভিন্ন অপর বস্তু লাভের জন্য উদ্গ্রীব নহেন, তাঁহার জ্ঞান সম্পত্তি, কর্ম্ম, সমৃদ্ধি ও লৌকিক সুখলাভে চিত্ত ব্যগ্র নহে। এই জড় জগতে থাকিয়া জীব অনেক সময়ে আত্ম-হারা হইয়া নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানী, স্বর্গসুখাদিতে ভোগী এবং ঐহিক ইন্দ্রিয়পর হইয়া আপনাকে ধনী মনে করেন। জগতের কোন না কোন বস্তুকে নিজের আয়ত্ত করিতে প্রয়াসী হইয়া তৎফল-লাভের উদ্দেশে কখনও বা ভোগীর বেষে, ভোগীর ভোগময় তাৎপর্য্যে এবং যথেচ্ছাচারের প্রবল তাড়নায়—"আমার ছিল, আমার চাই বা আমার আছে" বলিয়া "কিছু"র অন্বেষণে প্রধাবিত হয় ; যে কাল-পর্য্যন্ত জীব "কিছু"র পশ্চাদ্ধাবিত হইবার দাবী রাখেন,

তখন পর্য্যন্ত "কিছু" তাঁহাকে ওতঃপ্রোতভাবে আকড়িয়া থাকে, জাগতিক নশ্বর "কিছু" সংগৃহীত হইলেই জগতের সকল লোক তাঁহার পিছু পিছু ছুটিতে থাকে। যাহার জাগতিক এই "কিছু"র বালাই নাই, তিনিই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব, তাঁহার "কিছু" অন্বেষণ করিতে হয় না। "কিছু" ছিল বা আছে বা থাকিবে বলিয়া তাঁহার দৌড়াতেও হয় না। "জীব" আশ্রয় জাতীয় বস্তু হইয়াও তাহা ভুলিয়া গিয়া নিজেকে বিষয়জাতীয় অভিমান করে ও ছোটখাট ভগবান্ সাজিতে চাহে। জীব যে নিত্য আশ্রয়জাতীয় বস্তু, এবং বিষ্ণু যে নিত্য বিষয়জাতীয় বস্তু তাহা ভুলিয়া যাওয়ার নামই স্বরূপ-বিভ্রম এবং এই স্বরূপ-বিভ্রমই জীবের ত্রিতাপ ভোগ করিবার একমাত্র কারণ। আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয়—সংসারাদি দুঃখ॥
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥"

এই মায়ার আলিঙ্গনই জীবকে ভোক্তা সাজায়। যে-কাল পর্য্যন্ত জীবের অকিঞ্চনতার উপলব্ধি না হয়, তৎ-কালাবধি তিনি সকিঞ্চন অর্থাৎ জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী থাকেন; একমাত্র ভগবানের শুদ্ধভক্ত হইতে পারিলেই নিষ্কাম হওয়া যায়।

"ভোক্তা কে"

ভোক্তা কে? ইহা আমার ন্যায় মায়া-প্রপীড়িত বদ্ধজীবের বোধগম্য হয় না। তাই জীব নিজেকে নিজে ভোক্তাভিমান করতঃ প্রকৃত ভোক্তার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না।

পতিত জীবের এই প্রকার দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া করুণার অবতার শ্রীভগবান্ আশ্রয়জাতীয়-রূপে আচার্য্যের বেশ ধারণ করত এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন এবং শাস্ত্রযুক্তিমূলে বুঝাইয়া দেন যে প্রকৃত ভোক্তা কে?

তিনি বলেন,—শ্রীভগবানের ত্রিবিধা শক্তি যথা—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি; তন্মধ্যে তটস্থা-শক্তি হচ্ছে জীব। জীবেতে একটা স্বতন্ত্রতা দেওয়া আছে। সে তদ্দ্বারা ভাল এবং মন্দ উভয় কার্য্য করিতে পারে, জীব অণুচৈতন্য; শ্রীভগবান্ বিভুচৈতন্য। জীব অণুচৈতন্য বলিয়া মায়াবশযোগ্য আর মায়া কৃষ্ণের বহিরঙ্গা-শক্তি বা অপরা শক্তি, কৃষ্ণবিমুখ জীবকে নিয়ন্ত্রিত করাই মায়ার কার্য্য। শাস্ত্র বলেন—

"অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে"

জীব অহঙ্কার-মদে মত্ত হইয়া নিজেকে কর্ত্তা বা ভোক্তা মনে করিয়া এবং নিত্যারাধ্য শ্রীভগবানের সেবা পরিত্যাগ করতঃ মায়ার চাক্-চিক্যময় মনোহর রমণীয় সাজান বাগানে প্রবেশ করে এবং আপাততঃ মধুর বলিয়া সেই বস্তু সমুদয়কে আয়ত্তাধীনে আনিয়া ভোগ করিবার জন্য প্রধাবিত হয়, কিন্তু তাহার শেষ পরিণাম কি তাহা একবারের জন্যও চিন্তা করে না, তখন সে মনে করে ইহাপেক্ষা সুখ আর কি আছে? জীবের এই প্রকার ভোগ করিবার একান্ত চেষ্টা দেখিয়া, মায়াদেবী নানাপ্রকার বেশ ধারণপূর্ব্বক তাহার নিকটে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে থাকে, তখন জীব উন্মাদের ন্যায় হইয়া পিশাচী মায়ার পশ্চাদ্ পশ্চাদ্ ধাবিত হয়, কিন্তু হায়, হরিণ যে-প্রকার মরীচিকাতে জল-ভ্রম করিয়া তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ছুটাছুটি করিতে থাকে, কিন্তু জল পাওয়া দূরে থাকুক জন্মান্তর লাভ করে। সেই প্রকার জীবও মায়াকে ভোগ করিতে যায় কিন্তু পারে না, অবশেষে জন্মান্তর লাভ করে।

তাই শাস্ত্র বলেন,—

"পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥"

ভূতে পেলে জীবের যে প্রকার অবস্থা হয়, মায়া-পিশাচীগ্রস্ত জীবও 'আমি ভোক্তা আমি কর্ত্তা' এই প্রকার উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ বকিতে থাকে কিন্তু সে যে ভোক্তা নয় এটি কিছুতেই বুঝিতে পারে না।

তাই শ্রুতি বলেন,—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ
জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ
কস্য সিদ্ধনং॥"

এই পরিদৃশ্যমান জগতে যা কিছু আমরা লক্ষ্য করি সমস্তই শ্রীভগবানের। অখিলরসামৃত-সিন্ধু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপই হচ্ছেন শ্রীভগবান্, তিনি অসমোর্দ্ধ, তাঁর উপরেও কেউ নাই, তাঁর সমানও কেউ নাই, তিনি নিত্যকাল ছিলেন। এইজন্য তিনি পূর্ণ নিত্যবস্তু। তাঁহাতে কোন হেয়তা ও অবরতা নাই। অতএব শ্রীভগবানের বস্তু ভোগ করতে যাওয়া জীবের পক্ষে ভীষণ অপরাধজনক। যাবতীয় ভোগের উপকরণ শ্রীভগবানেরই ভোগ্য। তিনিই একমাত্র মালিক ও ভোক্তা। তিনি কৃপাপূর্ব্বক জীবকে তাঁহার ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী-পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার বস্তু-দ্বারা তাঁহার সেবা করা আমাদের কর্ত্তব্য। যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা। কিন্তু জীব কৃষ্ণের ইন্ধন না যোগাইয়া 'ভোক্তা আর কে? আমিই ভোক্তা' এই প্রকার ভোক্তা-অভিমানে মত্ত হইয়া যথেচ্ছাচারকে অবলম্বন করে।

কনক-কামিনীতে আসক্তচিত্ত জীব তখন হিতাহিত-রহিত হইয়া ভোগানলে দগ্ধীভূত হইবার জন্য ব্যস্ত হয় অর্থাৎ ভোগমূলা-বৃত্তি ক্রমশঃ এত প্রবল হয় যে, নাস্তিক্য-বাদকে অবলম্বনপূর্ব্বক স্বয়ং ভগবানের আসন গ্রহণ করিয়া ভগবানের ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ শ্রী বা লক্ষ্মীকে ভোগ করিবার জন্য রাবণের ন্যায় বাসনা পোষণ করিতে থাকে। সেইজন্য শীঘ্র অধোগতি লাভ করে।

'এক কৃষ্ণ সেব্য জগৎ ঈশ্বর।
আর যত সব তার সেবকানুচর॥'

অতএব তিনিই একমাত্র সেব্য বা একমাত্র ভোক্তা; জীবসমূহ তাঁর দাস। দাসের কর্ত্তব্য—প্রভুর সেবা করা, যে-প্রকার বাগানের মালীর কর্ত্তব্য—বাগানের যা কিছু উত্তম উত্তম ফল ফুল আছে, তাহা মালিকের ভোগে লাগান কারণ বাগানের একমাত্র মালিক তিনি।

সেই প্রকার ইহজগতের যত প্রকার উত্তম বস্তু আছে সব ভগবানেরই ভোগ্য। তিনি কৃপাপূর্বক যা দেবেন জীবন রক্ষার জন্য জীব তাহা প্রসাদ-স্বরূপ গ্রহণ করিবে, ইহাপেক্ষা অতিরিক্ত বস্তু-গ্রহণের অধিকার তাহার নাই। জীব ভোক্তা নয়, কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ আর সব প্রকৃতি। অতএব ইহজগতে যত প্রকার বস্তু আছে সবই তাঁহার "ভোগ্য" মূলপুরুষ রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র "ভোক্তা"।

———

লজ্জা

হ্রীবিকর্ম্মণি লজ্জা। সংসারে দৈব ও আসুরভেদে দুই প্রকার লোকের অবস্থান। দৈবসম্পৎ-লব্ধ ব্যক্তিগণই ভববন্ধন মুক্ত হইবার যোগ্য। লজ্জা তাহাদের একটি গুণ। লজ্জা আছে বলিয়া লোকে অপকর্ম্ম হইতে বিরত থাকে। লোকে লজ্জা দিবে, তিরস্কার করিবে বলিয়া পরদ্রব্য-অপহরণ, পরদার-গমন, হিংসা প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে না। যাহাদের লজ্জা নাই, তাহারা সমাজে বহুবিধ অসৎকার্য্য করিতে দ্বিধাবোধ করে না। অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গী নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে সমাজে বসবাস করে এবং কেহ কিছু বলিলেই তৎকর্ম্মের কর্ম্মিগণকে লইয়া দলপুষ্টি করে। বহু সংখ্যক লোকে সাধুজন-বিগর্হিত কার্য্য করে বলিয়া সেই সব কার্য্য করাকে দোষ বিবেচনা করে না।

ধুমপান, আসব পান, অমেধ্য-আহার, বারবনিতাসঙ্গ প্রভৃতি কার্য্য বহু লোকে করে—এটা যেন সমাজ চলতি, এতে আর দোষ কি ?

এই লজ্জাই আবার কোন কোন সময় ধর্ম্মপথের অন্তরায় হয়। অনেক লোক বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে বিড়ি, সিগারেট, তাড়ি খেতে পারে কিন্তু গুরুজন, বৈষ্ণব বা সাধুগণকে প্রণাম করিতে তাহাদের যত লজ্জা! তাহারা দেবালয়ে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া মস্তক নত করিতে পারে না; তুলসী-প্রণাম, সন্ধ্যা, আহ্নিক, তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যে লজ্জাবোধ করে। অসৎসঙ্গের ফলে এইসকল উৎপাত উপস্থিত হয়। পাছে তাহার সঙ্গীরা ঠাট্টা করিয়া বলে—তুমি যে বড়ই ভক্ত হ'য়ে গেলে, পিতা-মাতা, স্ত্রীপুত্রাদিকে কাঁদাইয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইবে নাকি ?

গলদেশে তুলসীর মালা ধারণ করিতে পারে না, ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিতে সাহস হয় না; এইরূপ সাজ সজ্জ করা যেন অসভ্যতা! যদি কেহ সাধুবাক্যে সাহস করিয়া মালা পরে, শিখা রাখে, তাহা হইলে অনেকের বন্ধুগণ মালা ছিঁড়িয়া, শিখা কাটিয়া দেয়, কাহারও স্মার্ত্ত অভিভাবক অতিশয় রুষ্ট হইয়া ভর্ৎসনা করিতে করিতে মালা ছিঁড়িয়া দিয়া অমেধ্য আহার করাইতে জবরদস্তি করে, ইহাও দেখিয়াছি।

ভজনোন্মুখ কনিষ্ঠ অধিকারীর সতের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভজনপথে যাওয়ার সময় লোক-লজ্জার ভয় তাহার পক্ষে যে কত অনিষ্টকর, তাহা সেই পথের পথিক ভিন্ন অন্যে বুঝিতে অক্ষম। গৃহে মৎস্যাদি অমেধ্য দ্রব্য আহার পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহারের কথা উঠিলেই যেন কি বিপদের সূত্রপাত হইল! ছেলের বুঝি বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। এখন কি এসব ছাড়বার বয়স? অনেকে উপদেষ্টা হইয়া সৎপথে যাইতে বাধা দেয়। সাধারণ ভোগী জনগণ পাছে কটাক্ষ করিয়া উপহাস করে, এই লজ্জার ভয়ে আর সে কথা উত্থাপন করিতে পারে না। লজ্জার ভয়ে ভাগবতকথা শুনতেও যেতে পারে না।

লোকলজ্জা পরমার্থ-পথের পরম শত্রু। যাহাদের হৃদয় দুর্বল, তাহাদের ভজনপথে অগ্রসর হওয়া বড়ই কষ্টকর। কলিকালে নিজের ইন্দ্রিয়বর্গ প্রতিকূল। ভজন-পথের প্রতিকূল বিষয়গুলির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইবে। হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ, ধৈর্য্য ও নিশ্চয়তার সহিত সাধুগণের উপদেশমত তত্তৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করা নিতান্ত আবশ্যক।

তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতেই হইবে। তাহারা প্রশংসা বা নিন্দা করে, সে-কথা শুনবার অপেক্ষা না করিয়া নিবৃত্ততৃষ্ণ সাধুগণের আলোচ্য বীর্য্যবতী হরিকথা সর্বদা শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে হইবে। মন্ত্রের সাধন, কিংবা শরীর পতন। ইহাতে কোন লজ্জার কথা নাই। অসৎ কে? —যোষিৎসঙ্গী কৃষ্ণের অভক্তগণ অসৎ। যাহারা মিথ্যা-পরায়ণ, যাহাদের শৌচাশৌচ জ্ঞান নাই, যাহারা দাম্ভিক, ক্রোধী, নিষ্ঠুর ও গ্রাম্যকথায় কাল কাটায় বা তাস, পাশা প্রভৃতি খেলিয়া আয়ু নষ্ট করে, অন্তরেন্দ্রিয়, বাহ্যেন্দ্রিয়-দমনে যাহাদের চেষ্টা নাই, যাহারা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী, বিষয়ী, ভোগপরায়ণ, কপটী আত্মজ্ঞানলাভে বীতস্পৃহ, ভক্তদ্বেষী, তাহারাই অসৎ। তাহাদের সঙ্গ করিলে আয়ু-যশঃ-সৌভাগ্যসমূহ নষ্ট হইয়া যায়। ইহাদের সঙ্গে ভোগ-পিপাসা প্রবল হইয়া শত শত আশাপাশে বদ্ধ করে। তখন কাম-ক্রোধ-লোভের বশবর্ত্তী করিয়া নরকের পথে অগ্রসর করায়।

অনন্তদেবের নামসমূহ কীর্ত্তন করিতে কোন লজ্জা নাই, শ্রীনারদঋষি নিজ শিষ্য শ্রীব্যাসদেবের নিকট বলিতেছেন—"তদনন্তর আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের মঙ্গলময় নামসমূহ অনবরত কীর্ত্তন করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম এবং সন্তুষ্টচিত্তে সকল প্রকার বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া নিরহঙ্কার ও মাৎসর্য্যহীন হইলাম।" তিনি অমানী ও মানদ হইয়া নামকীর্ত্তন-কালে কাহাকেও লজ্জা করিতেন না। নাম ও নামী অভিন্ন, এইরূপ উপলব্ধি হইলে জীবের লজ্জা থাকে না।

অনেকে শ্রীহরি-মন্দিরে হরিকথা বিষয়ক নৃত্য-গীতাদি

করিতে লজ্জাবোধ করেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

বিসৃজ্য লজ্জাং যোঽধীতেগায়তে নৃত্যতেঽপি চ।
কুলকোটিসমাযুক্তো লভতে মামকং পদম্॥

—যিনি লজ্জা ত্যাগ করিয়া—মৎসন্নিধানে অধ্যয়ন ও সঙ্গীত কিংবা নৃত্য করেন, মদীয় ধামে তিনি কোটিকুলসহ বসতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্বাভাবিক-নৃত্য-গীত-দ্বারা হরি প্রীত হইয়া থাকেন। ভক্তগণ যখন নৃত্য-গীতাদি করেন, তাঁহাদের নৃত্য উপবেশনপূর্ব্বক দেখিলে জন্মে জন্মে খঞ্জ হইয়া দেহ ধারণ করিতে হয়। দণ্ডায়মান হইয়া প্রেমিক ভক্তগণের নৃত্য দেখিতে হয়। নৃত্যাদিকারী ভক্তকুল ও প্রভুকে অন্তরাল করত তন্মধ্য দিয়া বক্রভাবে গমন করিতে নাই। করিলে তির্য্যগ্ যোনি লাভ হয়।

পরিবদতু জনো যথা তথা বা ননু মুখরো
ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরা-মদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম
লটাম নির্ব্বিশাম॥

শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ-বিধানের জন্য শ্রবণ, কীর্ত্তন, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তাহার জন্য অভক্ত মুখরগণ কি বলিবে বলিয়া লজ্জা করিতে হইবে না। সে বিচারের আবশ্যকতা নাই।

যখন ভগবদ্ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত হয়, যখন প্রেমের উদয় হয়, তখন লোক বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হইয়া হাসে, কাঁদে ও গান করে এবং উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করে, লোক লজ্জার ভয় থাকে না। কোন সৌভাগ্যবানের যখন কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ উপস্থিত হয়, তখন তিনি কৃষ্ণসুখহেতু লৌকিক ও বৈদিক ধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া—এমন কি নিজ-দেহ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হন, তখন লজ্জা, ভয় অথবা নিজ পরিজনের তাড়ন-ভর্ৎসন গ্রাহ্য করেন না। "সর্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।" ইহাতে নিজ ভোগবাঞ্ছা কিছুই নাই।

কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেমেতে প্রবল॥

শ্রীধর মহারাজের বক্তৃতা

স্বামীজী প্রথমে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিয়া বলেন যে,—দুই প্রকার জ্ঞানের কথা আমরা জানি—অধোক্ষজ-জ্ঞান এবং আধ্যক্ষিক-জ্ঞান। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়গণ আধ্যক্ষিক-জ্ঞানের নশ্বরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—'জড়জগতের জ্ঞান অবলম্বন করিয়া আমরা অপ্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় তৃতীয়-মানের বহির্ভূত অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় বস্তুর কোন প্রকার ধারণা করিতে পারে না, অধোক্ষজ-বস্তু-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অবরোহ-পন্থা অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই'। শ্রীগৌরাঙ্গদেবও আমাদিগকে এই কথাই জানাইয়াছেন। নশ্বর বস্তুর সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সদ্বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। তিনি জীব-ব্রহ্মবাদ নিরাস করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-মত স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ পরিপূর্ণ মাধুর্য্য এবং পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের একমাত্র আকর-বস্তু। সেই সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম অসমোর্দ্ধ বস্তু। সেই অপ্রাকৃত কামদেবের কামাগ্নির ইন্ধন-স্বরূপ হওয়াই জীবের জীবত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি। কারণ সত্যবস্তু নিত্যকালই নিরপেক্ষভাবে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারেন। লীলাপুরুষোত্তমই অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ভোক্তা এবং অন্য সমস্ত বস্তুই তাঁহার ভোগ্য। তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধাচারণই জীবের পক্ষে বৈকুণ্ঠ-জগৎ হইতে অনন্ত নরক মধ্যে ভৃগুপাত আনয়ন করে। শক্তিমান্ পুরুষের অনন্ত শক্তির মধ্যে ত্রিবিধ শক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী
জ্ঞান বল ক্রিয়া চ।'
—(শ্রুতিঃ)

জৈব-জগৎ তটস্থাশক্তি-সম্ভূত। ভোগেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া জীব বহিরঙ্গাশক্তি-জাত মায়িক জগতে মায়া-কবলিত হইয়া যায়। কিন্তু ভোগবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক জীব যখন মুকুন্দের পাদপদ্ম-সেবায় অনুপ্রাণিত হয় তখনই মায়ার কবল হইতে বিমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ-জগতে বসবাস করিবার অধিকারী হয়। বৈকুণ্ঠের জীবসকল শতকরা শতভাগই ভগবৎ-সেবায় উদ্বুদ্ধ। সেবাই তাঁহাদের জীবাতু কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব, স্বার্থান্ধ হইয়া নিজেন্দ্রিয়-তর্পণে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। আপাত-দর্শনে নিজ স্বার্থ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যদি কেহ দেশের জন্য কিম্বা দশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন সেই ব্যক্তিই গৃহমেধী ব্যক্তিদিগের আদর্শ-স্বরূপ হয়। 'কূপমণ্ডূক ন্যায়ে' দেশসেবী কিম্বা বিশ্বহিতৈষী গৃহকূপান্ধ ব্যক্তিদিগের আদর্শ-স্থানীয় সন্দেহ নাই কিন্তু অনন্তের তুলনায় উহা বিন্দুমাত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় আমরা দেখিতে পাই "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ।" অনন্তের জন্য জীবন-ধারণ করা এবং তাঁহার সেবায় আত্মোৎসর্গ করাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অংশ যত বড়ই হোক্ না কেন, তাহার জন্য আমাদের বিন্দুমাত্র শক্তি ব্যয়িত হওয়া উচিত নয়; আনন্দলাভই যখন জীবমাত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য তখন পূর্ণানন্দের উৎস-স্বরূপ রসময় পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবাতেই জীবের পরিপূর্ণ আনন্দানুভূতি নিহিত।

যে-পরিমাণে আমাদের বৃত্তি ভগবৎ-সেবোন্মুখী হইবে, সেই পরিমাণেই আমরা আনন্দলাভের অধিকারী হইব। ভগবদিতর বিষয়ে মনোনিবেশই জীবের বন্ধনের কারণ। "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকেঽয়ং কর্ম্মবন্ধন" (গীতা)। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম দুঃখ-যোনি-স্বরূপ। পুণ্যদ্বারা স্বর্গলাভ হইতে পারে কিন্তু ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। ত্রিবর্গকামী ব্যক্তিগণ স্থূলভাবে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য অতি-মাত্রায় ব্যস্ত কিন্তু মুক্তিকামী ব্যক্তি আর একটু সুচতুর, ত্রিবর্গের নশ্বর ফল দর্শন করিয়া তিনি স্থায়ী ভোগের ব্যবস্থার জন্য বিশেষ চেষ্টিত। ভগবদ্ভক্তগণ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে গর্হণ করেন এমন কি, মনোহারিণী মুক্তি অযাচিতভাবে অর্পিত হইলেও মুনিগণ তাহা উপেক্ষা করেন। তাঁহারা সত্যবস্তু ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বস্তু-লাভে সন্তুষ্ট হন না। জীবমাত্রেরই সত্যবস্তুর অনুসন্ধান করা একমাত্র কর্ত্তব্য। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকারী জ্ঞানি-গণের এবং পরমাত্মা-উপাসক যোগিগণের ভগবত্তার উপলব্ধি আংশিক মাত্র; কারণ ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা ভগবানের আংশিক প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণেই ভগবত্তার পূর্ণ অভিব্যক্তি। দর্শনকারীর অধিকার এবং যোগ্যতা-অনুযায়ী ভগবদ্-বস্তু বিভিন্ন প্রকারে প্রতিভাত হন। মুক্তিলাভের পরই সুষ্ঠুভাবে ভগবদ্ভক্তি আরম্ভ হয়।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

মুক্ত হওয়ার পরই বাস্তব জীবন আরম্ভ হয়। বাস্তব-জীবনে ভক্তগণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ রসে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। এই জড় জগতেও ঐ পাঁচ প্রকার রসের বিকৃত প্রতিফলন দৃষ্ট হয় কিন্তু বৈকুণ্ঠ-জগতের রসে কোন প্রকার হেয়তা, অবরতা অথবা অনুপাদেয়তা নাই, তাহা পূর্ণানন্দময়। শ্রীনারায়ণের উপাসনায় কেবলমাত্র আড়াই প্রকার রসের অবস্থিতি দৃষ্ট হয়—তাহা শান্ত, দাস্য এবং গৌরব-সখ্য। শ্রীকৃষ্ণে উক্ত পঞ্চবিধ রসই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান কিন্তু উহাদের মধ্যে মাধুর্য্যের তারতম্য আছে। মধুর রসে ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং উহা দুই প্রকার—কামরূপা এবং সম্বন্ধরূপা। দ্বারকার মহিষীদিগের মধুর-রসের সেবাই সম্বন্ধ-রূপা এবং ব্রজগোপী-দিগের সেবা কামরূপা। কামরূপা সেবাতেই মাধুর্য্যের সর্ব্বোত্তমতা বর্ত্তমান। ব্রজগোপীর আনুগত্যে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের ভজনই জীবের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় হওয়া উচিত।

জীবের ধর্ম্মই হচ্ছে সেবা করা, তাই চেতন জীব সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। যখন সে ভগবানের সেবা বিস্মৃত হয় তখন পিতা, পুত্র, স্ত্রী, দেবতা, পশু, পক্ষী ও মনুষ্যগণ তাহাকে সেবক বলিয়া দাবী করে এবং সেও অনেকের মন যোগাইতে গিয়া অবশেষে ভীষণ বিপদে পতিত হয়। সেই জন্যই সকলেরই একমাত্র সেব্য কৃষ্ণের ভজনার্থই শাস্ত্রের উপদেশ।

শ্রীনারদের উপদেশ

মায়াবদ্ধ জনগণ স্ব-স্ব কর্ম্মফলে ত্রিতাপযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ঐ সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য যতটা সম্ভব স্ব-স্ব-বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কিছুতেই নিজচেষ্টায় ত্রিতাপের কবল হইতে নিষ্কৃতি পান না।

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণ বদ্ধজীব নহেন। কিন্তু তাঁহারা জগদ্বাসীকে প্রাণপ্রভু শ্রীভগবানের নিত্য-শান্তি-প্রদ সেবাসন্ধান-প্রদানের জন্যই প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। তাঁহারা যদি নিত্যসিদ্ধভাবেই জগদ্বাসীকে উপদেশ দেন তাহা হইলে বিশ্ব জনগণ সেই উপদেশের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে ; কারণ তাহারা মনে করে, ঐসকল উপদেশ তাহাদের পালনযোগ্য নহে। তাই নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া নিজদিগকে মায়াবদ্ধ-জীবরূপে সর্ব্বসাধারণকে দেখাইয়া শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক কি-প্রকারে বদ্ধভূমিকা হইতে উদ্ধার লাভ করা যায় তাহার আদর্শ প্রদর্শন করেন। ইহজগতেও আমরা দেখিতে পাই, যে-শিক্ষক ছাত্রের বুঝিবার অসুবিধা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার ভাবে তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন সেই শিক্ষকই উক্ত ছাত্রের উন্নতিবিধান করিতে সমর্থ, আর খুব বড় পণ্ডিত হইয়াও যদি ছাত্রের বুঝিবার অসুবিধাস্থল ধরিতে না পারিয়া তাঁহার ইচ্ছামত বক্তৃতা করেন তাহা হইলে সেই বক্তৃতায় ছাত্রের কোনও উন্নতি হয় না, বরং অনেক সময় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া সে বক্তৃতার প্রতি ঔদাসীন্যই প্রকাশ করিয়া থাকে। শ্রীব্যাসদেবের হৃদয় বদ্ধভূমিকা-সুলভ বিষাদ-স্থান পাইবার যোগ্য না হইলেও মাদৃশ বদ্ধজীব যখন ঐ প্রকার বিষাদে আচ্ছন্ন হয়, তখন তাহা হইতে কি প্রকারে নিষ্কৃতিলাভ করিতে হইবে সেই পথ প্রদর্শনকল্পেই আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীব্যাসদেবের বিষাদগ্রস্ত হইবার লীলা।

শ্রীব্যাসদেবের ঐ লীলায় ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদিত পরিপ্রশ্নে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কি প্রকার বিনয়নম্রবচনে শরণাগতি সহ উপস্থিত হইতে হয়, তাহার উদাহরণ দেখিতে পাইতেছি। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও একদিন কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের নিকট নিজ দৈন্য জ্ঞাপন করিতে করিতে শ্রীগুরুপূজার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগুরুতত্ত্ব আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তায় অধিষ্ঠিত হইলেও তিনিও উপাস্য তত্ত্ব। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর "কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়" প্রভৃতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ন্যায় ব্যাসানুগত জনগণের শ্রীগুরুদেবের নিকট স্ব-স্ব দৈন্য ও মঙ্গল-প্রার্থনা শ্রৌতপথের বিশেষত্ব ও রহস্য। গুর্ব্ব-বজ্ঞাকারী তর্কপথাশ্রিত অধিরোহবাদিগণ গুরুদেবকে যে প্রকার বিপথগামী বলিয়া নির্দেশ করে, বৈয়াসিক গুরুদাসগণের বিচার সেরূপ নহে।

শ্রীব্যাসদেব স্বীয় গুরুদেবকে অধোক্ষজ সেবানিরত বলিয়াই জানেন। অধোক্ষজ বিষ্ণুই নিত্য অধোক্ষজগণের নিত্য-সেব্য। প্রপঞ্চান্তর্গত স্বর্গস্থ দেবগণ—বিষ্ণুদাস বৈষ্ণব, তাঁহারা সকলেই জীবসমূহকে অব্যভিচারিণী ভক্তিতে অবস্থিত হইবারই পরামর্শ দিয়া থাকেন। তবে যে-সকল ভোগী বদ্ধজীব স্ব-স্ব কামনার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের কামচরিতার্থকারী বিভিন্ন দেবরূপ কল্পনা করে, তাহারা বিষ্ণুসেবাচ্যুত হইয়া ত্রিতাপযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। তাহাদের কামনামূলক পূজা বস্তুতঃপক্ষে পূজা নহে, পূজ্যবস্তু হইতে পূজা-সংগ্রহের ফন্দী মাত্র। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম কামদেব বিষ্ণুরই কামনাপূরণকারিণী সেবা ব্যতীত নিজেন্দ্রিয়তর্পণপরতায় ব্যস্ত থাকেন না। মায়ামোহিত জীব ভোগ বা ত্যাগকেই পরমার্থজ্ঞানে অনর্থের হস্তে নিষ্পেষিত হয়। ঐকান্তিকী বিষ্ণুভক্তিতেই জীবের চরমকল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। শ্রীব্যাসদেব শ্রীগুরুদেবের নিকট যে পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহাতে এই সিদ্ধান্তটী সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীব্যাসদেবের উক্তি হইতে আমরা স্পষ্টরূপে জানিতে পারি—সাধক-শিষ্য ও শ্রীগুরুদেবের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। সাধনকালে অনর্থনিবৃত্তি ও নিত্যভাবের আংশিক উন্মেষ হইয়া থাকে। সাধন-দশার অতীতকালে

পরমার্থে অবস্থান-হেতু পতিত জীবগণকে অনর্থ হইতে উত্তোলন করিবার অধিকার মহাভাগবতের আছে। শিষ্যের পাতিত্যলীলার অভিনয় ও অসমর্থতা শ্রীব্যাস-দেবের উক্তিতে পরিস্ফুট।

শ্রীব্যাসদেব স্বীয় চিত্ত বিষাদগ্রস্ত হইবার কারণ শ্রীল নারদঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর করিয়াছেন এক্ষণে আমরা তাহাই আলোচনা করিতেছি! শ্রীব্যাস-গুরু শ্রীনারদ বলিতেছেন,—"হে মহর্ষে, আপনি শ্রীহরি নির্ম্মল-লীলা সুষ্ঠুরূপে কীর্ত্তন করেন নাই। শ্রীভগবানের লীলাবর্ণনেই জীবের চরমকল্যান লাভ ঘটে। ভগবল্লীলা-বিমুখ জীব নিজ স্বরূপ-বিস্মৃতিবশে ভোগময়ী ভূমিকায় ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-সংগ্রহে তৎপর হয়। ত্যাগময়ী বিরক্তিতে তাঁহাদের মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা প্রবলা হয়।" বদ্ধজীবগণ অভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হয় এবং ভোগ-রহিত হইয়া নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানে ব্যস্ত হয়। এই চতুর্বর্গ জীবাত্মার নিত্যস্বরূপলাভের অন্তরায় মাত্র। আপনি এই চতুর্বর্গের বিষয় যত অধিক কীর্ত্তন করিয়াছেন, ভগবান্ বাসুদেবের মহিমা তদ্রূপ কীর্ত্তন করেন নাই। সুতরাং জীবের প্রতি আপনার দয়া সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শিত হয় নাই।

পূতি-গন্ধ-পূর্ণ গর্ত্তে অন্ন পতিত হইলে কাকের আনন্দ হইলেও যে-প্রকার পদ্ম-সরোবরবাসী রাজহংসগণ ঐ অন্নের আদর করে না, সেই প্রকার "শ্রীহরি-তাৎপর্য্য-সিদ্ধান্ত-রসহীন বাক্যসমূহ বিচিত্র পদসম্পন্ন ও অলঙ্কার ভূষিত হইলেও তাহাতে ভগবদিতর কথা স্থান পাওয়ায় তাহা কামুক লোকের আনন্দবিধান করিলও বৈষ্ণবগণ ঐসকল বাক্যের আদর করেন না। জড়-চিত্তোন্মাদী বাক্য-বিবর্জ্জিত শ্রীহরিনাম সকল মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। জড়সাহিত্যের সুর, মান, লয় ও তাল প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার-বর্জ্জিত ভাষায়ও শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন জড়ভোগ বিনাশ করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ বিধান করিতে সমর্থ। সাধুর মুখে বিগীত হরিনামই সর্ব্ব-শুভোদয়ের কারণ, আর হরিবিমুখ-ব্যক্তির জড়বিষয়িণী ভাষা বা আলঙ্কারিক কৃতিত্বের কোনও মূল্য নাই। কারণ তাহাতে ভগবৎপ্রেম-রসিকের হৃদয়ে বৈরস্য উৎপন্ন করে। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞান অচ্যুত-ভক্তি-বিবর্জ্জিত হইলে এবং দুঃখ-প্রদ কর্ম্মসমূহ নিষ্কাম হইলেও পরমেশ্বর বিষ্ণুতে সমর্পিত না হওয়ায় উভয়েই নিষ্ফল।

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

—যে কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না, যে ধর্ম্মার্থকাম বিরাগপর জ্ঞানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না, যে বৈরাগ্যপূর্ণ সম্বিদ্-বিকাশ ভগবৎপাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত হয় না তাহাই জড় বা অচিৎ অর্থাৎ জীবনরহিত—প্রাকৃত মাত্র। সর্ব্বাত্মা-অচ্যুত হইতে চ্যুত হইয়া তাদৃশ নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞান কোন সুফল প্রসব করে না। গো-ময় যেরূপ পবিত্রতা সাধন করে ষণ্ডবিষ্ঠা তদ্রূপ করে না সেই প্রকার কর্ম্মবীরগণের অনুষ্ঠিত নশ্বর কর্ম্ম নিজ নিজ আসুরিক বৃত্তির চরিতার্থতা করিলেও তাহা ভগবদ্‌বিমুখ চেষ্টা হওয়ায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সেইজন্য কাল তাহাকে বিনাশ করিয়া তিন খণ্ডে বিভক্ত করে, কিন্তু হরিসেবা-কর্ম্ম বা হরিসেবন-জ্ঞান নিত্য অখণ্ডরূপে বর্ত্তমান। নিত্য হরিসেবা ছাড়িয়া যে জীব নশ্বর-ভোগ-প্রবৃত্তিতে ধাবিত হয়, তাহার সেই অসজ্ জ্ঞান কখনই চরম মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হয় না। সচ্চিদানন্দ-বস্তু-বর্জিত অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দময় ত্রিগুণ ভূমিকায় কর্ম ও জ্ঞান-বৃত্তিদ্বয় জীবকে ঈশসেবা বিমুখ করায়। ঈশবৈমুখ্যই জীবের যাবতীয় অশুভ আনয়ন করে। সেই ঈশ বৈমুখ্য-প্রকাশ নৈষ্কর্ম্য-জ্ঞান ভগবানের উদ্দেশ্যে হরিসেবায় নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা পঞ্চম-পুরুষার্থ শ্রীহরিপ্রেমা উৎপন্ন করিতে পারে না। হরি-প্রেমাতেই নিত্য নব-নব আনন্দের উৎস বর্ত্তমান। অতএব হে ব্যাসদেব, আপনি সমাহিত-চিত্তে শ্রীহরির চরিত কীর্ত্তন করুন। এখন বুঝিতে পারিতেছেন, আপনি—মহাভারতাদিতে যে চতুর্বর্গের কথা উপদেশ করিয়াছেন তাহা কেবল তুচ্ছ নহে পক্ষান্তরে বিরুদ্ধ এবং তাহা রচনা করা আপনার পক্ষে মহা অন্যায় হইয়াছে। কারণ সকাম ধর্ম্মে স্বাভাবিক অনুরক্ত জনগণ আপনার বাক্যে চতুর্ব্বর্গাদি সকাম-ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বিশ্বাস করিয়া আত্মধর্মের বিষয়ে অন্য কোন

তত্ত্ববিদ্ আচার্য্যের নিষেধ আর গ্রাহ্য করিবে না।

"নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী" বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বাসুদেবের নিত্যস্বরূপ জানিয়া ভজন করিতে পারেন, প্রবৃত্তি-মার্গরত নির্ব্বোধ জন তাহাতে অসমর্থ। অতএব তাহাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবানের লীলা কথা প্রদর্শন করুন। ধর্ম্মার্থ-কামাদি ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভক্ত্যঙ্গ সাধন করিতে করিতে অসিদ্ধ অবস্থায়ও যদি মৃত্যু বা পতন হয় তথাপি ঐ অনিত্য স্বধর্ম্ম-ত্যাগের জন্য তাহার কোন প্রকার অনর্থের বা অসুবিধার আশঙ্কা নাই। দুঃখ যেমন প্রার্থনা না করিলেও বিনা চেষ্টাই আসিয়া থাকে, তদ্রূপ উচ্চাবচ সকল লোকেই বিষয়-সুখাদি লাভ হইলেও উহা আগমাপায়ী সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতি দুর্লভ নিত্য পরমার্থের জন্যই সতত চেষ্টা করিবেন। ভক্তিশূন্য কর্ম্মী বা জ্ঞানী সংসার লাভ করে, কিন্তু ভক্ত যে কোন অবস্থায় থাকুন বা কেন, তিনি শ্রীভগবানের পাদ-পদ্ম-মধু একবার পান করিয়া আর তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয়-বিষরস-পানে সংসারে আবদ্ধ হ'ন না। এই বিশ্ব ও জীব যে ভগবান্ বিষ্ণু হইতে ভেদাভেদ-প্রকাশ, তাহা আপনি নিজ প্রমাণ বলে জানেন। আপনি স্বয়ং ঈশ্বরের শক্ত্যাবেশ অবতার, অতএব শ্রীহরির অদ্ভুত লীলা-চরিত আপনিই বর্ণন করুন। ভগবৎ কথা-কীর্ত্তনই যাবতীয় তপস্যা, স্বাধ্যায়, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ ও দানাদির ফল।

সৎসঙ্গের প্রভাব

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীল নারদ গোস্বামী শ্রীবেদব্যাসকে শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাবর্ণনের নিমিত্ত যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা গতকল্য 'শ্রীনারদের উপদেশে' লক্ষ্য করিয়াছি। সৎসঙ্গ ব্যতীত শ্রীভগবানের নামরূপাদিতে শ্রদ্ধার উদয় হয় না। সাধুগণই একমাত্র অপ্রাকৃত নামের মাহাত্ম্য জানেন। মুক্ত মহা-পুরুষগণের মুখেই অপ্রাকৃত শ্রীনাম উচ্চারিত হ'ন। তাই সাধুগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

—সাধুদিগের প্রকৃষ্ট-সঙ্গ হইতে আমার (শ্রীভগবানের) মাহাত্ম্য-প্রকাশক ও শুদ্ধহৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক যে-সকল কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যানিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে (শ্রীভগবানে) যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেম-ভক্তি উদিত হইবে।

বর্ত্তমানযুগে নাস্তিক্যবাদ ও সন্দেহবাদের তাণ্ডবনৃত্যে বিশ্ব প্রকম্পিত। যে-কোন কথাই বলা যা'ক্ না কেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অথবা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-রূপেই গ্রহণ করা যাইতে পারে এই প্রকার কোনও উদাহরণ প্রদর্শন করিতে না পারিলে কোন কথা সাধারণতঃ কেহ বিশ্বাস করিতে চাহেন না। অবশ্য শুধু বর্ত্তমাযুগে নহে, সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালেই বদ্ধজীবের হৃদয়ে সন্দেহের দোলনা সর্ব্বক্ষণই দোদুল্যমান্। তাই এই শ্রেণীর লোকের উপকারার্থই শ্রীনারদ পূর্ব্বজন্মে সৎসঙ্গের যে প্রভাব লাভ করিয়া বদ্ধ ভূমিকার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইয়াছেন এবং 'জাতিস্মর' বর লাভ করায় যাহা পরজন্মে মহাভাগবত অবস্থায় নিরন্তর কৃষ্ণ কীর্ত্তন সময়েও তাঁহার স্মরণ আছে, তিনি সেই ঘটনা শ্রীবেদব্যাসের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। আমরা আজ তাহাই এস্থলে আলোচনা করিয়া সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিবে।

শ্রীনারদ পূর্ব্বকল্পে পূর্ব্বজন্মে বেদার্থবেত্তা ভক্তিযোগী মুনিগণের এক পরিচারিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত ঋষিগণ চাতুর্মাস্য-ব্রতোপলক্ষে বর্ষার মাসচতুষ্টয় কোথাও একত্র বাস করিতে ইচ্ছুক হইলে শ্রীনারদ বালক হইলেও বালক-সুলভ চাপল্য ও বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংযতবাক্ ও আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া অনুচররূপে কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিতে থাকেন। তাঁহার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া মুনিগণ স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি কৃপালু হইয়া তাঁহার (শ্রীনারদের) প্রার্থনামত তাঁহাকে (শ্রীনারদকে) তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট প্রদান করিতেন।

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাইয়াছি,—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
ভক্তশেষ হইলে মহামহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্ত-পদ-ধূলি আর ভক্ত-পদ-জল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণ-প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনের ফল আমরা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর জ্ঞাতি-খুড়া শ্রীল কালিদাসের চরিত্রে দেখিতে পাইয়াছি। তাঁহার বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজন-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই—

গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তিঁহ করিলা ভোজন॥
উত্তম বস্তু ভেট লইয়া তাঁ'র ঠাঞি যায়॥
তাঁ'র ঠাঞি শেষ পাত্র লয়েন মাগিয়া।
এই মত তাঁ'র উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া॥
এই মত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে॥

কালিদাস বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য জানিতেন, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের মাহাত্ম্য জানিতেন। তাঁহার বৈষ্ণবে কখনও 'জাতি-বুদ্ধি' ছিল না। বৈষ্ণব যে-কোন কুলেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি পতিতপাবন—ব্রাহ্মণগণেরও পূজার পাত্র, ইহা তাহার চিন্ময় দর্শনে সর্বদাই লক্ষিত হইত। তাই ভূঁই মালী-কুলে আবির্ভূত 'ঝড়ুঠাকুরে'র উচ্ছিষ্টও তিনি 'আস্তাকুড়' হইতে উঠাইয়া পরমানন্দে সেবন করিয়াছেন। তিনি যখন পুরীতে গমন করেন, সেই সময় শুধু বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-সম্মানের ফলেই তিনি মহাপ্রভুর মহাকৃপার পাত্র হন।

সর্বজ্ঞ শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর॥
সেই গুণ লইয়া প্রভু তাঁ'রে তুষ্ট হইল।
অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিল॥
প্রভুর ঈঙ্গিতে গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসেরে প্রভুর শেষ পাত্র দানে॥

কালিদাস মহাপ্রভুর অবশেষ পাইয়া প্রেমে আপ্লুত হইলেন। বৈষ্ণবের পদধূলি এবং পাদোদকও এই প্রকার কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানে সমর্থ। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন,—

"তাহে বার বার বলি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥
এ তিন হইতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস।"

এখন ভগবদ্ভক্ত মুনিগণের উচ্ছিষ্ট-ভোজনে শ্রীনারদের কি অবস্থা হইল, তাহাই আলোচনা করিতেছি। তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ একবারমাত্র সেবনের ফলেই সমস্ত পাপ দূরীভূত ও চিত্ত মার্জ্জিত হইয়া ভাগবত-ধর্ম্মে তাঁহার রুচি জন্মিল। সাধুগণের হরিকথা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণফলে তাঁহার শ্রীহরিতে রুচি বৃদ্ধি পাইল অর্থাৎ সাধন-ভক্ত্যঙ্গ শ্রবণাখ্য-ভক্তির অনুবর্ত্তিতায় অল্প দিনের মধ্যেই শ্রীনারদ জাতরতি ভক্ত হইলেন। হইবারই কথা, কারণ শ্রবণেচ্ছুর সকল যোগ্যতাই ঘটনাক্রমে তাঁহাতে অধিষ্ঠিত ছিল। এবং বিষয়-বিরক্ত হরিপরায়ণ কীর্ত্তনকারিগণ তাঁহার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রবণ ও কীর্ত্তনের ফলেই জীবের চরম কল্যাণ লীলা-স্মরণাদির সম্ভাবনা হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভাবে সম্বন্ধ-জ্ঞান সমৃদ্ধ হয় না, ফলে জীব হরিলীলার পরিবর্ত্তে মায়িক-ভোগ্য ঘটনাবলীকে স্মরণের বিষয় মনে করে। তাহা

অপূর্ণ ও নশ্বর এবং ভাবাঙ্কুর প্রাপ্তিপথে মহাব্যাঘাত-কর। এই কথাটি সাধন-পথে প্রবেশেচ্ছু জনমাত্রেরই জানা একান্ত আবশ্যক।

যে-কালে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আমিত্ববোধ থাকে, তৎকালে আমরা চতুর্দ্দশ ভুবনে ফল-ভোগের আশায় ভ্রমণ করি। সৎসঙ্গ-প্রভাবে জীবের আত্মার নির্ম্মল-বৃত্তি উন্মেষিত হইলে হরিসেবার উপযোগী নিত্য-চিন্ময় ইন্দ্রিয়-সমূহ কৃষ্ণোন্মুখ হয়। স্থায়িভাব-রতি আত্মবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পাঁচ প্রকার আশ্রয়ের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণরূপ বিষয়ের সেবায় নিত্যকাল উদ্‌বুদ্ধ হয়। তৎকালেই তাঁহার ভোগময় জড়দর্শনাদির সম্ভাবনা থাকে না অথবা ভোগ্যবস্তু দৃশ্যজগৎ-প্রতীতি প্রবল হয় না, সুতরাং অবিদ্যা-জাত স্থূল-সূক্ষ্মোপাধি বিগত হইলে নিজ ভোক্তৃত্বের অবকাশ থাকে না। জাতরতি শ্রীনারদেরও তাহাই হইল, তিনি ভগবৎসেবায় অচলবুদ্ধি হইলেন এবং শুদ্ধস্বরূপের উদয়ে জানিতে পারিলেন যে, এই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর অবিদ্যা-ক্রমে বিরচিত হইয়াছে।

বর্ষা ও শরৎ অর্থাৎ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই চাতুর্ম্মাস্যকালে ঋষিগণের মুখে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় শ্রীহরির নির্ম্মল-লীলাদি কীর্ত্তন বিশেষভাবে শ্রবণ করিবার ফলে শ্রীনারদের মনে প্রাকৃত সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-গুণত্রয়-বিনাশিনী শুদ্ধা ভক্তি প্রকাশিত হইল। সুতরাং যাবতীয় পাপ আপনা হইতেই তাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

চাতুর্ম্মাস্য সমাপনান্তে মুনিগণ যখন স্থানান্তরে গমনোদ্যত হইলেন, সেই সময় তাঁহারা অনুকম্পাবশে শ্রীনারদকে সাক্ষাৎ ভগবন্নারায়ণ-কথিত গুহ্যতম তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিলেন, তদ্দ্বারা তিনি শ্রীভগবদ্ভক্তির স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিলেন এবং তৎকালে তাঁহার বিষ্ণুর পরম পদ লাভ হইল। ভোক্তার ভাব ত্যাগ করিয়া ভগবদ্দাস বুঝিতে অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলেই অনুষ্ঠিত কার্য্যসমূহের দ্বারা ত্রিতাপ ধ্বংস হয়। ভক্তি যোগাধীন জ্ঞান হরিতোষণোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মেরই অব্যভিচারি ফল।

ভগবৎ-সম্বন্ধবিহীন—

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমণ করে, কদর্য্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

শ্রীনারদ সাধুসঙ্গ ফলে যে সুদুর্ল্লভা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছেন তাহা বর্ণন পূর্ব্বক শ্রীব্যাসদেবের নিকট বলিতে লাগিলেন—"আমি পঞ্চরাত্রবক্তা শ্রীনারায়ণ হইতে এই জন্যে প্রণব মন্ত্র লাভ করি। যিনি বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের নামাত্মক মন্ত্রদ্বারা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বিষ্ণুকে উপাসনা করেন, তাঁহারই সমদর্শন বা অধোক্ষজ দর্শন হয়। ভগবান্ শ্রীনারায়ণ আমাকে নিজ নিগম পঞ্চরাত্রানুষ্ঠানরত জানিয়া জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও রতি প্রদান করিলেন। আপনিও শ্রীহরির চরিত-কথা বর্ণন করুন। তদ্দ্বারাই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সকল মীমাংসা হইবে। তদ্ব্যতীত পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের শান্তি বা আত্মপ্রসাদ-লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।"

আমরা পূর্ব্বোক্ত বিষয়-সমূহ আলোচনা দ্বারা নিম্ন-লিখিত বিষয় লক্ষ্য করিতেছি।

(১) অনর্থ দ্বারা অনর্থের নিবৃত্তি হয় না। যাহাতে অনর্থ ঘটে, তাহাকে অনর্থের উপশমকারক বলা যাইতে পারে না। কর্ম্মভোগ-পিপাসা কর্ম্মফল দ্বারা কখনই প্রশমিত হয় না। নাম-ভজন বিচারে যে অপরাধ ঘটে তাহা হইতে অপরাধযুক্ত নামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণেও মুক্ত হওয়া যায় না, কিন্তু অপরাধ-বর্জ্জিত অবস্থায় অবিশ্রান্ত নাম করিলে অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। নামসাধনে অপরাধ ও নামোচ্চারণকালে নিরপরাধ—এই অবস্থাদ্বয় এক নহে। অপরাধের সহিত নামগ্রহণ সেবার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাকে কখনই নাম-সাধন বলা যাইতে পারে না। অপরাধ বলে অপরাধ প্রশমিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। 'নামাপরাধ' কিছু 'নাম' নহে। অপরাধ-বিমুক্ত অবস্থায় সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল। সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল হইলে আর অনর্থ থাকিতে পারে না, অনর্থ কখনও অনর্থনাশের কারণ হইতে পারে না, তবে অনর্থ-থাকাকালে অনর্থের অবকাশ

না দিলেই পূর্ব অনর্থ বিনষ্ট হয়। অভক্তি ফলভোগমূলক ; কর্ম্ম বা জ্ঞান কখনই ভক্তির কারন নহে বা হরিবিমুখতা দ্বারা কখনই হরিতে উন্মুখতা লাভ করা যায় না।

(২) শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চরাত্র-কথিত চতুর্ব্ব্যূহের

'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।

প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নঃ সঙ্কর্ষণায় চ॥'

—এই মন্ত্রকে বৈদিক মন্ত্র বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। বেদ-বিরোধিগণ স্বীয় রুচিবশে পঞ্চরাত্রকে বেদের সহিত পৃথক্ বলিয়া স্থাপন করেন কিন্তু পঞ্চরাত্র বেদের বিস্তার-গ্রন্থ। এই কথাই শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা পাঞ্চরাত্রিক প্রথাকে অবৈদিক বলিবার দুঃসাহস করেন, তাহারা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য "উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে" বাসুদেবকে আকর্ষণের জনক, সঙ্কর্ষণকে প্রদ্যুম্নের জনক ও প্রদ্যুম্নকে অনিরুদ্ধের জনক বলিয়া যে পঞ্চরাত্রোক্ত বিচার উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা অসাত্বত। এ চতুর্ব্যূহ চারিমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াও এক অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেবই, কেহ কাহারও জনক নহেন। মায়াবাদিগণের বিচারে সঙ্কর্ষণ জীবতত্ত্ব, প্রদ্যুম্ন অহঙ্কার-তত্ত্ব ও অনিরুদ্ধ মনস্তত্ত্ব বলিয়া উল্লিখিত হ'ন ; কিন্তু তাঁহারা ঐ সকল তত্ত্ব না হইয়া ঐ সকল তত্ত্বেরই মূল কারণ। এই চতুর্ব্ব্যূহ সমানধর্ম্ম-বিশিষ্ট—দ্বীপ হইতে অপর দ্বীপের প্রকাশের ন্যায়। তবে তাঁহাদিগের লীলাগত পরস্পর বৈচিত্র্য আছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য আরও বলেন, বেদ হইতে শাণ্ডিল্য ঋষি অধিক উপকার পান নাই। পঞ্চরাত্র হইতে বিশেষ লাভবান্ হইয়াছেন, সুতরাং পঞ্চরাত্র অবৈদিক। প্রকৃত-প্রস্তাবে ঐরূপ লেখনীতে পঞ্চরাত্রের অবৈদিকতা প্রমাণিত হয় না। পঞ্চরাত্র বেদ-বিস্তৃতি মাত্র, বেদ-বিরোধী নহে। শাণ্ডিল্য ঋষির পাঞ্চরাত্রিক অভিজ্ঞতা অধিকতর সুবিধা-জনক বলায় তাঁহার উক্তি দ্বারা বেদের মৌলিকতাই স্বীকৃত হয়। তদ্দ্বারা পঞ্চরাত্রের উপযোগিতার আধিক্যই জানা যায়। দুগ্ধ হইতে ঘৃত হয়, দুগ্ধ অপেক্ষা ঘৃতের উপযোগিতা অধিক বলিলে দুগ্ধের মৌলিকতার হানি হয় না।

এই চতুর্ব্যূহ হইতেই পুরুষাবতারগণের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় ও বৈকুণ্ঠের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়। যাঁহারা এই পুরুষাবতার-তত্ত্ব ও তন্মূলভূত চতুর্ব্যূহ-তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারাই মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হন। প্রাকৃতিক দৃশ্য-জগত তাঁহাদিগকে হরিবিস্মরণ করাইতে পারে না।

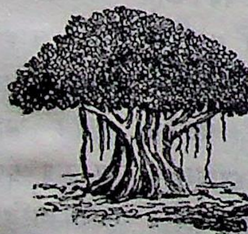
দাসী-গর্ভজাত নারদ বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত না হইয়াও প্রণব-সংযুক্ত মন্ত্র ঋষিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া সেই মন্ত্রে পূজাধিকার লাভ করিয়া মন্ত্র মূর্ত্তিতে দেবের উপাসনা করেন। এই কার্য্যে—

স্বাহা প্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদাদ্দ্বিজঃ।

শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি দ্বিজশ্চাণ্ডালতাঃ ব্রজেত॥

স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণগণের এই বিচারে পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণের পাতিত্য ঘটে নাই। শ্রীনারদের নিকট হইতেই এই মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস লাভ করিয়াছিলেন—এই কথা টীকাকার আচার্য্যগণের লেখায় ও মূল শ্লোকে উদাহৃত আছে।

যাহারা পঞ্চরাত্রোক্ত অধোক্ষজ সেবা বিচার বুঝেন না তাঁহারাই অক্ষজ দর্শনের বশীভূত হইয়া প্রকৃত শ্রৌতপথ স্বীকার করেন না—তাঁহারা অবৈদিক বৌদ্ধ ; তাঁহাদের দর্শনই অসম্যাগ্ দর্শন।



নারদের পূর্ব্বজন্মের কথা

আমরা গত শুক্রবার শ্রীনদীয়া-প্রকাশে 'সৎসঙ্গের প্রভাব'-শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীনারদ যে প্রকারে দাসীপুত্র হইয়াও মহাভাগবত মুনিগণের সঙ্গ-প্রভাবে প্রণব-মন্ত্র ও পারমার্থিক-জীবন লাভ করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিয়াছি। তাহাতে বলিয়াছি, তিনি জাতিস্মর ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পূর্বজন্মের ঘটনাসমূহ স্মরণ ছিল এবং স্বীয় শিষ্য শ্রীবেদব্যাসের কল্যাণার্থ সেই সকল ঘটনা তিনি তাঁহার নিকট বর্ণন করিয়াছেন। মুনিগণ চাতুর্মাস্যান্তে বিভিন্ন স্থানে গমন করিলে শ্রীনারদ কি করিলেন, তিনি জাতিস্মরই বা কি-প্রকারে হইলেন প্রভৃতি বিষয় জানিবার জন্য স্বভাবতঃই আমাদের কৌতূহল হইতেছে, শ্রীব্যাসদেবও কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল কথা শ্রীনারদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আজ আমরা এই প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়া পাটনা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বিতীয় দৃশ্যটী দর্শন শেষ করিব।

শ্রীনারদ পঞ্চবর্ষীয় বালক ; সুতরাং মুনিগণ বিভিন্ন স্থানে গমন করিলে তিনি স্বীয় জননীর নিকট রহিলেন। জননীর একমাত্র তনয় বলিয়া তিনি নারদকে স্নেহ-পাশে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন। সৎসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীনারদের মতি কিন্তু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি কি প্রকারে মাতৃদেবীর মমতাপাশ ছেদন করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই কথা শুনিয়া আমাদের অনেকেরই মনে হয় ত' সন্দেহের উদয় হইতেছে। পাঁচ বৎসরের ছেলের মনে আবার বৈরাগ্য! তাহাও কি সম্ভব? শ্রীভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের প্রসাদ যাঁহার উপর পতিত হয়, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নহে। ধ্রুব কি পাঁচ বৎসর বয়সে মধুসূদনের উদ্দেশ্যে বনে গমন করেন নাই? প্রহ্লাদ কি ঐ প্রকার অল্পবয়সে পিতার আরক্তলোচন ও যাবতীয় নির্য্যাতনের প্রতি উদাসীন থাকিয়া শত্রুপুরীর মধ্যে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন নাই? তবে আর অসম্ভব বলিয়া সন্দেহ কেন?

যাঁহার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়, শ্রীভগবান্ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার ভজনের সুবিধা করিয়া দেন, ভজনের বিঘ্নসমূহ অপসারিত করিয়া থাকেন। তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

"যাঁহারা সততযুক্ত হইয়া আমার (শ্রীভগবানের) ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে মৎপ্রাপক বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি।"

শ্রীভগবান্ সতত-ভগবদ্ভজনেচ্ছু জনগণের কি প্রকারে সুবিধা করিয়া দেন, তাহা আমরা অস্মদীয় আচার্য্যবর্য্যের অনুকম্পিত আমাদের শিক্ষাগুরু অনেক বৈষ্ণবের উদাহরণে দেখিতে পাই। যাঁহারা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-হৃদয় বন শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রমুখ ভাগবতগণের জীবনী লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শ্রীনারদের ভজনের আর্ত্তি যখন চরম সীমায় উপস্থিত হইল, যখন সংসার প্রতি-মুহূর্ত্তে তাঁহার শরীরে কাঁটা ফুটাইয়া দিতে লাগিল, সেই সময় অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ তাঁহার স্নেহময়ী জননীকে ধরাধাম হইতে সরাইয়া লইয়া তাঁহার ভজনের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিলেন। শ্রীনারদের জননী একদিন রাত্রিকালে গো-দোহনার্থ বহির্গত হইয়া সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। বঙ্গদেশবাসিগণ ত' অবাক্ হইবেন—স্ত্রীলোক আবার গাভী দোহন করে কি-প্রকারে? অবাক্ হইবার কিছুই নাই। পূর্ব্বকালে মেয়েরা গো-দোহন করিতেন বলিয়াই তাঁহাদের একটী সংজ্ঞা 'দুহিতা'।

আমার ন্যায় মায়াবদ্ধ জীব ত' নারদের ঐ অবস্থা দেখিয়া আকুল-ক্রন্দনে ধরণী বিদীর্ণ করিবেনই। 'সবে ৫।৬ বৎসরের শিশু আপনার জন বলিতে পৃথিবীতে আর কেহই নাই। তাঁহার একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী—জননী, বিধাতা

তাঁহাকেও সরাইলেন ! বিধাতা যে এমন নিষ্ঠুর হইতে পারেন, তাহা কি কেহ কখনও স্বপ্নেও ভাবিয়াছে!' এই প্রকারে দুঃখপ্রকাশ ও কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া কত প্রতিবেশী ত' সহানুভূতির নামে হৃদয়ের শোকাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য আগমন করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর মূঢ় ব্যক্তি মায়ার সেবকগণের চিত্ত-চাঞ্চল্য আনিতে পারিলেও হরিভক্তগণের কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। "যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর"। জাগতিক জনগণ যাহাকে দুঃখ-শোকের বোঝা বলিয়া বিধির নিন্দা করে, সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ভগবদ্ভক্তগণ প্রেম গদ্‌গদ-বচনে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া শ্রীভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাই শ্রীনারদ মাতৃবিয়োগকে ভক্তজন-মঙ্গলেচ্ছু শ্রীভগবানেরই কৃপা মনে করিয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে দ্রুত-গতিতে উত্তর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে তিনি বহু সমৃদ্ধ দেশ, রাজধানী, বিপ্র-শূদ্রাদির বসতি-স্থল, গোপ-পল্লী, রত্নাদির উৎপত্তিস্থান, কৃষক-পল্লী, গিরিতটবর্ত্তী গ্রাম, পুষ্পকুঞ্জ-শোভিত বন ও উপবন, সুবর্ণ-রজতাদি বিবিধ-ধাতুরঞ্জিত পর্বত, হস্তিশুণ্ড ভগ্নশাখ বৃক্ষ, পুণ্যতোয় হ্রদ, বিবিধ-রবকারী পক্ষিগণের কূজনধ্বনিতে আকৃষ্ট ইতস্তত বিচরণশীল ভ্রমরদল-শোভিত দেববৃন্দের আবাস-স্থল, পদ্ম-শোভিত সরোবর, নলবেণু-শর-গুল্মাদি গুল্মে পরিপূর্ণ, শিবাদি হিংস্রজন্তু-পরিপূর্ণ অরণ্যানী অতিক্রম করিলেন। পরিশেষে পথশ্রান্ত-কলেবরে বিজন বনের এক পার্শ্বে কিছুকাল বিশ্রাম এবং নদীর জলে স্নান, পান ও আচমন করিয়া শ্রান্তি দুর করিলেন। অতঃপর উক্ত বিজন-কাননের একটী অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে উপবেশন করিয়া আত্মবুদ্ধি-দ্বারা হৃদিস্থিত অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে মুনিগণের উপদেশানুসারে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভক্তিশুদ্ধ-হৃদয়ে শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে যখন তীব্র ব্যাকুলতা-হেতু শ্রীনারদের চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, তখন তাঁহার শুদ্ধহৃদয়ে শ্রীহরি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইলেন।

বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বা ভক্তিশুদ্ধ-হৃদয়ই বাসুদেব। এই বসুদেবেই ভগবান্ বাসুদেব আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবত (৪।৩।২৩)—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥

যোগেশ্বর মহাদেব প্রার্থনামুখে বলিয়াছেন—অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই 'বসুদেব' শব্দের দ্বারা অভিহিত। আবরণশূন্য অর্থাৎ স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূত স্বপ্রকাশ-শক্তিলক্ষণ-যুক্তপুরুষ সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে প্রকাশিত হন বলিয়া তাঁহার নাম 'বাসুদেব'। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্; তিনি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত পুরুষ। তিনি সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে নিত্য প্রকাশমান। আমি সেই ভগবান্‌কে বিশেষরূপে নমস্কার করিতেছি।

"আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাহাতে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥"

শ্রীভগবানের এই পূর্ণকৃপার অধিকারী যিনি হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয়-বৃন্দাবনে শ্রীভগবানের প্রাকট্য হইয়াছে, আনন্দময়কে পাইয়া তাঁহার কি প্রকার আনন্দ হইয়াছে, তাহা—যিনি এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন একমাত্র তিনিই অনুভব করিতে পারেন, অপরের অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে ধারণা করিবারও যোগ্যতা নাই। প্রিয় পাঠক, শ্রীভগবান্ হৃদয়ে প্রকটিত হওয়ায় শ্রীনারদের কি প্রকার অবস্থা হইল তাহা অনুধাবন করুন। গভীর প্রেমরসে তাঁহার শরীরে পুলক-রোমাঞ্চাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হইল। তিনি পরমানন্দস্রোতে নিমগ্ন হইলেন। আনন্দাতিশয্যে তিনি নিজকে বা শ্রীভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন না।

শ্রীভগবান্ একবার দেখা দিয়া যদি পুনরায় অদৃশ্য হন, তাহা হইলে ভক্তগণের অন্তঃকরণের অবস্থা কি প্রকার হয়, তাহা কল্পনার তুলিতেও অঙ্কন করা দুঃসাধ্য। যদি কখনও গোপীগণের আনুগত্য করিবার অবস্থা হয় তাহা হইলে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। ভগবান্ শ্রীহরির সেই

মনোমোহন অশোকরূপ হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ায় ব্যাকুল-ব্যথিত হৃদয়ে শ্রীনারদের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি সেই রূপ দর্শনের জন্য পুনরায় অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই আর কৃতকার্য্য হইলেন না। সুতরাং তিনি অতৃপ্ত হইয়া কাতর হইয়া পড়িলেন।

পূর্বোক্ত-ভাবে নির্জ্জন-কাননে বসিয়া যখন ভগবদ্দর্শনের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন বাক্য ও মনের অগোচর ভগবান্ শ্রীহরি যেন শ্রীনারদের বিরহ-শোক দূরীভূত করিবার জন্যই স্নেহমধুর-স্বরে বলিতে লাগিলেন, —"হে বৎস, এই জন্মে এ সংসারে তুমি আর আমার দর্শন পাইবে না। যাহাদের কামাদি-মল দগ্ধ হয় নাই, সেই অসিদ্ধ অনর্থযুক্ত জনগণ আমাকে সহজে দর্শন করিতে পারে না। তবে যে আমি একবার তোমাকে দর্শন করিয়াছি, তাহা আমার প্রতি তোমার অনুরাগ-বৃদ্ধির জন্যই। কারণ, আমাতে অনুরাগবিশিষ্ট হইলেই সাধুপুরুষ ক্রমে ক্রমে হৃদয়স্থ কামসমূহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। অতি অল্পকালমাত্র অনুষ্ঠান করিলেও তুমি যে সাধুসেবা করিয়াছ, তদ্দ্বারাই আমার প্রতি তোমার অচলা বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। তৎফলে তুমি তোমার এই দেহ পরিত্যাগান্তে আমার পার্ষদত্ব লাভ করিবে।" তোমার এই যে মদাশ্রিতা বুদ্ধি, তাহা কখনও বিলুপ্ত হইবে না এবং আমার কৃপা প্রভাবে তুমি প্রজা-সৃষ্টি এবং প্রলয়ের পরও তোমার জন্মান্তরীণ স্মৃতি বিস্মৃত হইবে না।"

শ্রীনারদের ভগবদ্দর্শন

গত শুক্রবার আমরা শ্রীনারদের ভগবদ্দর্শন ও অযাচক-ভাবে ভগবানের বর-লাভের বিষয় বর্ণন করিয়াছি। শ্রীনারদ ভগবানের যে রূপ দর্শন করিয়াছেন, অদ্য আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু বর্ণন করিয়া শ্রীনারদের স্বরূপসিদ্ধি ও তৎ-পরবর্ত্তি-অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

নারদের দৃষ্ট শ্রীভগবান্ সর্বব্যাপী, অশরীরী, সর্বনিয়ন্তা ও বিভুচিদ্বস্তু। সেই ভগবানের রূপ ও পাদপদ্ম শ্রীনারদের অনুভবের বিষয় হইয়াছিল। লীলাময় ভগবান্ বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে সার্দ্ধ দুইটী রসে আশ্রয়জাতীয় রসিকগণের সেব্য। তিনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ-বিশিষ্ট হইয়া তুরীয় লোকে নিত্য অধিষ্ঠিত। তাঁহার বৈভবপ্রকাশ শ্রীসঙ্কর্ষণরূপ হইতে কারণ, গর্ভ ও ক্ষীর-বারিতে তিনটি পুরুষাবতাররূপ প্রকটিত। পুরুষাবতারের মহাবিষ্ণুরূপ ও মহাবিষ্ণুর পাদপদ্ম নিত্য বর্ত্তমান। তবে, সেইগুলি অক্ষজজ্ঞানের গম্য বস্তু নহে। যে-কালে অক্ষজ-জ্ঞান প্রবল ও তাদৃশ পরিভাষায় সেই বস্তুর সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়, তখনই ঐ মহাবিষ্ণু সর্বব্যাপী, অশরীরী, সর্বনিয়ন্তা, বিভুচিৎ প্রভৃতি সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত হ'ন। নারদের উপলব্ধির বিষয় হইতে যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হইলেন, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়শরীর মাত্র নহে। সাধকের বাহ্যদশায় পুরুষাবতারের দর্শন সর্বক্ষণ সম্ভবপর হয় না। চতুর্ব্যূহের বদ্ধজগতের সহিত সম্বন্ধ পুরুষাবতারত্রয়ে প্রকটিত। আবার তাদৃশ সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াও বিষ্ণুতত্ত্ব নিত্যকাল মায়াধীশ। মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার পরম-ভাব না জানিয়া, আমার মহেশ্বর তত্ত্বকে কর্ম্মফল-বাধ্য মানুষী-তনু বলিয়া ধারণা করে। তাদৃশ ধারণা পুরুষাবতারত্রয়ের উপলব্ধি হইতে সম্যগ্‌রূপে বিনষ্ট হয়।

ঋষিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্র দ্বারা শ্রীনারদের দীক্ষালাভ ঘটিলে সেই দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে স্বীয় চিন্ময় অনুভূতিতে তিনি বাহ্যদশা ক্ষণকালের জন্য অতিক্রম করিয়াছিলেন। তখন তিনি পুরুষাবতার-স্বরূপ অবগত হইয়া বিষ্ণুতত্ত্ব দর্শন করেন। বিষ্ণুতত্ত্ব-দর্শনে দ্বিতীয়াভি-নিবেশের অভাবহেতু অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব দ্বিতীয়বার দর্শনীয় বস্তু বা ভেদবুদ্ধিতে ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তুবিশেষ নহেন এইরূপ বলিতে যাইয়া তাঁহার দ্বিতীয়বার দর্শন সম্ভবপর নহে, শুনিতে পাইয়াছিলেন। ভগবান্ যে দর্শন দেন, তাহা

তাঁহার নিজ স্বতন্ত্র ইচ্ছা। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" এই শ্রুতিবাক্যই ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ। শ্রীনারদের ভগবদ্দর্শন-লাভকে কেহ যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র মনে না করেন, এই জন্যই এই শ্লোকে অশরীরী প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য বা ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভগবানের নামকীর্ত্তন এবং ভগবানের মঙ্গলময় রহস্যাত্মক লীলাস্মরণ কার্য্যে ব্রতী হইয়া শ্রীনারদ বস্তুসিদ্ধির অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি অমানী ও মানদ হইয়া নামকীর্ত্তনকালে কাহাকেও লজ্জা করিতেন না। শ্রীনাম ও শ্রীনামীতে অভিন্ন, নামই স্বয়ং কৃষ্ণ, গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় এইরূপ উপলব্ধি হইলে জীবের আর লজ্জা থাকে না।

পরিবদতু জনো যথা তথা বা নন্থ
মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরামদাতিমত্তা
ভুবিবিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশাম॥

—এইরূপ ভক্তের ভাব নারদে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভগবানের লীলা পরমমঙ্গলকারিণী ও পরম গোপনীয়া অর্থাৎ দুজ্ঞেয়া। সেই সকল লীলা যাহাতে বহির্ম্মুখের কর্ণে প্রবিষ্ট না হইয়া মুক্তপুরুষগণের নিত্য চিন্তনীয় হয় সেইজন্য ভগবল্লীলা-স্মরণাদি। কীর্ত্তনীয় নাম সেবার বস্তু। স্মরণীয় লীলা সকলের শ্রবণীয় নহে বলিয়া সাধারণতঃ মুক্ত বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধাবানের নিকটই নামকীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তির অনুশীলন করেন এবং অনর্থমুক্ত অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট লীলা কীর্ত্তন করেন। জাতরতি ভক্তের নিকট শ্রুত লীলাকথা অনর্থমুক্ত-হৃদয়ে স্মৃতিপথে উদিত হয়। বহিরঙ্গভক্তগণ ঐ সকল কথা স্মরণকালে শুনিতে পান না।

'উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয়॥
প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই জানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥'

এইরূপ অমানী ও মানদ হইয়া শ্রীনারদ নাম গান করিয়াছিলেন। স্মরণাঙ্গভক্তি শ্রবণকীর্ত্তনের অধীন। অনবধানরহিত হইয়া শ্রীহরি কীর্ত্তিত হইলেই স্মরণের সুষ্ঠুতা হয়। স্মরণকালে ভগবান্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উচ্চারণকারীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন। কৃত্রিম জড়ীয় ভোগ চিন্তা স্মরণ-শব্দবাচ্য নহে। অনর্থযুক্তাবস্থায় কৃত্রিমভাবে যে স্মরণের চেষ্টা বদ্ধজীবহৃদয়ে পরিদৃষ্ট হয় তাহা অমঙ্গল জনক ও প্রাকৃত সহজিয়ার ভাব মাত্র।

'কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণ হইবে
সে-কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব।'

প্রভৃতি মহাজনবাণী—শ্রবণ-কীর্ত্তনের পূর্ব্বে 'গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি' ভাবে বিভাবিত হ'য়ে কৃত্রিম-স্মরণের বিফল প্রয়াস নিরাস করিয়াছেন। সুষ্ঠু নামকীর্ত্তনপ্রভাবেই রূপগুণলীলাত্মিকা স্মৃতি মুক্তভক্তের চিন্ময় হৃদয়াকাশে উদিত হন।

শ্রীনারদ গোস্বামী ভগবানের নামসমূহ অনবরত উচ্চারণ এবং রহস্যময় শুভ ভগবল্লীলা-সমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে সকল প্রকার বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া নিরহঙ্কার ও মাৎসর্য্যহীন হইলেন।

জাতরতি ভক্তের কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি নির্ম্মল হওয়ায় তিনি সর্বদা হরিগুণগান এবং হরিলীলা-চিন্তাপর হন। ইহাকেই জীবের স্বরূপ-প্রাপ্তি বা জীবদ্দশায় ভোগপিপাসামুক্তি বলা হয়। স্বরূপসিদ্ধিক্রমে অর্থাৎ অস্মিতায় বিষ্ণুসেবার উদয়ে বাহ্যজগতে ইন্দ্রিয়চালনার অবকাশ হয় না। যাঁহারা বাহ্যজগতের ভোক্তৃত্বভাবের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণসেবৈকচিত্ত, তাঁহাদের কার্য্যাবলী ভোগী জীবগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে বুঝিতে পারেন না। ভোগবাসনা-নির্ম্মুক্তহৃদয় বৈষ্ণবগণ যে প্রকারে হরিসেবা করেন, তাহাতে হরিসম্বন্ধি-বস্তুর সন্ধান না পাইলে কর্ম্মফলভোগী ফল্গু-বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ভক্তের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে পারেন না। ভগবদ্ভক্ত আপনার হরিসেবা প্রবৃত্তিতে অবস্থিত থাকিয়া বস্তুসিদ্ধিকালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত নূতন বাসনা স্বীকার করেন না। প্রাক্তন আরব্ধ ক্রিয়া তাঁহার স্বরূপসিদ্ধির ব্যাঘাত করে

না। তাদৃশ স্বরূপসিদ্ধ-ভক্তের ব্যবহার-দর্শনে নানাবিধ অপরাধ উপস্থিত হয়। সেইজন্য উপদেশামৃতে দেখিতে পাই,—

'ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ'

লব্ধস্বরূপ ভক্ত নিরুপাধিক হইয়া স্থূল প্রাপঞ্চিক শরীর ত্যাগ করেন। তৎকালে তাঁহার চিদানন্দ-স্বরূপ ভোগময় কর্ম্মের আবাহন করে না। তখন স্বরূপসিদ্ধ-ভক্তের ভগবানের সেবোপযোগী উপকরণরূপ স্বীয় চিন্ময়ী আত্ম-প্রতীতিরূপা শুদ্ধা ভাগবতীতনু লাভ হইয়া থাকে।

এইরূপে কৃষ্ণতাৎপর্য্যবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণে অনুরাগী হইয়া শ্রীনারদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধি ঘটিল। এই অবসরে বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় তাঁহার মৃত্যু হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীহরির প্রতিশ্রুত সেই শুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবৎ-পার্ষদোচিত শরীর ভগবৎকৃপায় লাভ করিতে উপযুক্ত হইতে শ্রীনারদের প্রারব্ধ-কর্ম্ম ধ্বংস হওয়ায় তাঁহার পঞ্চভূতাত্মক শরীরের পতন হইল।

জীবগণ কি উপায়-অবলম্বনে অনর্থমুক্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ প্রাণপ্রভু কৃষ্ণের সেবায় নিমজ্জিত হইয়া নিত্যমঙ্গল বরণ করিতে পারেন ও কৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভে সমর্থ হন তাহা জগদ্গুরু শ্রীনারদ গোস্বামীর জীবনে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পরমার্থ-রাজ্যে প্রবেশমুখেই আমরা সদ্গুরুচরণাশ্রয় ও সাধুসঙ্গের প্রভাব লক্ষ্য করি ও সাধুসঙ্গের ফলেই জীবের মঙ্গলপ্রদীপ ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। পরে কৃষ্ণের নিত্য-সেবক জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার-বশতঃ হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা নিষ্কপটে করিতে করিতেই তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা-লাভে যোগ্যতাবিশিষ্ট হয় ও শ্রীনারদের অনুগমনে দৃঢ়তার প্রাবল্যে নিত্য সেবাধনে ধনী হইয়া পরম মঙ্গল বরণ করে। শ্রৌতপন্থা—শাস্ত্রপন্থা বা গুরু-পন্থাই ভগবদ্দর্শনের অদ্বিতীয় পন্থা ও মঙ্গলেচ্ছু জীবের একমাত্র বরণীয় ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।

বিচার-ভ্রান্তি

জগতের অনেককেই বিচার-গ্রহণে পরিপন্থী দেখা যায়। বিচার না করিলে অবিচারের মধ্যে যে আমরা পড়িয়া যাইব, 'আলোকাভাবই যে অন্ধকার' এই প্রত্যক্ষ প্রমাণই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বিচার পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যাবরণ-দর্শনে সতীকে অসতী, অসতীকে সতী, জননীকে ভার্য্যা বা ভার্য্যাকে জননী, সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু, মঠকে গৃহ, গৃহকে মঠ প্রভৃতি বলা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়; ইহা অজ্ঞতারই দ্যোতক ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

বিচার না করা যেরূপ অনুচিত, বিচারে ভ্রান্তিও তদ্রূপ ভয়াবহ। বিচারভ্রান্তি ঘটিলে সত্যকে অসত্য, সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু, গৃহকে মঠ ও মঠকে গৃহ বলিয়া ভ্রম হয়। সেইজন্য মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

'সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥'

তাই আমরা বিচার-ভ্রান্তির দুই একটি বিষয় লইয়া অদ্য আপনাদের নিকট উপস্থিত হইতেছি এবং প্রকৃতভাবে বিচারগ্রহণ ও বিচারভ্রান্তি-পরিত্যাগের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিচার-পন্থা অবলম্বন করিলে আমরা দেখিতে পাই,—

গর্ভধারিণী জননী ও ধাত্রীর আচরণ, ক্রিয়াকলাপ ও হাবভাব একপ্রকার হইলেও উভয় বস্তু এক নহে। জননীর অপত্য-স্নেহ ধাত্রীতে জন্মে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোমতী ও পূতনার ব্যবহার দৃশ্যতঃ একপ্রকার হইলেও বস্তুতঃ এক নহে। বরং বিপরীত। যাঁহারা বাহিরের আচরণ বা

ক্রিয়াদি দ্বারা জননী ও ধাত্রী বা যশোদা ও পূতনাকে সম জ্ঞান করেন, তাঁহারা বস্তুর যথার্থ পরিচয় হইতে দূরে থাকেন। ফলে, প্রথমতঃ আত্মবঞ্চনা, দ্বিতীয়তঃ পরবঞ্চনা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জড়চক্ষুর প্রদত্ত সংবাদে নির্ভর করিয়া ভোগ-বাসনাময় জড়মন সর্বদাই উপরিউক্ত ভ্রম করিয়া থাকে। বিচার-ভ্রান্তিবশতঃ অনেকেই যশোদার স্থানে পূতনার হাতে পড়িয়া বিপদগ্রস্ত হন।

পরমার্থরাজ্যেও এই জাতীয় ভ্রম অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বাহিরের দৃষ্টিতে পরমার্থ ও জড়ীয় অর্থ বা ভোগাবস্তু—ভগবানের সেবা ও স্বীয় ইন্দ্রিয়-তোষণকে অনেকেই একরূপ দর্শন করেন। অনেকে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া পুত্রকন্যাদি লইয়া অর্থোপার্জ্জনপূর্বক দিনপাত করেন এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-জনিত ভোগে প্রমত্ত থাকেন। ইঁহারা সংবাদ রাখেন না যে এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর দেহ ভবসাগর-তরণের সুপটু প্লব। কিন্তু যাঁহারা এই মনুষ্যদেহের এই বিশেষত্ব অবগত হইয়া ক্ষণকাল-মাত্র বিলম্ব না করিয়া মৃত্যু উপস্থিত হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে সর্বদা ভবজলধি-উত্তরণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যদি ঐ জাতীয় ভোগপরায়ন মানবগণ স্বীয় ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবপূর্ণ মনের দ্বারা মাপিতে যান, তবে জননীর স্থানে ধাত্রী বা যশোমতীস্থানে পূতনা দেখিয়া ফেলিবেন।

মঠ বলিয়া যে বস্তুটী বাহিরের দৃষ্টিতে গৃহস্থলীলার ন্যায় প্রতীত হয়, বস্তুতঃ উহা গৃহস্থালী নহে। যাঁহারা সর্ব্বস্ব বিষয়ভোগ হইতে তুলিয়া লইয়া বৈষ্ণবের আনুগত্যে আত্মস্থ হইয়া অহর্নিশ কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় নিরত, তাঁহারাই মঠে বাস করেন। মঠবাসীর সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ভোগরহিত-চেষ্টা এবং দীনচেতা গৃহীদিগের প্রতি দয়ার কার্য্য নানা-আকারে প্রকাশিত হয়। মঠবাসিগণ সরলভাবে সর্ব্বস্ব শ্রীভগবানে অর্পন করিয়াছেন আর গৃহী সর্বস্ব অর্পন করা দূরে থাকুক, কপর্দ্দক-মাত্রও অনেক সময়ে শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োগ করিতে চাহে না। মঠবাসিগন জীবে-দয়ার কার্য্যে ব্রতী বলিয়া ঐ জাতীয় কৃপন-স্বভাব গৃহীর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহার নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া তাহারই কল্যাণ-বিধান করেন। গৃহীর অর্থ সংগ্রহ করিয়া মঠবাসী স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না।

মঠবাসীর আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা নাই তাই হৃষীকেশ তাঁহার সমস্ত হৃষীক অপহরণ করিয়া নিজে সেই ধনের অধিকারী হইয়া রাজা সাজিয়াছেন। মঠবাসী হৃষীকেশকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া সংগৃহীত বস্তুদ্বারা নিত্যকাল তাঁহার সেবা করিতেছেন। এই সেবাকার্য্যে মঠবাসীর স্বতন্ত্রতা নাই। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের আনুগত্যে অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাই মঠের একমাত্র কৃত্য।

মঠবাসিগন বদ্ধজীবের সুকৃতি জন্মাইয়া তাহাদের সাধুসঙ্গলাভের পথ সুগম করিয়া দিতেছেন। এই পথ-নির্ম্মাণ ও পথপ্রদর্শন-কার্য্যের জন্য মঠের বিবিধ অনুষ্ঠান। যাঁহারা মঠের নিত্যদয়ামূলক অনুষ্ঠানসমূহকে গৃহীর নিষ্ঠুরতামূলক ও আত্মহননকারী অনুষ্ঠানের সহিত তুল্য-বুদ্ধি করেন, তাঁহাদের দুর্ভাগ্য দর্শন করিয়া মঠবাসিগণ নিত্যকাল আক্ষেপোক্তি করিয়া থাকেন। যাহারা দুষ্কৃতির বশবর্ত্তী হইয়া মঠকে গৃহ, মঠবাসীকে গৃহী, বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব-জ্ঞানে আত্মম্ভরিতার কূপে পতিত হইতেছে, তাহাদের –"গতি নাই কোনকালে"।

মঠ বদ্ধজীবের—ভবরোগীর চিকিৎসালয়। এখানে ত্রিতাপ-উন্মুলনকারী ঔষধ ও পথ্য প্রদানের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে। এখানে যে জীবসেবা (?) তদ্রূপ জীবসেবা গৃহী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী করা দূরে থাকুক, তাহার ধারণাও করিতে পারে না। এখানে জীবহিংসার কোন ব্যবস্থাই নাই—জীবের সত্তারাহিত্য বা সত্তা রাখিয়া উহাকে জড়বৎ অবস্থা-প্রদানের চেষ্টারূপ হিংসার অনুষ্ঠান করা হয় না। এখানে বোদ্ধা আছেন, বোধ্য আছেন ও বোধ আছেন। এই তিনের নিত্য সহজ সম্বন্ধ মূর্ত্তিমন্ত হইয়া এই মঠে নিত্য বিরাজ করে। সুতরাং মঠ-বিদ্বেষ বা মঠবাসীর প্রতি গৃহস্থলীলার ভার আরোপ জীবহিংসারই পরাকাষ্ঠা।

হিরণ্যকশিপু সর্বদা 'হিরণ্য' (অর্থাদি) ও কশিপু (উত্তম শয্যাদি ভোগবিলাসের দ্রব্য) প্রাপ্তি, সংগ্রহ ও ভোগের চেষ্টায় বিব্রত সুতরাং তদ্‌বিপরীত বস্তু বিষ্ণু বা

বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব)-দর্শনে অন্ধ। প্রহ্লাদ সর্ব্বদাই হিরণ্যকশিপুর বিপরীত দর্শনযুক্ত। তিনি হিরণ্য ও কশিপুতে কোনপ্রকার আহ্লাদ অনুভব করেন না। তাঁহার প্রকৃষ্ট আহ্লাদ বিষ্ণু-বৈষ্ণবে আবদ্ধ। এইজন্য হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদে নিত্যকাল বিরুদ্ধভাব সমান্তরাল রেখার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। এই দুই রেখা কখনও মিলিত হয় না। 'তামাক'ও খাব 'ডুড' ও খাব দুই কার্য্য যুগপৎ চলিবে না।

একদিন হিরণ্য-কশিপু যখন প্রহ্লাদকে নিজের ভোগ্য-বস্তুজ্ঞানে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া তাঁহার মস্তক চুম্বন পূর্ব্বক তাঁহার গুরুগৃহে অভ্যস্ত পাঠের হিসাব-নিকাশ লইবার ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "বৎস প্রহ্লাদ! তুমি গুরুগৃহে এই কয়মাস যাহা পড়িয়াছ তাহা আমাকে বল।" উত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ, রাম, শ্যাম, যদু, টাকা, পয়সা, রাজা, যুদ্ধ-বিদ্যা, স্বদেশ, বিদেশ, বানান, সন্ধি, সমাস, উত্তমা সুন্দরী কবিতা কিছুই না বলিয়া বলিলেন, "হে অসুরশ্রেষ্ঠ, যাঁহারা সর্বদা অসৎবস্তুর সঙ্গ করার ফলে নিয়ত উদ্বিগ্ন-চিত্তে দিন যাপন করিতেছেন, তাঁহারা আত্মাবরণকারী গৃহান্ধকূপ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমনপূর্বক শ্রীহরিকে আশ্রয় করিলে, তাহাদিগের নিত্যকল্যাণ নিত্যশান্তিলাভ ঘটিবে।

অন্ধকূপসদৃশ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শুধু পরিষ্কৃত ও মুক্তস্থানে বাস করার চেষ্টার ন্যায় বনে গমন করিলে কোন শ্রেয়োলাভ হইবে না। জীবের হরিভজনই কৃত্য, হরিপাদাশ্রয়ই উদ্দেশ্য; উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া শুধু সুখলাভ ও মুক্তিলাভের আশায় গিরিগহ্বরে নির্জ্জন কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে কি হইবে? গৃহ ও বনে প্রভেদ কি? বনে গমন করিয়া দিবারাত্র গৃহ-চিন্তা করিলে তাহা কি বনবাস না গৃহবাস? গৃহে আসক্তি—ভোগবুদ্ধিই গৃহের অন্ধ-কূপত্ব।

যে গৃহী গৃহে আসক্ত নহেন তিনিই বনবাসী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী। যাঁহার একমাত্র কৃত্য হরিভজন, তিনি গৃহে থাকিয়াও গৃহবাসী বা গৃহস্থ নহেন তিনি মঠবাসীর বন্ধু; মঠবাসী তাঁহার সঙ্গের জন্য লালায়িত। ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় মঠবাসী বলেন—

"গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে,
এ অধম মাগে তাঁর সঙ্গ।"

গৃহান্ধকূপস্থিত সদা উদ্বিগ্নচিত্ত জীবের প্রতি যখন মঠবাসী দয়া প্রকাশ করেন, তখনই সেই পতিত অসুবিধা-গ্রস্ত জীব মঠ ও মঠবাসীকে জানিতে ও বুঝিতে পারে। গৃহান্ধ-কূপে থাকিয়া কূপমণ্ডুকের ন্যায় দিবাকরোজ্জ্বলা শ্যামলা বসুন্ধরা বা মাপ করিবার প্রয়াসের ন্যায় যাঁহারা মঠ বা মঠবাসীকে বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ভ্রান্তির অবধি কোথায়?

আমাদের প্রথম গলদ হইতেছে—অধোক্ষজ-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে যাহা সেই বস্তুকে চক্ষু, কর্ণ, মনাদির দ্বারা মাপিয়া বা জানিয়া লইবার বহির্ম্মুখী চেষ্টা। নিজের ইন্দ্রিয়-সম্বল নিয়ে সে-বিষয় ধারণার্থ জল্পনা-কল্পনা করা বৃথা সময়ক্ষেপ মাত্র; তাতে মঙ্গল তো' দূরের কথা অমঙ্গলের আশঙ্কাই বেশী।

ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাদি দোষ বদ্ধজীব-মাত্রেরই আছে। এমত দোষরোগগ্রস্তাবস্থায় নিজ মনের বা তদনুকূল যুক্তির সাহায্যে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে বিচার-ভ্রান্তি দূর করা অসম্ভব। আমরা বিচারাক্ষম মূর্খ বলিয়াই সিদ্ধান্তবিদ্ বিদ্বান্ ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে সমস্ত কুবিচার নিরসনপূর্বক সৎসিদ্ধান্ত বা সুবিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণও সেই সব অতীন্দ্রিয় শ্রীমদ্ভাগবত-কথা আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা অসাধুসঙ্গে যে সব কুবিচার শ্রবণ করিয়াছি সেগুলি সম্পূর্ণ-রূপে পরিহার পূর্বক এখন যদি সাধুগণের মঙ্গলময় উপদেশাবলী প্রণিপাত অর্থাৎ মনোযোগ, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি নিয়ে শ্রবণ করিবার জন্য ব্যাকুল হই, আমাদের অস্থির সিদ্ধান্তে বা বিচারে ঔদাসীন্য প্রদর্শনপূর্বক সাধুগুরু ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তে দৃঢ়শ্রদ্ধ হই তাহা হইলে আমরা আর অসুবিধার কবলে কবলিত হইব না। অতএব—

সাধু শাস্ত্র গুরু-বাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।'

এই মহাজনবাণীটী আমাদের হৃদয়ঙ্গমের বা আদর্শের বিষয় হইলে বিচার-ভ্রান্তি হইতে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যাইবে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আমরা বিচারে পারঙ্গত হইয়া ভজনোন্নতি-লাভে সমর্থ হইব, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই বা থাকিতে পারে না। কারণ এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বা আদর্শ শ্রীনারদ-প্রহ্লাদাদি মহাজনগণের জীবনীতেও আমরা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাই। অতএব এক কথায় বলিতে গেলে, শ্রৌতপথ বা গুরুবাক্যে দৃঢ়-নিশ্চয়তাই এ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এতদ্ব্যতীত ভজনের প্রধান প্রতিবন্ধক বা কণ্টকস্বরূপ এই বিচার-ভ্রমের আক্রমণের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আর কোনও দ্বিতীয় পন্থা নাই—নাই নাই।

বুজ্‌রুকী

আমরা পোষাক দেখিয়া সাধু ঠিক করি। সাধুর পোষাক অনেক রকম। গৃহস্থের মত কাপড়চোপড় পরিয়া সঙ্গে সঙ্গে কিছু ধার্ম্মিকের চিহ্ন ধারণ করা এবং ভাল কথা বলা, ইহাদিগকে গৃহীসাধু বলে। আর একরকম সাধু আছেন, তাঁহাদিগকে ত্যাগী সাধু বলে। ইহারা গৃহস্থের পোষাক ত্যাগ করিয়া গৈরিক কাপড় পরেন, জটা রাখেন, রুদ্রাক্ষাদ্রি ধারণ করেন, গায়ে ছাই মাখেন। আর এক রকম সাধু আছেন, তাঁহারা কাপড় পড়েন বা তাহা না পরিয়া পরমহংসের শুভ্র বসন পরেন, মাথা মুড়ান, শিখা রাখেন বা অশিখ থাকেন, হরিমন্দির-তিলকে ভূষিত হন, গলায় তুলসী ধারণ করেন, এইরূপ অনেক সাধু আমরা দেখিতে পাই।

একটা কথা আছে—"ভেকে ভিখ মিলে"॥ মানুষ যখন পরিশ্রম করিয়া ভাল খাইতে পরিতে পায় না, তখন কেহ কেহ ভিখ পাইবার জন্য বেষ পরিয়া সাধু সাজেন। এই জাতীয় ভিখারী আমরা প্রতিদিন ঘরে বসিয়া হাজার হাজার দেখিতে পাই। সত্য সত্য সাধু যেমন মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান, তারাও দেখিতে ঠিক তাঁহাদিগেরই মত। নকল সাধুগুলি গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়া ভিক্ষা চায়, কাকুতি মিনতি করে, আশীর্ব্বাদ করে বা নিরাশ হইয়া অভিশাপ দেয়। তাহারা উদরের চিন্তায় অস্থির, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত। ইহাই সাধুর বেশধারী অসাধুর বুজ্‌রুকী।

যাঁহারা যথার্থই সাধু তাঁহাদিগের অপর নাম 'সৎ'। 'সৎ' বলিলে আমরা সাধারণতঃ ভাল লোক মনে করি সত্য কথা বলে, ভিখারী দেখিলে পয়সা দেয়, ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্য দেয়, মাথা উঁচু করিয়া কথা কয় না, কাহাকেও কর্কশ কথা বলে না ইহাকেই সাধারণতঃ 'সৎ' বা 'সাধু' বলে। কিন্তু সাধারণত লোকের বিচার ও শাস্ত্রের বিচার পৃথক্। শাস্ত্রে—যিনি চিরকাল এক অবস্থায় আছেন, যিনি এমন কর্ম্ম করেন না, যাহা বদলাইয়া যায়, এমন জিনিষ লইয়া যিনি ব্যস্ত হন না যাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং যিনি ভগবান্ ছাড়া আর সকল জিনিষকে অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বা পরিবর্ত্তনশীল মনে করিয়া তাহা ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হন না, তাঁহাকেই 'সাধু' বা 'সৎ' বলিতেছেন।

এই দুই প্রকার সাধুর বিষয় আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইব যে, যাহাকে নকল সাধু বলি, তাহা একটী পরিবর্ত্তনশীল মাংসপিণ্ড—আকার মানুষের উপরে কতকগুলি আশ্রমের পরিচায়ক চিহ্ন। এই সাধুর মতলব ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করা, বিনাশ্রমে বিনাব্যয়ে অপরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাওয়া। কিন্তু শাস্ত্র লোকের মনেতে ধূলি দেওয়ার জন্য কতকগুলি বেশ পরানো এই মাংসপিণ্ডকে 'সৎ' বা 'সাধু' বলেন না। 'সৎ' বস্তু একমাত্র ভগবান্—তিনি সৎ অর্থাৎ নিত্যকাল একই ভাবে আছেন কেহ তাঁহার থাকা লোপ করিবে বা

বদলাইতে পারেন না। 'জীব' তাঁহার অণু অংশ বলিয়া জীবও সৎ। এই জীব বিভিন্ন দেহে থাকিতে পারে তবুও কিছু মাত্র বিকৃত বা রূপান্তরিত হন না। এই তত্ত্বটী যে-জীব ভুলিয়া যান তিনি নিজকে অসৎ বোধ করেন, অর্থাৎ জীবের আশ্রয় দেহটীকে জীব মনে করিয়া সেই দেহটারই সুখের চেষ্টায় ঘুড়িয়া বেড়ান। কিন্তু যে জীব বোধ করেন, তিনি যে দেহটীকে আশ্রয় করিয়া আছেন, তাহা তিনি নহেন তিনি সৎ—ভগবানের সেবাকারী অণু-অংশ তাঁহাকেই শাস্ত্রে সৎ বা সাধু বলিয়াছেন আমরা সৎ বা সাধু বলিলে এই বোধ সম্পন্ন জীবকেই বুঝিব। এই জীবের মতলব ভিন্ন প্রকার।

এই সাধুর আগমনে গৃহস্থের চিত্তে আহ্লাদের সঞ্চার হয়। দূরদেশ হইতে দীর্ঘ কাল পরে পিতার আগমনে পিতার অদর্শন ক্লিষ্ট পুত্রের যে প্রকার আনন্দ উছলিয়া উঠে, সাধুর দর্শনে ও সাধুর সঙ্গলাভে যাহার ভগবানের সেবা বা ভজন ছাড়িয়া সংসারের তাপে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাঁহারও পরমাত্মীয়লাভের ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া উঠেন এবং নিজের দুঃখের কথা বলিয়া তাঁহারা প্রতিকার প্রার্থনা করেন। সাধুর মতলব যাহা, গৃহস্থ তাহাই চাহিয়া বসে।

সাধুর উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে তিনি দেখিতে পান, জীব নিজেকে অসাধু বা অসৎ বোধ করিয়া কতই না ক্লেশ ভোগ করিতেছে—তিনি তাহার এই ক্লেশের মূল উৎপাটনে যত্নশীল। জীবের এই দুঃখ শুধু এই এক জন্মের নহে, লক্ষ লক্ষ জন্ম সে এই দুঃখ ভোগ করিতেছে। কি করিলে জীবের এই ক্লেশ দূর হইবে, তাহার ব্যবস্থাও ভগবান্ নিজে বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "জীবে দয়া করিতে হইলে তুমি আমার নামে রুচিবিশিষ্ট হও" যে জিনিষে আমার রুচি জন্মে, তাহা আমরা ত্যাগ করিতে কষ্টবোধ করি। সুতরাং যাঁহারা সৎ তাঁহারা ভগবানের নাম কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না এবং এই নামকীর্ত্তন দ্বারা তিনি অপর অসৎবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবকে সৎ বুদ্ধিবিশিষ্ট করিয়া দিতে পারেন। সুতরাং সাধুর মতলব—বুজ্‌রুকী বা পরবঞ্চনা নহে তাঁহার উদ্দেশ্য "জীবে দয়া—নামে রুচি।

বাজারে নকল নোট চলে বলিয়া কি আসল নোটের সমাদর নাই? কিংবা নকল নোট বাজারে আছে বলিয়া কি আমরা আসল নোট গ্রহণ করিব না? কিংবা আসল নোটকেও নকলের দলে ফেলিয়া নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইব?'—আমরা এমন বোকা নহি। এই নকল বা চালাকীর দিনেও বাজারে আমরা আসলকে পরীক্ষা করিয়া যত্নের সহিত গ্রহণ করিব, নকলকে দূরে রাখিব এবং নকল-প্রদাতাকে বিচারালয়ে প্রেরণ করিব—যাহাতে নকলের প্রচার বৃদ্ধি না পায়। সাধুর মতলবের মধ্যে এইটীও একটী বড় মতলব।

তাঁহারা মেকীর লক্ষণ ঢেঁড্‌রা পিটাইয়া সকলকে বলিয়া বেড়ান এবং সকলকে সাবধান করেন। যাহারা নিজেরা মেকী বা নকল, তাহারা সাধুর মতলবকে 'নিন্দা' আখ্যা প্রদান করিয়া অন্ধকারের আড়ালে থাকিয়া গলবাজি করিয়া বেড়ান। তাই সাধুর কথা—"সাধু সাবধান"

—::*::—

শ্রীল পুরী মহারাজের বক্তৃতা

সমবেত সজ্জনবৃন্দ অদ্যকার আলোচ্য বিষয়—'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের দয়া"। শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু একটী শ্লোকে তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

এই শ্লোকটীতে তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কথা

বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অচৈতন্য বিশ্বে কৃষ্ণনাম-প্রেম বিতরণ পূর্ব্বক জীবকুলকে চৈতন্য দান করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইলা।
করাইলা চৈতন্য কীর্ত্তন প্রকাশিলা॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্ব্বলোক তোমা হইতে হইলেন ধন্য॥

তাঁহার রূপ গৌরবর্ণ—সেই স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন তাই তাঁহার রূপ গৌরবর্ণ, তাঁহার গুণ—মহাবদান্য। কৃষ্ণ প্রেম প্রদানই তাঁহার লীলা।

'দয়া' কথাটী বলিলে উপাধিযুক্ত অবস্থায় আমরা যাহা বুঝি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়া সেরূপ নহে, তাঁহার দয়ার বৈশিষ্ট্য আছে। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

বিচারের দুইটী পন্থা আছে। একটি আরোহপন্থা, আর একটী অবরোহপন্থা। আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক, মন, বুদ্ধির সাহায্যে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা বস্তুদর্শন করিয়া যে বিচার করি তাহা আরোহ পন্থার বিচার। দৃশ্যবস্তুকে নিজের আলোকের সাহায্যে দর্শন না করি। যদি তাঁহার শরণাগত হই এবং তাঁহার আলোকের সাহায্যে তাঁহাকে দর্শন করি, তাঁহার দয়া বিচার করি—এই পন্থাটির নাম অবরোহ পন্থা। জাগতিক আলোকের সাহায্যে সূর্য্য দর্শন করিবার বৃথা চেষ্টা আরোহ পন্থা এবং সূর্য্যের শরণাগত হইয়া তাঁহার প্রেরিত আলোকের সাহায্যে তাঁহাকে দর্শন করা অবরোহ-পন্থার উদাহরণ।

আমাদের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই চারিটি দোষ আছে। সুতরাং আমরা এইরূপ অধক্ষজজ্ঞানকে সম্বল করিয়া যদি তাঁহার অসার কথা আলোচনা করিতে যাই তবে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইব।

শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অধোক্ষজ বস্তু। অতএব তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলার কথা, তাঁহার দয়ার কথা যদি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সাহায্যে মাপিতে যাই তবে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে অনেক সময় বিপরীত ধারণা করিব, তাঁহাকে দয়ালু না বলিয়া নিষ্ঠুর বলিব।

আবার আমাদের কল্পিত দয়ার সহিত তাঁহার দয়া যদিও কোন কোন স্থলে বাহ্য দর্শনে একই প্রকার লক্ষিত হয় তাহা হইলেও আরোহ-পন্থার বিচারে তাঁহার ঐ দয়ার মধ্যেও যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব না।

তাঁহার দয়াটী যে অক্ষজজ্ঞানগম্য নহে, তাহা আমরা তাঁহার দুই একটী লীলার কথা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায়—

প্রভু সে পরম ব্যয়ী ঈশ্বর ব্যবহার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥
দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি।
অন্নবস্ত্র কড়ি পাতি দেন গৌরহরি॥

তাঁহার এই দয়ার কার্য্যটী জনসাধারণের কল্পিত দয়ার সহিত বাহিরে মিল দেখা গেলেও তাহার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে অর্থাৎ অন্নবস্ত্রাদিরূপ ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ দ্বারা আত্মার নিত্যকল্যাণ-বিধানই যে তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা সাধারণে বুঝিতে পারেন না।

যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে দয়ালু-শিরোমণি বলা হয় তাঁহার কোন কোন লীলা বাহ্যদর্শনে দেখিতে গেলে তাঁহাকে অনেকে নিষ্ঠুর বলিলেন। তিনি অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা জননী শচীদেবীকে ও ষোড়শবর্ষীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিরাশ্রয় এবং কপর্দ্দ শূন্যাবস্থায় রাখিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা-অভিনয় করিলেন, ছোট হরিদাস ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে তাঁহার সেবার ছলনায় মাধবী দাসীর নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিলে তাহাকে বর্জ্জন করিলেন। কিছুতেই ক্ষমা করিলেন না, এমন কি, প্রয়াগে ত্রিবেণীতে দেহত্যাগের পরও তাহার জন্য কোন দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। আবার বৈষ্ণবাপরাধী চাপাল-গোপা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলে প্রথমবার তাহাকে

তিরস্কার করিয়া বিদায় দিলেন। যাঁহারা নৈতিক ভূমিকায় অবস্থান করিতেছেন, জাগতিক নীতি অপেক্ষা ভক্তিনীতির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা অক্ষজ-বিচারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ঐ প্রকার লীলাবলীর গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন না এবং তাঁহাকে করুণাময়-বিগ্রহ বলার পরিবর্ত্তে বিপরীত কথাই বলিবেন। সুতরাং গৌর-ভক্তগণের নিকট শ্রৌতপথে তাঁহার দয়ার কথা বিচার করিতে হইবে; তাহা হইলেই আমরা তাঁহার দয়ার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারিব। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

গৌরাঙ্গের নিগূঢ়-লীলা বুঝিতে কার শক্তি।
সেই জানে গৌরচন্দ্রে যার দৃঢ়ভক্তি॥

দয়া দুই প্রকার। মন্দ-উদয়া দয়া ও অমন্দ-উদয়া দয়া। কোন ব্যক্তির অন্নবস্ত্রের অভাব হইয়াছে ইহা দেখিয়া কেহ অন্ন-বস্ত্র দিয়া তাহার অভাব দূর করিলেন কিন্তু তাহার আবার রোগ-শোক প্রভৃতি অন্য প্রকারের দুঃখ আসিয়া তাহাকে উদ্বেগ দিতে লাগিল। এইরূপে এক প্রকার অভাব দূর করিলে অন্যপ্রকারের অভাব আসিয়া উপস্থিত হয় কিংবা যে সব অভাব দূর করা হইল তাহা পুনরায় কিছুদিন পরে দেখা দিল, এইরূপে জন্ম-জন্মান্তরে সেই ব্যক্তি ত্রিতাপের দ্বারা ক্লিষ্ট হইতে থাকে, স্থায়ীভাবে তাহার দুঃখ-মোচনের কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন না। কোন ব্যক্তি অনাহারে মরিয়া যাইতেছিল তাহাকে খাদ্য দিয়া বাঁচাইলেন, তখন সে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় কোন সতী নারীর প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইল, কারণ সে, বাঁচিয়া কি করিলে তাহার জীবন সার্থক হইবে? কেন ঐ প্রকার কষ্ট পাইতেছিল? সে-সব শিক্ষা দয়ালু ব্যক্তির নিকট পান নাই। অর্থাৎ ঐ প্রকার দয়ালু ব্যক্তির এমন কোন সম্পত্তি নাই যদ্দ্বারা তিনি স্থায়ীভাবে দুঃখ-নিবারণের ব্যবস্থা করিতে পারেন অথবা গৃহীতার পরে কোন প্রকার মন্দ উৎপন্ন না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন। পূর্ব্ব প্রকারে দয়ার দ্বারা স্থায়ীভাবে কোন উপকার হয় না বরং পুনঃ পুনঃ মন্দ উৎপন্ন হয় তাই ঐরূপ দয়ার নাম মন্দ-উদয়া দয়া।

আর এক প্রকারের দয়া আছে তাহার নাম অমন্দ-উদয়া দয়া, এই দয়া যাঁহারা গ্রহণ করেন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার অভাব, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নিত্যকালের জন্য বিদূরিত হয়, এমন কি, অভাব ও দুঃখের মূলটী পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। এই দুঃখাদি ও তাহার মূল বিনাশকার্য্যটী অমন্দ-উদয়া দয়ার আনুসঙ্গিক ফলমাত্র, তাঁহার মুখ্য ফল—কৃষ্ণপ্রেম। যাঁহারা প্রেমদাতা শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের দয়া লাভ করিয়াছেন কিম্বা যাঁহারা গৌরভক্তগণের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যের দয়া বিচার করেন তাঁহারাই এই অমন্দ-উদয়া দয়ার সহিত লৌকিক দয়ার বৈশিষ্ট্য কি তাহা বুঝিতে পারেন।

দুই প্রকার চিকিৎসক দেখা যায়। যাঁহারা চিকিৎসা শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ অথচ চিকিৎসা ব্যবসা করেন, তাঁহারা রোগের মূল কারণ স্থির করিতে না পারিয়া কেবল উপসর্গের চিকিৎসা করেন। ইহাতে ২।৪ দিনের জন্য কোন উপসর্গ কম হইলেও পরে আবার প্রবলভাবে রোগটী পাকিয়া উঠে; তখন রোগীর প্রাণ লইয়া টানাটানি হয়। কিন্তু সুচিকিৎসক উপসর্গের চিকিৎসা না করিয়া রোগের মূল ধরিয়া চিকিৎসা করেন। যেমন কোন ব্যক্তির কোষ্ঠবদ্ধরূপ মূলকারণ-বশতঃ বিভিন্ন উপসর্গের সৃষ্টি হইয়াছে। এ অবস্থায় যে চিকিৎসক মূলকারণ স্থির করিতে না পারিয়া কেবল উপসর্গের চিকিৎসা করেন তিনি রোগ নিরাময় করিতে পারেন না, কিন্তু সুচিকিৎসক কেবল দুই এক মাত্রা কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবার ঔষধ দিয়া বা যন্ত্রের সাহায্যে কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া অতি সহজভাবে রোগীকে সুস্থ করিয়া দেন। সেই প্রকার জগজ্জীব এই ত্রিতাপে কেন ক্লিষ্ট হইতেছে? তাহার মূলকারণ স্থির না করিয়াই অনেকে ক্লেশ দূর করিবার জন্য ছুটাছুটি করেন অর্থাৎ তাঁহারা প্রথম প্রকার চিকিৎসকের মত কার্য্য করেন তাই স্থায়ীভাবে ক্লেশ দূর করিতে পারেন না, তাই পুনঃ পুনঃ মন্দ উদিত হয়। কিন্তু যাঁহারা ভব-রোগ-বৈদ্য তাঁহারা উপসর্গের চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত না হইয়া রোগের মূল ধরিয়া চিকিৎসা করেন—সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের মূলকারণ অবিদ্যাটী বিনাশ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব সেই ভবরোগ বৈদ্যগণের শিরোমণি; তাই তিনি বলিয়াছেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥

তিনি পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উপকার করিবার আদেশ করিয়াছেন। যে উপকার করিলে পরে মন্দ উদিত হয় সেরূপ দয়া করিতে বলেন নাই বা সেরূপ আদর্শ দেখান নাই। তিনি অমন্দ-উদয়া দয়া বিতরণ করিবার আদেশই দিয়াছেন এবং সেই আদর্শই দেখাইয়াছেন, তিনি কৃষ্ণ-নাম-প্রেম বিতরণ করিয়াছেন।

তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন—

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥

পরে কর্ম্মীগণের মন্দ-উদয়া দয়া ও শ্রীচৈতন্যদেবের এবং চৈতন্যভক্তগণের অমন্দ-উদয়া দয়ার বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার জন্য জীবের বিভিন্ন ভূমিকার কথা, নৈতিকগণের মন্দ-উদয়া দয়ার পরিণাম, জীবের স্বরূপ-ধর্ম্মের কথা, তটস্থশক্তি জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে অবিদ্যাগ্রস্ত হওয়া বা মায়ার বশবর্ত্তী হওয়াই ত্রিতাপের মূল কারণ প্রভৃতি কথাগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া করুণাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম-প্রেম-বিতরণরূপ করুণার কথা বর্ণিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়ার কথা ২।১ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে বর্ণন করা অসম্ভব। এখন দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু দার্শনিক বিচারের দ্বারা শ্রীচৈতন্যের দয়ার বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করিবেন। আশা করি, আপনারা আরও কিছু সময় ভিক্ষা দিবেন এবং ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত বাণী শ্রবণ করিয়া পরম তৃপ্ত হইবেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কথা ও শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার কথা যে-সকল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই প্রধান। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়াছেন। অদ্য আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে তাঁহার শিক্ষার কথা কি আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যদেব ৪৪৭ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে নবদ্বীপ দেখিতে অন্যান্য দেশ বা গ্রামেরই মত তবে তাহার পূর্ব্বে "শ্রীধাম" এই কথাটী বলিবার তাৎপর্য্য কি? এবং 'জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন' না বলিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন' এইরূপ বলিবার আবশ্যকতাই বা কি?

তদুত্তর এই যে, শ্রীভগবানের স্বরূপ, তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য, লীলা ও শ্রীধাম এই সমস্তই অধোক্ষজ তত্ত্ব অর্থাৎ অক্ষজ ইন্দ্রিয়ের গম্য নহেন। যাহা প্রাকৃত দর্শনের গ্রাহ্য নহে তাহা প্রাকৃতদর্শনে দেখিবার চেষ্টা করিলে প্রাকৃত বলিয়াই মনে হইবে কিন্তু তাহার বাস্তব-স্বরূপ দর্শন হইবে না।

অধোক্ষজ বস্তু স্বতঃ প্রকাশতত্ত্ব সুতরাং উহা দর্শন করিতে হইলে আরোহপন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবরোহপন্থা বা শ্রৌতপথ আশ্রয় করিতে হইবে। অন্য কোন আলোকের সাহায্যে সূর্য্য দেখা যায় না। সূর্য্যের শরণাগত হইলেই তাঁহার প্রেরিত আলোকের সাহায্যে তাঁহাকে দেখা যায়; সেইরূপ শ্রীভগবত্তত্ত্ব, ভগবদ্ধাম ও লীলার কথা বুঝিতে হইলে অক্ষজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইবার চেষ্টারূপ আরোহপন্থা ছাড়িয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী বৃত্তির সহিত শ্রীভগবানের প্রেরিত জন, তাহা হইতে অভিন্নবিগ্রহ দিব্য-আলোক-প্রদাতা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন করিতে হইবে। অবশ্য 'গুরু' বলিতে লৌকিক বা কৌলিক গুরুর কথা কেহ যেন মনে না করেন। শ্রীগুরুদেব শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ তিনি জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী। তিনি অধোক্ষজ-তত্ত্ব নিত্যকাল দর্শন করেন এবং দর্শন করাইতে পারেন।

সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটে শরণাগত হইলে তিনি বৈকুণ্ঠবাণী বা শ্রীনাম কীর্ত্তন করেন, ঐ শ্রীনাম নামী হইতে বা শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন-তত্ত্ব অর্থাৎ শব্দব্রহ্মরূপে শ্রীভগবান্ প্রকটিত হন সুতরাং শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ-বিগলিতা বাণী ও প্রাকৃত ভূতাকাশের শব্দ বা অক্ষর এক নহে ; সেই বৈকুণ্ঠ শব্দ সেবোন্মুখবৃত্তির সহিত শ্রবণ করিলে আমরা দিব্য আলোক প্রাপ্ত হই এবং আমাদের অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হয় অর্থাৎ অধোক্ষজ তত্ত্ব-দর্শনের অন্তরায় সমূহ বিদূরিত হয়। আমরা তখন বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হই, তৎকালে আমাদের স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিগত অভিমান থাকে না। সেই বিশুদ্ধসত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির হ্লাদিনী সমবেত-সার সম্বিৎবৃত্তি বা ভক্তিবৃত্তি কৃপাপূর্বক প্রকটিত হন। সেই ভক্তিচক্ষে আমরা শ্রীধামের স্বরূপ, শ্রীভগবানের স্বরূপ ও লীলাবলী দর্শন করিতে ও উপলব্ধি করিতে পারি।

শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বা অন্তরঙ্গা শক্তির সন্ধিনী-বৃত্তি দ্বারা শ্রীধাম নিত্য প্রকটিত। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে ভগবানের লীলা দুই প্রকার। যে লীলা সাধারণের নয়নগোচর হন তাহা প্রকট-লীলা। যাহা চর্ম্মচক্ষে লক্ষিত হন না তাহাই অপ্রকট লীলা। উভয় প্রকার লীলাই নিত্য। তবে প্রাপঞ্চিক লীলার বিশেষত্ব এই যে' উহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হন, এখন এই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত না থাকিলেও অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত আছেন। নির্দ্দিষ্টকাল পরে পুনরায় এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইবেন। এইরূপ অলাতচক্রের ন্যায় শ্রীভগবান্ লীলা-মণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও তিনি প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব, প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিতে প্রাপঞ্চিকের মত দৃষ্ট হন মাত্র। আবার যে স্থানে অবতীর্ণ হন তাহা প্রপঞ্চের অন্তর্গত, দেশ গ্রামের মত মনে হইলেও প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব বা অপ্রাকৃত ধাম উহা অন্তরঙ্গা শক্তির সন্ধিনী বৃত্তি দ্বারা প্রকটিত নিত্য ধাম ; কিন্তু প্রাকৃত জগৎ বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তির সন্ধিনী-বৃত্তি দ্বারা প্রকাশিত এবং তাহা নিত্য নহে তাই মহাজনগণ ভগবল্লীলাস্থলী নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতির পূর্বে 'শ্রীধাম' কথাটি বলিয়া থাকেন, তাহাতে ঐ স্থানের বৈশিষ্ট্য বা অপ্রাকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

বদ্ধজীব যেরূপ এজগতে জন্মগ্রহণ-কালে একটি দেহ আশ্রয় করিয়া আসে, কিছুদিন অবস্থানের পর সেই দেহটী ছাড়িয়া পরলোক গমন করে অর্থাৎ তাহাদের দেহ ও দেহীতে ভেদ আছে, তাহাদের দেহটী অনিত্য ; শ্রীভগবান্ সেইরূপ নশ্বর দেহ ধারন করিয়া এজগতে আগমন করেন না, তাঁহার দেহ-দেহী-ভেদ নাই, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। সেই বিগ্রহই এ প্রপঞ্চে প্রকটিত হন। পূর্বেই বলা হইয়াছে তিনি অলাতচক্রের ন্যায় লীলা-মণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছেন, সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডের লীলা সংগোপন করিয়া যখন অন্য ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকট করেন তখন তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের জন্য সাধারণের দৃষ্টির গোচরীভূত হন না। অতএব বদ্ধজীবের জন্ম-মৃত্যু এবং শ্রীভগবান্ ও ভক্তের অবির্ভাব-তিরোভাব-লীলা এক নহে, উভয়ের মধ্যে পূর্বোক্ত প্রকার বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যটী প্রকাশ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন' না বলিয়া 'অবতীর্ণ' বা 'আবির্ভূত' কিম্বা 'প্রকটিত' হইয়াছিলেন প্রভৃতি কথা ব্যবহার করা আবশ্যক। আবার যখন এই ব্রহ্মাণ্ডের লীলা সংগোপন করিয়া অন্য ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকট করেন তখন 'অপ্রকট' 'তিরোভাব' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিলে সাধারণের মৃত্যুর সহিত শ্রীভগবান্ ও ভক্তের লীলা-সংগোপনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়।

শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিই শ্রীধাম নবদ্বীপরূপে প্রকটিত। শ্রীধাম নবদ্বীপ অষ্টদল পদ্মের ন্যায় ; চারিদিকে আটটী দ্বীপ—যথা—শ্রবণাখ্য সীমন্তদ্বীপ, কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুমদ্বীপ, স্মরণাখ্য মধ্যদ্বীপ, পাদসেবনাখ্য কোলদ্বীপ বা বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর, অর্চ্চনাখ্য ঋতুদ্বীপ, বন্দনাখ্য জহ্নুদ্বীপ, দাস্যদ্বীপ বা মোদদ্রুমদ্বীপ ও সখ্যদ্বীপ বা রুদ্রদ্বীপ। ইহার কেন্দ্রস্থলে আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপে স্বয়ংরূপ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর শচীনন্দনরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

তিনি বাল্যলীলা, বিদ্যাবিলাসলীলা, গার্হস্থ্যলীলা

প্রকট করিয়া ২৪ বৎসরের পর সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি অচৈতন্যবিশ্বে কৃষ্ণনামপ্রেম বিতরণ করিয়া চৈতন্যদান করিবার জন্য সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলাভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন কাশীধামে শ্রীল তপন মিশ্রের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তাঁহার নিত্য পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁহার পাদ-পদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া (নিম্নলিখিত) দুইটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যথা—

কে আমি? কেন আমায় জারে তাপত্রয়?
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি॥

অনেকে মনে করিতে পারেন,—'আমি কে'? এই প্রশ্নটী হাস্যোদ্দীপক। কারণ আমার পরিচয় অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা আমি নিজেই ভাল জানি। কিন্তু 'আমিত্ব' সম্বন্ধে যে লৌকিক বিচার জগতে প্রচলিত আছে যথা আমি অমুকের পুত্র, আমার নাম অমুক, আমি অমুক দেশবাসী, আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি স্ত্রী বা পুরুষ, আমি রাজা, আমি দরিদ্র প্রভৃতি তাহা জানিবার জন্য বা জানাইবার জন্য গোস্বামী প্রভু উক্ত প্রশ্ন করেন নাই, যাহা জগতের লোক কেহই জানে না তাহা জানাইবার জন্য ঐ প্রশ্ন করিলেন। তিনি অবশ্য নিত্যপার্ষদ। সুতরাং উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের প্রকৃত উত্তর ও তাঁহার জানা আছে তবে কৃষ্ণ-বিমুখ জীব আমরা কেহই আমিত্বের প্রকৃত পরিচয় বা স্বরূপের পরিচয় জানি না এবং যে-ত্রিতাপে সর্ব্বক্ষণ ক্লিষ্ট হইতেছি তাহার মূল কারণও জানি না তাই আজ জগতের এই অশেষ দুর্গতি। তাই পরদুঃখদুঃখী গোস্বামী ঠাকুর পরদুঃখ-মোচনের জন্য তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিয়া ও তদুত্তরে শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণ করিয়া অচৈতন্য-বিশ্বে চৈতন্যদানকারী চৈতন্যবাণী প্রচার করিবার একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন।

পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ এই দুই প্রকার দেহে 'আমি-বুদ্ধি' করিয়া জগজ্জীব, মাদৃশ কৃষ্ণ-বিমুখ জীব আত্মবিস্মৃত হইয়াছে তাই জানে না আমি 'চিৎকণ জীব'। তাহারা জানে না—জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস এবং সর্বপ্রকার দুর্গতির মূলকারণ কৃষ্ণসেবা-বিস্মৃতি। সেই কথা জানাইবার জন্য তিনি ঐরূপ প্রশ্ন করিবার অভিনয় করিলেন। তখন এই শ্রীচৈতন্যবাণী জগতে প্রচারিত হইল—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥

সুখ কি?

দেখিতে পাওয়া যায় যে, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি সভ্য, কি অসভ্য, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, কি গৃহী, কি ত্যাগী, কি ভোগী, কি যোগী এবং কি মানব, কি পশ্বাদি—সকলেই সুখপ্রাপ্তির আশায় বদ্ধপরিকর। যদি কেহ সুষ্ঠুভাবে অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলের সুখাশাই তাঁহাকে যাবতীয় কার্য্যে প্রণোদিত করিতেছেন। সর্বপ্রকার ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক ও নিখিল জীবের চিত্তাকর্ষকরূপ পরম-কমনীয় ও সুমহান্ সুখ-নামক সম্রাটের প্রকৃত স্বরূপ কি? তৎসম্বন্ধে আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অনেক সময় শিশুগণ নিদ্রাভঙ্গের পর অকস্মাৎ প্রবল-বেগে ক্রন্দন আরম্ভ করে এবং ক্রন্দনকালে সান্ত্বনা করিবার জন্য উহাদিগকে অভিভাবক যে সমুদয় বাক্য প্রয়োগ

করিয়া থাকেন, তাহা উহারা শুনিতে চাহে না বরং ক্রমশঃ পূর্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত বেগে চীৎকার করিতে থাকে। বয়প্রাপ্ত মানবগণের মধ্যে বিচারশক্তির অভাবে সুখের প্রকৃত স্বরূপ কি ও কি প্রকার সাধন আশ্রয় করিলে সুখের সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা যাঁহারা স্বতঃ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, এবং কেহ বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও মনোযোগপূর্বক হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রস্তুত হন না, তাঁহারা নিতান্ত ভাগ্যহীন ও পূর্বোক্ত ক্রন্দনশীল শিশুগণের ন্যায় অত্যন্ত মূঢ়। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যেন সুখের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে ও তাহার যথোচিত সাধনে প্রবৃত্ত না থাকেন, ইহাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

অন্ধকার-গৃহে যখন দীপ জ্বলিতে থাকে তখন আমরা দেখিতে পাই যে, প্রদীপ-শিখা গৃহের চতুর্দ্দিকে আলোক বিকীর্ণ করিয়াও নিজ শিখাস্থ আলোকরাশিকে যথাস্থানে অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করে। এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, প্রকাশশীল আলোকের 'ব্যাপকতা'-নাম্নী একটী গুণ বা শক্তি আছে, যাহার দ্বারা সে একস্থানে অক্ষুণ্ণ বা অবিকৃত-ভাবে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থরাজিকে নিজ প্রভাদ্বারা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। আলোকে যেরূপ 'ব্যাপকতা'-নাম্নী একটী শক্তি অবস্থিত সুখ-স্বরূপ-ভগবত্তত্ত্বেও তদ্রূপ ব্যাপকতা-নাম্নী একটী মহতী শক্তি অন্তর্নিহিতা আছে। যাহার প্রভাবে তিনি নিজ স্বরূপকে পূর্ণ সচ্চিদানন্দঘন-তত্ত্বরূপে সংরক্ষণ পূর্বক তদিতর প্রত্যেক জীবে নিজসুখরূপের আভাস বা জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হন, এবং সেই আভাসের পরিচয় দেখাইয়া নিখিল জীবকে নিজ ঘনানন্দময় স্বরূপের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

আলোকের প্রকাশগুণ যেরূপ অন্ধকারে লক্ষিত হয় না এবং অন্ধকারের আবরণগুণ যেরূপ আলোকে দৃষ্ট হয় না তদ্রূপ সুখরূপ পদার্থের চিত্তবিনোদকারী গুণ, তদিতর তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে পারে না। অতএব সুখান্বেষী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য—সুখলাভার্থে হৃদয়ে অনুভূত সুখকিরণের সাহায্যে তাঁহার উৎসরূপ সুখ-সূর্য্যের আলোচনায় নিযুক্ত থাকা। যাঁহারা সুখ-সূর্য্যের চিন্তা পরিত্যাগপূর্বক নশ্বর ও ক্ষুদ্র ধনজনাদির চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া তত্তৎ-পদার্থ দ্বারা সুখলাভের আশা পোষণ করেন, তাঁহারা শস্যলাভার্থ বৃথাই তুষরাশিকে আঘাত করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর মনুষ্যকে কখনও 'বুদ্ধিমান্' বলা যাইতে পারে না এবং দুর্ভাগ্যই যে তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূষিত করিয়াছে, তাহা সুধীগণ মুক্তকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়া থাকেন।

সুখের স্মৃতি অস্ফুট আকারে হৃদয়ে জাগিবামাত্র দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁহাদিগের চিত্ত শুদ্ধভাবে উহার উৎসাভি-মুখে ধাবিত হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাঁহারা রজ্জুতে সর্প-দর্শনের ন্যায় বিবর্ত্তবুদ্ধির সাহায্যে উহাকে পূর্বদৃষ্ট অন্য কোন নশ্বর বাহ্য পদার্থের সংসর্গজনিত ফলবিশেষের আংশিক বিকাশ বলিয়া বুঝিতে বাধ্য হন ও তৎফলে পুনরায় সেইরূপ পদার্থ দ্বারা উহাকে সুস্পষ্ট আস্বাদন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন। বাহ্য-পদার্থের স্মৃতি জাগিবার পূর্বে তাঁহাদিগের লক্ষ্য মুখ্যভাবে সুখের অস্ফুট স্মৃতির অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে; কিন্তু বিবর্ত্ত-বুদ্ধির সাহায্যে বাহ্যবিষয়ে স্মৃতি জাগিবার পরবর্ত্তিকালে ঐ লক্ষ্য বাহ্যবিষয়ের অভিমুখে মুখ্যভাবে ধাবিত হইতে আরম্ভ করায় উহা সুখস্মৃতির দিকে গৌণভাবে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর যখন বিষয়ের চিন্তা তন্ময়ীভাব ধারণ করে, তৎকালে লক্ষ্য সুখ-স্মৃতির প্রতি গৌণভাবটুকুও বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। সূর্য্যাস্তের পর যেমন ঘোর অন্ধকাররাশি দিক্‌সমূহকে ছাইয়া ফেলে, সুখস্মৃতির প্রতি গৌণভাবে অবস্থিত লক্ষ্যটুকুর অপগমেও সেইরূপ সুখের বিপরীত যে নিদারুণ দুঃখ, তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের হৃদয়দেশকে অধিকার করে। এই সুখস্মরণাত্মক পথের বিপরীত দুঃখ-আহরণকারী যে বাহ্যবিষয়ের চিন্তারূপ পথ, তাহাকে শাস্ত্রকারগণ 'ভাবনাবর্ত্ম' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাঁহারা ভাবনাবর্ত্মকে অতিক্রম করিতে সমর্থ, কেবল তাঁহারাই সুখের বিশুদ্ধস্বরূপ অনুভব করিতে ও অনুভবজনিত বিমলরস আস্বাদনে পারগ।

সুবর্ণে তাম্র-'খাদ' মিশাইয়া 'গিনি' নামক স্বর্ণমুদ্রা

প্রস্তুত হয়। 'গিনি প্রস্তুত হইলে স্বর্ণের সহ তাম্র অংশ এরূপ ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে যে, আমাদিগের চক্ষু ঐ তাম্র অংশকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না ও সমগ্র 'গিনি'কে স্বর্ণেরই প্রকারভেদ বলিয়া দর্শন করিতে বাধ্য হয়। এই দৃষ্টান্তের ইঙ্গিত লইয়া বিচারশীল হইলে বুঝা যায় যে অজ্ঞ ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ধারণায় বৈষয়িক সুখ-আকারে যে বস্তু অনুভূত হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে বাহ্য বিষয় ও সুখজ্যোতির সংমিশ্রিত ভাবদ্যোতক। রাসায়ন ক্রিয়াযোগে গিনি হইতে তাম্রাংশকে বহিষ্কৃত করিলে স্বর্ণকে যেরূপ পুনরায় বিশুদ্ধাকারে দর্শন করিতে পারা যায়, বহির্মুখ জনগণ যদি নিজ নিজ চিত্তদর্পণ হইতে সুখেতর বাহ্য নশ্বর পদার্থের চিন্তারাশিকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহারাও সুখ-বস্তুকে তদ্রূপ বিশুদ্ধ চিদ্‌ঘনানন্দময় ভগবত্তত্ত্বরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

সূর্য্যের আলোক চন্দ্রে পতিত হওয়ায় আমরা চন্দ্রকে আলোকময় দেখিতে পাই। যদিও আমাদিগের চক্ষু ঐ আলোককে স্বতন্ত্র চন্দ্রালোকরূপে দর্শন করে তথাপি বিজ্ঞানবিদ্‌গণের গবেষণা জানাইয়া দেয় যে, উহা সূর্য্যেরই আলোক, স্বতন্ত্র চন্দ্রালোক নহে। বাহ্য বিষয়ের চিন্তাকালে মানবচিত্ত যে যে পদার্থের চিন্তায় নিমগ্ন হয়, তাহাতেই কথঞ্চিৎ তন্ময়তা লাভ করে। চিত্ত কোন বিষয়ে তন্ময় হইলে অন্যান্য বিষয়ের চিন্তাকে স্তব্ধ রাখে। অন্যান্য বহুতর বিষয়ের চিন্তা যেকালে স্তব্ধীভূত থাকে, সে-সময় চিত্ত কথঞ্চিৎ শান্ত ভাব ধারণ করে ও তদ্ধেতু তাহা নিরুপদ্রবে ধ্যেয়-বস্তুকে ধারণা করিতে সমর্থ হয়। তরঙ্গরাশির কথঞ্চিৎ বিরামকালে জলাশয়ে যেরূপ চন্দ্রের প্রতিবিম্ব সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়, চিত্তের কথঞ্চিৎ শান্ত ভূমিকায় সুখময় ভগবত্তত্ত্বের তদ্রূপ ঈষৎ আভাস অনুভূতির গোচর হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সুখময় ভগবত্তত্ত্ব হইতেই সুখের 'ঝলক' হৃদ্দেশে অনুভূত হয়; কিন্তু সুখ দিলেন সুখময় ভগবান্, ইহার পরিবর্ত্তে সূর্য্যালোককে চন্দ্রালোকের প্রতীতির ন্যায় অজ্ঞ মানবগণ মনে করেন যে সুখ দিল বাহ্য বিষয় এবং সেইজন্য তাঁহারা বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়েন। শুষ্ক-অস্থি-চর্বণকারী সারমেয় যেরূপ কঠিন অস্থিদ্বারা ক্ষতবিক্ষত স্বীয় মুখ-নিঃসৃতরক্তকে অস্থিগত রুধির বলিয়া মনে করে ও নিজমুখ-নির্গত রক্তপানার্থ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল উদ্যমের সহিত ঐ শুষ্ক অস্থিকে পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণ করিতে থাকে, অজ্ঞমানবগণের সুখাস্বাদনের যত্নও ঠিক সেইরূপ।

মানবগণের বুদ্ধিতে ত্রিবিধগতি লক্ষ্য করা যায়, যথা—(১) ভোগপরা বা বিষয়াভিমুখিনী (২) ত্যাগ-পরা বা ব্যতিরেক মুখিনী (৩) সেবাপরা বা ভগবদুন্মুখিনী ভোগ পর-বুদ্ধির উদয়কালে মনুষ্যগণ নিজাতিরিক্ত পদার্থ সমূহকে ভোগ্য ও আপনাদিগকে ভোক্তৃভাবে অবগত হন এবং তন্নিবন্ধন বাহ্য পদার্থে সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে রজ্জুতে সর্প-দর্শনের ন্যায় ভোগীদিগের বুদ্ধি বিবর্ত্তিত হওয়ায় তাহারা সুখের উৎস কোথায় তাহা বুঝিতে অসমর্থ। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভোগপর-বুদ্ধিই উক্ত বিবর্ত্তের জনক এবং সত্যজ্ঞানের বাধক।

ভোগপর পন্থায় অজস্র দুঃখ উপস্থিত হয় দেখিয়া যে সমুদয় মনুষ্য ভোগপর-বুদ্ধিকে সঙ্কুচিত করিবার উদ্দেশ্যে ত্যাগপর ব্রত অবলম্বন করেন ও ত্যাগদ্বারে দুঃখের উৎসাদন রূপ শাশ্বত শান্তিকে উপভোগ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হন, তাঁহারা 'জ্ঞানী' নামে অভিহিত ও ত্যাগপর-বুদ্ধিবিশিষ্ট। এই প্রকার ত্যাগনিষ্ঠ জ্ঞানিগণ শান্তিকে এক প্রকার বাহ্য বিশেষ-ধর্ম্মরহিত সুখমাত্রাত্মক সর্বব্যাপী তত্ত্ব বলিয়া বুঝেন ও সর্বদা তাঁহারই ধ্যানে নিযুক্ত থাকিবার জন্য যত্নশীল হন। শাস্ত্রে জ্ঞানিগণের লক্ষিত সুখকে 'ব্রহ্মানন্দ' নামে বর্ণন করা হইয়াছে।

মানবগণের মধ্যে যাঁহারা এই ব্রহ্মানন্দকে ভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃ বলিয়া আম্নায় পারম্পর্য্যক্রমে অবগত হইবার ভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্ত নামে অভিহিত। বিক্ষিপ্ত কিরণ অপেক্ষা যেরূপ কিরণ রাশির আশ্রয় (প্রতিষ্ঠা) ঘনীভূত তেজোবিগ্রহ সূর্য্য কোটীগুণ সমুজ্জ্বল, তদ্রূপ কিরণ স্থানীয় ব্রহ্ম হইতে চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের

পরমাশ্রয় চিদ্‌ঘনবিগ্রহ ভগবান্‌ও পরিপূর্ণ রসময়। সুদূর পর্বতোপরি বিরাজিত ক্ষুদ্র দেবালয়ের শ্রীমূর্ত্তি নিকটস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন একটী ক্ষুদ্রবর্ণের সমাবেশমাত্র-রূপে দৃষ্ট হয়, সেবাবুদ্ধির সাহায্যে সেব্য চিদ্‌ঘন শ্রীভগবন্মূর্ত্তির দর্শন লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ত্যাগপর-বুদ্ধির প্রেরণা হইতে পরতত্ত্বকেও সেইরূপ নিরাকার ধ্যেয়-ব্রহ্মজ্যোতিঃ বা সুখ মাত্রাত্মক তত্ত্বরূপে অনুভব করিতে হয়।

ভোগী ও ত্যাগী উভয়ে স্ব-সুখকামী। ভক্তই কেবল শ্রীভগবানের সুখে সুখী ও সেইজন্য নিষ্কাম। পিতা নিজে না খাইয়া পুত্রকে খাওয়াইলে যেরূপ আপনাকে সুখীবোধ করেন, ভক্তও সেইরূপ নিজ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভগবৎ-তৃপ্তিতে আপনাকে তৃপ্ত মনে করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তের হৃদয় শুদ্ধ অর্থাৎ কামনার পূতিগন্ধ-শূন্য এবম্বিধ শুদ্ধ হৃদয় ব্যতীত সুখঘনমূর্ত্তি শ্রীভগবানের দর্শন ও সেবানন্দসুখ আস্বাদনের উপায়ান্তর নাই।

স্ব-সুখপরতার লেশমাত্র থাকিতে সেবাবুদ্ধির উদয় সম্ভবপর নহে। আনন্দ ঘনমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ নিজ আনন্দের আভাস দ্বারা জীবসমূহকে সেবানন্দ রস আস্বাদন করাইবার জন্য প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করিতেছেন। হরিবিমুখ আমরা তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই দুঃখ ভোগ করিতেছি। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য—ত্যাগ বা ভোগপর বুদ্ধিরূপ মলরাশিকে হৃদয় হইতে সরাইয়া নির্ম্মল হৃদয়ে শুদ্ধাকারে দর্শনযোগ্য উক্ত আকর্ষক রজ্জুকে অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হইয়া জীবনকে ধন্য করা।

—— ::*:: ——

শ্রীধাম-সেবা

প্রাপঞ্চিক জগতে ধাম ও ধামের অধিকারী স্বতন্ত্র তত্ত্ব। কিন্তু অপ্রাকৃত-তত্ত্ব শ্রীভগবানের তদ্রূপবৈভব ধাম ও তিনি স্বয়ং অভিন্ন-তত্ত্ব। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর বৈশিষ্ট্য বা তদ্রূপবৈভব ধাম, পার্ষদভক্ত ও লীলোপকরণ—সকলই একতত্ত্ব। যেই নাম—সেই নামী। রূপ ও রূপী, গুণ ও গুণী, লীলা ও লীলাময়, ধাম ও ধামী একই তত্ত্ব। পরস্পরের মধ্যে লীলাবৈচিত্র্য ব্যতীত অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের এগুলির কোন পার্থক্য নাই। তাই তদ্ধাম বৃন্দাবন, নবদ্বীপ ও তিনি একই বস্তু। যিনি কায়-মনোবাক্যে ধাম-সেবা করিতে পারেন তিনিই ধন্য, কেন না তিনি শ্রীভগবানের সেবা করেন তাহাই তাঁহার স্বরূপ-ধর্ম্ম, তাই তাঁহাকে আর স্বরূপ বিকৃতির তাড়নায় মায়ার নফর হইতে, মায়ার দূত ষড়্‌রিপুর ও ষড়্‌বেগের অধীন হইতে হয় না বা জাগতিক জড়ভোগের মত্ততায় ব্যস্ত হইবার জন্য তাঁহার চিত্ত আর প্রধাবিত হয় না।

তিনি নিষ্কিঞ্চন, নিরহঙ্কার, মমতাবুদ্ধিশূন্য ভগবদ্দাস। একজন ধাম-সেবা করিতেছেন, অথচ ভগবৎসেবা-তৎপর না হইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত আছেন এরূপ বলিলে "সোনার পাথর-বাটীর" ন্যায় অসমঞ্জস উক্তি হইয়া যায়—কেহ ধামসেবা করিতেছেন অথচ স্বীয় জড়-ইন্দ্রিয়সেবায় ব্যস্ত সেখানে বুঝিতে হইবে তিনি ধাম-সেবা করেন না, ধামকেই ইন্দ্রিয়সেবার সামগ্রী করিয়া বসিয়া আছেন। এইরূপ কপট ব্যক্তিকে কেহ যেন ভক্ত মনে করিয়া তাহার সঙ্গ না করেন, কেন না তাহাতে অসৎসঙ্গ হইয়া যাইবে, কিন্তু অসৎসঙ্গ ত্যাগ না হইলে বৈষ্ণবাচারের আরম্ভই হইল না।

শ্রীমদ্ভাগবত বজ্র-নির্ঘোষে বহির্ম্মুখ জীবকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন,—দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সজ্জনের সহিত সঙ্গ করিয়া থাকেন, কেন না সাধুগণ নিরপেক্ষ, তাঁহারা কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া প্রিয়বাক্য বলিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, তাঁহারা উক্তি দ্বারা শ্রোতার বিষয়াসক্তি-রূপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া সুচিকিৎসকের ন্যায় পরিণাম-

মঙ্গল আপাত-ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকেন। সাধু কাহারও মনের মত কথা বলিয়া প্রীতিভাজন হইবার যত্ন করেন না, কপট সমন্বয়বাদীরূপে উদারতার প্রশংসা-প্রাপ্তি তাঁহার উচ্চাভিলায বলিয়া মনে হয় না। তিনি জিজ্ঞাসু অজিজ্ঞাসু প্রত্যেককেই অমঙ্গলের পথ বর্জ্জন পূর্বক মঙ্গলের পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন, ইহাতে লোকে তাঁহার সম্বন্ধে কি ধারণা করিবে, না করিবে, তিনি তাহার অপেক্ষা রাখেন না। এরূপ চিত্তবৃত্তির সহিত যিনি ধাম-সেবা করেন, তাঁহারই যথার্থ ধাম-সেবা নচেৎ সকলই বিড়ম্বনা।

ধামবাসীর আকারে অনেক অবান্তর-উদ্দেশ্য প্রণোদিত কপট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা যায়। স্বীয় ভক্তাগ্রণীদিগের সাহায্যে গুপ্ত বৃন্দাবন-ধামকে প্রকাশিত করিয়া ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ শ্রীভগবান্ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুবর্ত্তনে পার্ষদভক্তচূড়ামণি নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর ভগবৎপ্রেরণায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলাস্থলীগুলি প্রকাশ করিয়া আধুনিক যুগে ধামসেবার আদর্শ স্থাপন পূর্ব্বক মানববৃন্দের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া সকলের গুরু হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার অনুবর্ত্তনে জগদ্গুরু পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কয়েক বৎসর যাবৎ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতাকে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা করাইয়া ধামসেবার প্রকরণ শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহারই আদেশে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক সকলের ধামসেবার পথ সুগম করিয়া দিয়া ধামসেবার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। ইহাতে অসূয়ান্বিতচিত্ত ব্যক্তির বিশেষ ক্ষোভের উদয় হইয়াছে।

শেষোক্ত প্রকারের ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, ধামদর্শন ও ভৌগোলিক স্থান বুঝি একই ধরণের কিন্তু বেচারাগণ ভুলিয়া যান যে, শ্রীধাম অপ্রাকৃত বস্তু এবং "অপ্রাকৃত-বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর"। প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত গ্রাম, নগর, দেশাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। যতদিন ইন্দ্রিয়-দ্বারে ভোগবুদ্ধি প্রবল থাকিবে ততদিন অপ্রাকৃত-তত্ত্ব শ্রীনবদ্বীপ বৃন্দাবনাদি ধামের উপলব্ধি হইবে না। নিজ চক্ষুতে মায়াজালের আবরণ থাকায় যাহা কিছু দেখা যায়, সবই যেন জালে ঢাকা, আমরা ধাম দেখি না মায়ার জাল দেখিয়া তাহাকেই ধাম মনে করি, শ্রীধাম ও ভৌগোলিক স্থানের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। মনে হয়, ভোগদ্বার ইন্দ্রিয়সহযোগে স্থানের জ্ঞান যেরূপ উপলব্ধ হয়, চক্ষু-কর্ণ-মননের সহযোগে ধামের সেইরূপ উপলব্ধি হইবে। কিন্তু এরূপ ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না।

যাঁহারা যথার্থ ভগবদ্ভক্ত মহীয়ান্ সাধু, তাঁহাদের যদি কৃপা হয়, তবে শ্রীধাম নিজে দর্শন দিলে শ্রীধামদর্শনের সৌভাগ্য জীব প্রাপ্ত হন নচেৎ নহে। এস্থলে উপনিষদের "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" এই উক্তি পরমাত্মতত্ত্বাভিন্ন শ্রীধাম-সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যাঁহাকে ধাম নিজে কৃপা করিয়া দর্শন দিবেন, তিনিই দেখিবেন, অন্যে নহে।

শ্রীগৌরনিজজন শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় ভগবৎপ্রেরণায় শ্রীধাম-দর্শনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ও তাঁহার অনুগমনে অবরোহমার্গ আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ-ভক্তগণ শ্রীধামের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন। সাহিত্যিকের চক্ষু, প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণা, ঐতিহাসিকের প্রযত্ন, ভৌগোলিকের বিচার—এ সমস্তই শ্রীধামদর্শনে পরাঙ্মুখ। তাহা হইলেও শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণবোচিত জীবেদয়া দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, রাজসরকারের কাগজপত্র ও মানচিত্র-দর্শনের সুযোগ ও যোগ্যতা, প্রত্নতত্ত্বের বিচার প্রভৃতি আরোহমার্গের অস্ত্রগুলিও প্রয়োগদ্বারা তদবলম্বী জনগণের নিকটও শ্রীধামতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন তাঁহারা একমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, সাধারণ লুপ্ত স্থান উদ্ধারের জন্য তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। বিদ্যাবুদ্ধি, অধ্যবসায়, অন্তর্দৃষ্টি—এ সকলই তাঁহার অলৌকিক পরিমাণে ছিল। অথচ সেগুলি তাঁহার অবলম্বন ছিল না, তাঁহার অবলম্বন ভক্তের

অবলম্বন, 'যমেবৈষ বৃণুতে' অনুসারে ভগবৎ-আনুগত্যই তাঁহার অবলম্বন ছিল। তাঁহার যে সকল জাগতিক মনীষা প্রভৃতি দেখা যাইত সেগুলিকে তিনি অপ্রাকৃত অনুভূতি ভক্তিচক্ষুর অনুগত করিয়া ধামদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আনুগত্যরহিত মনীষা কেবল ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার বিলাসভূমি মাত্র। তিনি ভগবৎপ্রেরণা-ক্রমেই গুপ্তধাম-উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি পার্থিব উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের নিমিত্ত শ্রীধাম-সেবার ভাণ করেন নাই।

হীনচরিত্র ব্যক্তি পণ্ডিতের সজ্জায় বিরক্তের বেষে অধিরোহ প্রণালী মাত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার স্পর্দ্ধা করিতেছে দেখিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে ভক্তদ্বেষী ভক্তবদ্দ্বেষী জ্ঞানে তাহাদের সঙ্গ হইতে বিরত থাকেন, সাধারণ ভদ্রলোকও তাহাদিগকে গৃহীবাউল বা নেড়ানেড়িগণের দলের বলিয়া জানিতে পারায় তাহাদিগকে দূরে রাখেন, তবে অনভিজ্ঞ কোন কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে বেষের সম্মান দিয়া প্রশ্রয় দিতেছেন বটে, কিন্তু কপট লোকবঞ্চক ব্যক্তিগণের ধামসেবায় ভাণ দেখিয়া সুবিজ্ঞ সুধী প্রতারিত হ'ন না। তাহাদের প্রশ্রয়-দাতার মধ্যে অনেকে তাহার পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনবগত, কেহ কেহ অর্ব্বাচীন আর কয়েকজন তাহারই সজ্জিত কাপট্য-ব্রতে ব্রতী হইয়া তাহার সহিত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে তৎপর। ইহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া কৃপালু সাধু মঙ্গলার্থ সর্বদা সতর্ক করিয়া দিতেছেন—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্"। 'ভাই সব, সাবধান, কপট ভণ্ডের করে পড়িয়া যেন আত্মসর্বনাশ-সাধন করিও না।' নচেৎ লোকচরিত্র-সমালোচনা তাঁহার বৃত্তি নহে।

সমাধান

মন যেরূপ চঞ্চল, মনোধর্ম্মী জীবের প্রবৃত্তি, মীমাংসা, ধারণা প্রভৃতি সকলই সেইরূপ চাঞ্চল্যময়। পরম-মঙ্গলময় সাধু-শাস্ত্রের উপদেশ-গ্রহণে অমনোযোগী, নিজের মনো-ধর্মের ছাঁচে তৈয়ারী ধারণার শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনে দৃঢ়সঙ্কল্প, আত্মমঙ্গলের পথে ঔদাসীন্য-প্রদর্শনকারী, জড়ভোগে প্রমত্ত বা বিরক্ত জনগণের মনোধর্মোত্থ অসংখ্য প্রশ্নাবলীর সমাধান করা সময়সাপেক্ষ হইলেও কুসিদ্ধান্ত-নিরসনকল্পে শ্রীগৌড়ীয়, শ্রীনদীয়া-প্রকাশ, গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও তদীয় অনুকল্পিত বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রযুক্তিমূলে বহু প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

কিন্তু প্রশ্নসমূহের সুমীমাংসা বা সুসিদ্ধান্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণের অভিনয় করিয়াও আধুনিক সভ্য-জগতের অনেকেই বলিয়া থাকেন,—"মহাশয় শুধু হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়াইলেই কি দেশোদ্ধার হইবে? চতুর্দ্দিকে যে ভীষণ দুঃখ-বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে—জীবকুল 'পরিত্রাহি' 'পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছে, তাহাদের সেই দুঃখ-নিরাকরণের জন্য বদ্ধপরিকর হউন্—কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যাদির উন্নতিবিধান করুন্—দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করুন্—অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্রগণকে প্রচুর অন্নবস্ত্র-বিতরণের আয়োজন করুন্—পীড়িতের শুশ্রূষা করুন্—দেশকে পরাধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য যত্নবান্ হউন্—দেশের রাস্তাঘাটভাল করুন স্বাস্থ্য ভালো হউক, তবেই না দেশের উপকার করিতে পারিবেন? শুধু হরিকথা বলিয়া সময় নষ্ট করিলেদেশ আপনাদের দ্বারা আর কতটুকু লাভবান্ হইবে?"

বিকারী-রোগীর বিজ্ঞ ডাক্তারকে Prescription বা diet পরিবর্ত্তনের উপদেশ দেওয়ার ন্যায় তথাকথিত ভবরোগগ্রস্ত উপদেশ-ব্রুবগণের প্রলাপোক্তির অভাব এ জগতে নাই। প্রশ্নাবলীর সুমীমাংসিত সমাধান-শ্রবণে অন্যমনস্কতা, গণমতকে শ্রেষ্ঠ পদবী প্রদান পূর্বক শাস্ত্র

বা মহাজন-মতকে দুর্ভাগ্যবশতঃ অবহেলা করার দরুণই সত্যকে অসত্য-ভ্রমে গ্রহণ করা-রূপ দুর্দ্দৈবের সমাগম।

আমাদের বন্ধুবর্গ এতাদৃশ অকল্যাণকর দুর্দ্দৈবের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করতঃ সুসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 'উপকার' শব্দের স্বরূপ ও গূঢ় তাৎপর্য্য-গ্রহণে আত্মমঙ্গলের ও জগন্মঙ্গলের সন্ধান করিবেন—এই মহতী আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমরা অদ্য সামান্য কয়েকটী মাত্র বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

পরোপকার মহাধর্ম। পরোপকার-সাধনে ব্রতী হওয়া জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। একথা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুও নিজমুখে বলিয়াছেন। যথা (চৈঃ চঃ)—

"ভারত-ভূমিতে হইল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

অনিত্য দেহ-মনের কিছু সাময়িক উপকার করিবার কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন নাই। হরিকীর্ত্তনমুখে জীবের আত্মবৃত্তি—কৃষ্ণদাস্যকে উদ্বুদ্ধ করিয়া জগজ্জীবকে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করা-রূপ মহদুপকার, নিত্য উপকার বা পরম মঙ্গল করিবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কৃপাদেশ। রোগের উপসর্গ-দমনে ব্যস্ত না হইয়া রোগের মূল নিরাকরন পূর্বক রোগমূলধ্বংসার্থ চিকিৎসাই বিজ্ঞ ডাক্তারগণের অভিমত। অন্যথায় রোগ-নির্ম্মুক্তি হওয়া অসম্ভব। অতএব ভবরোগগ্রস্ত জীবের দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করাই সদ্‌বৈদ্য, সাধু ও শাস্ত্রের কর্ত্তব্য। তাই সেই দুঃখের মূল শাস্ত্রযুক্তিমূলে নিরাকরণান্তর উপদেশ-চিকিৎসা-দ্বারা রোগ-নিরাময়ের আশায় গুর্বানুগত্যে আজ আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা।

কৃষ্ণদাস জীব যে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার দুর্ভাগ্য লাভ করিয়াছেন সেই মুহূর্ত্ত হইতেই কারাধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবী তাঁহাদিগকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ নিগড়ে বদ্ধ করিয়া দগ্ধীভূত করিতেছেন। জীবগণ কেবল যে বর্ত্তমান সময়েই ক্লেশভাক্ হইয়াছেন, ইহার পূর্বে ছিলেন না বা ইতঃ পূর্ব্বে আর কখনও তাঁহাদের দুঃখ নিবারণের যত্ন হয় নাই, তাহা নহে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ অনাদিকাল হইতেই এই মায়িক সংসার কারাগারের নানা অভাব অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন, করুণাবারিধি ভগবান্‌ও স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া অথবা তাঁহার পার্ষদ ভক্তকে পাঠাইয়া নিরন্তর তাঁহাদের সেই দুঃখ দূর করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। যে সকল জীব ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তকে একমাত্র বিপদুদ্ধারণ বান্ধবজ্ঞানে তাঁহাদেরই পাদপদ্মে শরণাপত্তি স্বীকার পূর্বক তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা অবনত-মস্তকে মানিয়া লইতেছেন, তাঁহারাই ক্লেশমুক্ত হইতেছেন। কিন্তু যাঁহারা সেই ব্যবস্থায় বিশ্বাস-স্থাপন করিবার ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া নিজেরাই দুঃখ-নিরাকরণের ভার লইতেছেন, তাঁহারা দুঃখমুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আরও গভীর দুঃখসাগরে নিমর্জ্জিত হইতেছেন। এক দুঃখ দূর করিতে গিয়া শত সহস্র দুঃখ আসিয়া তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে, ইহারই নাম আরোহপথ। এই সর্ব্বনাশকর পন্থানুসরণে জীবগণ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্ম হইয়া প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে 'আমার কার্য্য'-জ্ঞানে 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অভিমান করেন। ইহাতে সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ভগবান্‌কে যে অসূয়া করা হয়, তাহা ভাগ্যহীন তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে চাহিবেন না। তাই শ্রীভগবান্ বড় দুঃখের সহিত তাঁহাদিগকে বলেন—(গীতা ১৬।১৮—২০)

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥"

যাঁহারা মন্নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্বক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পরমেশ্বর স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং আমার ভক্তগণে দোষ আরোপ করে, সেই বিদ্বেষী, ক্রুর নরাধমদিগকে আমি এই সংসার মধ্যেই অশুভ আসুরী যোনিতে সর্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাঁহাদের ভক্তিবিদ্বেষী আসুর ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে-জন্মে

আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হইয়া তাহা হইতেও অধম-গতি লাভ করে।

"সর্ব্বজীবপ্রভু শ্রীভগবান্ই জীবকুলকে রক্ষা করিতে পারেন"—এই শরণাপত্তি মূলক বিশ্বাসরাহিত্যের নামই নাস্তিকতা বা ভগবদ-বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ যাঁহার হৃদয়ে যত পুষ্টিলাভ করিতেছে, তিনি ততই ভগবৎ-কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। শ্রীভগবান্ গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত-রূপে জীবের ত্রিতাপক্লেশ নিবারণের যে-সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তাহা স্বীকার না করিয়া জীবগণ যতই স্বকপোল-কল্পনা-প্রসূত পন্থানুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ততই মায়া আসিয়া তাঁহাদিগকে আরও পীড়া প্রদান করিতেছে। অনেকে বলিতে চাহেন,—"পূর্বে লোকের এখনকার মত এত অভাব অসুবিধা ছিল না। যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলেও আমরা বলিব,—পূর্বে লোকে এত কৃষ্ণবিমুখও ছিল না। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দিন দিন যত বেশী বাড়িতেছে, জীবের অসুবিধাও ততই বাড়িতেছে। সুতরাং মূল অসুবিধা কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দূর না হইলে অর্থাৎ কৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রপত্তি স্বীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ না হইলে জগতের কোন অসুবিধাই দূর হইবে না। সমস্ত অসুবিধার প্রসূতি যে দৈবী গুণময়ী মহামায়া তাঁহার আনুগত্যে জীবগণ কখনই অসুবিধার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

বেদ, উপনিষৎ, ভাগবত, পুরাণ, ইতিহাসাদি শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ যে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যে ব্যবস্থা নারদ ঋষি বীণযন্ত্রে উচৈঃস্বরে গান করিয়া বলিতেছেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

—যাহার ব্যাখ্যা কলিযুগপাবনাবতারী ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর আরও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া জগজ্জীবকে জাগাইয়া বলিলেন,—

'কলিকালে-নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হইতে হয় সর্বজগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম' উক্তি তিন বার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব' কার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান-যোগ তপ আদি কর্ম নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি,—তিন উক্ত 'এব'-কার॥'

—আবার মহাপ্রভুর ঐ মঙ্গলময়ী বাণীতে জগজ্জীবকে আরও দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট করিবার জন্য অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জগদ্বাসী সকলকেই সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়া কহিলেন,—

"ঊর্দ্ধ বাহু করি' ক'হো, শুন সর্ব্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥"

—সেই কথাই শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্য আজ নানাভাবে নানাপ্রকারে লোকের দ্বারে দ্বারে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতি নানা উপায়াবলম্বনে প্রচার করিতেছেন। সেই হরিকথার সুবহুল প্রচার এই জগজ্জীবের সর্বপ্রকার অনর্থ দূরীভূত হইবে। হরিকথাতেই সর্ব্বজীবের মধ্যে সুমঙ্গল নিহিত। হরিকথা শ্রবণ হইতেই জীবের সর্ব্বানর্থের মূল যে অবিদ্যা তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেই জীব পরবিদ্যাপীঠের নিত্য অন্তেবাসী হইয়া শোক মোহ-ভয়াপহ, পরবিদ্যাবধূজীবন পরংব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে মাতোয়ারা হন-সেই নাম সংকীর্ত্তন হইতেই জীব সংকীর্ত্তন-পিতা মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের মহাদান কৃষ্ণ-প্রেম-ধন লাভে অধিকারী হন। কৃষ্ণ যাঁহার কর্ণে শব্দব্রহ্ম রূপে কীর্ত্তিত হন, তাঁহার হৃদয়ে মায়িক ভোগপর অভদ্র-সমূহ কিছুতেই অবস্থান করিতে পারে না। অবিদ্যা হইতেই জীব-হৃদয়ে ভোগবাসনার উদয় হয়, আবার ভোগবাসনা হইতেই নানা অভাব-অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কৃষ্ণনাম শ্রবণকীর্ত্তন দ্বারা সেবিত হইলে জীবহৃদয়ের সমুদয় পাপ বাসনা সমূলে বিনষ্ট করেন।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥
(ভাঃ ১।২।১৭)

শ্রীমদ্ভাগবত তাই কৃষ্ণকথাকীর্ত্তনকারীকে সর্বশ্রেষ্ঠ

বদান্য বলিয়াছেন, কেননা, জগতের অন্যান্য কথা কীর্ত্তনকারী দাতা জীবের তাৎকালিক অভাব দূরীকরণে সমর্থ হইলেও নিত্য অভাব দূর করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

—অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, সংসারে যাঁহারা ত্রিতাপক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবনপ্রদ, বৈষ্ণবগণ-পূজিত, সকল কলুষ-নাশক, শ্রবণমঙ্গল, সর্বশক্তি সমন্বিত ও সর্বব্যাপক তোমার কথামৃত বর্ষণ করেন তাঁহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ বদান্য, সর্বাপেক্ষা জীব-হিতে ব্রতী।

এতএব হে আমার বন্ধুবর্গ, মায়ানির্য্যাতীত নিরীহ জীবকুলের তাৎকলিক অভাব মোচন-কার্য্যে পারদর্শিতা-হেতু 'পরোপকারী' নাম লইয়া নিত্যকালের অভাবমোচন-কার্য্যে পারদর্শী, কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী পরমমঙ্গলময় সাধুর কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনের অপ্রয়োজনীয়তা বিচার দ্বারা তাঁহাকে অসম্মান করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করিও না। ভাগবতাদি শাস্ত্রদ্বারা ভগবান্ একমাত্র নামসংকীর্ত্তনকেই কলি জীবের কলিকলুষনাশের পরম উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সাধু, শাস্ত্র ও মহাজনবাক্য অবহেলার বিষয় নহে—ইহা সকলেই স্থিরচিত্তে প্রণিধান করুন্। জগতে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের আয়োজন প্রয়োজন হউক। দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তের তত্ত্বাবধানে পরবিদ্যাপীঠ স্থাপিত হইয়া কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন শ্রবণের ব্যবস্থা হউক্—কৃষ্ণকীর্ত্তন বন্যায় জগৎ ভাসিয়া যাউক্—তবেই জগতের সুদিন আসিবে। জগদ্বাসীর দুঃখ দৈন্য চিরতরে ঘুচিবে—জগৎ শান্তির সুশীতল ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিবে। নতুবা অশান্তির অনল জগতের বক্ষে দাউ দাউ করিয়া জলিয়া জগৎকে এক মহাশ্মশান-ক্ষেত্রে পরিণত করিবে! হে বন্ধুগণ, এখনও সময় থাকিতে সাবধান হও! অহর্নিশ কৃষ্ণকীর্ত্তনই সময়ের সদ্ব্যবহার। দেশোদ্ধারে কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনের সর্ব্বতোভাবে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয়তা আছে—অন্যান্য কথারই বরং আত্যন্তিক প্রয়োজনাভাব।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবাই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও বিধেয়—এই বিষয়টি যতদিন না আমাদের প্রকৃষ্ট রূপে উপলব্ধির বিষয় হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গে ভগবৎকথা শ্রবণ, সাধুপদিষ্ট বাক্য কীর্ত্তন, সাধুনির্দ্দিষ্ট সাত্বত শাস্ত্রসমূহের পঠন-পাঠন ও সাধুসেবানাদি কোন ব্যাপারেই আমাদের আন্তরিক স্পৃহা বা উৎসাহ বিদ্যমান থাকা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না।

বাণী পূজার অধিকারী কে?

অদ্যকার শুভ-তিথিটি জগৎপূজ্যা। জগৎপূজ্যা বলি কেন? জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে এই মাঘী কৃষ্ণ-পঞ্চমীর শুভ প্রভাতকে জগৎপূজ্যা করিয়া যষ্টিবৎসর পূর্বে শুভাবির্ভাব-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, উদয়াচলস্বরূপ নীলাচলে ভাগবতার্করূপে—কুরাধান্তর্ধান্তভাস্কররূপে উদিত হইয়াছিলেন ভাগবতার্কমরীচিমালা জগজ্জীবকে বিতরণ করিবার জন্য। কৃষ্ণবিমুখজীবকুলের অসৎ সিদ্ধান্তরূপ অজ্ঞানতমঃ বিনাশ করিবার জন্য।

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ তিনি, তাই তাঁহার নাম অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী বা সরস্বতী, তিনি বাহ্যদর্শনে নরের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও নর নহেন অর্থাৎ তিনি নরোত্তম বা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিগ্রহ। নরগণের দেহদেহীতে এবং নাম ও নামীতে ভেদ দেখা যায় কিন্তু তাঁহার দেহদেহীতে এবং নাম ও নামীতে বা স্বরূপে কোনও ভেদ নাই, কারণ তিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবৎ-তত্ত্ব। তাই তাঁহার স্বরূপ ভক্তিসিদ্ধান্তবিগ্রহ এবং নামও ভক্তিসিদ্ধান্তবিগ্রহ বা ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী।

প্রাকৃতবস্তুর রূপ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য কিন্তু তাঁহার

শ্রীপদকমলের শ্রীরূপ প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, কারণ তিনি অধোক্ষজতত্ত্ব, তিনি স্বতঃপ্রকাশবস্তু। সূর্য্যকে যেরূপ অন্য কোন আলোকের সাহায্যে দেখা যায় না, কেবল সূর্য্যের শরণাগত হইলেই তাঁহার প্রেরিত আলোকের সাহায্যে তাহাকে দেখা যায়। সেইরূপ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটী বৃত্তি লইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিগ্রহের, ভাগবতার্কের শরণাগত হইলেই তাঁহার প্রদত্ত মরীচি-মালার সাহায্যেই তাঁহার পদ-নখ-শোভা দর্শনের সৌভাগ্য হয়।

শ্রীরূপানুগবরের শ্রীপদের শ্রীরূপ যেমন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন সেইরূপ শ্রীগুণমঞ্জরীর অভিন্নবিগ্রহের অপ্রাকৃত গুণাবলীও প্রাকৃত জ্ঞানের বা অক্ষজজ্ঞানের গম্য নহেন অর্থাৎ আরোহপথের পথিকের উপলব্ধির বিষয় নহেন। যাঁহারা অবরোহ বা শ্রোতপথের পথিক, যাঁহারা শ্রৌতপথ আশ্রয় পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সিদ্ধান্তবিগ্রহ, সেবাবিগ্রহ ও বাণীবিগ্রহের নিষ্কপট শরণাগত অর্থাৎ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর বিশ্রম্ভসেবক, তাঁহারাই মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেব হইতে অভিন্ন-শ্রীচৈতন্যবাণী যে মহামহাবদান্য, ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

কোন বস্তুর পরিচয় দিতে হইলে তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কথা আলোচনা করা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্য বাণীর নাম ও স্বরূপের অভিন্নত্ব, তাঁহার শ্রীপদনখশোভা এবং তাঁহার গুণ বা মহিমার কথা যেরূপ অচিন্ত্য, অগম্য ও বর্ণনাতীত কেবল তাঁহার বিশ্রম্ভ সেবকগণই তাহা উপলব্ধি করিতে ও বর্ণনা করিতে পারেন; সেইরূপ তাঁহার লীলার কথাও অচিন্ত্য, অগম্য, বর্ণনাতীত অর্থাৎ তাঁহার অভিন্নাঙ্গ বিশ্রম্ভসেবকগণই তাহা উপলব্ধি করিবার ও বর্ণনা করিবার পাত্র। শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহের অন্তরঙ্গসেবকগণ বলেন, শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টস্থাপন বা শ্রীচৈতন্যবাণী সর্ব্বত্র প্রচারই শ্রীচৈতন্যবাণীর-লীলা।

যাঁহারা বিশেষ ভাগ্যবান্, যাঁহাদের ভূতশুদ্ধি হইয়াছে, তাঁহারাই আজ স্ব-স্ব উপায়নের পরিপূর্ণ সাজি হস্তে লইয়া উল্লসিতচিত্তে ছুটিয়াছেন অহৈতুকী বৃত্তির সহিত ও অপ্রতিহতা গতিতে বাণীহট্টের দিকে, সেই শ্রীচৈতন্যবাণীর পাদপদ্ম পূজা করিবার জন্য। আমিও তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয়ের অভিনয় করিয়াছি। কিন্তু আমার গতি আজ প্রতিহতা কেন? তাঁহার অহৈতুকী করুণা ত' সকলকেই আকর্ষণ করেন! চুম্বক সকল লৌহকে আকর্ষণ করিলেও যে লৌহ বিরূপ-অবস্থাপ্রাপ্ত বা মরিচাযুক্ত, সেই লৌহের প্রতি চুম্বকের আকর্ষণ থাকিলেও অর্থাৎ চুম্বক সেই লৌহকে অন্যান্য লৌহের ন্যায় আকর্ষণ করিলেও ঐ লৌহের উপরে যে মরিচার একটী আবরণ আছে তাহাই ঐ লৌহটীকে চুম্বকের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার পক্ষে বাধা দিতেছে বা অন্তরায় হইয়াছে। কিন্তু যখনই মরিচার আবরণটী বিশেষভাবে মার্জ্জিত হইবে বা লৌহের স্বরূপাবস্থা প্রকাশিত হইবে তখন উক্ত লৌহ চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিবে না। সেইরূপ আমার প্রতি বা মাদৃশ জীবের প্রতি শ্রীচৈতন্যবাণীর অহৈতুকী করুণা নিরন্তর সমভাবে বর্ষিত হইলেও—তাঁহার অসীম করুণা সকলকেই সমভাবে আকর্ষণ করিলেও মাদৃশ ব্যক্তির চিত্ত-দর্পণে যে অসংখ্য প্রকার ময়লা জমাট বাঁধিয়া আছে সেই হৃদয় ময়লাগুলিই তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইবার পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইয়াছে বা আমার ও মাদৃশ জীবের হৃদয়ের যে গতি, তাহা প্রত্যক্‌গতি; এই গতি তাঁহার পাদপদ্মের দিকে যে গতি তাহা প্রতিহত করিয়াছে। তবে মনুষ্য বা জীবমাত্রেই লৌহের ন্যায় জড়বস্তু নহে, জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। সুতরাং শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের সময় নিষ্কপটে আশ্রয় না করিয়া আশ্রয়ের অভিনয় পূর্ব্বক স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার বা উপযুক্ত চেষ্টা না করিয়া বঞ্চিত হইতে পারেন, আবার শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটে শরণাগত হইয়া শরণাগতির ষড়্‌বৃত্তির অন্যতম "আনু-কূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বিবর্জ্জনম্" এই দুই বৃত্তির দ্বারা বা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহাররূপ উপযুক্ত চেষ্টা দ্বারা সাধুসঙ্গ-বলে ও শ্রবণ-কীর্ত্তনজলে পূর্ব্বোক্ত হৃদয় ময়লাগুলি মার্জ্জিত করিবার জন্য, বিধৌত করিবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে বিশেষ যত্ন করিতে পারেন। অতএব উপযুক্ত চেষ্টার ফলে, সাধুসঙ্গ বলে ও শ্রবণ-কীর্ত্তনজলে যাঁহাদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত বা বিধৌত হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহাদের ভূতশুদ্ধি হইয়াছে।

তাঁহারাই "বাণী-পূজার অধিকারী"। আজ তাঁহারাই ভক্তিকুসুমের পরিপূর্ণ সাজি হস্তে লইয়া ছুটিয়াছেন বাণী-হট্টের দিকে—শ্রীচৈতন্যবাণীর পাদপদ্ম পূজা করিবার জন্য, তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তিকুসুমাঞ্জলি-প্রদানের জন্য। যে সকল হৃদয়মলয়া আমার ও মাদৃশজীবের শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের দিকে স্বাভাবিকী গতিটী প্রতিহত করিয়াছে তন্মধ্যে নিম্নে ঊনত্রিংশ প্রকারের বর্ণনা করিতেছি। ইহা একটী অসম্পূর্ণ তালিকা, পরে অপরগুলি প্রকাশ করিব।

১। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" এই শ্লোকটী কেবল মুখে কীর্ত্তন করিলেও নিজ আচরণের দ্বারা অঙ্কিত করিতে পারি না।

২। কোন দিন সমস্ত সময়টাই শ্রীগুরু-সেবাকার্য্যে অতিবাহিত হইলে বলি যে অদ্য নিজের ভজনাদি করিবার অবসর পাইলাম না অর্থাৎ মন্ত্র-জপ, মালিকা-সংযোগে সংখ্যা-নাম জপ বা কীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিবার, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখের কথা শুনিবার সময় পাইলাম না। সুতরাং দিনটা বৃথাই গেল। কেবল কর্ম্ম করিয়া দিন অতিবাহিত হইল, শুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠানের অবসর পাইলাম না। এইরূপে শ্রীগুরু-সেবা-কার্য্য প্রীতির সহিত না করিয়া কেবল লৌকিকভাবে করিয়া থাকি মাত্র।

৩। পূর্ব্বোক্ত মনোধর্ম্মের ভ্রান্ত বিচারটী ধ্যান করিতে করিতে পুষ্ট হইলে সেবা কার্য্য হইতে রেহাই পাইবার কৌশল অনুসন্ধান করিয়া মালিকা জপ করিবার, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিবার বা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিবার অভিনয় করি।

৪। পূর্ব্বোক্ত বিচারটী পরিপক্ক হইলে মনে করি মহান্তগুরুর সাক্ষাৎ সেবা করা অপেক্ষা নির্জ্জনে নাম-ভজন (?) করিয়া চৈত্ত্যগুরুর সেবা (?) করাই ভাল। তখন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য একবারেই ছাড়িয়া নির্জ্জন-ভজনের (?) জন্য নির্জ্জন কুটীরের অনুসন্ধান করি, কিম্বা কিছু আনুগত্যের ভাব দেখাইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট একটি নির্জন কুটীরের জন্য আবেদন করি।

৫। কখনও ভাবি—"আমি মূর্খ; কিছু বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া পণ্ডিত না হইলে, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া কণ্ঠস্থ না করিলে চিরকালই এইরূপ কষ্টকর ও নীচ (?) সেবাকার্য্যে জীবন কাটাইতে হইবে, উচ্চসেবা-কার্য্য করিবার অর্থাৎ যাহাতে কম পরিশ্রম হয়, নিজে বেশী পরিশ্রম না করিয়া অন্যের দ্বারা করাইবার সুযোগ আছে কিম্বা যাহাতে বেশী সম্মান আছে, ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্য না চাহিলেও পাওয়া যায় এরূপ সেবা-কার্য্যের যথা—লেখা-পড়ার কার্য্য, বা পাঠ-বক্তৃতাদির কার্য্য প্রভৃতি করিবার অধিকার লাভ হইবে না।" তখন জড়াবিদ্যা-অর্জ্জনের স্পৃহা বলবতী হয় এবং সেবাকার্য্যে প্রীতির অভাব লক্ষিত হয়। এইরূপে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকেই সেবা কল্পনা করিয়া সেবা-বিষয়ে উচ্চনীচ বিচার, হরিসেবায় জাড্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কপটতা প্রভৃতি অনর্থের প্রশ্রয় দিয়া থাকি বা উপশাখায় জলসেচন করিতে থাকি।

৬। সময় সময় এরূপ বিচার করি—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥"

সুতরাং শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা-কার্য্যে ব্রতী থাকিলে শাস্ত্র-অধ্যয়ন করিয়া ও গুরু-বৈষ্ণবের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত-জ্ঞান হইবার পক্ষে বিঘ্ন হইবে। তাই এখন কেবল শাস্ত্র-অধ্যয়ন ও শ্রবণাদি দ্বারা সিদ্ধান্ত বিষয়ে পরিপক্ক হইব। এখন বৈষ্ণবেরা ভিক্ষা করিয়া আমার সেবা করিবেন, আর আমি তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া শ্রবণ ও অধ্যয়নাদি করিতে করিতে সিদ্ধান্তবিৎ হইব। এইরূপে সেবা বাদ দিয়া শ্রবণাদির অভিনয় পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত রত্ন হইবার চেষ্টা করিয়া, শ্রৌতপথের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না হইয়া তর্কপন্থার আশ্রয়ে বিরোচনের ন্যায় শ্রীগুরু-কৃপা হইতে বঞ্চিত হই।

৭। আবার কখন কখন শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া সিদ্ধান্ত-শ্রবণে আলস্য প্রকাশ করি, তখন কিছুদিন বাহিরে সেবা-কার্য্যের খুব ঠাট্‌বাট দেখাইলেও মনে সর্ব্বক্ষণ দেহাদির চিন্তা, পূর্ব্ব ইতিহাসের চিন্তাদি করিতে

থাকি। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন করিয়া শ্রবণের সুযোগ থাকিলেও তাহাতে রুচি থাকে না। তাই শ্রবণ-বিষয়ে মোটেই উৎসাহ দেখা যায় না; এমন কি, শ্রবণের অভিনয় করিয়াও তাহাতে প্রীতির অভাববশতঃ অন্যমনস্ক থাকি। শ্রীগৌড়ীয়, শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রভৃতি পরমার্থ-পত্রিকায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক এবং শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্-ভাগবত ও তদ্‌ভিন্ন মহাজন-রচিত গ্রন্থ-ভাগবতে যে-সব উপদেশামৃত বর্ণিত হইয়াছে তাহা সাধুসঙ্গে ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করিবার, ভক্তিপূর্বক পাঠ করিবার ও ভক্তিপূর্বক বিচার করিবার প্রবৃত্তি আদৌ থাকে না। এইরূপে সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে মায়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হই।

৮। কিছু শ্রবণের পর শ্রৌতসিদ্ধান্ত আরও পরিষ্কার-ভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য, কীর্ত্তনযজ্ঞের দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবর্দ্ধনের জন্য শ্রীগুরুদেব শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনের অধিকার দিলে আমি বিচার করি—আমার শ্রবণদশা-শেষ হইয়াছে, আমার আর শ্রবণের আবশ্যতা নাই, আমি নিজেই এখন বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করিয়া অন্যকে মুগ্ধ করিতে পারি। সুতরাং শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ যে সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন তাহা কেবল অন্যের শ্রবণের জন্য, উহা আমার শ্রবণ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। যদি কখনও তাঁহাদের কথা শ্রবণ করি তাহা কেবল ব্যবহারিকতার মত—কোটী কোটী কর্ণে শ্রবণের পিপাসা উদিত হয় না।

৯। নিজে যে শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করি তাহা আমার শ্রবণের আবশ্যকতা নাই, অপরকে শ্রবণ করাইবার জন্যই কীর্ত্তন করিতেছি মাত্র এইরূপ মনে করি; তাই শ্রৌত-বাণী পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তনের অভিনয় করিলেও তাহা আচরণ করিতে পারি না এবং সেই প্রাণহীন প্রচারে অন্যেরও কোন মঙ্গল হয় না।

১০। সেবোন্মুখবৃত্তির সহিত যদি শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিতাম তবে হরিকীর্ত্তনে জাড্য দেখা যাইত না—আরও কোটী কোটী জিহ্বায় নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করিবার স্পৃহা বলবতী হইত—তজ্জন্য কোটী কোটী তুণ্ডলাভের প্রার্থনা করিতাম। কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে নামী হইতে অভিন্ন শ্রীনামে আমার অনুরাগ হইল না, তাই কেহ শ্রবণ করিতে আসিয়া হরিকীর্ত্তনের সুযোগ দান করিলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতে পারি না বরং কোনদিন হরিকীর্ত্তনের সুযোগ না ঘটিলেই যেন ভাল মনে করি।

১১। অন্যকে শুনাইবার বৃত্তি লইয়াই খোল-করতাল সংযোগে কীর্ত্তন করি অর্থাৎ কীর্ত্তনের অভিনয় করি; তাই দেখা যায় "কবে হ'বে বল সেদিন আমার", "কিরূপে পাইব সেবা আমি দুরাচার", "কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর", "ভবার্ণবে পড়ে মোর আকুল পরাণ" প্রভৃতি পদগুলি শত শত বার কীর্ত্তন (?) করিলেও চিত্তের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যদি নিষ্কপট আর্ত্তির সহিত ঐ প্রার্থনা করিতাম, তবে এই পাষাণ চিত্তও বিগলিত হইত; তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তনের অধিকার হইত; শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় রুচি হইত, বৈষ্ণবের কৃপায় সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় হইত, তখন আর বেশ-ভূষার অভিমানে প্রমত্ত হইয়া অর্থাৎ আমি সন্ন্যাসী, আমি ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অভিমান বশতঃ 'আমি হরিজন-কিঙ্কর'—এই স্বরূপটী বিস্মৃত হইয়া ভবার্ণবে হাবুডুবু খাইতাম না।

১২। আমার বক্তৃতা ও কীর্ত্তন শ্রবণ পূর্বক লোকে মুগ্ধ হইয়া যখন 'বাহাবা' দেন তখন শ্রীগুরুদেবই যে কীর্ত্তনকারী বিগ্রহ সুতরাং এই প্রতিষ্ঠা যে তাঁহারই প্রাপ্য তাঁহার পাদপদ্মেই যে ইহা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে এই বিচার বিস্মৃত হইয়া আমি নিজেই তাহা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করি। কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিতে বিলম্ব করিলে প্রশ্ন করিয়া তদুত্তরে আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা শ্রবণ করিবার বৃত্তি লইয়া কান পাতিয়া থাকি। পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিলে তাহাতে আমার নামটী থাকিলেই বিশেষ আনন্দিত হই। কোনদিন বেশী ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহা গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে দিয়া তদ্‌বিনিময়ে তাঁহাদের নিকট হইতে "দিল্লীর লাড্ডু"

পাইবার আশা করি, তাহা না পাইলে আমার সেইরূপ উৎসাহ দেখা দেয় না। এইরূপে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠাশারূপা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী আমার হৃদয়-প্রাঙ্গণে সর্ব্বক্ষণ নৃত্য করিতে থাকে।

১৩। আমি নিজে শ্রেষ্ঠ বক্তা, ভাল কীর্ত্তনীয়া, ভাল মৃদঙ্গ-বাদক বা প্রধান ভিক্ষা-সংগ্রহকারী অভিমান করিয়া তদুপযুক্ত প্রসাদ পাইবার আশা করি, তাহার ত্রুটি হইলেই আমার চক্ষুর আকার ও বর্ণ অন্যরূপ ধারণ করে, গাত্রের উত্তাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বালিশে কৃপার ছলনায় প্রসাদ বিতরণকারীর প্রতি অমৃতময়ী বাণী ধারা বর্ষণ করিতে থাকি। তখন "শ্রীগুরু সেবক হয় মান্য আপনার" এই শ্রৌতবাণীটী বিস্মৃত হই, কেবল তাহাতেই নিরস্ত না হইয়া মঠরক্ষকের যোগ্যতা আমার তৌল-দাঁড়িতে মাপিবার জন্য ব্যস্ত হই। এইরূপে প্রসাদের অবজ্ঞা, বৈষ্ণবের অবজ্ঞা করিয়া বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তীর পদতলে পিষ্ট হই।

১৪। আবার প্রসাদ-বিতরণাদি-দ্বারা বৈষ্ণবসেবার সুযোগ উপস্থিত হইলে আমি নিজ সেবাকার্য্যে অন্যমনস্ক থাকি' তাই বৈষ্ণবসেবার ত্রুটি দেখিয়া কোন বৈষ্ণবঠাকুর আমাকে বঞ্চনা না করিয়া কৃপাপূর্ব্বক আমার দোষটী দেখাইয়া দিলে বা ভবিষ্যতে যাহাতে ঐপ্রকার ত্রুটী না করি তাহার উপদেশ দিলে আমি তাঁহার মঙ্গলময়ী বাণী গুলি অনুগ্রহরূপে বরণ না করিয়া অসহিষ্ণু হইয়া পড়ি ও সেবাসৌভাগ্যটী পরিত্যাগ করিবার জন্য আবেদন করি এবং বৈষ্ণবঠাকুরকে আমারই মত চিত্তবৃত্তি বিশিষ্ট মনে করিয়া তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রকাশ্যে বা মনে মনে "বৈরাগীর কৃত্য" শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হই।

১৫। বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার উপকরণগুলিকে পূজারূপে দর্শন না করিয়া আমার ভোগ্য মনে করি, তাই জিহ্বা-বেগের বশবর্ত্তী হইয়া বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পাইবার প্রতীক্ষা না করিয়া ভোগের আগেই প্রসাদ সেবনের ছলনা করি।

১৬। নিজেকে শ্রেষ্ঠ অভিমানবশতঃ অন্য গুরুসেবকের দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইবার বা গ্রহন করিবার প্রবৃত্তি বলবতী হয়, তাই 'গুরুসেবক আমার মান্য' এই বুদ্ধির পরিবর্ত্তে 'আমার ভোগ্য' এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়। তখন আচার্য্যদেবের নিম্নলিখিত মঙ্গলময়ী বাণীটী বিস্মৃত হই।

আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
গুরু অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট পদজল-রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥
নিজ শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে
হ'বে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কার॥
অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

১৭। আবার "কামুকা পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" এই ন্যায়ানুসারে নিজে যেরূপ অপবিত্র-চরিত্র, সেইরূপ বৈষ্ণবদিগকেও মনে করি এবং অক্ষজ দর্শনে বৈষ্ণবের আচরণ দেখিতে গিয়া রামচন্দ্র পুরীর ন্যায় কেবল বৈষ্ণবের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে থাকি। তাঁহাদের গুরুপাদপদ্মে অর্পিত দেহরক্ষা বিধানের জন্য হরিসেবার অনুকূল চেষ্টা বা যুক্তবৈরাগ্য এবং মাদৃশ ভোগীর ভোগময় চেষ্টা একই প্রকার মনে করি। তখন মহাজনের নিম্নলিখিত উপদেশটী স্মরণপথে আসে না বলিয়া বৈষ্ণবনিন্দা করিয়া অনন্ত নরকের পথে অগ্রসর হই।

বৈষ্ণব ঠাকুর অপ্রাকৃত সদা
নির্দ্দোষ আনন্দময়।
কৃষ্ণনামে প্রীত জড়ে-উদাসীন
জীবেতে দয়ার্দ্র হয়॥

অভিমান-হীন ভজনে প্রবীন
বিষয়েতে অনাসক্ত।
অন্তরে বাহিরে নিষ্কপট সদা
নিত্যলীলা অনুরক্ত॥
বৈষ্ণব-চরিত্র সর্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তা'রে
থাকে সদা মৌন ধরি'॥

১৮। বৈরাগ্যের প্রকৃত স্বরূপ বুদ্ধিতে অসমর্থ হইয়া— ফল্গু ও যুক্ত বৈরাগ্যের পার্থক্য বা যুক্তবৈরাগ্যের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে না পারিয়া লোকদেখান ফল্গু-বৈরাগ্যকেই সাদরে বরণ করিয়া বঞ্চিত হই। "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥" এবং "অনাসক্তস্য বিষয়ান যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥" এই শ্লোক দুইটীর শ্রৌতমর্ম্ম উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি না।

১৯। ফল্গুবৈরাগ্যের দাসত্ব করিতে গিয়া কখনও পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারীর ন্যায় আহার কমাইয়া 'কণভোজী' হইবার চেষ্টা করি, কখনও বা নিদ্রার পরিমাণ কমাইয়া 'জিতনিদ্র' নামে খ্যাত হইবার জন্য সাধনা করি। আবার কখনও শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষার মর্ম না বুঝিয়া কেবল তাঁহার অনুকরণ পূর্বক বলিয়া থাকি— আমি লাফরা ব্যঞ্জন ব্যতীত অন্যরূপ সুস্বাদু ব্যঞ্জন প্রসাদ কিছুই গ্রহণ করিব না। এইরূপ কখনও শ্রীল রূপ সনাতন গোস্বামীর, কখনও বা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের অনুকরণ করিয়া থাকি। তখন-কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতির পরিবর্ত্তে ফল্গু বৈরাগ্যের চিন্তা করিতে করিতে ব্যতিরেকভাবে ষড়রসের চিন্তারূপ কৃষ্ণেতর চিন্তা বা কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ কুফলই লভ্য হয়।

২০। ফল্গুবৈরাগ্যের প্রিয় সেবকগণের ফল্গুবৈরাগী বিশ্বামিত্রের স্ত্রীসন্দর্শন বর্জনের আদর্শটাই বড় আদরের হয়; তাই যুক্ত-বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান্ আদর্শশিরোমণি নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিশ্ব-মঙ্গলময় সহজ আদর্শের স্ত্রী-মূর্ত্তি দর্শন শিক্ষা না করায় কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণ-কান্তারূপে দর্শনের বিবেক উপস্থিত না হওয়ায় সতত কৃষ্ণপাদপদ্মস্মৃতির ও কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের আদর্শের অনুসরণ করিবার সৌভাগ্য হয় না। তাই "আমি স্ত্রীলোক দেখিব না" "আমি স্ত্রীলোক দেখিব না" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্যতিরেকভাবে নিরন্তর যোষিতের চিন্তা বা সূক্ষ্মভাবে যোষিৎসঙ্গ করিতে করিতে পরে বিশ্বামিত্রের ন্যায় স্থূলভাবেও কামিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া পূর্ণমাত্রায় বান্তাশী হইতে হয়।

২১। সনাতন-শিক্ষা সার সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বত্রয় এবং যুগপৎ ভক্তি, পরেশানুভব ও বৈরাগ্য এই তিনটী তত্ত্বের কথা মাদৃশ ফল্গুবৈরাগীর অনুশীলনের বিষয় না হইয়া কেবল মূল্যবান্ ভোটকম্বল পরিত্যাগ করিয়া ছেঁড়া কাঁথা গ্রহণ ও পুরাতন বস্ত্রখণ্ড পরিত্যাগ করা অর্থাৎ ভাল ভাল বস্ত্র পরিধান না করা ও ভাল দ্রব্য ভোজন না করাই বা লোকদেখান বৈরাগ্যই সনাতন-শিক্ষা-সার, এইরূপ বিচার হইয়া থাকে। তখন বাহ্যিক বৈরাগ্যের কঠোরতা দেখাইয়া অন্যের নিকট হইতে "আপনার বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা" প্রভৃতি কথা শুনিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। এইরূপ কৃত্রিম-চেষ্টার ফলে কৃষ্ণবিস্মৃতিই হইয়া থাকে।

২২। যাহাতে আমার ফল্গুবৈরাগ্যের কোনপ্রকার বিঘ্ন না হয় তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকি, কাজেই গুরুবৈষ্ণবের প্রদত্ত মহাপ্রসাদ ও তাঁহাদের প্রদত্ত বস্ত্র-প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করিয়া অর্থাৎ মহাপ্রসাদ বা অনুগ্রহের অবজ্ঞা করিয়া মনোধর্মের খেয়ালমত খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র-সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হই। আবার গুরুবৈষ্ণবগণ—"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ" এই আজ্ঞা করিলে কিম্বা প্রত্যেক গৃহে গৃহে যাইয়া 'মাধুকর ভৈক্ষ্য' সংগ্রহ করিতে আদেশ দিলে 'স্ত্রীসন্দর্শন', 'রাজদর্শন' বা 'বিষয়িদর্শন' হইবে এইরূপ বিচার কল্পনা করিয়া তাঁহাদের আদেশ-পালনে বিমুখ হই; কারণ "ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ" শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের এই আশীর্বাদের উপর নির্ভর করিতে বা ঐ বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারি না। সুতরাং ফল্গুবৈরাগ্যের সেবা করিতে গিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব

সেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হই। "ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে" এবং "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥" এই দুইটী উপদেশের শ্রৌতমর্ম শ্রৌতপথে অবগত না হইয়া বাহ্যার্থ গ্রহণ প্রবৃত্তিই ঐরূপ বঞ্চিত হইবার প্রধান কারণ।

২৩। আবার আর একদিকে যুক্তবৈরাগ্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বৈষ্ণবের অনুকরণ করিতে গিয়া যুক্ত বৈরাগ্যের ছলনায় ভোগের পথে ধাবিত হই। তখন শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রদত্ত ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের অন্ন বা শুষ্ক রুটি, লাফরা ব্যঞ্জনাদিরূপ মহা-প্রসাদের সেবা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। কাজেই রোগের ছলনায়' অথবা বিশেষ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া স্বীয় পদমর্য্যাদা রক্ষা করিলে প্রচারের অনুকূল হইবে—এইরূপ "প্রচার-সেবার ছলনায়" নিজে বরাত করিয়া কিম্বা নিজে পৃথক্ সেবক নিযুক্ত করিয়া ভাল ভাল দ্রব্য পাক করাইবার বা সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকি। তখন আমি এইরূপ বিচার করি যে "ভাল না খাইবে" "আমাকে দাও লাফরা ব্যঞ্জন" "শ্রীল রূপসনাতনের শুষ্ক রুটি, চানা চিবাইবার আদর্শ" শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সড়া অন্ন প্রসাদ লবণ দিয়া ভোজনের আদর্শ" "জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥" প্রভৃতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ও শ্রীগোস্বামিবর্গের আচরণ ও উপদেশগুলি আমার শিক্ষার জন্য নহে—ঐ সব উপদেশ পালন করিবার বা আদর্শের অনুসরণ করিবার আবশ্যক আমার নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগোস্বামিবর্গেরই যেন ঐ প্রকার আচরণ করিবার আবশ্যক হইয়াছিল কিম্বা আমার গুরুবর্গকে শিক্ষা দিবার জন্যই যেন তাঁহারা ঐসব আচরণ ও উপদেশ করিয়াছেন। আমার নিকট বিধি-পালন বা সাধন বলিয়া কোন কথা নাই, কিম্বা কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ বলিয়া কথাটি আমার আচরণীয় নহে, কারণ আমি সাধনের পূর্ব্বেই সিদ্ধ (?) হইয়াছি, বৃক্ষে না উঠিয়াই ফল লাভ (?) করিয়াছি, অকালে পক্ক বা এচড়েই পক্ক হইয়াছি। অতএব আমার পক্ষে সাতখুন মাপ, বিধি-উলঙ্ঘনজনিত দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না! পরমহংস বৈষ্ণবগণের বা গুরুবর্গের অনুসরণ না করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্যের ছলনায় অনুকরণ করিলে বা মর্কটের ন্যায় যুক্তবৈরাগীর বেষে মর্কটবৈরাগী আমি তাঁহাদিগকে ভেঙচাইলে তজ্জনিত যে অপরাধ, তাহা আমি হজম করিতে পারিব।

২৪। যুক্তবৈরাগ্যটি (?) আমার এত প্রিয় হইয়াছে যে, তাহা বজায় রাখিবার জন্য আমার অখিলচেষ্টা, তাই অন্য বৈষ্ণবগণ কোন্ দিন কোন্ সময় কি কি প্রসাদ সেবন করিতেছেন তাহা বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক অবগত হইয়া তাহার অনুকরণ না করিয়া আমি থাকিতে পারি না।

২৫। "ভাল না পরিবে" শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশটি যেন তাঁহার নিত্য-পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীরই শ্রবণের ও আচরণ করিবার আবশ্যক হইয়াছিল, উহা আমার শ্রবণ করিবার ও আচরণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ আমি যে যুক্তবৈরাগী (?) তাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রদত্ত বসন-ভূষণাদিতে আমি সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া পৃথগ্‌ভাবে বিলাসোপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হই। আমি যে সাধন না করিয়াই সিদ্ধ বা পরমহংস (?) তাই চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে, মচ্‌মচে চর্ম্ম-পাদুকা-বিক্রেতা আমাকে দেখিবা মাত্রই নমস্কার করে।

২৬। বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলে বা প্রচার-সেবার জন্য উৎকৃষ্ট যানাদিতে আরোহণ করেন, সেরূপ আচরণে তাঁহাদের অন্তরে বিন্দুমাত্রও আত্ম-সম্ভোগের অভিসন্ধি বা কপটতা নাই, কিন্তু আমি তাঁহাদের আচরণের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অনুকরণপূর্ব্বক অনেক সময় প্রচার সেবার ছলনায় বা যুক্তবৈরাগ্যের ছলনায় আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলে কেবল স্থূলদেহের মাংসপিণ্ডকে উৎকৃষ্ট যানবাহনে চাপাইয়া সূক্ষ্মদেহের খেয়াল মিটাইয়া থাকি। আত্মসম্ভোগ-বুদ্ধিতে অপকৃষ্ট যানেও চাপা উচিত নয়, তাহা আমি বুঝি না।

২৭। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণীর অকৃত্রিম সেবক তাঁহারা প্রচার-সেবার জন্য সর্ব্বত্র গমন করিলেও তাঁহাদের সর্ব্বত্র গুরুদর্শন বা কার্ষ্ণ-দর্শন ব্যতীত প্রকৃতি-দর্শন, বিষয়ি-

দর্শন বা রাজদর্শন নাই কিন্তু মাদৃশ সেবকাভিমানী, যুক্ত-বৈরাগী-অভিমানী সময় সময় নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আদর্শের অনুসরণ না করিয়া প্রচার-সেবার ছলনায় ছোট হরিদাসের ন্যায় চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া কৈতব-পথে ধাবিত হইয়া থাকি।

২৮। "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে···স এব গোখরঃ"—এই শ্লোকটী আমি অনেকবার কীর্ত্তনের অভিনয় করিলেও আমার দেহাত্মবুদ্ধি বিদূরিত হয় নাই। তাই আমি রোগগ্রস্ত অভিমানে দেহের চিন্তায় এতদূর অভিভূত হইয়া পড়ি যে, দেহের ঐ অসুস্থতাই শ্রীভগবানের অনুগ্রহ—তাহা ভুলিয়া গিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কর্ত্তৃক নিযুক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসায় সন্তুষ্ট না হইয়া যুক্তবৈরাগ্য (?) বজায় রাখিবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন চিকিৎসকের নিকট ছুটাছুটি করি এবং বৈষ্ণবের প্রদত্ত পথ্যে তৃপ্ত না হইয়া নিজখেয়ালমত পথ্যসংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হই ; কারণ তাঁহারাই যে আমার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী তাহা বিস্মৃত হইয়া পড়ি।

২৯। বিভিন্ন চিকিৎসকের নিকট ছুটাছুটি করিয়া বহুবিধ ঔষধসেবাজনিত ঔষধের বিসক্রিয়া উপস্থিত হয় ; তখন ঔষধ সেবন বন্ধ করাই সেই রোগের চিকিৎসা এই বিচার, কিম্বা রোগ আরোগ্য হইলেও রোগের কল্পনা করিয়া রোগের চিন্তা করাই আমার একটা রোগ হইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া বৈষ্ণবগণ আমার প্রতি উপেক্ষারূপ অনুগ্রহ করেন। আমি তখন তাঁহাদের অমন্দোদয়া কৃপার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া আমার প্রতি তাঁহাদের যথাযোগ্য ব্যবহারের ক্রটী হইল, এইরূপ ভাবিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ অর্জ্জন করি। আমি—হরিজন-কিঙ্কর, তাঁহাদের সেবা করাই আমার স্বরূপের বৃত্তি, তাহার বিনিময়ে তাঁহাদের নিকট হইতে সুস্থাবস্থাতেই হউক বা অসুস্থাবস্থাতেই হউক সেবাগ্রহণ প্রবৃত্তি বা তাঁহাদিগকে সেবক-জ্ঞানরূপ দুর্ব্বুদ্ধি বৈষ্ণবদাসের আচরণ নহে তাহা আমি ভুলিয়া যাই। বৈষ্ণবগণ ভবরোগবৈদ্য সুতরাং তাঁহারা জানেন, আমার গলদ কোথায়, তাই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া বঞ্চনা করেন না ; কারণ আমার নিত্যমঙ্গলই আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহারা যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া ঔষধ-পথ্যাদি দেন তাহাও তাঁহাদের অনুগ্রহ, আবার যদি ঘোর বিকারগ্রস্ত অবস্থায় কোন প্রকার চিকিৎসার এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা না করিবার বা কোন খোঁজখবর না লইবার, এমন কি সেই অবস্থায় মঠ হইতে টানিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিবার অভিনয়ও করেন তথাপি নিষ্কপটে গুরুসেবকের চিত্ত বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না, তখন তাঁহারা এইরূপ বিচার করেন যে—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ আমার সেবাবৃত্তি পরীক্ষা করিতেছেন ; আমি—

"মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥"

—শরণাগতির এই পদটি বহুবার কীর্ত্তন করিয়াছি ইহা আচরণের দ্বারা প্রতিফলিত করিতে পারি কি না তাহাই পরীক্ষা করিতেছেন; অতএব শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ যে কৃপা-সিন্ধু সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

৩০। যুক্তবৈরাগ্য (?) বজায় রাখিবার জন্য অখিল চেষ্টার আর একটী বিশেষ নিদর্শন—"আখেরের চিন্তা-জনিত অত্যাহার" "সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া, পড়েছি তোমার ঘরে" ইহা বহুবার কীর্ত্তন করিলেও দেখা যায় আমার একটী পৃথক্ তহবিল আছে, কারন "যেজন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর" সুতরাং আমি যখন কৃষ্ণ ভজন (?) করিতেছি তখন আমার চতুর হওয়া বিশেষ আবশ্যক। চতুরতা বজায় রাখিতে হইলে আখেরের চিন্তা না করিয়া থাকা যায় না এখন যদি সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পন করিয়া দিই তবে তিনি কীর্ত্তনযজ্ঞে তৎক্ষণাৎ সব ব্যয় করিয়া দিবেন আমার আখেরের জন্য কিছুই রাখিবেন না। তাহার উপর

"নিতাই চরণ সত্য"

—ইহা মুখে কীর্ত্তন করিলেও অন্তরে তাঁহাকে মনুষ্যবুদ্ধি না করিয়া অর্থাৎ তাঁহার অপ্রকটের কথা চিন্তা না করিয়া থাকা যায় না, তাঁহার অপ্রকটের পর কে আমাকে রক্ষা ও পালন করিবেন ? তাই আমি বাহিরে

শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবক বলিয়া পরিচয় দিলেও শুক্রাচার্য্যেরই নিষ্কপট সেবক। শুক্রাচার্য্য বলি মহারাজের নিকট অচৈতন্য-বাণী কীর্ত্তন করিলে তিনি যে বাণীর অনাদর করিয়াছিলেন আমি বলি মহারাজ অপেক্ষা চতুরাভিমানী বলিয়া সেই অচৈতন্য বাণীকেই চৈতন্যবাণীর পরিবর্ত্তে সাদরে বরণ করিয়াছি। আমার চতুরতার আরও পরিচয় এই যে তিনি আখেরে কোন প্রকার চিন্তা না করিয়াই তহবিল সমেত সর্বস্ব অর্পন করিয়াছিলেন বা আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু তহবিলটি দস্তুর মত পৃথক্ রাখিয়া এবং ক্রমশঃ তহবিল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা ষোল আনা বজায় রাখিয়া আত্মনিবেদন (?) করিয়াছি, অতএব দেখুন কে বুদ্ধিমান্? আমি না তিনি ও তাঁহার অনুসরণ কারিগণ? তাহা ছাড়া দেখুন, আমি কত জীবে দয়া করিতেছি', অনেক মূর্খ ব্যক্তি আমার জলন্ত আদর্শ দেখিয়া চতুর হইয়া পড়িতেছে, তাহারা ভাল করিয়া না বুঝিয়া, আখেরের কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইয়াছিল কিন্তু আমার এমন মূর্ত্তিমদ্ আদর্শ দেখিয়া কি তাহারা মূর্খ থাকিতে পারে! তাই আমার কৃপায় ক্রমশঃ চতুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এখন দেখিতেছি আমি বর্ত্ম প্রদর্শক হইলেও আমার কোন কোন চেলা আমা অপেক্ষাও বেশী বুদ্ধিমান্ তাই তাঁহারা তাহাদের তহবিলের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য "নির্গুণ-খাদ্য" ও প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না, নৈতিক ভূমিকায় কোন কথাই তাহাদিগকে সে-কার্য্যে বাধা দিতে পারে না কারণ দৈবী মায়া তাহাদিগকে যুক্তবৈরাগ্যের ছলনা বা ভক্তিনীতির অনুকরণ করিবার বুদ্ধিযোগ দান করে, আবার তাহাদের এত দৈন্য যে নৈতিকগণেরও নিম্ন-ভূমিকায় অবস্থান করিবার জন্য বিশেষ রুচি। যদি আমি শ্রীচৈতন্যবাণীর নিষ্কপট সেবক হইতাম তবে শুক্রা চার্য্যের উপদেশের (?) আদর করিতাম এবং নিম্নলিখিত শ্রীচৈতন্যবাণীগুলি আমার চিন্তার বিষয় হইত, আলোচনার বিষয় হইত এবং তাহা আচরণের দ্বারা প্রতিফলিত-করিবার বিশেষ চেষ্টা থাকিত।

হিরণ্য গোবর্দ্ধন্‌কে লক্ষ্য করিয়া শ্রীচৈতন্য-বাণী—

"তোমার বাপ জেঠা বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি' মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
তথাপি বৈষ্ণব নহে বৈষ্ণবের প্রায়॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কার্য্য করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥"

ঈশানের প্রতি শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বাণী—

"সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল যম।"

ও

"মোহর লইয়া যাহ তুমি দেশ।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ)

বন্দিগণের প্রতি শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বাণী—

"বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥
বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল।"

নীলাচলের পথে শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের নিষ্কিঞ্চনতা পরীক্ষা ও তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভগবন্নির্ভরতা শিক্ষা প্রদানরূপ শ্রীচৈতন্যবাণী—

পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সবা প্রতি।
কি সম্বল আছে বল কাহার সংহতি॥
সবে বলে প্রভু বিনা আজ্ঞায় তোমার।
কার দ্রব্য লইতে বা শক্তি আছে কার॥
শুনিয়া ঠাকুর বড় সন্তোষ হইলা।
শেষে সেই লক্ষ্যে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা॥
প্রভু বলে কাহার যে কিছু না লইলা।
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা॥
ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে দিন লিখন।
অরণ্যেতে আসি মিলে অবশ্য তখন॥
প্রভু যারে যে দিবস না লিখে আহার॥
রাজপুত্র হউ তবু উপবাস তা'র॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নছত্র।
ঈশ্বরের আজ্ঞা থাকে মিলিব সর্ব্বত্র॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২য় অঃ)

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বাণী—

আপনে ঈশ্বর সর্বজনেরে শিখায়।
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই সুখ পায়॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সেই ফল ধরে॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২য় অঃ)

৩১। আমি 'ত্যাগী' অভিমান করিয়া স্ত্রীসঙ্গিগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখি কিন্তু আমি বুঝি না যে কোন জীবই ঘৃণার-পাত্র নহে। তবে কৃষ্ণবিমুখ জীবের কৃষ্ণবিমুখতা যোষিৎ সঙ্গিগণের যোষিৎসঙ্গ বা নিজেকে ভোক্তা অভিমান ও স্ত্রীকে ভোগ্যরূপে দর্শন প্রভৃতি অসদাচারগুলিই ঘৃণ্য, আবার বৈধ বা অবৈধ-স্ত্রীতে আসক্তি ব্যতীতও যে বহু প্রকারে স্থূল বা সূক্ষ্ম ভাবে যোষিৎসঙ্গ হইতে পারে সে চিন্তা আমি করি না, সে বিষয়ে আমি সতর্ক হই না। মুহূর্ত্তের জন্যও নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে দেখা যায়—আখেরের জন্য রক্ষিত তহবিলটী, অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষ্য এই দেহটি বসনভূষণাদি—এমন কি ডোর-কৌপীন পর্য্যন্ত আমার নিকট যোষিদ্রূপে বর্ত্তমান অর্থাৎ নিজেকে ভোক্তা অভিমান করিয়া ঐ সকলকে ভোগ্যরূপে দর্শন করায় এবং ঐ সকলে আসক্তচিত্ত হওয়ায় আমারও অন্যপ্রকারে সর্ব্বক্ষণ যোষিৎসঙ্গই হইতেছে। কারণ ঐ সকলে আসক্তচিত্ত হওয়ায় কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ ফলই লাভ করিতেছি। সুতরাং আমি বৈরাগীর বেষেও যোষিৎসঙ্গী বা মর্কট বৈরাগী। অতএব সোজাসুজি স্ত্রীসঙ্গিগণের অপেক্ষাও আমার অনেক আচরণ ঘৃণ্য।

৩২। আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মূর্ত্তিমান্ আদর্শের, শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট সেবকগণের, বিশ্রম্ভ সেবকগণের জ্বলন্ত আদর্শের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, তাহাদের অনুসরণ জন্য রুচিবিশিষ্ট হই না, কেবল অনুকরণ করিয়া বঞ্চিত হই, আর একদিকে রামচন্দ্র পুরী, ছোট হরিদাস, কালাকৃষ্ণদাস (শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশে ভ্রমণের সঙ্গী বা ভৃত্য) ও ঈশান (বৃন্দাবনপথে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সঙ্গী বা ভৃত্য) প্রভৃতির ন্যায় চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট সেবকব্রুবগণের অসদাচারের আদর্শগুলিই আমার বড় আদরের হয়, আমি তাহাদের অসদ্-আদর্শগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক বঞ্চিত না হইয়া থাকিতে পারি না। কোন বৈষ্ণবঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক আমার দুর্দ্দৈব-গুলি দেখাইয়া দিলে আমি শেষোক্ত আদর্শ দেখাইয়া নিজেকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করি।

৩৩। নিষ্কপট সেবকগণ শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা-সুযোগ-লাভের জন্য সময় প্রতীক্ষা করেন এবং কোন সেবা সুযোগ লাভ করিলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেন। কিন্তু আমার বিচার তাহার ঠিক বিপরীত। আমি অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া ভাবি যে—"সেবাকার্য্য করিয়া আমি তাঁহাদিগকেই ধন্য করিয়া দিতেছি, আমি সেবাকার্য্যে 'ইস্তফা' দিলে তাঁহারা আমার অভাবে বিশেষ অসুবিধায় পড়িবেন, আমার স্থলে অন্য কোন উপযুক্ত সেবক পাইবেন না, সুতরাং সেবাকার্য্যের বিশেষ বিশৃঙ্খলা হইবে এবং তখনই তাঁহারা আমার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবেন!" এইরূপ বিচার করিয়া সময় সময় সেবাকার্য্যে ইস্তফা দিবার সঙ্কল্প করি বা সঙ্কল্পটী কার্য্যে পরিণত করিবার ধৃষ্টতা করি। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছারূপ কাম ও সেবার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে না পারিয়া কখনও বলি—আমাকে যে সেবার ভার দিয়াছেন বা দিতেছেন তাহা আমি করিতে পারিব না ; যদি আমাকে অমুক সেবার (?) ভার দেন তবে আমি করিব। মাদৃশ নগণ্য শত সহস্র সেবকব্রুব থাকিলেই কি, আর না থাকিলেই বা কি? তাহাতে বৈষ্ণবগণের কি আসে যায়? তাঁহারা কেবল জীবে দয়ার বশবর্ত্তী হইয়াই এ হেন অধমকেও স্থান দেন, ইহা আমি দুর্দ্দৈববশতঃ বুঝি না।

৩৪। বিশেষ উৎসাহের সহিত নিষ্কপটে পাঁচপ্রকারের ভিক্ষা-সংগ্রহের জন্য উৎসাহ আমার মোটেই নাই। কখনও ভাবি, ভিক্ষাসংগ্রহ করিবার যোগ্যতা আমার নাই, যাঁহাদের যোগ্যতা আছে তাঁহারাই সে বিষয়ে চেষ্টা করিবেন, শ্রীগুরুসেবার জন্য— প্রচার-সেবার জন্য যত ঝঞ্ঝাট তাঁহারাই পোহাইবেন, তাঁহারাই সব চিন্তা করিবেন, আমার যখন যোগ্যতা নাই তখন সে-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিব, যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য উপযুক্ত চেষ্টা করিবারও আমার আবশ্যক নাই। যদিও

বা কখন কোন বৈষ্ণবের সহিত ভিক্ষায় বাহির হই তাহা কেবল লোক দেখাইবার বা দিন কাটাইবার মত; কারন যত বুদ্ধি ও বাক্য তিনিই ব্যয় করিবেন, আমার মাথা খাটাইবার কোন আবশ্যকতা নাই, আমি কেবল সঙ্গে থাকি ঠুঁটুরামের মত বা একটী শুষ্ক যষ্টি কিম্বা জড়বস্তুর মত, যেন চেতনের ক্রিয়া একবারেই লুপ্ত হইয়াছে। আবার যদি ভিক্ষাসংগ্রহে বিশেষ পারদর্শী হই তবে তখন ধরাকে সরার মত দেখি। তাই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে ভিক্ষালব্ধ অর্থ প্রদানের সময় বলি যে—"ভিক্ষাসংগ্রহ করিতে অনেক গ্যালন রক্ত খরচ করিতে হয়, যাঁহারা ভিক্ষা সংগ্রহ করেন তাঁহারা ইহা যতটা বুঝেন যাঁহারা খরচ করেন তাঁহারা ততটা বুঝেন না, সুতরাং এই অর্থ বুঝিয়া সুজিয়া খরচ করিবেন, অমুক অমুক বিষয় খরচ করিবেন না, সংগৃহীত অর্থ ঐসব বিষয়ে খরচ করা আমার মত নহে। এইরূপে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে অর্থনীতি শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতা করি। আমার চক্ষুর কিরূপ দিব্য দর্শনশক্তি। তাই তাঁহাদের হরিসেবা ছাড়া—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ ছাড়া অন্য কোনও কৃত্য আছে এরূপ দর্শন করি। অহো! ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমার পোড়া-কপালকে, ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমার প্রাকৃত দর্শনে, ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্, আমার সেবার ছলনাকে ধিক্!

৩৫। শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর শিষ্যব্রুব কমলাকান্ত বিশ্বাস যেরূপ স্বীয় গুরু ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্যকে ঋণগ্রস্ত ভাবিয়া নীলাচলাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট আচার্য্যের ঋণ-শোধের জন্য তিন শত মুদ্রা ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন আমিও অনেক সময় ভিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে ও বুঝাইতে অসমর্থ হইয়া কমলাকান্তের আদর্শ-গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষাসংগ্রহ করিতে অগ্রসর হই; কখনও আচার্য্যবর্য্যের কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহার আচরণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলি যে—আয় বুঝিয়া ব্যয় না করিলে নিশ্চয়ই ঋণ হইবে সুতরাং কিছু ব্যয়সঙ্কোচ করা আবশ্যক, এমন কি সময় সময় প্রাকৃত দর্শনে দেখিতে গিয়া তাঁহাকে ঋণগ্রস্তও দেখিয়া থাকি। তখন কমলাকান্তের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিম্নলিখিত দণ্ডের কথা, তাঁহার সিদ্ধান্তের কথা বিস্মৃত হইয়া উপরিউক্ত মায়াবাদ বা বাউলমতেরই প্রশ্রয় দিয়া থাকি। আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ আচার্য্যের প্রতি দরিদ্রতা আরোপ যে মহাপরাধ, তিনি বিভিন্ন প্রকার আচরণের অভিনয় করিয়া যে আমাদিগকে সেবা-সুযোগ দান করেন তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

ঈশ্বরের দৈন্য করি' করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি' করাইব শিক্ষা॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল ইহা আজি হইতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসে এথা না দিবে আসিতে॥
(চৈঃ চঃ আদি ১২শ পঃ)

৩৬। শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে প্রণিপাতের অভিনয় করিলেও নিষ্কপটে প্রণিপাত করিতে পারি না। মাদৃশ বদ্ধজীব ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব-দোষযুক্ত এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যে উক্ত দোষ-চতুষ্টয়শূন্য ইহা মুখে শত সহস্রবার বলিলেও আচরণের দ্বারা তাহার বিপরীত ভাবই প্রকাশ করি। আমি কোন সেবাকার্য্যে ব্রতী হইয়া যে পদ্ধতি অবলম্বন করি তাহা যে ভ্রমযুক্ত ইহা কৃপাপূর্ব্বক তাঁহারা জানাইয়া দিলেও তাহা অবনত-মস্তকে হৃষ্টচিত্তে স্বীকার করিতে পারি না; বরং পাষাণের অবনত হওয়াও সম্ভব, কিন্তু আমার মস্তক কিছুতেই তাঁহাদের সিদ্ধান্তের নিকট অবনত হইতে চায় না, আমার ধারণা এতটা বদ্ধমূল হয় যে, বরং সূর্য্য পশ্চিমদিকে উদিত হইতে পারে তথাপি আমার সিদ্ধান্তে—আমার বিচারে কখনই ভুল হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিচারই ভুল, তাঁহারা যদি কার্য্যক্ষেত্রে নামিতেন তাহা হইলে আমার বিচার যে নির্ভুল এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে ভ্রমযুক্ত ইহা অবশ্যই বুঝিতে পারিতেন। তৎকালে আমার চিত্তের অবস্থা এরূপ হয় যে—শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিচার গ্রহণ করা অপেক্ষা সেবাকার্য্যে ইস্তফা দেওয়াই আমার পক্ষে সহজ হয়। অতএব আমি কেবল মুখে শ্রৌতপথের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেও আরোহ-পথেরই পথিক।

৩৭। সময় সময় যথাযথ আদেশ পালনের অভিনয় করিলেও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আদেশের মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করি

না, তাহাতে সেবাকার্য্যে ব্রতী হইয়াও সেবা করিতে পারি না। বিষয়টী বুঝাইবার জন্য উদাহরণরূপে বলা যাইতে পারে—কোনও প্রভু সেবককে হরিতকী আনিতে বলিলে তিনি হরিতকীর বাহিরের আবরণটী ফেলিয়া অষ্টিটী আনিলেন, তাঁহার এরূপ বিচার হইল যে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কলা, বাদাম প্রভৃতি ফলের খোসা ফেলিয়া ভিতরের দ্রব্যটী দিতে হয়। সুতরাং হরিতকীরও খোসাটী ফেলিয়া দিতে হইবে। তখন তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—অরে মূর্খ, হরিতকীর যে অংশটি দরকার তাহাই যে ফেলিয়া দিয়াছিস্, ইহার খোসাটাই যে কাজে লাগিত। আর একদিন সেবককে এলাচ আনিতে বলিলে এলাচের দানাগুলি ফেলিয়া দিয়া সেবক কেবল খোসাটী লইয়া উপস্থিত; কারণ, প্রভুর পূর্ব্ব-উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। আমিও অনেক সময় ঐরূপ সেবা (?) করিয়া থাকি। শ্রীশ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সহিত সততযুক্ত হইয়া যদি প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতাম তাহা হইলে তিনি বুদ্ধিযোগ দান করিতেন।

৩৮। কায়, মন ও বাক্যকে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিয়া দণ্ডিত করার নামই ত্রিদণ্ডধারণ সুতরাং গুরুসেবক যে আশ্রমেই অবস্থান করুন না কেন অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ—সকলকেই ঐপ্রকার ত্রিদণ্ডধারণ করিতে হইবে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বাণপ্রস্থগণ বাহিরে ত্রিদণ্ডধারণ না করিলেও অন্তরে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবেন এবং সন্ন্যাসিগণ অন্তরে ও বাহিরে ত্রিদণ্ড ধারণ করিবেন। যদি অন্তরে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে শ্রীগুরুসেবা করিবার প্রবৃত্তি না থাকে তবে কেবল বাহিরে ত্রিদণ্ডধারণ করার কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু ত্রিদণ্ডধারণের পূর্ব্বোক্ত প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া আমি অবান্তর উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী হইবার জন্য ব্যস্ত হই। আশ্রমোন্নতির চিন্তা ছাড়িয়া যে অবস্থানটী আচার্য্যের অনুমোদিত তাহাই যে আমার পক্ষে বরণীয় এবং আচার্য্য সেবাই যে আমার একমাত্র কৃত্য, তাহা আমি ভুলিয়া যাই।

৩৯। আমার একপ্রকার দুর্দ্দৈব—"দেশভ্রমণ-কাম"। অনাদিকাল হইতে বহু দেশ, বহু যোনি ভ্রমণ করিয়াছি। তথাপি এখনও আমার দেশভ্রমণ কামের নিবৃত্তি হয় নাই, তাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যে-স্থানে রাখেন, সেস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার জন্য আবেদন করি। কখনও শারীরিক অসুস্থতা, কখনও একস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান জনিত চিত্ত-চাঞ্চল্য, কখনও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মদর্শনেচ্ছা (?), কখনও শ্রীধাম পরিক্রমা করিবার বাসনা (?), কখনও সৎশিক্ষা প্রদর্শনী-দর্শন-কামনা, কখনও বৈষ্ণবগণের সহিত মনের অমিল, কখনও বিভিন্ন ধাম দর্শন লালসা (?), কখনও বিভিন্ন মঠের মহোৎসবাদিতে যোগদানের ইচ্ছা, কখনও প্রচারকগণের সহিত প্রচারে যাইবার বাসনা প্রভৃতি আবেদনের কারণ হয়। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট আনুগত্যই যে সেবা এবং আনুগত্য ছাড়িয়া আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাই যে কাম, তাহা আমি বিস্মৃত হই। সময় সময় কামনানল এত প্রজ্জলিত হয় যে, আবেদন করিয়া আদেশ লইবার ধৈর্য্যটুকুও দগ্ধীভূত হয়। এইরূপে দেশ-ভ্রমণ কামের প্রশ্রয় দিয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে চিরতরে বিচ্যুত হই। যদি নিম্নলিখিত বাণীগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিতাম তাহা হইলে শারীরিক অসুস্থতা, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শনেচ্ছা (?) প্রভৃতি আবেদনের কারণ হইত না।

তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি ॥

৪০। তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম মহিমা কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ আচার্য্য-মহিমা-শ্রবণে তদীয় শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট ভাগ্যবান্ জনকে "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার" রূপে

দর্শনই—নিষ্কপট সেবকের কৃত্য ; কিন্তু আমার আচরণ, আমার বিচার তাহার বিপরীত, তাই আমি নিজেকেই গুরু অভিমান করিয়া সেইপ্রকার ব্যক্তিগণের নিকট পূজা গ্রহণ করি', তাঁহারা আমার শিষ্যপ্রতীম এইরূপ বিচার করি এবং সময় সময় শ্রীল প্রভুপাদের অনুকরণ পূর্বক "স্নেহবিগ্রহেষু" বলিয়া তাঁহাদিগকে পত্র দিয়া থাকি। আবার কখন কখন শ্রীল প্রভুপাদের অপেক্ষা বেশী দয়ালু (?) হইয়া নিজের উচ্ছিষ্ট নিজ হাতে প্রদান করিবার ধৃষ্টতা করি। এইরূপে নিজের গুণে (?) নিজেই মুগ্ধ হইয়া নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্যই ব্যস্ত হই, আমি যে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর, এই স্ব-স্বরূপটী ভুলিয়া যাই।

৪১। নিরপেক্ষভাবে আত্মচরিত্র বিশ্লেষণ করিতে পারি না। নিজের গুণ (?) ছাড়া কোন দোষই আমার নজরে পড়ে না এবং অন্যের দোষ ছাড়া কোন গুণই গ্রহণ করিতে পারি না। তাই নিজেকে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবশূন্য সর্বগুণকর বা ভক্তিগুণাকর মনে করি। এইরূপে অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া অমানী ও মানদ হইতে পারি না, সুতরাং হরিকীর্ত্তনের অধিকার না হওয়ায় আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দারূপ প্রজল্পই আমার কৃত্য হইয়া পড়ে।

৪২। অনেক সময় দামোদর পণ্ডিতের ন্যায় নিরপেক্ষ হইতে গিয়া বৈষ্ণবগণের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিয়া বসি। মর্য্যাদা রক্ষা করাই যে সাধুর স্বভাব, মর্য্যাদা পালন করিলে যে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হন এবং মর্য্যাদা লঙ্ঘন যে তিনি সহ্য করিতে পারেন না শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত নিম্নলিখিত শ্রীচৈতন্যবাণীই তাহার প্রমাণ।

তথাপি ভক্তস্বভাব মর্য্যাদা রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন জন॥
* * * *
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারোঁ সহিতে॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ)

৪৩। বাহিরের বেষভূষায় বৈষ্ণবতা আবদ্ধ নাই। সুতরাং যে-কোন আশ্রমেই কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম—এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবই থাকিতে পারেন, "কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি ও উত্তমে শুশ্রূষা" ইহাই বৈষ্ণবের সহিত ব্যবহারের নিয়ম। কোন মহাজন গাহিয়াছেন—"যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া, আদর করিব যবে। বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্বসিদ্ধি, অবশ্য পাইবে তবে॥" বৈষ্ণব স্বতঃপ্রকাশবস্তু সুতরাং অভিমানশূন্য হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রপন্ন হইলে তাঁহার কৃপালোকেই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। নির্ম্মৎসর হইয়া, তৃণাদপি সুনীচ হইয়া বৈষ্ণবের লেখনী, বাণী, সেবাচেষ্টা, ভক্তিপূর্বক বিচার করিলে, ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করিলে, ভক্তিপূর্বক অধ্যয়ন করিলে তাঁহার কৃপালোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে, বাহিরের বেষভূষা ও আশ্রম এবং বাহিরের ক্রিয়ামুদ্রার দিকে দৃষ্টি করিয়াই আমি বৈষ্ণবতা মাপিতে গিয়া বঞ্চিত হই ও বৈষ্ণবাপরাধ অর্জ্জন করি। কোন কোন বৈষ্ণব গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় করিলেও উন্নত অধিকারী হইতে পারেন এই বিচারটী বিস্মৃত হইয়া আমি ভাবি যেহেতু তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রাদি আছে, স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য অর্থোপার্জ্জন-চেষ্টা আছে সুতরাং তাঁহারা নিশ্চয়ই পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্তচিত্ত বা গৃহব্রত। আবার আর এক দিকে বিচার করি যেহেতু আমরা গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসী সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমি ভাবি না, 'মর্কট-বৈরাগ্য', 'যুক্তবৈরাগ্যের ছলনা', আমি ত বৈষ্ণব এইরূপ অভিমান,' লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কুটীনাটী,' 'মাৎসর্য্য,' 'বৈষ্ণবাপরাধ,' আখেরের চিন্তার জন্য অত্যাহার প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার দুর্দ্দৈব আমাকে কোন নরকের পথে লইয়া যাইতেছে। আমি যে তাঁহাদের বাহ্যকৃত্যের জল প্রদান করিবারও যোগ্য নই, আমি যে তাঁহাদের পাদুকা বহন করিবারও অধিকারী নই এবং সেই অধিকার কোটী কোটী জন্ম পরেও লাভ করিব কিনা সন্দেহ তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তাঁহাদের মহা-মহোপদেশময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া, পাঠ করিয়া তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতে পারি না

বরং তাহাতে আমার মর্য্যাদার হানি হইবে মনে করি, এইপ্রকার কুবিচার অধোগতির লক্ষণ কিনা তাহা একবারও ভাবিনা বা তাহা হইতে সতর্ক হইবার চেষ্টা করি না; অধিকন্তু "জিহ্বা ফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনম্" এই চৈতন্য-বাণীর বিপরীত আচরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হই এবং ঐপ্রকার ভজন (?) কার্য্যটী কেবল বিবিক্তানন্দী হইয়া না করিয়া গোষ্ঠানন্দী হইয়া করিবার জন্য উৎসাহবিশিষ্ট হই। শ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নলিখিত বাণী আমার কর্ণেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হয় না তাই উৎসাহবৃত্তিটী পরাক্‌গতি-বিশিষ্ট হয়।

যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দা মাত্র হয়।
সর্বধর্ম্ম থাকিলেও তার হয় ক্ষয়॥
সন্ন্যাসি-সভায় যদি হয় নিন্দ্য কর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে-সভা অধর্ম্ম॥
নিন্দক সন্ন্যাসী বাটোয়ারে নাহি ভেদ।
দুইতে নিন্দক বড় দ্রোহী কহে বেদ॥
অতএব নিন্দক সন্ন্যাসী বাটোয়ার।
বাটোয়ার হৈতে এ অনন্ত দুরাচার॥

৪৪। আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার সেবকগণ বা বৈষ্ণবগণ পরস্পর অভিন্ন অঙ্গ, অঙ্গী হইতে ভিন্ন নহেন, সেবকগণ অঙ্গ এবং শ্রীগুরুদেব অঙ্গী। আমি শ্রীগুরুপূজার অভিনয় করিলেও বা তাঁহাকে কেবল মুখে মানিলেও তাঁহার অঙ্গস্বরূপ তাঁহার সেবকগণকে মানি না। অঙ্গকে না মানিয়া অঙ্গীর পূজা করা অর্থে পূজার অভিনয় করা। সেরূপ পূজার দ্বারা শ্রীগুরুদেব কখনও প্রীত হন না, বরং তিনি বিশেষ অসন্তুষ্ট হন। ভক্তগণ যে শ্রীগুরুদেবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তাহা হইতে অভিন্ন, সেবককে লঙ্ঘন করিয়া প্রভুপূজা কিম্বা এক বৈষ্ণবকে মানিয়া অন্য বৈষ্ণবকে না মানা যে দাম্ভিকতা, পাষণ্ডতা, কপটতা ও তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অগ্নিবর্ষণের ন্যায় এবং ঐ প্রকার কৃত্রিম স্তুতিই যে আত্মবিনাশের কারণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নলিখিত বাণীগুলিই তাহার প্রমাণ। আমার এমনই পোড়া কপাল যে ঐ বাণী পড়িয়াও পড়ি না, শুনিয়াও শুনি না, অন্যকে বুঝাইবার অভিনয় করিয়াও নিজে বুঝি না।

ঈশ্বরের অভিন্ন সকল ভক্তগণ।
দেহের যে হেন বাহু অঙ্গুলি চরণ॥
একেত বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান।
"অর্দ্ধকুক্কুটীন্যায়" তাহার প্রমাণ॥
কিম্বা দোঁহা না মানিয়া হওত পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি এই মত ভণ্ড॥
এক হস্তে যেন বিপ্রচরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢেলা মারে মাথায় কপালে॥
এসব লোকের কি কুশল কোন ক্ষণে।
হইয়াছে হইবেক বুঝ ভাবি মনে॥
এক হস্তে ঈশ্বরের সেবয়ে কেবল।
আর হস্তে দুঃখ দিলে তার কি কুশল॥
মোর পূজা মোর নাম গ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে যদি তারে বিঘ্ন ধরে॥
মোর ভক্ত না পূজে আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥
মোর এই সত্য শুন সবে মন দিয়া।
যে আমারে পূজা করে সেবক লঙ্ঘিয়া॥
সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি হেন পড়ে॥
আমার দাসের যেই সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম কল্পতরু সংহারে তাহারে॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১)

৪৫। হরিভজনের জন্য নির্ব্বন্ধিনী মতির অভাব আর একটী বিশেষ দুর্দ্দৈব, হরিভজনের ঠাটবাট করিতেছি অথচ জ্ঞানোন্নতি হইতেছে না কেন, ইহা একাবারও ভাবি না। যদি ভজনের জন্য বিশেষ আগ্রহ থাকিত তবে এরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া দিন কাটাইতে পারিতাম না এবং ভজন-প্রতিকূল বিষয়গুলি বর্জ্জন ও ভজন-অনুকূল অনুষ্ঠান গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। নির্ব্বন্ধিনী মতির অভাবেই সর্বপ্রকার দুর্দ্দৈব আমাকে গ্রাস করিবার অবসর পাইতেছে। যেদিন মহাজনের নিম্নলিখিত বাণী আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবে সেইদিন নির্ব্বন্ধিনী মতির উদয় হইবে।

উদিত তপন হইলে অস্ত,
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত,
তবে কেন এবে অলস হই,
না ভজ হৃদয়রাজে।
জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার,
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে॥

৪৬। "শ্রীজয়মঙ্গল চাবুকে"র প্রতি অবজ্ঞাও একটী বিশেষ অপরাধ। চাবুক দুই প্রকার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। প্রাকৃত চাবুকের দ্বারা জীবহিংসা হয় কিন্তু অপ্রাকৃত বা জয়মঙ্গল চাবুকের দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল হয়; তাই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ জীবে-দয়ার বশবর্ত্তী হইয়াই মাদৃশ দুর্দ্দৈব-গ্রস্ত জীবের সর্বপ্রকার দুর্দ্দৈব-মোচনের জন্য জয়মঙ্গল চাবুক প্রদান করেন, সেই অপ্রাকৃত চাবুক শব্দরূপে বা অক্ষররূপে প্রকটিত হন, যাঁহারা বিশেষ ভাগ্যবান্ তাঁহারাই ঐ শব্দরূপী বা অক্ষরাকৃতি পরমমঙ্গলময়ী চাবুকের যথাযোগ্য সম্মান করেন, সহিষ্ণু হইয়া সাদরে তাঁহাকে বরণ করেন, কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয়া থাকিতে পারি না। কারণ আমি উহাকে উদ্বেগদায়ক প্রাকৃত শব্দ মনে করি। আমি এইরূপ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া বা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যকে অযথা উদ্বেগদায়ক বাক্যবাণ প্রয়োগ করি। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রদত্ত জয়মঙ্গল চাবুককেও তাহারই অন্যতম মনে করিয়া অবজ্ঞাপূর্বক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে এবং চাবুকবর্য্যের চরণে অপরাধ অর্জ্জন করি। আমার দুর্দ্দৈব আমাকে বুঝিতে দেয় না যে, চাবুকরাজের সাদর অভ্যর্থনা করিলে তাঁহার অহৈতুকী কৃপা আরও অধিকতর বর্ষিত হইয়া আমাকে সম্পূর্ণভাবে দুর্দ্দৈবমুক্ত করিবেন এবং শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের জয়মঙ্গল চাবুকের মতই কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী করিয়া দিবেন।

ডাক্তারের ছুরি এবং শিক্ষকের ছড়ি যেমন প্রথমমুখে কষ্টপ্রদ বলিয়া মনে হইলেও বিশেষ মঙ্গলপ্রদ, মহতের ভর্ৎসনারূপ দণ্ডও সেইরূপ তাঁহাদের অহৈতুকী করুণার নিদান এবং বদ্ধজীবের হরিবিমুখতারূপ ভবরোগ-প্রশমনে অব্যর্থ মহৌষধ।

মঙ্গলময় মহতের দণ্ডও যে কৃপা এবং উহা যে জীবকে মঙ্গলের পথে—কৃষ্ণভক্তিপথে লইয়া যায়, নিত্যানন্দ পার্ষদের জয়মঙ্গল-চাবুক অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। কৃপাদণ্ড লাভে পরমোপকৃত ব্যক্তিগণেরই ইহা উপলব্ধির বিষয়।

৪৭। কনকমুদ্রা গোলাকার বস্তু। সুতরাং উহা ভোগ্য-রূপে ভোগ করিতে গেলেও গোল, প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে ত্যাগ করিলেও গোল। আবার হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার ছলনায় ভোগবুদ্ধিতে নাড়াচাড়া করিতে গেলেও গোল অর্থাৎ নিষ্কপট সেবাবুদ্ধি ব্যতীত সর্বাবস্থাতেই গোল, সেই গোলযোগের হাত হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়—

"কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।"

কেবল গৃহস্থাভিমানিগণই যে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা বাদ দিয়া কনকের মোহে মুগ্ধ হন তাহা নহে, মাদৃশ ত্যাগী-অভিমানীও হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার ছলনায় কনকের মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। তখন আমি একটী শাখামঠের রক্ষক-অভিমানে মত্ত হইয়া অর্থাৎ উক্ত মঠটীকে মঠ না দেখিয়া একটী সংসার বা ভোগাগাররূপে দেখিয়া নিজেকে সেই সংসারের কর্ত্তা মনে করি এবং অন্যান্য মঠগুলিকে বা মূলমঠকে এক একটী পৃথক্ পৃথক্ সংসারের মত দেখি ও বিভিন্ন মঠের মঠরক্ষকগণকে ভিন্ন সংসারের কর্ত্তা মনে করি। মঠসেবকগণকে "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার" রূপে না দেখিয়া আমার ভোগ্য, আমার পাল্য, আমার শাসনের পাত্র মনে করি। আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য, আমার পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য, আমার দেহরোগ-নিবারণের ঔষধ ও পথ্যাদি-সংগ্রহের জন্য ভিক্ষালব্ধ অর্থ ব্যয় করিতে যতটা মুক্তহস্ত, ততটা হরিসেবা, গুরুসেবা, মঠসেবক বা গুরুসেবকগণের সেবার জন্য মুক্তহস্ত হইতে পারি না, যত ব্যয়সঙ্কোচের প্রবৃত্তি কেবল হরিগুরু ও গুরুসেবকের সেবাকালে। কারণ তখন এই চিন্তা—পাছে তহবিলটী কমিয়া যায়, কিম্বা পাছে তহবিলটী ফুরাইয়া যায় অথবা পাছে তহবিল ফুরাইয়া

গেলে আবার অর্থসংগ্রহের জন্য চিন্তা করিতে বা ছুটাছুটী করিতে হয়। আবার সমস্ত মঠেরই মালিক শ্রীগুরুদেব সুতরাং সমস্ত মঠের সেবাই গুরুসেবা ইহা বিস্মৃত হইয়া অন্য মঠকে একটী পৃথক্ পৃথক্ সংসাররূপে দেখিতে গিয়া বিশেষ আবশ্যক হইলেও অন্য মঠের সেবার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হই, এমন কি তজ্জন্য শ্রীগুরুসেবার ক্রটী করিতেও ভয় পাই না। অন্য মঠ হইতে কিম্বা মূল মঠ হইতে কোন দ্রব্যাদি বা অর্থ প্রদত্ত হইলে তাহা অনুগ্রহ মতো পূজ্যরূপে বা গুরুবৈষ্ণবসেবার উপকরণরূপে দর্শন না করিয়া আমার ভোগ্যরূপে বা ভোগের ইন্ধনরূপে দেখিয়া উল্লসিত চিত্তে গ্রহণ করি অর্থাৎ গ্রহণকালে কোন আপত্তি নাই কিন্তু অন্য মঠের বা মূলমঠের সেবার জন্য কোন দ্রব্য বা অর্থাদি প্রদান করিতে হইলে আমার বুক যেন ফাটিয়া যায়; হরিগুরু বৈষ্ণবসেবার কোন উপকরণ টাকাটা সিকেটার বিনিময়ে নীলাম করিতে পারি তথাপি তাহা অন্য মঠের কিম্বা মূলমঠের সেবায় দিতে পারি না। পূর্ব্বোক্ত ঘৃণ্য চিত্তবৃত্তির বা বিষয়াবিষ্ট চিত্তবৃত্তির মূল কারণ—কনকের নেশা, কনকের মোহ বা কনককে ভোগ্যরূপে দর্শন ও নিজেকে সেবক-অভিমানের পরিবর্ত্তে ভোক্তা-অভিমান বা কর্ত্তা-অভিমান। তাই বলি ভাই সব! সাবধান! গুরুসেবকের বেষে যেন আমরা ভোগী হইয়া না পড়ি, সংসারী বা কর্ত্তা হইয়া না পড়ি। সমস্ত মঠেরই মালিক শ্রীগুরুদেব, সমস্ত উপকরণই শ্রীগুরুসেবার জন্য, বৈষ্ণব-সেবার জন্য, মুক্তহস্তে হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা করিলেই শ্রীগুরুদেব প্রীত হন ইহা যেন আমাদের স্মরণ থাকে আর যেন মনে থাকে একটী কথা—

"বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥
বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল॥"

৪৮। কি গৃহস্থ কি ত্যাগী সেবকাভিমানিগণের দুর্দ্দৈব সমূহের অন্যতম দুর্দ্দৈব "ভক্তিনীতির ছলনায় নীতিবিরুদ্ধ আচরণ।" যাঁহারা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, যাঁহাদের চিত্ত প্রত্যক্‌গতি বিশিষ্ট তাঁহাদের সমস্ত ক্রিয়ামুদ্রাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলে অনুষ্ঠিত হয় সুতরাং তাঁহাদের কোন আচারই নীতিবিরুদ্ধ নহে বা হইতে পারে না। সম্বন্ধ-জ্ঞানাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামীর রাজকার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অসুস্থতার অভিনয় বা বাদশাহকে বঞ্চনা কারাগার হইতে মুক্তিলাভের জন্য উৎকোচপ্রদান, কারারক্ষকের নিকট বৃন্দাবন-গমনের কথা গোপন করিয়া মক্কা যাইবার কথা বর্ণন ও বাদশাহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার নিকট অসত্য কথা বলিবার জন্য তাহাকে পরামর্শপ্রদান এবং শ্রীল রামানুজাচার্য্যের শিষ্যগণের শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরনির্ম্মাণের জন্য দস্যুবৃত্তির অভিনয় প্রভৃতি আচরণগুলি বাহ্যদর্শনে নীতিবিরুদ্ধ মনে হইলেও তাহা নীতিবিরুদ্ধ নহে পরন্তু উহা পরম নির্ম্মল ভক্তিনীতি অর্থাৎ ঐ সকল অনুষ্ঠানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার গন্ধও নাই উহা কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছামূলেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু ঐ প্রকার অনুষ্ঠান মুক্তপুরুষগণেরই সম্ভব, মাদৃশ কোন সাধক বা অনর্থযুক্ত ব্যক্তি তাঁহাদের অনুষ্ঠিত আচরন সমূহের অনুকরণ করিতে উদ্যত হইলে তাহা নীতিবিরুদ্ধ আচরণ ব্যতীত কখনই ভক্তিনীতি হইতে পারে না। মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তি ভক্তিনীতির প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির ছলনায়, ভক্তিনীতির ছলনায় নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করিবার জন্য উৎসাহ-বিশিষ্ট হয় কিন্তু সেরূপ কার্য্য যে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কখনও অনুমোদিত নহে তাহা মাদৃশ ব্যক্তি বুঝিতে পারে না। এইরূপে গুরু-কুলের মাদৃশ কুলাঙ্গারের দ্বারা শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের মহিমা প্রচারের পরিবর্ত্তে অমহিমা (?) প্রচারিত অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ মাদৃশ ব্যক্তির নীতিবিরুদ্ধ আচরন শ্রীগুরুদেবেরই অনুমোদিত মনে করিয়া বঞ্চিত হন ও অপরাধী হন এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা পোষণ করেন। ক্রমে আমরা ভক্তিনীতির ছলনায় এতটা অভ্যস্ত হইয়া পড়ি যে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকটও সেই নীতি না খাটাইয়া থাকিতে পারি না। ঐ প্রকার আচরণের ফলে আত্মহিংসা ও জীবহিংসা ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হয় না।

৪৯। যদিও অর্চ্চন ব্যাপারটী খুব প্রাথমিক ভক্ত্যনুকূল চেষ্টা এবং কর্ম্ম ও ভক্তির তটরেখা অর্থাৎ অর্চ্চনকে

ভুলভাবে বুঝিলেই অর্চ্চনে অত্যাগ্রহী হইলেই কর্ম্মী হইয়া পড়িতে হয়, আবার অর্চ্চন সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইলে ভক্তি বা কীর্ত্তনময় হইয়া পড়ে, যদিও অর্চ্চন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ন্যায় নিরপেক্ষ নহে সাপেক্ষ ধর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ অর্চ্চনে কালাকাল, শুদ্ধাশুদ্ধি প্রভৃতি বিচার আছে, যদিও অর্চ্চন শ্রবণ কীর্ত্তনাদির মত সাক্ষাৎ অনুশীলন নহে কেবল অর্পণ মাত্র, যদিও অর্চ্চনের দ্বারা শ্রবণ কীর্ত্তনাদির ন্যায় যুগপৎ স্বার্থ ও পরার্থ সাধিত হয় না উহাতে কেবল নিজস্বার্থ সাধিত হয় তথাপি অর্চ্চনকে প্রাথমিক অনুশীলন মনে করিয়া অকালপক্ক অবস্থায় (কি গৃহী কি ত্যাগী) বাদ দিলে বা অর্চ্চনের প্রতি উদাসীন হইয়া ভজনের অভিনয় করিলে বিষম বিপদের সম্ভাবনা। কারণ, অর্চ্চনের দ্বারা নিয়মন কার্য্য হয় অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয়ে অহংমম-বুদ্ধি বিশিষ্ট ধন স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত, বাহ্যবিষয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত, ইন্দ্রিয়-লোলুপ (জিহ্বা, উদর ও উপস্থবেগপরায়ণ) ব্যক্তির চিত্ত ক্রমে ক্রমে নিয়মিত হয়, অর্চ্চনের বিধি-পালন করিবার জন্য, সেবাপরাধ-বর্জ্জনেরও জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে সংযত হইতে হয়, সুতরাং প্রাথমিক সাধকগণকে অর্চ্চন অবশ্যই করিতে হইবে, অর্চ্চন বাদ দিলে তাঁহাদের নরক-পাত অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য ত্যাগিগণ গুর্ব্বানুগত্যে সমস্ত কার্য্য করিবেন, তাঁহাদের শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা বাদ দিয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘণ্টা নাড়িবার কোন আবশ্যকতা নাই, শ্রীগুরু আজ্ঞাই শিরোধার্য্য তবে সাধক বা অনর্থযুক্ত গৃহস্থগণ ষোলআনা গুর্ব্বানুগত্য করেন না, তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা আছে তাই তাঁহাদের পক্ষে স্বগোষ্ঠী অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-স্বজনাদির সহিত নিয়মিত হইবার জন্য অর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য।

ত্যাগীর ইন্দ্রিয়লালসা যেরূপ আশ্রম-বিড়ম্বনা; অনর্থ-যুক্ত গৃহস্থ-সাধকের অর্চ্চন-পরিত্যাগও সেইরূপ আশ্রম-বিড়ম্বনা। সন্ন্যাসীর বান্তাশী হওয়া যেরূপ দোষের, অনর্থযুক্ত গৃহস্থসাধকের অর্চ্চন-পরিত্যাগও সেইরূপ দোষের। এমন কি অনুক্ষণ কীর্ত্তনকারী মধ্যমাধিকারী গৃহস্থভক্তের পক্ষেও অন্যান্য গৃহস্থগণকে ক্রমমঙ্গললাভের আদর্শ দেখাইবার জন্য বাহ্যে অর্চ্চন করিবার ব্যবস্থা আছে। কারণ অর্চ্চন ব্যতীত অনর্থযুক্ত সাধকের মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই, অর্চ্চন ব্যতীত ভক্তিসদাচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না, অর্চ্চনের নিত্যতা স্বীকার না করিলে নির্ব্বিশেষবাদী বা ভগবদ্‌-বিরোধী নাস্তিক হইতে হয়। তবে যে অর্চ্চন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির দ্বারা নিয়মিত নহে কিম্বা যে, অর্চ্চনের ফল শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তি বা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন-প্রবৃত্তি নহে সেই অর্চ্চন অসম্পূর্ণ বা অর্চ্চন-ব্যভিচার মাত্র।

অর্চ্চন সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বিশেষভাবে আলোচনা না করার জন্য মাদৃশ অনর্থগ্রস্ত অনেক গৃহস্থাভিমানী গৃহ-ব্রতভাবগুলি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে 'অর্চ্চন' বাদ দিয়া কেবল নাম-ভজনের ছলনা করেন। দেহ, গৃহ, স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্তি, বিত্তশাঠ্য, অনবধান, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রভৃতি অনর্থগুলি বজায় রাখিয়া কোটীজন্ম নামাক্ষর উচ্চারণ করিলেও যে মুক্তকুলের উপাস্য শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি হইবে না, নামী হইতে অভিন্ন শ্রীনাম যে সেবোন্মুখ-জিহ্বায় স্বয়ং স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন তাহা তাঁহারা শুনিয়াও শুনেন না বুঝিয়াও বুঝেন না। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে।

৫০। আবার কেহ কেহ অর্চ্চনের অভিনয় করিলেও বিত্তশাঠ্য দোষটী ছাড়িতে চান না বা ছাড়িবার চেষ্টা করেন না। স্ত্রী, পুত্র স্বজনাদির ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য অর্থব্যয় করিতে যতটা মুক্তহস্ত শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য সে প্রকার মুক্তহস্ত হইতে পারেন না; তাই শ্রীবিগ্রহের নৈবেদ্যাদি বসন-ভূষণ, অলঙ্কার ও শ্রীমন্দির প্রভৃতির জন্য যতটা কম-খরচে পারা যায় তাহারই চেষ্টা করেন,—

"কনকের দ্বারে সেবহ মাধব"

—ইহা আচরণ করিবার জন্য যত্ন করেন না, শ্রীল রাঘব পণ্ডিত প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের শ্রীবিগ্রহসেবার আদর্শের অনুসরণ করিবার জন্য উৎসাহ-বিশিষ্ট হন না। এইরূপে বিত্তশাঠ্যদোষে অর্চ্চন-ব্যভিচার হওয়ায় অর্চ্চনের ফললাভে বঞ্চিত হন। অর্চ্চনের ফল—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তি, সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন-প্রবৃত্তি ও কীর্ত্তন-সেবা বা প্রচার-সেবায় সর্ব্বস্ব অর্পণ।

উক্ত ফললাভে বঞ্চিত হইবার মূলকারণই বিত্তশাঠ্যদোষ। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া গৃহস্থের কৃত্য কৃষ্ণসেবা ব্যতীত বৈষ্ণবসেবা ও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের কথা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তিনি যে স্বয়ং অতিথি ও বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন নিম্নলিখিত বাণীই তাহার প্রমাণ।

প্রভু কহেন—কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥

—(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ পঃ)

নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সবাকারে ॥
কোন দিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সবা নিমন্ত্রেণ প্রভু হইয়া হরিষ ॥
সেইক্ষণে কহি' পাঠায়েন জননীরে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে ॥
তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষ তবে প্রভু আসি' বৈসে ॥
সন্ন্যাসিগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।
তুষ্ট করি' পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া ॥
গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম ॥
গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে।
পশু পক্ষী হইতে অধম বলি তারে ॥

—(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪ অঃ)

বিত্তশাঠ্যদোষে দুষ্ট মাদৃশ গৃহব্রতগণ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করেন না, তাঁহার আদর্শের অনুসরণ করিবার জন্য যত্ন করেন না, বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত আদর্শ গৃহস্থ-ভক্তগণের আচরণের অনুসরণ করিবার জন্য উৎসাহবিশিষ্ট হন না। তাঁহাদের বৈষ্ণব-সেবায় এমনি উৎসাহ যে শ্রীনাম-প্রচারের জন্য শ্রীগুরুদেবের নিজজনগণ তাঁহাদের গৃহে গমন করিলে—

"বৈষ্ণবসঙ্গেতে মন উল্লসিত অনুক্ষণ"

—ইহার বিপরীত অবস্থা হয়; কেহ কেহ এত ভাগ্যবান্ (?) যে বৈষ্ণবগণকে দর্শন করিবা-মাত্রই সন্ধ্যাকালেও গন্তব্য পথ দেখিবার পরামর্শ দিয়া গললগ্নী-কৃতবাসে কৃপা প্রার্থনা (?) করিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না, আবার কেহ কেহ কিছু উদার হইয়া দুই চারি দিনের জন্য অপ্রীতির সহিত সেবা (?) করিতে করিতে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় দিবার কৌশল চিন্তা করেন কিম্বা সেখানে অন্য কোন সতীর্থ থাকিলে তিনি স্বয়ং বদান্য সাজিয়া তাঁহার স্কন্ধে সেবাভার চাপাইবার চেষ্টা করেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহার বিমুখতা দেখিয়াও শ্রীগুরুসেবার জন্য ও তাঁহার প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রকাশ করিবার জন্য কয়েকদিন অবস্থান করিলে সেবোপকরণের স্বাস্থ্য দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে, আর একদিকে তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি এতটা প্রসন্ন (?) যে তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পূর্ব্বোক্ত আদর্শের অনুসরণ না করিয়া তাহার বিপরীত আচরণ করেন অর্থাৎ বৈষ্ণবসেবা-সুযোগকে সাদরে বরণ না করিয়া অসুস্থতার অভিনয়পূর্ব্বক শয্যা গ্রহণ করেন, ঐ প্রকার ব্যক্তিগণের সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনের উৎসাহ না থাকিলেও তাঁহারা নির্জ্জনে পূর্ণ-সংখ্যা বা ততোধিক নাম জপ (?) করিতে বিশেষ পারদর্শী, শ্রীনামে এত অনুরাগ (?) যে নাসিকা-গর্জ্জন করিতে করিতে সংখ্যা-পূরণের জন্য যত্ন (?) করেন, তাঁহাদের প্রচার-সেবায় এতটা অনুরাগ যে বৈষ্ণবগণ এক গ্যালন চিদ্রক্ত ব্যয় করিলে পর এক সিকি বা এক মুদ্রা না দিয়া থাকিতে পারেন না। যদি অর্চ্চনটী সুষ্ঠুরূপে সাধিত হইত, কীর্ত্তনের দ্বারা নিয়মিত হইত তবে বৈষ্ণব-সেবায় ঐ প্রকার উৎসাহের অভাব হইত না, সাধুসঙ্গে শ্রবন-কীর্ত্তনের সুযোগ ঘটিলেও সে-সুযোগ হইতে অব্যাহতি-লাভের চেষ্টা হইত না এবং প্রচার-সেবার জন্য টাকাটা সিকেটা দিয়া রেহাই পাইবার ও তহবিলটি পুত্র-কলত্রাদির সেবার জন্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার যত্ন করিতেন না। কারণ অর্চ্চনের ফলই বৈষ্ণব-সেবা, অর্চ্চনের ফলই সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচি, অর্চ্চনের ফলই প্রচার-সেবায় সর্ব্বস্ব-সমর্পণ। শ্রীল রামানুজাচার্য্যের শিষ্য দারিদ্র-লীলাভিনয়-কারী ব্রাহ্মণ বরদাচার্য্যও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবার আদর্শটি মাদৃশ গৃহব্রতগণের

বিশেষভাবে আলোচ্য। (শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম' নামক গ্রন্থে উক্ত উপাখ্যানটি বর্ণিত আছে, উহা পাঠ করিলে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না)।

৫১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ গৃহস্থ-লীলাভিনয়কারী ভক্তগণ প্রায় প্রতি বৎসরই বহু কায়ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া সপরিবারে গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শনের জন্য বৈষ্ণবসেবা-সুযোগ লাভের ও সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিবার আদর্শ দেখাইবার জন্য গমন করিতেন, শ্রীল শিবানন্দ সেন সমস্ত যাত্রিগণের ঘাটী সমাধান করিতেন অর্থাৎ সমস্ত যাত্রিগণের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি সকলের থাকিবার স্থান ও পোষণের ব্যবস্থা করিতেন। "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ" সুতরাং সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ ব্যতীত কৃষ্ণভক্তিলাভের অন্য কোন উপায় নাই। কারণ অর্চ্চন শ্রবণের দ্বারা নিয়মিত না হইলে ফলপ্রদ হয় না। তাই শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনের ও বৈষ্ণবসেবা করিবার সুযোগ প্রদানের জন্য বিভিন্ন মঠে বিভিন্ন সময়ে মহোৎসবাদি, পরিক্রমা, সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান করিয়া সকলকেই আহ্বান করিতেছেন, এমন কি থাকিবার স্থান ও প্রসাদ পর্য্যন্ত বিতরণ করিতেছেন। তথাপি মাদৃশ গৃহব্রতগণ সে সুযোগ গ্রহণ করিতে চান না, বিত্তশাঠ্য-দোষটীই উক্ত সুযোগ গ্রহণের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। পথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের মত দুর্গম নহে কারণ বাষ্পীয় যান প্রভৃতির সাহায্যে অল্প-সময়েই বিনা আয়াসে যাতায়াত হইতে পারে কেবল কিছু পাথেয় খরচ করিতে হয়। কিন্তু বিত্তশাঠ্যদোষটী মাদৃশ ব্যক্তিগণকে এতটা দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছে যে—আমরা অধনে যত্ন করিয়া ধন পরিত্যাগ করি। আবার শ্রীল আচার্য্যবর্য্যের কৃপায় বাড়ীর নিকটে মঠ হইয়াছেন, সেখানে যাইতে কোন পাথেয় খরচ হয় না, কেবল কিছু সময়ের জন্য বিষয়-কার্য্য হইতে অবসর লইয়া পায়ে হাঁটিয়া গেলেই সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সুযোগ লাভ করিতে পারি কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে, অর্থ ও পরমার্থের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারি না তাই বিচার করি—মঠে গিয়া হরিকথা শ্রবণ করিলে যে সময়টা নষ্ট (?) হইবে সেই সময়ে কিছু পয়সা রোজগার করিতে পারিব কিম্বা ছেলেদিগকে নিজেই পড়াইলে প্রাইভেট টিউটারকে দেয় টাকাটা বাঁচিয়া যাইবে, সময় সময় আর এক প্রকারের বিচার উপস্থিত হয় যে—যাঁহারা মঠে বেশী যাতায়াত করেন, তাঁহারাই হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য মঠে অর্থ প্রদান করেন সুতরাং আমি যদি মঠে বেশী যাতায়াত করি তবে আমার অবস্থাও তদ্রূপ হইবে তখন আমার প্রাণাধিক অর্থের তহবিলটীর স্বাস্থ্য ক্ষীণ হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে আমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার জন্য কি থাকিবে? অতএব মঠবাসীদের সঙ্গে বেশী মিলামিশা না করাই ভাল, কেবল মহোৎসবের দিন মুখ পাল্‌টাইবার জন্য স্ত্রী, পুত্র ও কলত্রাদির সহিত বিশেষতঃ 'অনবধান' বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া মঠে যাইতে কোন আপত্য নাই। শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় বাড়ীর নিকটে মঠ হইলে কি হইবে, ঐ গোলাকার বস্তুটিই যে যত গোল বাঁধাইতেছে, তাঁহার কৃপা গ্রহণ করিতে দিতেছে না; তাই দেখুন, এখানেও যত নষ্টের গোড়া ঐ বিত্তশাঠ্য দোষ।

৫২। ভাগবত দুই প্রকার—গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত। সকল সময়ে আমরা ভক্ত-ভাগবতের সঙ্গলাভের সুযোগ পাই না, যাহাতে আমরা ঘরে বসিয়াই গ্রন্থ-ভাগবতের সঙ্গ লাভ করিতে পারি তজ্জন্য আচার্য্যপ্রবর মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় ছয়টি পত্রিকা ও বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, নিয়মিতভাবে উক্ত গ্রন্থভাগবত অর্থাৎ বিভিন্ন পত্রিকা ও গ্রন্থসমূহ শ্রদ্ধা করিয়া পাঠ করিলে পরিপ্রশ্নের উদয় হইবে, তখন ভক্ত-ভাগবতের সঙ্গলাভের আগ্রহ হইবে এবং আবশ্যকতাও উপলব্ধি করিতে পারিব। কিন্তু বিত্তশাঠ্যদোষটীই ঐসকল পত্রিকা ও গ্রন্থাদি সংগ্রহের পক্ষে বা গ্রন্থভাগবতের সেবা-সৌভাগ্য-গ্রহণের পক্ষে অন্তরায় হয়। কখনও ভাবি—বিত্তশাঠ্য-দোষটী বজায় রাখিয়া, অন্যের পত্রিকা ও গ্রন্থাদি লইয়া পাঠ করিয়া কিম্বা মঠের লাইব্রেরীতে গিয়া পত্রিকা ও গ্রন্থাদি

পাঠ করিয়া সিদ্ধান্তবিদ্ হইব ; কিন্তু ভাবি না—বিত্ত-শাঠ্যরূপ অনর্থটি বজায় রাখিবার জন্য যত্ন করিলে সেই বিষয়াবিষ্টচিত্তে, বিষয়মলিনচিত্তে ভক্তি-সিদ্ধান্তের স্ফূর্ত্তি হইবে না। কখনও কিছু মুক্তহস্ত হইয়া যে-কোন একটী পত্রিকা লইয়া বলি— সবই অভিন্ন পত্রিকা। সুতরাং একটি লইলেও যাহা হইবে সবগুলি লইলেও তাহাই হইবে, আবার কখনও সময়ের অভাবই পত্রিকা না লইবার বা একাধিক পত্রিকা ও অন্যান্য গ্রন্থ না লইবার কারন দেখাইয়া থাকি ; কিন্তু আমি ভাবি না—যদি আরও দুই ঘণ্টা চাকরী করিতে হইত তবে কি সময়াভাবে চাকরীতে ইস্তফা দিতাম ! অথবা চাকরী বজায় রাখিবার জন্য যদি বৎসর বৎসর একটা পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকিত এবং সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে যদি দৈনিক দুই ঘণ্টা করিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত তবে কি আমি সময়াভাবে পরীক্ষায় ফেল হইয়া চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিতাম ! সময় সময় অর্থাভাবের অছিলায় একাধিক পত্রিকা বা গ্রন্থাদি-সংগ্রহ করি না কিম্বা মোটেই কোন পত্রিকা বা গ্রন্থ সংগ্রহ না করিয়া গ্রন্থভাগবতের সেবা হইতে বঞ্চিত হই, কিন্তু গ্রাম্যবার্ত্তাবহ সংগ্রহ করিবার জন্য অর্থের অভাব হয় না। শ্রীপত্রিকাদির ও শ্রীগ্রন্থাদির সেবা করিলে অর্থাৎ গ্রন্থভাগবতের সেবা করিলে আনুসঙ্গিক-ভাবে বিত্তশাঠ্যদোষ, অসৎসঙ্গ, অসচ্চিন্তা, প্রজল্প, চিত্ত-চাঞ্চল্য, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, দেহে আত্মবুদ্ধি ও দেহসম্বন্ধীয় বস্তুতে মমতাবুদ্ধি, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, অপরাধ প্রভৃতি যাবতীয় অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবায় রুচি এবং কৃষ্ণভক্তিরূপ মুখ্য ফল লাভ হইবে অর্থাৎ পরমার্থ লাভ হইবে। অতএব প্রত্যেক গৃহস্থ-ভক্তেরই নিরপেক্ষভাবে স্ব-স্ব যোগ্যতা বিচার করিয়া যতদূর সম্ভব গ্রন্থাদি ও পত্রিকাদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক, সম্ভব হইলে যাবতীয় পত্রিকা ও যাবতীয় গ্রন্থাদিই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ; এমন কি, ধনী গৃহস্থের গৃহে যত জন গুরু-সেবক আছেন প্রত্যেকেরই পৃথগ্‌ভাবে যাবতীয় পত্রিকা এবং একসেট্ করিয়া ভক্তিগ্রন্থ লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য নচেৎ বিত্তশাঠ্যদোষ হইবে। পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি গ্রাম্যবার্ত্তাবহ ও গ্রাম্যপুস্তক-বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনের ন্যায় অতিশয়োক্তি নহে পরন্তু নিত্যমঙ্গলময়ী কুহকশূন্যা বাস্তব-বাণী ; এই বাণী শ্রবণ করিলে আমরাই পরমার্থ-ধনে ধনী হইয়া লাভবান্ হইব, অন্যথা করিলে আমাদেরই ক্ষতি, আমাদেরই অসুবিধা, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের ও গ্রন্থভাগবতের তাহাতে কিছু আসে যায় না।

৫৩। মাদৃশ গৃহব্রতগণের মধ্যে আর এক প্রকারের দোষ দেখা যায়, তাহার নাম—"প্রচ্ছন্ন বিত্তশাঠ্য"। আমরা নিজগৃহে আড়ম্বরের সহিত প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া শ্রীবিগ্রহ-সেবার ঠাটবাট করি ; যথা—কারুকার্যখচিত অতি মনোরম সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ, মণিমুক্তা-খচিত সিংহাসনোপরি বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদিদ্বারা ভূষিত, নয়ন-মনোভিরাম শ্রীবিগ্রহ স্থাপন ও শ্রীবিগ্রহের জন্য ছাপান্ন ভোগ ও ছত্রিশ ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা, গৃহে সমাগত অতিথি বৈষ্ণবগণকে চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় নৈবেদ্য প্রদানের ব্যবস্থা প্রভৃতি বাহ্যদর্শনে ও জাগতিক বিচারে অনেক প্রকারের সুব্যবস্থা প্রভৃতি। এই সব আড়ম্বরের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করি কিন্তু দিব্যদর্শনরূপ সার্চ্চলাইট দিয়া দর্শন করিলে দেখা যায়—উহার মূলে প্রতিষ্ঠাশা ; আমাদের হৃদয়প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠাশারূপিণী ধৃষ্টা শ্বপচরমণী সর্ব্বক্ষণ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছে, সেই শ্বপচরমণীদ্বারা চালিত হইয়াই আমরা বিপুলভাবে অর্চ্চনের ঠাটবাট বা অর্চ্চন-ব্যভিচার করিতেছি ও অতিথিবৈষ্ণব-সেবার ছলনা দেখাইতেছি। আমাদের এই অর্চ্চনের অনুষ্ঠানগুলি শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রৌতবাণী-শ্রবণের দ্বারা নিয়মিত নহে, তাই আমরা অর্চ্চনের ফললাভে বঞ্চিত হই ; ফলে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা, নিজের খেয়াল মত কিছু না করিয়া বৈষ্ণবের ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া বৈষ্ণবসেবা বা বৈষ্ণবের প্রীতিবিধান চেষ্টা এবং অর্চ্চনের চরমফল—কীর্ত্তনসেবা বা প্রচার-সেবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিবার প্রবৃত্তি আমাদের হয় না। যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমার গৃহে বা আমার গ্রামে অথবা আমার দেশে মঠ স্থাপন করেন তাহা হইলে আমি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া মন্দির-নির্ম্মাণ ও সেবার ব্যবস্থা করিতে পারি এবং উক্ত মঠের

সেবার জন্য প্রচুর সম্পত্তি দান করিতে, এমন কি সর্ব্বস্ব-প্রদানের অভিনয় করিতে পারি; যদি তাঁহারা আমার বরাত মত কোন মঠের মন্দির, ধর্ম্মশালা, মহোৎসব, ছাপাখানা, সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রভৃতি করেন কিম্বা আমার বরাত মত শ্রীবিগ্রহের জন্য বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান করেন তবে আমি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে বা সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে পারি কিন্তু শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের ইচ্ছামত কোন সেবা-কার্য্যের জন্য অথবা প্রচার-সেবার জন্য শত মুদ্রা—এমন কি, একটী মুদ্রা প্রদান করিতেও আমার উৎসাহ হয় না, আমাদের চিত্তবৃত্তি এই প্রকার। ইহাই কি অর্চ্চনের ফল? না অসম্পূর্ণ অর্চ্চন অথবা অর্চ্চন-ব্যভিচারের ফল? তাহা কি আমাদের বিচার করা উচিত নহে? কিয়ৎ-কালের জন্য নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে প্রচ্ছন্ন-বিত্তশাঠ্য-দোষেই ঐপ্রকার অর্চ্চন-ব্যভিচার বা অসম্পূর্ণ অর্চ্চন হইতেছে। বিত্তশাঠ্যদোষটী আমাদের ঠিক আছে তবে কেবল প্রতিষ্ঠাশামূলেই বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলেই যাহা কিছু আড়ম্বরের বা মুক্ত হস্ত হইবার অভিনয় করিতেছি মাত্র; তাই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের ইচ্ছামত বা তাঁহাদের নির্দ্দেশ-মত কিছুই করিতে পারি না। যেদিন শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন পূর্ব্বক সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিষ্কপটে বলিব—"হে পতিতপাবন প্রভো! আপনার ধন আমার নিকট যাহা গচ্ছিত আছে তাহা আপনার শ্রীচরণেই অর্পণ করিতেছি, কারণ আমি জানি না কি করিলে উক্ত অর্থের সদ্ব্যবহার হইতে পারে, অতএব আপনি কৃপাপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন এবং আপনি স্বীয় ইচ্ছামত যে-কোন বিষয়ে ব্যয় করুন না কেন সে-সম্বন্ধে আমার বলিবার কিছু নাই" সেই দিনই বুঝিব যে আমি অর্চ্চনের ষোল আনা ফল লাভ করিবার সৌভাগ্যকে বরণ করিয়াছি—সেই দিনই বুঝিব যে আমি প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন উভয়বিধ বিত্তশাঠ্যদোষ হইতে মুক্ত হইয়াছি।

৫৪। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার পরও—পাঞ্চরাত্রিক বিধানে সংস্কৃত হওয়ার পরও হৃদয়-দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থের বশবর্ত্তী হইয়া—অসুর-সমাজের ভয়ে ভীত হইয়া শৌক্রবর্ণের পরিচয়-প্রদান, আচার্য্যপ্রদত্ত নামও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি গোপনে রাখিবার চেষ্টা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ না করা, অসুর সমাজের পাচিত ও প্রদত্ত দ্রব্য ভোজনাদিরূপ অসদাচার ও অসৎসঙ্গ, স্ত্রী, পুত্র স্বজনাদিকে অমেধ্য-ভোজন ও অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়া এবং পিতৃমাতৃ-বিয়োগের পর অশৌচ-পালনাদি ও স্মার্ত্তবিধানানুসারে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান প্রভৃতি অনর্থযুক্ত সাধক-গৃহস্থগণের পক্ষে বিশেষ ভজন-প্রতিকূল বা ভজনোন্নতির প্রধান কণ্টকস্বরূপ।

"আমার কর্ত্তব্য"

"আমার কর্ত্তব্য কি?" এ বিষয়ে আমি যখন চিন্তা করি তখন দেখ্‌তে পাই—এই "দেবীধামে" বহু প্রকারের কর্ত্তব্য আমার, সম্মুখে দণ্ডায়মান। স্বামীর-সেবা করা, তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির তৃষ্ণাদূর, ক্ষুধাতুর ব্যক্তির ক্ষুধা দূর করা এই প্রকারের বহু কর্ত্তব্য আমার নিকট "আমার কর্ত্তব্য" ব'লে পরিচয় দান করে। কিন্তু এইগুলি কি "আমার প্রকৃত কর্ত্তব্য?" তা' যদি হ'ত তবে চৌরাশি-লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে এই প্রকার বহু মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ বৃথা কালক্ষয় করাতেও আমার কর্ত্তব্যের শেষ হ'ল কৈ?

চৌরাশি লক্ষ যোনি গতাগতির পর এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ ক'রেও "আমার কর্ত্তব্য" বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ উদাসীন, তাই বিমুখমোহিনী মায়ার আনুগত্য অবলম্বন করতঃ মায়া-প্রপীড়িত জীবগণের সেবা এবং এই

প্রকার অনিত্য বস্তুতে মত্ত হ'য়ে পশুর ন্যায় খেয়ে দেয়ে বেঁচে থাকাকেই আমি আমার একমাত্র 'মুখ্য কর্ত্তব্য ব'লে বিবেচনা করি। কিন্তু হায়! এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি চিন্তা করি না যে ইহজগতের যাবতীয় বস্তুই অনিত্য, অতএব অনিত্য বস্তুর সেবাদ্বারা আমার প্রকৃত কর্ত্তব্য পালন হ'তে পারে না। এই প্রকার অবান্তর কর্ত্তব্য পালন করবার জন্যই কি ভগবান্ আমাকে সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম দান ক'রেছেন ?

প্রকৃত যদি চিন্তা করি তা'হলে সম্যগ্‌রূপে বুঝতে পারি এ সমস্ত কর্ত্তব্যপালন দ্বারা আমার কোন আত্ম-মঙ্গলের আশা নাই। এই প্রকার কর্ত্তব্য-সমূহ গৌণ কর্ত্তব্য। দৈহিক সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হ'য়ে যার সেবারূপ কর্ত্তব্য-পালনে প্রবৃত্ত হই পরক্ষণেই আবার সেই সেব্যবস্তু আমার নয়নান্তরালে লুকিয়ে যায়। অথবা আমাকেই তা'র সেবা পরিত্যাগ ক'রে জগৎ ছেড়ে চ'লে যেতে হয়। অতএব যে বস্তু নিত্যকাল স্থায়ী নয় তা'র সেবা দ্বারা আমি কি সুফল লাভ ক'রতে পারব ?

বিমুখমোহিনী মায়ার ছলনায় মুগ্ধ হ'য়ে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে আমি অবান্তর কর্ত্তব্য পালন ক'রেছি কিন্তু আমার ত' কোন মঙ্গল হ'ল না! তাই "ভগবান্" আমার প্রতি করুণা-পরবশ হ'য়ে প্রকৃত কর্ত্তব্যপালনের জন্য এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম দিয়েছেন এবং তৎসঙ্গে তাঁর সেবা ক'রবার মত যোগ্যতাও দিয়েছেন, কিন্তু আমি আমার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করতঃ তাঁর সেবা জলাঞ্জলি দিয়ে মায়ার দাসত্ব ক'রে নিজের মহামূল্য জীবনকে অনিত্য বস্তুর সেবায় নিয়োজিত ক'রেছি।

আমি মায়িক জগতে সচরাচর দেখ্‌তে পাই যে, মনুষ্যমাত্রেই মাতাপিতার সেবা, দেবতার সেবা ও ঋষিদের সেবাকে প্রধান কর্ত্তব্য ব'লে বিবেচনা করে। কারণ দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ এই ঋণত্রয়ে মায়িক জগতের জীবসমূহ আবদ্ধ। এই ঋণত্রয় শোধ না ক'রলে জীবগণকে ঋণবদ্ধ হ'য়ে থাকতে হ'বে এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে জীবগণ এই ত্রিবিধ প্রকার ঋণ-পরিশোধকে কর্ত্তব্য ব'লে দৃঢ়বিশ্বাস করে এবং তাঁহাদের সেবাদ্বারা উক্ত ঋণ-শোধের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু শাস্ত্র বলেন—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

—(ভাঃ ১১।৫।৪১)

যে ব্যক্তি সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য পরিত্যাগ ক'রে বাসুদেবই একমাত্র ভোক্তা এই বিচারে সকলের একমাত্র শরণ্য—শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করতঃ একান্তভাবে শরণ গ্রহণ করেন। তিনি এই ঋণত্রয়ের নিকট, শুধু ঋণত্রয় কেন, মনুষ্য ইত্যাদি ক'রে কোন লোকের কাছে ঋণী থাকেন না বা কারও দাসত্ব করেন না।

"আশ্রয় লইয়া সেবে,	তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ।"

যেদিন এই সকল অবান্তর কর্ত্তব্য পরিত্যাগ ক'রে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করবো সেইদিন তিনি উপেক্ষা না ক'রে তাঁর সেবা সুযোগ দান ক'রবেন।

ভগবান্ একমাত্র সেব্য। জীবগণ তাঁর সেবক এই সূত্রে তাঁর সেবা করাই "আমার কর্ত্তব্য"। শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রলে পৃথক্ ক'রে আর কা'রও সেবা ক'রতে হয় না। "ভগবানের সেবাই মুখ্য কর্ত্তব্য।' মুখ্য কর্ত্তব্য পালন করলে পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তব্য সমূহ পালন হ'য়ে যায়। যথা—

তরোর্মূ'ল-নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভূজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

—(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যেমন গাছের গোড়ায় জল সেচন করলে শাখা-পল্লবের বল হয়, প্রাণে আহার দিলে ইন্দ্রিয় সকল বলবান্ হয়, সেই প্রকার একমাত্র মূলবস্তু শ্রীভগবানের সেবা করলে আর কারও সেবা বাদ থাকে না, সকলের সেবা হ'য়ে যায়। অতএব মায়ার সেবা পরিত্যাগ ক'রে যেদিন বল্‌তে পারব—

"আমি ত তোমার	তুমি ত আমার
কি কাজ অপর ধনে।"

ভগবান্ একমাত্র সেব্য, আমি তাঁর সেবক এই প্রকার সম্বন্ধ-জ্ঞান নিয়ে ইতর বস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগ ক'রে যেদিন পতিত-উদ্ধারকারী শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রণতি স্বীকার করতে পারব—সেইদিন গুরুদেব কৃপা-পরবশ হ'য়ে ব'লে দেবেন—

"কি শয়নে কি ভোজনে কিম্বা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥"

ভোক্তাভিমান ছেড়ে দিয়ে নিজেকে সেবকাভিমান করতঃ কালাকাল বিচার না ক'রে সর্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হও তাহ'লে তোমার "প্রকৃত কর্ত্তব্য" পালন হবে। তখনই আমি শ্রীগুরুদেবের বীর্য্যবতী বাণীর কৃপায় বুঝতে সমর্থ হ'ব—শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিত্যারাধ্য শ্রীভগবানের সেবায় সর্বতোভাবে আত্ম-নিয়োগ করাই "আমার কর্ত্তব্য।"

সন—১৩৩৪

শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ

সপ্তম মন্বন্তরের শ্বেতবরাহকল্পে অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের অন্তর্গত কলিযুগের প্রথম ভাগে চৌদ্দশত সাত শকাব্দের ফাল্গুন মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে—চৌদ্দশত ছিয়াশি খৃষ্টীয় অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের অষ্টাদশ দিবসে সায়ংকালে শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল শচীগর্ভসিন্ধু হইতে অকলঙ্ক গৌরেন্দু নদীয়া-গগনে সমুদিত হইলেন। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রপতি ক্ষারাব্ধি-গর্ভোদিত পূর্ণকল সকলঙ্ক শশধরের লজ্জাম্লান বদনখানি অর্দ্ধগ্রহ রাহুদেবতা যেন সহানুভূতিবশেই কিয়ৎকালের জন্য লোকলোচনের অন্তরালে লুকাইয়া রাখিলেন। জগন্ময় হরিধ্বনি উত্থিত হইল। কেহ পূর্ণিমা রজনীর আনন্দ-নির্ঝর পূর্ণশশীকে পাপ-রাহুগ্রস্ত দেখিয়া জগদ্বাসীর অকল্যাণ কল্পনা করিয়া জগতের হিতকল্পে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গধ্বনি, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রকে অন্ন-বস্ত্র অর্থাদি দান, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইলেন—কেহ উপহাস করিবার উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে হরি-ধ্বনি করিতে লাগিলেন ; এইরূপে জগতের জীবগণ স্ব স্ব ভাবে বিভাবিত হইয়া সকলেই হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সজ্জনবৃন্দ বুঝিলেন—

"হেন মতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচার॥
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক 'গ্রহণ' দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে 'হরি' বলি যায়েন ধাইয়া॥
যা'রা মুখে জন্মেও না বলে হরিনাম।
সেহ 'হরি' বলি ধায় করি গঙ্গাস্নান॥
দশদিক পূর্ণ হইল উঠে হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজমণি॥"

লৌকিক পরিচয়-সূত্রে আমরা জানিতে পারি নারায়ণ-পরায়ণ মধুকর মিশ্র নামে জনৈক পশ্চিম দেশীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ কোনও কারণে শ্রীহট্টে আগমন করিয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র উপেন্দ্র মিশ্র পণ্ডিত, ধনী ও বহু সদ্‌গুণশালী ছিলেন। তাঁহার সপ্তপুত্রের মধ্যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র অন্যতম। তিনি অধ্যয়নের নিমিত্ত শ্রীহট্ট হইতে সর্ব্ববিদ্যাপীঠ শ্রীনবদ্বীপে শুভাগমন করেন। শ্রীজগন্নাথের শাস্ত্রীয় উপাধি—পুরন্দর। তিনি নবদ্বীপবাসী শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা দুহিতা শ্রীশচীদেবীর পাণি-গ্রহণ করেন। উদাররত পুরন্দর মিশ্র আর্য্যা শচীদেবীর সহিত বিষ্ণুপাদোদ্ভবা ভাগীরথী সমীপে বাস করিবার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীশচীদেবীর উপর্য্যুপরি আটটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পর অত্যল্পকাল মধ্যেই ইহলীলা সম্বরণ

করিল। পুরন্দর মিশ্রের দুঃখের অবধি রহিল না। তিনি পুত্র-সন্তান-লাভার্থ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তৎফলে তাঁহার নবম সন্তানরূপে শ্রীবিশ্বরূপ জগতে অবতীর্ণ হইলেন। তদনন্তর স্বয়ং ভগবান বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপী শ্রীজগন্নাথ ও মূর্ত্তিমতী ভক্তিরূপিনী শ্রীশচীদেবীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। ত্রয়োদশ মাস গর্ভাবস্থান লীলা জ্ঞাপন করিয়া চৌদ্দশত সাত শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় যুগধর্ম্ম হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন অগ্রে করিয়া লোক লোচনের সমক্ষে প্রকটিত হইলেন।

"ফাল্গুন-পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রের গ্রহণ হয়॥
'হরি' 'হরি' বলে লোক হরষিত হঞা।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু 'নাম' জন্মাইয়া॥"

মহাজন গাহিয়াছেন;—

"অবতার সার—গোরা অবতার।"

"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই।" শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।" সজ্জন-মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া আমরা জানিতে পারি শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশচী-জগন্নাথের দশম সন্তানরূপে জন্মলীলা বিস্তার করিলেও তিনি সাধারণ মানবের সম-পর্য্যায়ভুক্ত নহেন। তিনি সর্ব্বাবতার-সার-শিরোমণি স্বয়ং ভগবান গোলোক-বিহারী হরি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু 'স্বয়ং ভগবান'-শব্দের অর্থ ও সংজ্ঞা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন;—

যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ং ভগবান'-শব্দের তাহাতেই সত্তা॥

শ্রীল গোস্বামিপাদের কৃপায় আমরা জানিতে পারি;—

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥

অমল প্রমাণ-শিরোমণি বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে;—

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহার মুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ, যাহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ (নিত্যানন্দ-অদ্বৈত), উপাঙ্গ (শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ), অস্ত্র (হরিনামাদি) ও পার্ষদ (গদাধর, দামোদর, স্বরূপাদি) পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায় যজ্ঞ (পূজা সম্ভার) দ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

সাধু-শাস্ত্রমুখে আমাদের ভগবত্তত্ত্ব-কথা শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ হইলে আমরা শ্রীভগবানের কথা জানিতে পারি; অথবা তিনি স্বপ্রকাশ বস্তু—কৃপা করিয়া যখন স্বয়ং অবতরন করিয়া সৌভাগ্যবান জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই তাঁহার পরিচয় পাইয়া আমরা ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইতে পারি। সেই সময়ে আমাদের আত্ম-স্বরূপোপলব্ধিও হইয়া যায়।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তবৃন্দের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন এবং অভক্তগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য ছদ্মবেশে কলিযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥

স্বয়ং ভগবানের এই প্রকারে অবতীর্ণ হইবার কারণ-বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥
এসব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥
অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥"

স্বয়ং ভগবানের কলিযুগে অবতীর্ণ হইবার কারণ শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদি-কবি শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;—

"কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি সংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥"

শ্রীল স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথানুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীগৌরাবতারের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ;—

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম। যুগধর্ম্ম-প্রচার বিষ্ণুর কার্য্য ; তাহা কোন যুগাবতারের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত কৃষ্ণ-প্রেম দান অন্য বিষ্ণুতত্ত্বের দ্বারা হইতে পারে না। বিধিভক্তি-প্রচারার্থই বিষ্ণুর অবতার, আর রাগ-ভক্তির প্রচারার্থে কৃষ্ণের গৌরাবতার। আর একটি কারণ শুদ্ধভক্তের অভিলাষ-পূরণরূপ কৃপা দ্বারা ভক্ত মাহাত্ম্য প্রচার। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রথমে গুরুবর্গের সহিত প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া লক্ষ্য করিলেন,—

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণ পূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে যায় ভব-রোগ॥"

সংসারের এবম্বিধ দুরবস্থা দর্শন করিয়া ভক্ত-হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্রকে জগতে অবতীর্ণ করাইতে না পারিলে জগজ্জনের কল্যাণ লাভের অন্য কোন উপায় নাই বিচার করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে জল তুলসী অর্পন করিয়া শুদ্ধভাবে কৃষ্ণের আরাধনা এবং সদৈন্য নিবেদন করিতে লাগিলেন। শুদ্ধ সরল ভক্তপ্রবর শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের প্রেম-হুঙ্কারে ভগবান স্থির থাকিতে পারিলেন না। অল্পকালের মধ্যে জগতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তগণের উল্লাসবর্দ্ধন করিলেন।

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন এবং ভক্তগণের বাঞ্ছাপূরণ গৌরাবতারের বাহ্য কারণ। এতদ্ব্যতীত গৌরাবতারের আরো তিনটি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

(১) প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ালম্বন শ্রীরাধার প্রেম মাহাত্ম্য-অনুভব।

"না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল॥
নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা প্রেমাস্বাদ॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥

(২) প্রেমের একমাত্র বিষয়ালম্বন নিজ মধুরিমার আস্বাদন।

"অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকা-স্বরূপ হইতে তবে মন ধায়॥"

(৩) তাহাতে শ্রীরাধার যে সুখ হয় তাহার অনুভব।

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
আত্মসুখদুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে সব ব্যবহার॥
সেই গোপীগণ-মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্বাধিকা॥
সেই রাধা-ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগ-ধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার॥"

এই সব বাহ্য ও মুখ্য কারণে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলিততনু ঔদার্য্য প্রকাশ বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দররূপে জগতে প্রকটিত হইলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব অবতারের মূল কারণ স্বয়ং ভগবান হইলেও বিভিন্ন ব্যক্তি অধিকার, রুচি, পারদর্শিতা ও অবস্থানের ভূমিকাভেদে তাঁহাকে বিভিন্নভাবে দর্শন করিয়া থাকেন।

"অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোন মত কহে, যেমন যার মতি॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥

কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার॥
চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে॥"

শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইয়া সর্বজীবের উদ্ধারার্থ শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রেম প্রচার করিলেন এবং তাহা সর্বজীবের পক্ষে সহজসাধ্য করিবার জন্য স্বীয় নামে সর্ব-শক্তি অর্পণ করিলেন। শ্রীনাম গ্রহণ বা স্মরণ করিতে কালাকাল শৌচাশৌচ-বিধি রাখেন নাই।

"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনামবীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥"

কিন্তু গৌর নিতাই বা তাঁহাদের নামে অপরাধের বিচার নাই।

চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥

আজ শ্রীগৌর প্রকট দিনের কথা স্মরণ করিয়া আসুন আমরা সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলি জয় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের জয়।

দীক্ষা

দীক্ষার বিধান ভারতে আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং ভারতে 'দীক্ষা' কথাটি উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত-মূর্খ ও স্ত্রী-শূদ্র সকলের নিকট পরিচিত; কিন্তু কালপ্রভাবে আমাদের অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা ভারতবাসী হইয়াও ঐরূপ প্রথার তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে সম্পূর্ণ উদাসীন। এমন কি যদি কোন শুভানুধ্যায়ী আমাদের নিকট আসিয়া ঐসকল কথা ব্যক্ত করেন, তখন হয়ত আমরা বলিব "ওহে ভাই, তোমরা ওসকল সেকেলে কথা রাখ, বর্ত্তমানকালে সেসব কথার আদর নাই। যদি তোমরা উন্নতি করিতে চাও, যদি তোমরা নিজদিগকে সুখী করিতে চাও, যদি তোমরা তোমার দেশবাসীর হিতসাধন করিয়া মর্ত্ত্যজগতে চিরকীর্ত্তি স্থাপন করিতে চাও, তাহা হইলে সেকেলে শাস্ত্রের বিধি-বন্ধন হইতে আগে মুক্ত হও, কর্ম্মঠ হও, দৈবনির্ভরতারূপ সেকেলে বিশ্বাস ছাড়িয়া দাও। দীক্ষা-গ্রহণ, মন্ত্রজপ, কীর্ত্তন, প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বিধি পালনে তুমি প্রমত্ত, কিন্তু তোমার ভাই বন্ধুর কি হইতেছে, তোমার দেশবাসীর কি হইতেছে, তদ্বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ উদাসীন। এখন চাই বাহুবল, শাস্ত্রীয় বিধি বৈরাগ্যাদি—দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য।" কিন্তু হায়, যে দীক্ষাবলে, যে মন্ত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া বিশ্বামিত্র একদিন বলিয়াছিলেন, "ধিক্ বলম্ ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলংবলম্" সেকথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, এখন আমাদের নিকট আর সে কথার আদর নাই, তাহার কারণ কি—কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, প্রকৃত মন্ত্রসিদ্ধ গুরুর অভাবে আমাদের এই দশা উপস্থিত হইয়াছে। আগে আপনারা 'গুরু' ও 'দীক্ষা' কথাটির অর্থ অনুসন্ধান করুন। গুরু কথাটির অর্থ শাস্ত্রে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে।

গু শব্দে অন্ধকারস্তু রুকারস্তন্নিষেধকঃ।
অন্ধকার-নিষেধত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

অর্থাৎ গুরু শব্দটির প্রথম অক্ষর গু, তাহার অর্থ অন্ধকার, রু-কারের অর্থ নিষেধ অর্থাৎ যিনি আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ করিয়া দেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। আর দীক্ষা কথাটির অর্থ—

দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ব-কোবিদৈঃ॥

অর্থাৎ যাহা হইতে ভগবৎ সেবাপর দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, যাহা হইতে পাপ সমূলে বিনষ্ট হয়, তাহাই দীক্ষা নামে অভিহিত হয়। এখন দেখুন, দীক্ষা কেবল কানে ফুঁ দেওয়া বা নেওয়া মাত্র নহে। আবার যিনি গুরু-পাদাশ্রয় পূর্ব্বক অপ্রাকৃত-জ্ঞান মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই, তিনিও গুরু হইতে পারেন না। সদ্‌গুরুর অভাবে আমাদের দীক্ষা কার্য্যটি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না, তথাকথিত নামধারী ব্যক্তির নিকট মন্ত্র লইয়া আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না, দীক্ষিত ও অদীক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, কাজেই আমাদের মন্ত্রে অবিশ্বাস ও গুরুতে অবিশ্বাস। অবশ্য ইহাও সত্য যে আমরা প্রাকৃত দর্শনের সাহায্যে যে গুরু বৈষ্ণবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে করি, অথবা তথাকথিত নামধারী গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের জপ করি, তাহা সামর্থ্যহীন প্রাকৃত জড়বস্তুর অন্যতম; অপ্রাকৃত নাম, মন্ত্র ও গুরুর অনুরূপ; বস্তুতঃ প্রকৃত সত্য—বস্তু হইতে পৃথক্। কিন্তু প্রতিবিম্বিত তত্ত্বের বিকৃতাবস্থা লক্ষিত হয় বলিয়া সত্য বস্তুকেও বিকৃত বস্তুর অন্যতম মনে করিতে হইবে না। আপনারা এই প্রকৃত বস্তুর অনুসন্ধান করুন, বিত্তাপহারক গুরুকে ছাড়িয়া সন্তাপহারী সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করুন। সদ্‌গুরু লাভ হইলেই আমরা শক্তিশালী হইব, আমাদের নিকট ক্ষত্রিয় বল তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইবে। গুরুদেব সাক্ষাৎ বলসঞ্চারী বলদেব, তাঁহার বলে বলীয়ান হইলে জীব সমগ্র জগৎকে জয় করিতে সমর্থ হইবে, সমগ্র জগৎ কেন, অজিত ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত জয় করিতে পারিবে। আমাদের যে গুরু ও শাস্ত্রে অবিশ্বাস, তাহা বিদূরিত হইবে, সংসার-দাবানল চিরকালের জন্য নির্বাপিত হইবে, আমরা তখন নাচিয়া নাচিয়া গাইব—

বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে।
* * তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

আমাদের জাগতিক অভাব চিরতরে প্রশমিত হইয়া বিশ্ব পূর্ণ সুখময় হইবে।

আজকালকার আর এক শ্রেণীর নব্য দল আছেন, তাঁহারা বলেন, কলিকালের যুগধর্ম্ম একমাত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তন, নাম করিতে হইলে দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাদির অপেক্ষা নাই, সুতরাং সদ্‌গুরুর নিকট যাইবার—তাঁহার কথা শুনিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। অজামিল অত্যন্ত দুরাচার ছিলেন, তিনি কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, অথচ অন্তিমকালে পুত্রনাম সংকেতে নারায়ণ-নাম উচ্চারণ করিয়াই মুক্ত হইলেন, আমরাই বা কেন না সেরূপ হইতে পারিব। আমরা উপরিউক্ত পূর্ব্বপক্ষটির মীমাংসা করিতে গিয়া জটিল তর্কের অবতারণা করিতেছি না, তবে এইমাত্র বলিতেছি যে, মন্ত্রদীক্ষার আবশ্যকতা যদি না-ই থাকে তাহা হইলে শাস্ত্রে যে দীক্ষা ও গুরুর মাহাত্ম্য ভুরি ভুরি রহিয়াছে, সেগুলি কি শাস্ত্রকারদিগের প্রজল্পমাত্র? জগদ্‌-গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের দীক্ষাভিনয় লীলা কি লোকশিক্ষার জন্য নহে? ভগবৎ-প্রেম যদি একমাত্র লক্ষ্য বস্তু হয়, তাহা হইলে দীক্ষার প্রয়োজন অবশ্য আছে,—

দীক্ষা-কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তৎকালে তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে সেহ শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥

এই প্রবন্ধটি পড়িয়া অনেকের মনে হইবে যে সদ্‌গুরু লাভ হওয়া কঠিন। সুতরাং আমরা কিরূপে তাঁহাকে পাইব, তিনি যে সদ্‌গুরু তাহাই বা আমি কিরূপে চিনিব? জগতে সাধুর ছড়াছড়ি, কে সাধু কে অসাধু চেনা কঠিন, একথা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া সাধু নাই—এরূপ নহে। সাধু আছেন কিন্তু তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার সেবা করিবার বাসনা মোটেই নাই। গুরুদেব মর্ত্ত্য জীব নহেন, বস্তুতঃ ইহ জগতে তাঁহার মর্ত্ত্য জীবের ন্যায় জন্ম হয় নাই, তিনি ভগবান হইতে অভিন্ন বস্তু, ভগবানের নিত্য সহচর। আমাদের যদি তাঁহার সান্নিধ্য লাভের নিষ্কপট বাসনা থাকে, তাহা হইলে অন্তর্য্যামী ভগবান্ তাঁহার নিত্য পার্ষদকে আমাদের নিকট অবশ্য প্রেরণ করিবেন।

আপনারা একবার সেই পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুবের কথা স্মরণ করুন, ভগবান্ ধ্রুবের নিষ্কপটতা ও ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করিয়া স্বীয় পার্ষদ নারদকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমাদের হৃদয়ের যদি নিষ্কপটতা ও ঐকান্তিকতা থাকে, তাহা হইলে আমাদেরও সদ্গুরু লাভ দুর্লভ হইবে না।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"

মনের কথা ও শ্রৌত কথা

"আজকাল মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় 'লেখক' বলিয়া পরিচিত হওয়া একটা বড় সহজ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। কোন গতিকে মুদ্রণ-ব্যয়টা সংগ্রহ করিতে পারিলেই আর ভয় নাই। ছাই ভস্ম যা' কিছুই লিখিয়া ফেলি না কেন, ছাপা ত' হইবেই। পরে দুই চারিদিনের মধ্যে দপ্তরীর বাড়ী থেকে বেশ একখানি লালটুক্‌টুকে বই হইয়া আসিবে। তখন আর আমায় পায় কে? বাজারে আমার পুস্তকের এত ডিম্যাণ্ড হইয়া উঠিবে যে শেষে সংস্করণের উপর সংস্করন হইয়াও কুল নাই। দু'একটা খবরের কাগজে ও সম্পাদক মহাশয়দের হাতে পায়ে ধরিয়া দু'এক কলম প্রশংসাপত্র লিখিয়া লইব। বেশ দু'পয়সা করিয়া খাইব আবার মাঝ হইতে নামটাও জাহির হইয়া যাইবে। কিন্তু একটা দুঃখের বিষয় এক ধরণের লোক আছে, তা'দের যত নজরটাই যেন আমারই উপরে। লিখিলাম একখানি বই। তা' শত্রুদের জ্বালায় আর পারিয়া উঠার জো নাই। গানে—বক্তৃতায়—লেখায় কেবল আমার বিষয় লইয়াই তাদের যত আলোচনা! কেন, তা'দের কি হইয়াছে? সাধারণে ত' ভালই বলিতেছে?"

আমি বসিয়া বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় আমার এক বন্ধু আসিয়া বলিলেন, "ভাই, এই দেখ না, আমি 'মনের কথা' বলিয়া একখানা বই লিখিয়াছি। বাজারে বইখানা বেশ চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কতকগুলি আমার মনের সুখ-অসহিষ্ণু লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, যাহাতে 'মনের কথা' বাজারে আর না বিকায়। 'মনের কথা'র লোকে আদর করিবে না ত' আর কিসের আদর করিবে?" আমার বন্ধুটি একটু হাসিয়া বইখানি দেখিতে চাহিলেন। আমি 'উঠিত' পড়ি' করিয়া বইখানি বন্ধুর হাতে দিলাম। বন্ধু বলিয়া উঠিলেন, তোমার বইখানার অনাদরকারী কে? আমি বলিলাম, 'শ্রৌত কথা' না কি একখানা গ্রন্থের প্রকাশক আমার 'মনের কথা'র অত্যন্ত বিরোধী। বন্ধুবর আমাকে একটু ক্ষুণ্ণচিত্ত দেখিতে পাইয়া খুব মৃদুমধুর স্বরে আমাকে অনেক উপদেশ করিলেন। উপদেশগুলি আমার তাৎকালিক অবস্থায় বিশেষ প্রীতিপ্রদ না হইলেও পরে খুব উপকারে আসিয়াছিল, বন্ধুই আমার জীবনপথের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। পাঠক বর্গ, বন্ধুবরের কথাগুলি আপনাদের উপকারে আসিতে পারে বলিয়া যতটা স্মরণ হয় লিখিলাম। আপনারা একটু ধৈর্য্যধারণ করিয়া অবধান করুন।

'বন্ধুর কথা'

"ভাই, তোমার মনের অভিপ্রায়—'শ্রৌত কথা'র আদরকারিব্যক্তি তোমার 'মনের কথা'র আদর করেন না কেন, আর জগতের সমস্ত লোকই বা 'মনের কথা'র আদর করে কেন? কথাটা একটা মস্ত বড় সমস্যারই বটে। দেখ, আত্মা, মন ও দেহ—এই তিনটী বস্তু আছে। আত্মা এই দেহ এবং মনের অতিরিক্ত একটি বস্তু। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতাত্মক দেহ ও সূক্ষ্মভূতাত্মক মন—ইহারা সকলেই গীতোক্ত অপরা প্রকৃতি। আত্মা এই প্রাকৃত দেহ ও মন হইতে একটি স্বতন্ত্র বস্তু—শ্রীভগবানের জীবভূতা পরা প্রকৃতি। জল যেমন নিসর্গ-ক্রমে শৈত্যসংযোগে কাঠিন্য-

ভাব ধারণ করিলেও তাহার স্বরূপগত সার্বকালিকী বা নিত্য স্বভাব তারল্য কখনও নষ্ট হয় না, অপ্রকাশিত থাকে মাত্র, জীবাত্মাও সেইরূপ প্রকৃতিবশযোগ্যতা-নিবন্ধন অসৎসংসর্গে আগন্তুক ভগবদ্বিমুখতা বরণ করিলেও তাঁহার যে একটি নিত্যা সর্বকালিকা বৃত্তি আছে, তাহা কখনও নষ্ট হয় না। জীবাত্মার সেই নিত্যাবৃত্তিটির নাম ভগবৎ-সেবা বা ভক্তি। 'শ্রৌতকথা' বলিতে আত্মার এই নিত্যা বৃত্তি ভক্তিকথা। চিদাভাস বা চেতনাভাস, মন মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়দ্বারা গ্রস্ত ও সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ধর্ম্ম বিশিষ্ট। সুতরাং শুদ্ধ জীবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই আস্থাহীন—

'আত্মা আছে কি না আছে সন্দেহ তাহার কাছে।'

এইরূপ শুদ্ধজীব স্বরূপবৃত্তি বা আত্মবৃত্তির আনুগত্য-সম্বন্ধ-বিশ্লিষ্ট মনের যাবতীয় চেষ্টা ভক্তি প্রতিকূল। এতাদৃশ মন সর্ব্বদাই ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষ চতুষ্টয়ে দুষ্ট। ভ্রম অর্থাৎ এক বস্তুতে অন্যবস্তু বুদ্ধি— যেমন সর্পে রজ্জু ভ্রম, প্রমাদ—অনবধানতা, করণাপাটব— ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অপটুতা, বিপ্রলিপ্সা—আত্মবঞ্চনেচ্ছা। সুতরাং এই মনের কথা কখনও প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। তবে যখন এই মন শুদ্ধ চেতনবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাহার আর প্রাকৃতত্ব থাকে না, চেতনত্বই লাভ হইয়া থাকে। জড়দেহের সম্বন্ধেও ঐরূপ। তখন মনের সমস্ত কথাই শুদ্ধ জীবাত্মার কথা— হরিসেবা ছাড়া আর কিছুই নহে, দেহের সমস্ত কার্য্যই— শুদ্ধজীবাত্মার কার্য্য বা ভগবৎসেবা।

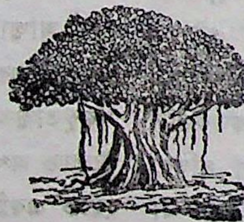
শুদ্ধজীবাত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ভগবৎসেবাবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রৌতপন্থার অনুসরণকারী বা শ্রৌতপন্থী— তিনিই শ্রুতি অর্থাৎ গুরুপারম্পর্য্যে শ্রুত শ্রৌত-কথা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ। কিন্তু 'মনের কথা'-কীর্ত্তনকারী গুরুপারম্পর্য্যে লব্ধ শ্রৌতপথ স্বীকার না করায়, অশ্রৌত-পন্থী, বেদবিরোধী, ভক্তিবিরোধী, নাস্তিক বা জীবাত্মা-স্বরূপের নিত্যধর্ম্মবিরোধী; সুতরাং তাহার কথা অজ্ঞ সাধারণের শ্রুতিমধুর হইলেও তাহা তত্ত্বজ্ঞগণের অশ্রাব্য।

শ্রীশ্রীসদ্গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত জনই হরিকথা-শ্রবণাধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রবণ সুষ্ঠু হইলে গুরুদেব তাঁহাকে কীর্ত্তনাধিকার প্রদান করেন। তখন সেই গুরু-কৃপালব্ধজন-কীর্ত্তিত 'শ্রৌত কথা' আবার অন্যের শ্রোতব্য হইয়া থাকে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনাশ্রিত—গুরুমুখবাক্য-অশ্রুত জনের মনোধর্ম্ম প্রণোদিত হইয়া কীর্ত্তন বা 'মনের কথা' কখনও নিঃশ্রেয়সার্থীজনের শ্রোতব্য হইতে পারে না। ভগবদ্ভজনানভিজ্ঞ জনগণ মনোধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়া থাকেন, তাই তাঁহাদের মনের কথায় আদর, শ্রৌত-কথায় আদর নাই।

জীব যখন গুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ করেন, তখন গুরুদেব তাঁহার দেহ ও মনকে আত্মসম অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু করিয়া লন—প্রাকৃত রাখেন না। তখন সেই অপ্রাকৃত মনের কথা আত্মারই কথা, তাহা আর জড়ীয় মনের কথার সহিত এক নহে।

তাহা হইলে এখন বোধ হয় তুমি বুঝিয়াছ, শ্রীশ্রীসদ্-গুরুপাদপদ্মে অনাশ্রিত ব্যক্তির 'মনের কথা' বিজ্ঞজনের শ্রবণীয় নহে। শ্রৌতকথাই বিজ্ঞজনের আদরণীয়!"

বন্ধুবরের এই কথা শ্রবণে আমার শ্রৌতকথা শ্রবণেচ্ছা ক্রমেই বলবতী হইতে লাগিল। মনের কথায় ক্রমেই আদর কমিয়া আসিল।



ভক্তি না ভুক্তি ?

"ভক্তি' অর্থে সেবা, আর 'ভুক্তি' অর্থে ভোগ। 'ভগবদ্ভক্তি' বলিতে শ্রীভগবানের সেবাকে নির্দ্দেশ করে। অধিকারিভেদে ভগবৎ-সেবা অনেক প্রকার। কনিষ্ঠাধিকারী কেবল বিগ্রহসেবাতেই তৃপ্তি লাভ করেন, কিন্তু যাঁহারা বিগ্রহ ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের কোন্ অধিকার এ বিচার আবশ্যক। সকল স্থানেই, বিশেষতঃ প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়া বিশ্রুত স্থানগুলিতে এই সকল বিগ্রহ ব্যবসায়ীর প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ইঁহারা বিগ্রহ-সেবক কিনা, সেই প্রশ্ন অনেকেই করেন। ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে প্রশ্নটির বিশেষ বিচার আবশ্যক। 'সেবা' বলিতে গেলে নিজ ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়া প্রভুর প্রীত্যর্থে ক্রিয়াকে নির্দ্দেশ করে। যদি ভোগবাসনা কিয়ৎপরিমাণে থাকে, সেবা সেই অনুপাতে বাধা প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত আচার হইতেছে প্রভুকে দিয়া নিজসেবা করাইয়া লইবার বাসনা, প্রভুর সেবোপকরণ স্বয়ং আত্মসাৎ করা। যেখানে এভাবে সেবাবঞ্চনা দেখিব, সে স্থলে আমরা সেবা বলিয়া স্বীকার করিব না বা তাহার অনুমোদন করিব না, অর্থাদির দ্বারা আনুকূল্যও করিব না; কেননা, সেখানে সেবা হয় না। সে স্থলে প্রদত্ত আনুকূল্য কেবলমাত্র নিষ্ফল নহে, পরন্তু অসতের চেষ্টাকে প্রশ্রয় দেওয়ায়, উহাতে সেবাপরাধরূপ কুফল প্রসব করে। এরূপ সেবকাভিমানীর সঙ্গ পরিত্যজ্য।

এতৎপ্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ে। বাবু সারাদিন আফিসের সাহেবের তাড়া খাইয়া চাকরী করিয়া ঘরে ফিরিলেন, গৃহিণী রন্ধনশালায় ব্যস্ত। বাবু ক্ষুধিত হইয়া রামশরণ বেহারাকে একটি সিকি দিয়া চারিটী সন্দেশ আনিতে বলিলেন। বাবু ত' বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন, হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালনে ব্যাপৃত থাকিবার পর দেখেন, রামশরণ একটি সন্দেশ লইয়া আসিয়াছে, দেখিয়া তিনি কিছু বিরক্ত হইলেন, একে ক্ষুধায় কাতর' তাহাতে অর্থব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু ঈপ্সিত দ্রব্য আসে নাই। ক্রুদ্ধভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে হতচ্ছাড়া, তোকে সিকি দিলুম, আর তুই একটা সন্দেশ আন্‌লি যে ?" ভৃত্য সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, সে অনেক কথা, আপনি এই তেতে পুড়ে এলেন, এখন থাক্, পরে সব ব'ল্‌ব।"

"পরে ব'ল্‌ব, ব্যাটা পাজি, আর তিনটে সন্দেশ কি হ'ল বল্, নইলে তোর মুণ্ডু ভেঙ্গে দিব।" "আজ্ঞে, আজ্ঞে, তবে সব আমাকে বল্‌তে হয়, কিন্তু বাবু, যদি রাগ না করেন, আমি নির্ভয়ে বলি।" "আচ্ছা, বল্।" "আজ্ঞে, আপনাকে ত কখনও খারাপ জিনিষ ব্যাভার কর্‌তে দেখিনি। তা, ময়রা কি দিলে, ভাল কি মন্দ, আমি না দেখে ত' আন্‌তে পারি না, তাই, একটা চেখে দেখ্‌লুম, হাঁ, ভাল জিনিষই বটে।" "ব্যাটা কি শয়তান্, যা' কিন্‌তে দিয়েছি তা'র ভেতর কি চাখ্‌তে বলেছিলুম ? আচ্ছা, যাক্, তা'তে না হয় একটাই গেল, আর দুটো ?" "আজ্ঞে, আপনি আমার মনিব, মা বাপ্। আমি কি আপনার শত্তুর হ'তে পারি ? আপনাকে কি ক'রে তিন শত্তুর দিই, এই ভেবে দিশেহারা হ'য়ে এক বুদ্ধি অনেক কষ্টে মাথায় এল। তাই, আর একটা মুখে ফেলে দিয়ে তিন শত্তুর ঘুচিয়ে দিয়ে দুটো রাখ্‌লুম। আমি কি আপনার দুশ্‌মন্ হ'তে পারি, হুজুর ?" "বেটা কি ভক্ত-বিটেল দেখ। আমায় কত ভালবাসে দেখেছ ? তাই আমার মুখের গ্রাস খায়। আচ্ছা যাক্। তা'হলে ত' দুটো থাক্‌তো, আর একটা কি হ'লোরে, হারামজাদা ?" আজ্ঞে যদি বলেন, তা'হলে বলি। আপনি ত যা' খা'ন আমার জন্য পেসাদ রাখেন, তা' সেটা আমি আগেই পেয়ে নিয়েছি। জানি, আমার পাওনা আমি পেলে, আপনার দয়ার শরীর, আপনি রাগ কর্‌বেন না।" "ব্যাটার সব ভক্ত-বিটেলদের মত ভোগের আগেই পেসাদ। ব্যাটা, আগে দু-দুটো খেয়ে নিয়ে শেষকালেরটা কি ক'রে খেলি ?" "আজ্ঞে, তা' আমি দেখাতে খুব রাজি। দেখুন, বাবু, যেন দোষ নেবেন না, আপনি বললেন ব'লে তাই দেখাচ্ছি। খেলুম এই এমনি ক'রে।" এই বলিয়া

প্রভুভক্ত ভৃত্য চতুর্থ সন্দেশটিও গালে ফেলিয়া দিয়া অপর তিনটি সে কি করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার প্রণালী দেখাইয়া দিল। তাহার পর যাহা ঘটিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে কথার আবশ্যকতা নাই বলিয়া আর বাহুল্য করিয়া বলিলাম না। এখন দেখুন পাঠক মহাশয়, এ কিরূপ প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ। "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস" তাহা ভুলিয়া গিয়া মায়ার ফাঁস গলায় পরিয়া কৃষ্ণকে ফাঁকি দিতে বসিয়াছে, নিজেকে ফাঁকি দিতেছে, অপরকেও দিতেছে। এক্ষণে আপনারাই বিচার করিয়া দেখুন, সেবাস্থলে এরূপ বিগ্রহ-ব্যবসায় প্রভুসেবা না নিজ ভোগ-সাধন? আমরা আর উত্তর দিয়া এক শ্রেণীর লোকের বিরাগভাজন হইব না, আমরা কাহাকেও চটাইতে প্রস্তুত নহি। আমরা নিরপেক্ষ রহিলাম, আপনারাই বিচার করিয়া লউন, ইহা "ভক্তি না ভুক্তি?"

নূতন কথা

আজকাল সাধারণ জড় জগতের কথায় লোকের এত আদর হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের অন্যকথা চিন্তা করিবার আর বিন্দুমাত্রও অবসর হইয়া উঠিতেছে না। পরজগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই লোকে আস্থাহীন। বিশেষতঃ অধিকাংশ নব্যশিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ে ভগবৎ কথার আলোচনা বৃথা সময় নষ্ট বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধগণের মধ্যেও অধিকাংশস্থলে দেখা যায়, তাঁহাদের একটু ধর্ম্মভাব লক্ষিত হইলেও তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ মনগড়া সিদ্ধান্তে এত ভরপূর হইয়া আছেন যে, তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারাই সবজান্তা, শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য কেবল তাঁহারাই হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহাদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান আর কেহ নাই। সুতরাং তাঁহাদের মতে 'শ্রৌতপন্থা' আবার একটা কি? আরোহপন্থাই গ্রহণীয় অর্থাৎ তাঁহারা নিজ বুদ্ধিবলেই ভগবান্‌কে বুঝিয়া লইবেন; কাহারও অপেক্ষা রাখেন না।

অন্যান্য সাধারণে বলিয়া থাকেন—'আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম', আগে খাইয়া দাইয়া নিজেরা বাঁচি, নিজেদের স্বাস্থ্য ভাল রাখি, তারপর বাবা হরিনাম, কি যে নাম বল একটা কিছু করা যাইবে। হরিনামে ত' আর খাওয়া পরা মিলিবে না—জীবিকানির্ব্বাহাদির জন্য সারাদিন পরিশ্রম করিয়া যখন একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িব, তখন বিশ্রামের সময়—কেহ যদি একটু খোল করতাল বাজাইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করে, তা' একটু বরং শোনা যাইতে পারে—কিন্তু যে সে কীর্ত্তন হইলে আমার ভাল লাগিবে না বরং বিশ্রামেরই ব্যাঘাত হইবে—একটু রসকীর্ত্তন হয় আরাম করিয়া শুনা যাইবে।

কেহ কেহ আবার বলেন, দুর্ব্বল, রোগা, বুড়োহাড়া লোকেদের কার্য্য বসিয়া বসিয়া হরিনাম করা। এখন আসুরিক বলের দরকার। উপনিষদও বলেন 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' অর্থাৎ কিনা এই আসুরিক বল সঞ্চয় না করা পর্য্যন্ত স্বরাজ্য পাওয়া যায় না।

পরমার্থ কথার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও অনেকে আবার কতকগুলি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা আনিয়া সর্ব্বনাশ করেন। ভগবান্ যেন এক একটা ছোট সম্প্রদায়েই আবদ্ধ। 'বৈষ্ণব' বলিয়া একটা পৃথক্ সম্প্রদায়। কৃষ্ণ সেই সম্প্রদায়েরই উপাস্য, আমরা যখন বৈষ্ণব নহি, তখন কৃষ্ণ আমাদের কেহ নয়। 'নবদ্বীপ' 'বৃন্দাবনে'র নাম শুনিলেই ত' কতকগুলি লোকে একটু নাম মুখ সিঁট্‌কাইয়া বলেন—ও' স্থানগুলা বৈষ্ণবদের, ও' গুলার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। মনোধর্ম্মীদের এইরূপ কত যে বিভিন্ন সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনের মতামত জগতে প্রচারিত আছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য মনোধর্ম্মিগণের এই সকল বিভিন্নমুখিনীচিন্তাস্রোতের গতি রোধ করিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সার্ব্বজনীন সহজ শুদ্ধভক্তিকথা

কীর্ত্তন সাধারণসমক্ষে জগতের যেন একটা সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব আনিয়া ফেলিতেছে।

তাই সাধারণ জগৎ বলিতেছেন—"তোমাদের যেন একটা সৃষ্টি ছাড়া কথা। সেই ভাগবত-পুরাণের যুগে কবে কি হইয়াছিল, সেই পুরাণ একঘেয়ে কথা আর আমরা শুনিবার জন্য প্রস্তুত নই। এখন নূতনের যুগ—নূতন কিছু বল—নূতন কথা শুনিব।

আমরা বলি. হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমরা তোমাদিগকে নূতনই বলিতেছি, কেন না—পুরাতনই নূতন, নূতনই পুরাতন। পুরাণ, পুরাতন, সদাতন বা সনাতন কথা নিত্যনূতন। তাহা কখনও ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই কালত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে, নিত্যকাল বিরাজিত। তোমাদের শ্রবণ সুষ্ঠু হইতেছে না। কালক্ষোভ্য নশ্বর জগতের কথায় তোমাদের কর্ণরন্ধ্র এত পরিপূর্ণ হইয়া আছে যে, সেখানে অপ্রাকৃত জগতের নিত্যনূতন কথা প্রবেশ করিবার পথ পাইতেছে না। তোমরা মনে করিতেছ বটে তোমরা অপ্রাকৃত জগতের কথা শুনিতেছ, কিন্তু ব্যাপারটী ঠিক তাহাই নহে। অপ্রাকৃত জগতের কথা শ্রবণ করিতে হইলে অগ্রে কর্ণ প্রস্তুত করার দরকার। আমার একজন বন্ধু একদিন হঠাৎ আমার গুরুদেবের নিকট গিয়া বলিলেন—'প্রভো, আমাকে কিছু হরিকথা বলুন'। প্রভু তাহার কথা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"হরিকথা শ্রবণের পূর্বে আপনার কয়েকটী কথা শুনিতে হইবে। দেখুন, সাধারণ জগতে বালকেরা ঠাকুরমার নিকট গিয়ে বলে, 'ঠাকুরমা, একটা গল্প বল ত'। ঠাকুরমাও গল্প বলিতে আরম্ভ করেন, আর বালকেরা তাহা শ্রবণ করিয়া খুব আনন্দ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই হরিকথা ঠাকুরমার উপকথা নয়, ইহা শ্রবণ করিবার জন্য কর্ণ প্রস্তুত করিতে হয় আর উপলব্ধিরও সর্ব প্রকার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, তবেই ইহা হইতে আনন্দপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। নতুবা আমার ২০০ গ্যালন রক্ত খরচ করা হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে আপনার বিশেষ কিছু সুবিধা হইয়া উঠিবে না। শ্রীকৃষ্ণকথা কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রহ্য বস্তু নহে—ইন্দ্রিয়বর্গের সেবোন্মুখ অবস্থাতেই তত্তদিন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণনামাদির শ্রবণাদি সৌভাগ্য লাভ হয়।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

এই সেবোন্মুখতা লাভের উপায় কি? শ্রীভগবানের প্রিয় সখা অর্জ্জুন স্বয়ং আচরণ করিয়া বদ্ধ জীবকুল আমাদিগকে সে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। অর্জ্জুন শ্রীভগবান্‌কে বলিতেছেন, "হে ভগবান্, আমি আজ হইতে আমার সর্ববিধ স্বতন্ত্রতা বিসর্জ্জন দিলাম। আমি তোমার সর্বতোভাবে শিষ্য বা শাসনযোগ্য—তোমাতে একান্ত শরণাগত, আমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ কর—'শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'। শ্রীগীতার অন্যত্রও শ্রীভগবানের উক্তি—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপ দেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ"। তত্ত্বদর্শী কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরুদেব তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেন বটে—কেন না আচার্য্যের কার্য্যই ভক্তিশংসন বা ভক্ত্যুপদেশ—"আচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ"; কিন্তু শিষ্যেরও কর্ত্তব্য সেই আচার্য্যের পাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিক্ষেপ-পূর্বক সর্ববিধ স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া দিয়া পরিপ্রশ্ন করা—বৃথা তর্কোত্থাপন নহে—সত্য সত্য নিজ মঙ্গল লাভের জন্য জিজ্ঞাসা; এই জিজ্ঞাসার নামই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসা কিরূপ, তাহা একদিন আচার্য্য সনাতন গোস্বামী আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—

"কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি, কেমনে 'হিত' হয়॥
সাধ্য, সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥"

আবার এই পরিপ্রশ্নের প্রদত্ত উত্তর প্রশ্নকারীর হৃদয়ে ততটুকু স্ফূর্ত্তি পাইবে, যত টুকু তাঁহার সেবাবুদ্ধি উন্মেষিত হইবে। আত্মনিক্ষেপ ত' মুখের কথা মাত্র নহে, সেবাবুদ্ধিই আত্মনিক্ষেপকারীর প্রধান নিদর্শন। সুতরাং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার যুগপৎ সমাবেশই প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণকথা শ্রবণের যোগ্যতা প্রদান করে। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু যখন জীবশিক্ষার জন্য সর্ব্ববিধ

স্বতন্ত্রতা ত্যাগ দ্বারা জগদ্‌গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে অভিগমনপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শরণাপত্তি ও সেবাবুদ্ধি সহকারে 'কে আমি' ইত্যাদি পরিপ্রশ্ন করিলেন, তখনই মহাপ্রভু জীবোদ্ধারার্থ তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া সনাতন বা নিত্য নূতন শিক্ষা উপদেশ করিলেন। সনাতন নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ, তাঁহার সাধনসিদ্ধজীবলীলাভিনয় মাদৃশ অজ্ঞজনের উদ্ধারার্থই জানিতে হইবে। তাঁহাতে বদ্ধত্বারোপ তচ্চরণে ভীষণ অপরাধেরই পরিচয় মাত্র।

অবশ্য অল্পভাগ্যে জীবের সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে ঐরূপ শরণাপত্তি আসিতে পারে না—বহু বহু জন্মের সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইলেই তবে তাহার ঐরূপ ভগবৎসেবা উদিত হয়॥

অল্পভাগ্যে জীবের নহে কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
সংসার ভ্রমিতে **কোন** ভাগ্যে **কেহ** তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥
কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥

এই ভাগ্য বা সুকৃতি তিনপ্রকার :—

(১) ভক্ত্যুন্মুখী, (২) ভোগোন্মুখী ও (৩) মোক্ষোন্মুখী সুকৃতি। যে সকল কার্য্য সংসারে শুদ্ধভক্তি-জনক বলিয়া স্থির আছে, সেই সকল কার্য ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপন্ন করে, যে সকল কার্য্যের ফল বিষয়-ভোগ, সে সকল ভোগোন্মুখী সুকৃতিপ্রদ, আর যাহদের ফল মোক্ষ, সে সকলমোক্ষোন্মুখী সুকৃতিপ্রদ। ভোগ ও মোক্ষ বা ভুক্তি ও মুক্তি—উভয়ই জীবের সংসার-প্রাপক এবং কৃষ্ণভক্তিবাধক। কৃষ্ণভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিই সংসার নাশক। এই সুকৃতি পুষ্ট হইয়া যখন ফলোন্মুখ হয়, তখনই জীবের সাধুসঙ্গে রতি উৎপন্ন হয় এবং সৎকথা শ্রবণেচ্ছা উদিত হয়। এইরূপ সুকৃতি অর্জ্জন হইলে জীবের (১) ভগবৎ-কথালোচনাকে আর বৃথা সময় নষ্ট বলিয়া মনে হইবে না, (২) গুরুমুখশ্রুত শ্রৌত কথায় আদরের পরিবর্ত্তে অশ্রৌত-কথায় বা আরোহপন্থায় আদর হইবে না; (৩) জীবাত্মার সহজ সুস্থ বা স্বাভাবিক অবস্থাই যে কৃষ্ণসেবা এবং তাহাই যে তাঁহার একমাত্র স্বাস্থ্য ও অস্বাভাবিক অবস্থাই যে কৃষ্ণবৈমুখ্য এবং তাহাই যে তাঁহার অস্বাস্থ্য, ইহা উপলব্ধির বিষয় হইবে, (৪) 'আগে বাঁচিয়া তাহার পর হরিনাম করিব' এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির পরিবর্ত্তে হরিনাম করার জন্যই জীবন ধারণ নতুবা জীবননাশই শ্রেয়ঃ, এই বুদ্ধি হইবে। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে জীব আরও বুঝিতে পারে—(৫) হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি তাঁহার ইন্দ্রিয়-তর্পণেব বিষয় নহে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণার্থই নৃত্যগীত বাদ্যাদির প্রয়োজনীয়তা, (৬) রস কথা শ্রবণ কীর্ত্তন অনধিকার চর্চ্চার বিষয় নামে—গুরুদেবই আমাদের যোগ্যতা বিচার করিয়া সে অধিকার প্রদান করেন। অনধিকারী অবস্থায় রসকীর্ত্তন শ্রবণে নরকগমন অবশ্যম্ভাবী। জগতের লোক এই অনধিকার চর্চ্চার ফলেই স্ব স্ব সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, রাধাকৃষ্ণে প্রাকৃত বুদ্ধি আনিয়া নরকের পথে ধাবমান হইতেছে। (৭) হরিনাম বলহীন লোকে করিতে পারে না বটে, কিন্তু সে বল আসুরিক বল নহে, সে বল—চিদ্‌বল—অভিন্ন বলদেব-নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীগুরুদেবের বল। সেই বলশালী হইয়াই হরিনাম করিতে হইবে। দেহ ও মন নশ্বর—প্রাকৃত বস্তু, তাহাতে আত্মবুদ্ধি করিয়া তাহাকে স্বাস্থ্যবান্ করিবার চেষ্টা পাগলের—বুদ্ধিমান্, বিবেকবান্ মনুষ্যের নহে। প্রাকৃত দেহ ও মনের বলে বাল্য, যুবা ও বৃদ্ধাবস্থা বর্ত্তমান, কিন্তু আত্মবলে তাদৃশ ভেদ নাই। তাহা নিত্যকালই হ্রাসবৃদ্ধি শূন্য। বর্ত্তমানে সেই বল উপলব্ধির অভাব হওয়াতেই আমরা আমাদিগকে দুর্ব্বল অভিমান করিতেছি। কিন্তু বলদেবের কৃপায় সেই অভিমান শীঘ্রই তিরোহিত হইবে। আমরা আত্মবলে বলীয়ান হইয়া বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থ—এই ষড়বেগ দমন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইব—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কৃষ্ণ-বিমুখতা জয় করিয়া স্বরাজ্য অর্থাৎ কৃষ্ণের নিত্যকাল সেবা লাভ করিব। (৮) 'বৈষ্ণব' কোন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ নহেন। জীবমাত্রই—বৈষ্ণব। "কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস। যে না মানে সেই পাপে তার হয় নাশ॥" যিনি সর্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর সম্বন্ধ স্বীকার করিতে নারাজ, তিনিই বিষ্ণুবিরোধী—নাস্তিক। জগৎ হইতে

এরূপ নাস্তিকতার উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্যই শ্রীভগবান গৌরসুন্দরের অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীমায়াপুর নবদ্বীপে অবতার।

হে জীব, কেন আর তোমরা নিজের সর্ব্বনাশ নিজে বরণ করিয়া হাহুতাশ করিয়া মর, তোমাদের জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য এবং রূপের সকল অভিমান ছাড়িয়া দিয়া—

"গৌরজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া।
হরেকৃষ্ণ নাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥"

সম্প্রদায়-বিদ্বেষ ছাড়িয়া দাও ভাই, আর বৃথাকার্য্যে সময় নষ্ট করিও না। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদের আর কোন অভাব থাকিবে না। তোমরা সকলেই কৃষ্ণের বস্তু, কৃষ্ণ হইতে কেহই পৃথক্ নহ, কৃষ্ণসেবাই তোমাদের একমাত্র কৃত্য—কৃষ্ণ জগতের পিতা, সেই পিতার সেবা না করিয়া তোমাদিগকে যে পিতৃদ্রোহী হইতে হইবে—জন্মে জন্মে ত্রিতাপ ভোগ করিতে হইবে। শ্রীভগবজ্জনগণের কথায় অনাদর করিও না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনিত্য, বিশ্বের কথাও অনিত্য। অনিত্য কথার আদর করিতে গিয়া নিত্যের আদর ভুলিও না—পুরাণ বা পুরাতন কথাই একমাত্র নূতন—সনাতন কথা, সেই কথায় আদর কর।

প্রকৃত সঞ্চয়

সমগ্র জগৎ সঞ্চয়চেষ্টায় ব্যস্ত। এইরূপ চেষ্টা বর্ত্তমান কালেই দেখা যাইতেছে এরূপ নহে, পরন্তু অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। রাজন্যবর্গ রাজ্য সংগ্রহের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্য্যে, প্রজাবর্গ প্রজাবৃদ্ধির জন্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে, ধার্মিকগণ ধর্ম সংগ্রহার্থ নানা দেব দেবীর উপাসনায়, জ্ঞানিগণ অতিরিক্ত জ্ঞান সংগ্রহ করিবার জন্য নানা শাস্ত্রের আলোচনায় সর্বদা ব্যাপৃত। এতদ্ব্যতীত আরও এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা স্বীয় তহবিল বৃদ্ধি করিবার জন্য এতদূর আগ্রহবিশিষ্ট যে, স্ব স্ব বিত্ত সংগ্রহার্থ ধর্ম্ম কর্মাদি পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন না, এমন কি অবশেষে নিজ পাপ কর্মাদির প্রশ্রয় দিবার উদ্দেশ্যে নাস্তিক্যবাদ অবলম্বন করেন। ইঁহারা সকলেই সঞ্চয়ী, আবার যাঁহাদিগকে আমরা ত্যাগী বলিয়া লক্ষ্য করি, তাঁহারা যে সঞ্চয়চেষ্টা হইতে বিরত, এরূপও নহে। তাঁহাদের চরিত্র ভাল করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সঞ্চয়িগণ অপেক্ষা আরও অধিক সঞ্চয়ী, তবে তাঁহারা আমাদের ন্যায় এরূপ ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে ব্যস্ত নহেন, তাঁহারা আরও কিছু বেশী চান—এইমাত্র পার্থক্য। এই প্রকার সঞ্চয় চেষ্টা বর্ত্তমানকালে আমাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন এইরূপ সঞ্চয় চেষ্টার পরিণাম কি? সঞ্চয় চেষ্টার পরিণাম অতীব ভয়ানক, তজ্জন্য নৈতিক শাস্ত্রেও উহার নিন্দা শ্রবণ করা যায়। তৎসম্বন্ধে একটি গল্প চির-প্রচলিত আছে—কোন সময় এক ব্যাধ মাংসলুব্ধ হইয়া ধনুক গ্রহণপূর্বক বনে গমন করিয়া একটি মৃগ বধ করিল। ব্যাধ হত মৃগ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে এমন সময় এক ভীষণকায় শূকর তাহার নয়নপথে পতিত হইল, তখন সে মৃগকে ভূমিতে রাখিয়া শর দ্বারা শূকরকে আহত করিলে শূকরও ব্যাধকে আঘাত করিল, তাহাতে সেই ব্যাধ মৃত্যুমুখে পতিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে উহাদের পাদপ্রহারে একটি সর্পও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। ইতোমধ্যে এক শৃগাল আহারের জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে মৃত সর্প, ব্যাধ ও শূকরকে দেখিতে পাইল এবং মনে মনে বলিতে লাগিল, অহো! ভাগ্যক্রমে প্রচুর খাদ্য উপস্থিত হইয়াছে। এই খাদ্যদ্বারা আমার তিন মাস সুখে চলিয়া যাইবে। এই মনুষ্যটি এক মাসের খাদ্য, মৃগ ও শূকর দুই মাসের এবং সর্প এক দিবসের ভক্ষ্য হইবে। আজকার মত ধনুকের ছিলাটি ভক্ষণ করি। এই মনে করিয়া যেমন সে ধনুকের তন্তুটি

স্পর্শ করিয়াছে অমনি আয়ুবন্ধন ছিন্ন হইয়া তাহার হৃদয়-দেশ বিদ্ধ করিল। সর্বপ্রকার সঞ্চয়ীর পরিনাম এই একই প্রকার। এই প্রকার শত শত আখ্যায়িকা থাকিলেও উহার দ্বারা আমাদের কোন উপকার হয় না। কেননা আমরা ঐ সকল কথা পাঠ্যাবস্থায় আলোচনা মাত্র করি, কার্য্যতঃ সে সকল কথা ভুলিয়া যাই। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—যাঁহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন মাত্র করে, কিন্তু তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করেন না, তিনি কখনও পণ্ডিত বা জ্ঞানী পদবাচ্য হইতে পারেন না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি আমরা সঞ্চয় চেষ্টা হইতে একেবারে পৃথক থাকি, তাহা হইলে কি প্রকারে আমাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ হইবে? এতদ্বিষয়ে একটি সুন্দর বিচার আছে,—আমরা চেতনবস্তু, পূর্ণ চেতনময় বস্তুর সহিতই আমাদের নিত্য সম্বন্ধ, জড়বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ মোটেই নাই, বদ্ধাবস্থায় অল্প দিনের জন্য জড়ের সহিত সংস্রব থাকে মাত্র। জড়ের সহিত যতদিন আমাদের সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন অবশ্যই সঞ্চয় চেষ্টা করিতে হইবে, কিন্তু তাহা কেবল শরীরযাত্রা নির্বাহের জন্য। অনায়াসলব্ধ বস্তুদ্বারা সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া অবশিষ্টকাল হরি-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। এইজন্য শাস্ত্রে 'যাবন্নির্বাহ প্রতিগ্রহের' ব্যবস্থা আছে। 'যাবন্নির্বাহ প্রতিগ্রহ' বলিতে যে পরিমিত অর্থের দ্বারা সংসারযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে তাবৎ পরিমিত অর্থের গ্রহণ। আবার সংসারযাত্রা নির্বাহোপযোগি অর্থও সৎপথ অবলম্বন করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। ধর্মের ভাণ করিয়া অথবা পাপকর্ম দ্বারা নিজ উদর পূর্ত্তি বা লোকবঞ্চনা দ্বারা অর্থসংগ্রহ-চেষ্টা করিতে হইবে না। ভগবানের সেবাই আমাদের নিত্য-ধর্ম, ইহা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ"

অর্থাৎ শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিবে না—ইহার নাম যুক্তবৈরাগ্য। ভক্তগণ যুক্তবৈরাগী, তাঁহারা সংসারে অন্যান্য ব্যক্তির মত নানাবিধ সংগ্রহচেষ্টায় বিব্রত হইয়াও নিষ্কিঞ্চন। জড় জগতের লোক তাঁহাদের চেষ্টা বুঝিতে পারে না। ভাই সকল! সর্বদা মনে রাখিবেন—

সঙ্গমঃ কেশবে ভক্তি গঙ্গাম্ভসি নিমজ্জনম্।
অসারে খলু সংসারে ত্রীণি সারাণি ভাবয়েৎ॥

সঞ্চয় অর্থে নিজ-ভোগার্থ ধনসমূহ আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা। কিন্তু যাঁহারা পূর্বোক্ত শৃগালের ন্যায় কৃপণতাপূর্বক কেবল ধনের সঞ্চয়ের চেষ্টা মাত্র করেন না কিন্তু উপার্জ্জিত বা সঞ্চিত ধনের দ্বারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদিগকে সঞ্চয়ী বলা যায় না। কৃপণগণ সঞ্চিত অর্থ ভূমির অধো-ভাগে প্রোথিত করিয়া রাখে, তাহার ফলে সেই ধন চোর বা রাজা কর্তৃক অপহৃত হইয়া অন্যের ভোগ্য হয়। আজ যাঁহারা সঞ্চিত বা প্রোথিত অর্থদ্বারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারা অর্থের বিনিময়ে পরমার্থ প্রাপ্ত হন। অর্থাসক্তি যাবতীয় অনর্থের মূল একথা নূতন নহে। অতএব যাঁহার যাহা আছে, তদ্দ্বারা ভক্ত ও ভগবানের সেবা করুন, তাহা হইলেই আমাদের অর্থ পরমার্থ, যুগপৎ সাধিত হইবে, জীবন পূর্ণানন্দময় হইবে নতুবা শেষ সময় অনুতাপ ও শোকাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইতে হইবে।

এখন উপায় কি?

জগতের কোথাও দুর্ভিক্ষ, কোথাও মহামারী, কোথাও বা ভীষণ অগ্নিকাণ্ড, আবার কোথাও বা আকস্মিক মৃত্যু, ভীষণ হত্যাকাণ্ড এইরূপ দিন দিন যে কতপ্রকার দৈব-দুর্বিপাকের সংবাদে সংবাদপত্রের প্রত্যেক স্তম্ভ পরিপূর্ণ হইতেছে, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা নিজেরাও চাই শান্তি, অপরকেও শান্তিতে রাখিবার ইচ্ছা করি—চেষ্টাও কিছু কিছু করি। কিন্তু পারিয়া উঠি কই? অশান্তি কমিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, দিনের পর দিন ত'

বাড়িয়াই উঠিতেছে। এখন উপায় কি? দুই দশটা লোককে খাইতে দিলাম, কি দুই দশটা রোগী শুশ্রূষা করিলাম কিম্বা ঐরূপ দুই চার দফা অশান্তি দমনের চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহাতে আর হইল কি? যে অশান্তির অগ্নি আজ জগতের বক্ষে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহা নিবারণের ক্ষমতা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রশক্তি কোটি কোটি মনুষ্যের চেষ্টাতেও ত' সম্ভব হইবে না। মনুষ্যের গম্যস্থানের বহুদূরে বনে দাবাগ্নি উত্থিত হইলে সে অগ্নি নির্ব্বাপণের জন্য যেমন দুই চারিটা দমকল যাইয়া উপস্থিত হয় না, সাগর হইতে বাষ্পাকারে মেঘ উত্থিত হইয়া বায়ু-দ্বারা চালিত হইতে হইতে দৈবক্রমেই যেমন সেই দাবাগ্নির উর্দ্ধস্থিত আকাশে যাইয়া উপস্থিত হয়—আবার শুধু যে সে মেঘ নয়—বর্ষণোন্মুখ মেঘ-রূপেই উপস্থিত হয় এবং বর্ষিত হইয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করে, সেইরূপ সংসার দাবানল-স্পৃষ্ট লোকসমূহের ত্রাণের নিমিত্ত ভগবানের অশেষ-কল্যাণ-গুণ-সমুদ্র হইতে বাষ্পাকারে উত্থিত কারুণ্য-ঘনাঘনত্ব প্রাপ্ত শ্রীভগবানের প্রিয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবেন্দ্রের অহৈতুকী কৃপাবারি বর্ষণ ভিন্ন এ জগতের অশান্তি-অনল নির্ব্বাপিত হইবার নহে। ভগবদ্বৈমুখ্যই জগতের সমস্ত অশান্তির মূল। জগতের প্রত্যেক মানব যতদিন না ভগবদ্বিমুখতা ত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরুর আনুগত্যে সর্বক্ষণ ভগবদ্‌ভজনে প্রবৃত্ত হইবেন, ততদিন মানবের আর মঙ্গল নাই। একজন ভগবানের সেবা করিবেন, তাঁহার আদর্শে আর পঞ্চাশজনের সেবাবুদ্ধির উদয় হইবে। এইরূপে যখন একে একে জগতের সকল লোকেই একমাত্র জগতের নাথ জগন্নাথের সেবায় নিযুক্ত হইবে, তখন এক আনন্দের হাট বসিয়া যাইবে—সকল নিরানন্দ দূর হইয়া যাইবে।

প্রাকৃত উপায় অবলম্বনে জগতের লোকের তাৎকালিক অশান্তি কিয়ৎপরিমাণে দূর হইতে পারে বটে কিন্তু সার্ব্বকালিকী অশান্তি দূর হওয়ার উপায় সকল শান্তির নিলয় ভক্ত ও ভগবানের পাদপদ্মাশ্রয়। পূর্বকালে দণ্ড্য ব্যক্তিকে জলে চুবাইয়া ধরা একপ্রকার শাস্তি ছিল। দোষীব্যক্তি জলমধ্যে যখন অত্যন্ত ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিত, তখন দণ্ডদাতা তাহাকে এক একবার জলের উপরে উঠাইয়া ধরিত—উদ্দেশ্য এক একবার হাঁফ ছাড়িয়া লইতে পারে। লোকটিও 'বাবা বাঁচিলাম' বলিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িত। কিন্তু হায়, পরমুহূর্ত্তেই যে তাহাকে আবার জলে ডুবাইয়া ধরিবে—তাই তাহাকে একবার অবসর দেওয়া হইল, তাহা বুঝি সে বুঝিতে পারে না বা চায় না। আমাদের অনন্ত অশান্তির মধ্যে শান্তির প্রয়াসটিও ঠিক ঐরূপ। দুঃখের তাৎকালিক নিবৃত্তিই যে পরিণামে আরও ভীষণ দুঃখের আবাহন করে, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই, তাৎকালিক দুঃখ নিবৃত্তিকেই সুখ বলিয়া মনে করি। অতএব ক্ষণিক সুখ-শান্তির আশা ত্যাগ করিয়া আমরা যাহাতে নিত্যসুখ শান্তির আশ্রয় লইতে পারি, তজ্জন্য আমাদের আর ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া, প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক—জীবন ক্ষণভঙ্গুর—এই আছে এই নাই।

অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

নৃসিংহ দেব

ভগবানের শক্তি অনন্ত! অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি শক্তি প্রধান চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। ভগবান্ ত্রিবিধ শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ত্রিবিধ লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। চিচ্ছক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবান্ মাধুর্য্যময়ী, ঐশ্বর্য্যময়ী, ঔদার্য্যময়ী এবং ঐশ্বর্য্য প্রধান মাধুর্য্যময়ী লীলা প্রকাশ করেন। মায়াশক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ত্রিবিধ পুরুষাবতার প্রকট পূর্ব্বক বহিরঙ্গা শক্তির পরিচালনা করিয়া থাকেন এবং জীবশক্তিতে অধিষ্ঠিত

হইয়া লীলাবতার সমূহের প্রকট করেন। এই লীলাবতার সকল অংশাবতার বলিয়াও পরিচিত। শ্রীনৃসিংহদেব এই লীলাবতার বা স্বাংশ অবতারগণের অন্যতম।

জীব ভগবল্লীলায় নিত্য সহচর, তাঁহার স্বরূপে ভগবদ্দাস্য নিত্য বর্ত্তমান। বদ্ধাবস্থায় এই স্বরূপগত দাস্য বিকৃত রূপে লক্ষিত হয়। তৎকালে বদ্ধজীব আপনাদিগকে ভগবদ্দাস-রূপে পরিচিত করিবার পরিবর্ত্তে কর্ম্মী বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন। কর্ম্মমার্গে পরিভ্রমণ করিতে করিতে জীব নানা অবস্থা প্রাপ্ত হন, জীব-অন্তর্য্যামী পরমাত্মায় তখন বিভিন্ন রূপ প্রকট করিয়া লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। জীব যখন মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভগবানের নিত্যদাস্য বিস্মৃত হইয়া পশুর ন্যায় আহার, নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি ধর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে এবং ভগবদ্দাস্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের বহুমানন করে, তখন ভগবান্ স্বীয় নৃসিংহ-মূর্ত্তি প্রকটপূর্ব্বক তাদৃশ নর-পশুকে বিনষ্ট করিয়া ভক্তিমার্গ সংরক্ষণ করেন। নৃসিংহ-দেবই ভক্তিপথের একমাত্র সংরক্ষক, ভক্তিপথের পথিকের হৃদয়ে কামক্রোধাদি বাটপাড়গণ উদিত হইয়া দৌরাত্ম্য করে। নৃসিংহদেব তখন স্বীয় ভীষণ মূর্ত্তি প্রকট করিয়া ঐসকল বাটপাড়দিগকে নাশ করিয়া থাকেন। এইসকল বাটপাড়গণের মধ্যে হিরণ্যকশিপু প্রধান। সত্যযুগে ভক্তিমার্গের মূর্ত্তিমান বিঘ্নস্বরূপ হিরণ্যকশিপু (হিরণ্য—অর্থ, কশিপু—উত্তম শয্যা) যখন প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন ভগবান্ নৃসিংহদেব স্বীয় মূর্ত্তি প্রকট করিয়া হিরণ্যকশিপু বধ ও প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন। নৃসিংহদেবের ন্যায় তাঁহার ভক্তগণও তৎকৃপায় ভক্তিপথ সংরক্ষণ করিতে সমর্থ। কলিকালে বৌদ্ধবিপ্লবে সমগ্র জগৎ প্লাবিত হইবার উপক্রম হইলে পাণ্ড্যরাজপুরোহিত দেবেশ্বরের পুত্র শ্রীবিষ্ণুস্বামী নৃসিংহ-দেবের আশ্রয়ে শুদ্ধাদ্বৈত মত প্রচার করিয়া ভক্তিপথ সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি প্রধান সাত শত সন্ন্যাসীকে নৃসিংহমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। তদধস্তন শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবার্থদীপিকা নাম্নী টীকার রচয়িতা শ্রীধরস্বামী। ইনি নৃসিংহোপাসক ছিলেন। ভাগবত টীকা প্রারম্ভে শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী নৃসিংহদেবের স্বরূপ নির্ণয়ে বলিয়াছেন—

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ॥

অর্থাৎ বাগ্‌দেবী সরস্বতী যাঁহার বদনে, লক্ষ্মী যাঁহার বক্ষঃস্থলে এবং সম্বিৎ (জ্ঞান) শক্তি যাঁহার হৃদয়ে বিরাজমান ; সেই নৃসিংহদেবকে আমি ভজনা করি।

নৃসিংহদেবের উপাসক ও ভক্ত্যেক-সংরক্ষক বলিয়া শ্রীধরস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদ্‌গুরুর আসন প্রদান করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তিপ্রচারক ভক্তদিগের একমাত্র সংরক্ষক শ্রীনৃসিংহদেব। শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় ভক্তগণ যাবতীয় ভক্তিবিরোধিদলকে জয় করিতে সমর্থ হন। শ্রীনৃসিংহ-দেবের উপাসকগণ সকলেই প্রচারক। এইজন্য শ্রীনৃসিংহ-উপাসকগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীনৃসিংহ উপাসনা করিয়া ভক্তমাত্রেরই নৃসিংহ উপাসনার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন।

বাইস পহাচ পাছে উপর দক্ষিণে।
এক নৃসিংহ মূর্ত্তি আছেন উঠিতে বামভাগে ॥
প্রতিদিন তাঁরে প্রভু করেন নমস্কার।
নমস্করি এই শ্লোক পড়ে বার বার ॥

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহি র্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহ মাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥

এদিকে নৃসিংহ ওদিকে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে যাই সেখানে নৃসিংহ বাহিরে নৃসিংহ আর হৃদয়ে নৃসিংহ এবম্বিধ সেই আদি নৃসিংহের আমি শরণাপন্ন হইলাম।

শ্রীনৃসিংহদেবের ভক্ত-সংরক্ষণ সম্বন্ধে একটি প্রাচীন ইতিহাস আছে। দক্ষিণ দেশীয় এক ভগবদ্ভক্ত বিপ্র তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে কোন স্থানে এক রাজপুত্রের সহিত মিলিত হন। মিলনাবধি তাঁহাদের বন্ধুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, রাজপুত্রও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি শিবের উপাসক ছিলেন এবং প্রতি রাত্রে চারি প্রহরে

চারিবার শিবপূজা করিতেন, একদিন হঠাৎ রাজপুত্রের জর হইল। তিনি সেদিন রাত্রে আর শিবপূজা করিতে সমর্থ হইলেন না, অবশেষে স্বীয় বন্ধুবরকে শিবপূজা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধু ঐকান্তিক ভগবদ্‌ভক্ত, তিনি ভগবান ব্যতীত অন্য দেবোপাসনা করিতে ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং বন্ধুর অনুরোধেও তিনি শিব পূজা করিতে স্বীকৃত হইলেন না, অবশেষে রাজপুত্র তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। তখন তিনি রাজপুত্রের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বাহ্যে রাজপুত্রের আদেশ পালন করিতে সম্মত হইলেন এবং অন্তরে সর্বদা স্বীয় ইষ্টদেবকে ধ্যান করিতে করিতে রাজপুত্র-সহ পূজা-স্থলে উপস্থিত হইয়া নৃসিংহ মন্ত্রে শিব-মস্তকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন তখন রাজপুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গ উত্তোলন পূর্বক ভক্ত বিপ্রের প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইতেছেন এমন সময় শ্রীনৃসিংহদেব শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া আবির্ভূত হইয়া রাজপুত্রকে বিনাশ ও স্বীয় ভক্তকে রক্ষা করিলেন। অদ্যাপি লিঙ্গস্ফোট নৃসিংহ মূর্ত্তি তথায় বিরাজ করিতেছেন।

"শ্রীনৃসিংহ, জয়নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ॥"

পরশমণি

পরশমণি নামক একটি পরম লোভনীয় বস্তুর কথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ চোখে দেখিয়াছেন বলিয়া বলেন নাই। চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, নীলকান্ত, অয়স্কান্ত বৈদুর্য্য, কোহিনুর কতরকম মণির নাম আমরা শুনিয়াছি, এইসকল মণির কোন না কোনটি বড় বড় ঐশ্বর্য্যশালী লোকদের অধিকারে আছে তাহাও জানি—কিন্তু পরশমণি—যাহার নাম ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ ছোট বড় আবালবৃদ্ধবনিতা আমরা সকলেই শুনিয়াছি—কাব্যে সাহিত্যে গল্পে কথায় যখন তখন আমরা ব্যবহারও করি, সেই বস্তুটি কোথায় আছে আমাদের ন্যায় দরিদ্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষত: রাজা রাজড়াদিগের মধ্যে এমন কি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাটের গুপ্ত মণি ভাণ্ডারেও সযত্নে রক্ষিত আছে কিনা তদ্বিষয়ে প্রকাশ্য বা গোপন সংবাদও আমরা কেহ কোনদিন পাই নাই। তবে কি এই বস্তুটির অস্তিত্ব কেবল শব্দ মাত্রেই পর্য্যবসিত? অথবা ভূগর্ভ বা সমুদ্রগর্ভবিহারী প্রত্নতত্ত্ববিদের শতাব্দী-ব্যাপী অক্লান্ত গবেষণার অন্তর্গত? আমরা একটি গানে শুনিয়াছিলাম,—

দেশহিতব্রত এ পরশমণি,
পরশিবে যারে বারেক যখনি,
রাজভয় আর কারাভয় তার
ঘুচিবে তাহারি তখনি জেনো।

তাহা হইলে পরশমণি কি একটী কাল্পনিক বস্তু যাহা কবি বা সাহিত্যিকের প্রয়োজন মত কোন বিশেষ গুণ, ভাব বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষের উপর সাময়িকভাবে আরোপিত হইয়া থাকে? আমরা এই বস্তুটির প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার জন্য বহু প্রবীণ সংবাদপত্র-সম্পাদক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, রাজকর্ম্মচারী, মণিকার এমন কি অঘটন-ঘটনপটিয়সী মহামহিম গুপ্তচরগণেরও দ্বারস্থ হইয়াছি কিন্তু এযাবৎ কেহই এবিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ কোন সন্ধান বা আলোক প্রদান করিতে পারেন নাই।

অবশেষে একান্ত হতাশ হইয়া যখন তথাকথিত শৃগালের আঙ্গুর ফলকে অম্লরসদুষ্ট সাব্যস্ত করার ন্যায় এই বস্তুটিকে অলীক আকাশকুসুমবৎ বা নিশার স্বপন সম স্থির করিয়া অন্য কোন সত্যফলপ্রসূ গবেষণায় মনোনিবেশ করিবার সঙ্কল্প করিতেছি এমন সময় সহসা বিশ্বস্তসূত্রে কোন প্রবীণ ঐতিহ্যমুখে যে উপাদেয় বিবরণটি প্রাপ্ত

হইলাম, তাহাতে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া একাকী উপভোগ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। 'উদারচরিতানাম্ভ বসুধৈব কুটুম্বকম্' এই নীতি বাক্য স্মরণ করিয়া আপনা-দিগকেও তাহার অংশ দিতে অভিলাষী হইয়াছি। আশা করি এ বিষয়ে আপনাদের অরুচি লক্ষিত হইবে না।

বাংলা দেশে বৰ্দ্ধমান জেলায় মানকর নামক গ্রামে শ্রীজীবন মিশ্র নামে এক দরিদ্র বিপ্র বাস করিতেন। বহু চেষ্টায় ও কোন রকমে দুইটি দিকের সামঞ্জস্য বিধান করিতে না পারিয়া অবশেষে তিনি দেবাদিদেব আশুতোষের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘ তিনটী দিবস-যামিনী অনাহারে অনিদ্রায় যাপন করিবার পর ব্রাহ্মণ ক্লান্তিবশে কিয়ৎকাল তন্দ্রাবিষ্ট হইলে শ্রীমন্মহাদেব স্বপ্ন-যোগে বিপ্র সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, তোমার অভিপ্রায় কি? ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে মিনতি করিয়া বলিলেন, কৃপা করিয়া বিষম দারিদ্র্য-দুঃখ হইতে আমাকে চিরতরে পরিত্রাণ করুন। জীব-দুঃখ কাতর করুণানিধি ভোলানাথ ব্রাহ্মণের প্রতি অশেষ কৃপা-পরবশ হইয়া চিন্তামণিময়ী ব্রজভূমিবাসী শ্রীসনাতন গোস্বামীর সন্নিধানে গমন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে; এই প্রকার আদেশ প্রদান করিলেন।

ব্রাহ্মণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া অবিলম্বে ব্রজধামোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বহু আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সুদীর্ঘ পথক্লেশ নীরবে সহ্য করিয়া জীবন বিপ্র অবশেষে বৃন্দাবনে মহাবৈরাগ্যবান নিষ্কিঞ্চন পরমহংস শ্রীল সনাতন গোস্বামীর চরণ-প্রান্তে উপনীত হইলেন, এবং প্রণত হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। শ্রীল সনাতন বলিলেন, আমি বৃক্ষতলবাসী ভিক্ষামাত্রোপজীবি কৌপীনধারী সন্ন্যাসী। তোমার দারিদ্র্যমোচন হইতে পারে এরূপ অর্থ আমি কোথায় পাইব? একান্ত ভ্রান্তিবশতঃই তুমি আমার নিকট আসিয়াছ, এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে ভাবিলেন, আমার দুরদৃষ্ট-বশতঃ স্বয়ং আশুতোষও আমাকে প্রতারিত করিলেন। আমার এই ধিক্‌কৃত ব্যর্থ জীবন বহন করিয়া আর ফল কি? অদ্য সকলের অলক্ষ্যে যমুনা-গর্ভে প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিব। এইরূপ চিন্তা সাগরে ব্রাহ্মণ নিমগ্ন এমন সময় শ্রীল সনাতন গোস্বামীর স্মৃতিপথে কয়েক মাস পূর্বের একটি ঘটনার কথা সহসা উদিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যাত ব্রাহ্মণের পশ্চাদনুসরণ করিয়া যমুনাতটে কোনস্থানে তাহাকে দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন, ব্রাহ্মণ, মহাদেব প্রতারণা করেন নাই—আমারই ভ্রম হইয়াছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে একদিন যমুনায় স্নান করিতে গিয়া আমি একটি পরশমণি পাইয়াছিলাম, তৎকালে তাহা অনাবশ্যক বোধে যমুনাতটে বালুকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। চল ব্রাহ্মণ, তদনুসন্ধান করিয়া সেই বস্তুটি তোমাকে দান করিব। তাহা প্রাপ্ত হইলে তোমার দারিদ্র্যদাবদাহ চিরতরে নির্বাপিত হইবে। এই বলিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে যথাস্থানে মণিটী প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহা বিপ্রকে প্রদান করিয়া স্ব-স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, বস্তুটি প্রকৃতই পরশমণি বটে। স্পর্শমাত্রে লৌহকেও সুবর্ণে পরিণত করিতে এই মণিটি যথার্থ ই সক্ষম। ব্রাহ্মণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কল্পনাবলে বহু ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া মনে মনে স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। সহসা এক নূতন চিন্তা আসিয়া তাঁহার উদ্দাম কল্পনা-স্রোতে বাধা দান করিল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, জগদ্দুর্লভ যে বস্তুটি প্রাপ্ত হইয়া আমি আজ আনন্দসাগরে ভাসমান, কি আশ্চর্য্য! এই ছিন্নকন্থাধারী ভিক্ষামাত্রোপজীবি তরুতলবাসী সন্ন্যাসী সেই বস্তুটির মাহাত্ম্য সম্যক অবগত থাকিয়াও কিরূপে তাহা লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন? কে এ মহাপুরুষ?—পরশমণি যাঁহার কাছে এত তুচ্ছ—এত হেয়!! নদীতীরে বালুকা-মধ্যে প্রোথিত করিয়া আসিয়াছেন অথচ কথাটা স্বচ্ছন্দে বিস্মৃত হইয়াছেন! পরশমণির কল্যাণে পৃথিবীর সাম্রাজ্য সহজেই করতলগত হইতে পারে। কি অদ্ভুত কথা!!—নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী এমন কোন মহারত্নের মালিক যাঁহার কাছে

পৃথিবীর সাম্রাজ্য—স্বর্গরাজ্যের আধিপত্যও নিতান্ত নগণ্য। আমি যদি তাঁহার শরণাগত হই, তিনি কৃপা করিয়া সেই মহারত্নটির সন্ধান আমাকে দিলেও দিতে পারেন। এইরূপ চিন্তায় বিহ্বল হইয়া ব্রাহ্মণ শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীচরণপ্রান্তে পুনরায় উপনীত হইলেন। দেখিলেন গোস্বামীর প্রশান্ত বদনমণ্ডল কৃষ্ণনাম গানে প্রেমানন্দে অত্যুজ্জ্বল। অবসর বুঝিয়া ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর পদযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া অতীব মিনতি সহকারে নিবেদন করিলেন, প্রভো! যে মহাধনে ধনী হইয়া আপনি পরশমণিকে লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন আমার প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া সেই মহাধনের কিয়দংশ আমাকে প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন। ব্রাহ্মণের আর্ত্তি দেখিয়া গোস্বামীর হৃদয় দ্রবীভূত হইল তিনি কৃপা করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'যদি প্রকৃতই সেই মহারত্ন লাভ করিতে তোমার আগ্রহ জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে যে পরশমণিটি তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ তৎপ্রতি আর কিছুমাত্র আসক্তি না রাখিয়া অবিলম্বে তাহা যমুনার গভীর জলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া আইস'। ব্রাহ্মণ অবিচলিত চিত্তে আদেশ পালন করিলেন। শ্রীল সনাতন উপযুক্ত ক্ষেত্র বুঝিয়া ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া সর্ববিধ জাগতিক দুঃখ হইতে চিরতরে পরিত্রাণ পাইলেন।

এই উপাখ্যানটি শ্রবণ করিয়া আমরা কিছু সার সংগ্রহ করিতে পারিলাম কি? জীবন বিপ্র সত্য সত্যই পরশমণি প্রাপ্ত হইয়াও তাহা ত্যাগ করিলেন কেন? প্রকৃতই তিনি তদপেক্ষা অধিকতর লাভবান হইলেন না ইহা তাঁহার বিকৃত মস্তিষ্কের ফল? আমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বিষয়টি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিব যে জীবন বিপ্র প্রকৃত বুদ্ধিমানেরই কার্য্য করিয়াছেন। যেহেতু জীবন জড়-জগতের আর্থিক কষ্ট নিবারণ করিতে পারে, জন্ম-মৃত্যু, জরা, রোগ-শোক ও ইহকাল বা পরকালের উপর তাহার হাত নাই। পরশমণি কোনও ব্যক্তিবিশেষের অধিকারে যাবজ্জীবন থাকিবে এরূপ নিশ্চয়তা নাই—দস্যুতস্কর বা অপর বলবান ব্যক্তিকর্ত্তৃক যে কোন সময়ে অপহৃত হইতে পারে। সুতরাং তাহা দ্বারা আমাদের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা চিরপ্রসিদ্ধ স্যমন্তকমণির উপাখ্যান স্মরণ করিতে পারি। এই সকল কথা বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াই জীবন বিপ্র নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীচরণযুগলে প্রপন্ন হইয়াছিলেন। তদ্দ্বারা সাধু-গুরুর কৃপায় তাঁহার স্বরূপোদ্বোধন ক্রমে নিত্য কৃষ্ণদাস্যে অবস্থিত হইয়া পরাশান্তি—পরানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত সাধুসঙ্গ সুবর্ণপ্রসূ পরশমণি অপেক্ষা লক্ষ কোটি গুণে অধিক বরণীয়।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

—০—

ফল্গু ও যুক্ত বৈরাগ্য

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্যে তাৎকালিক-সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত—শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাকে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি বলিয়া সম্মান দান করিয়াছিলেন সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রবাসী সর্ব্বজনমান্য শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব কথঞ্চিৎ অবগত হইয়া ভয়ে ভয়ে—অতি সন্তর্পণে গুপ্তভাবে প্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল ঠাকুর জগদানন্দের হস্তে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণোদ্দেশে যে দুইটি শ্লোকরত্ন উপহার পাঠাইয়াছিলেন তাহার প্রথম শ্লোকটি এই ;—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষার্থ-মেকঃ
পুরুষঃপুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

অর্থাৎ—বৈরাগ্য, বিদ্যা এবং নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য দয়ার মহাসমুদ্রতুল্য একমাত্র সনাতন পুরুষ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কলেবরে প্রকট হইয়াছেন ; তাঁহার চরণে আমি প্রপন্ন হই।

বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু বিরক্ত-প্রধান শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

মহাপ্রভুর ভক্তগনের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হন গৌর ভগবান॥

এই সকল বাক্য দ্বারা আমরা জানিতে পারি, ভোগ-মূলা পৃথিবীতে যাবতীয় ভোগ্যবস্তু গ্রহণে বিরত হইয়া ত্যাগের পন্থা বা বৈরাগ্য অবলম্বন করাই শ্রেয়া লাভের প্রধান উপায়। সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি লোকশিক্ষকগণ মোহ-মুদ্গার, বৈরাগ্যশতক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা বিষয়াসক্তি পরিহার পূর্ব্বক ত্যাগ-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য বিষয় বিষ্ঠা-গর্ত্তে নিপতিত ভোগী মানবগণকে শিক্ষা দিতেছেন। অন্যের কি কথা স্বয়ং ভগবান অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের প্রধান লক্ষণ যে বৈরাগ্য তাহা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগ্রন্থ-প্রণেতৃগণ পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে অমনোযোগী অজ্ঞগণ প্রাচীনকালের ঋষি মুনিগণও ত্যাগের জলন্ত নিদর্শন ছিলেন, যাবতীয় বিষয়ভোগে বিরত, অনুক্ষণ তপশ্চর্য্যা, সাধারণের হিত-চিন্তা বা ভগবদালোচনায় রত, গভীর অরণ্য বা গিরিগুহাবাসী ফলমূলজলাহারী বা ভিক্ষো-পজীবি মানবগণকেই আমরা সাধুপুরুষ বলিয়া জানি। কিন্তু আজকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত পরিচয়াকাঙ্ক্ষী একদল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আচরন ভিন্নপ্রকার দেখা যায়। ইঁহারা মৎস্য, মাংস, পান, তামাক, চা, চুরুট, তাস, পাশা, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি কয়েকটী সাধারণ ভোগোপকরণ—বোধ হয় অল্পবুদ্ধিজীবি ব্যক্তিদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত বর্জ্জন করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় ভোগোপকরণ যথা রেল, ষ্টীমার, ইলেক্ট্রিকফ্যান, লাইট, মোটরগাড়ী, সাইকেল, ছাপাখানা, সংবাদপত্র, মঠ, মন্দিরের নামে বড় বড় ইষ্টকালয়, জামা, জুতা, ঘড়ি, ছাতা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, দই, সন্দেশ, মালপো, রাবড়ী—হরিসেবার নাম দিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বচ্ছন্দে উপভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের বৈষ্ণবতা কিরূপ—এ বৈরাগ্য না আর কিছু—ইহাতে গৌর ভগবান কি রূপেই বা প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন ?

এইপ্রকার প্রশ্ন দূরদর্শনরহিত অবিমৃষ্যকারী হঠাৎ-ভক্ত বা সেকেলে অবিচারকে ধর্ম্ম বলিয়া অনুমানকারি মনোধর্ম্মোত্থ ভোগবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন তখন যেখানে সেখানে শুনিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ আমাদের ন্যায় মনোধর্ম্মী ভোগবাদীকুলকে ভীষণতম বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত রাখিবার জন্য শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বৈরাগ্য কাহাকে বলে তাহা সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়া উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীল গোস্বামিপাদের শ্রীচরণে প্রণত হইয়া তদ্বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার কৃপায় আমরা অবগত হইতে পারি যে, বৈরাগ্য দুই প্রকার ; (১) ফল্গু বৈরাগ্য, (২) যুক্ত বৈরাগ্য। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ত্রিবিধ ত্যাগের বিষয় কথিত হয়। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। তন্মধ্যে রাজস ও তামস ত্যাগ ফল্গু বৈরাগ্যের অন্তর্গত। ইহাদের লক্ষণ নিম্নে বর্ণিত হইল,—

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

ভাবার্থ এই, নিত্যকর্ম্মের সন্ন্যাস সম্ভব নয়। ভ্রমবশতঃ যাঁহারা নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ত্যাগ তামস ত্যাগ।

দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥

ভাবার্থ এই, নিত্যকর্ম্মকে ক্লেশকর জানিয়া ভয়ে যিনি তাহা ত্যাগ করেন তাঁহার ত্যাগ রাজস ; তিনি ত্যাগফল প্রাপ্ত হন না। এই প্রকার ত্যাগ ফল্গু অর্থাৎ হেয় বা তুচ্ছ।

প্রকৃত ত্যাগ কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি—

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥

অর্থাৎ দেহধারী জীবের সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ সম্ভব নয়। যিনি সমস্ত কর্ম্ম-ফলত্যাগী তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥

অর্থাৎ, যিনি কর্ত্তব্যবোধে নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন এবং সেই কর্ম্মের আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগ সাত্ত্বিক।

শ্রীল রূপপাদ বলেন,—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি সেবার যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

তাৎপর্য্য এই, সংসারের যাবতীয় বস্তুই শ্রীহরির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভোক্তা, প্রত্যেক বস্তু তাঁহার ভোগ্য। জীব মাত্রেই নিত্য কৃষ্ণদাস। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা অনুকূল প্রতিকূল বিচারে প্রতিকূল বর্জ্জন করিয়া অনুকূল বস্তুসমূহ দক্ষতা সহকারে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করাই কৃষ্ণদাস জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু মোক্ষকামী জ্ঞানিগণ প্রাপঞ্চিক বা মায়াময় অলীক জ্ঞানে এই সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া যে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন তাহাই ফল্গু বা শুষ্ক বৈরাগ্য।

ফল্গু বৈরাগীর মন সদা শুষ্ক রসহীন।
নাম রূপ গুণ লীলা না হয় সমীচীন॥

যুক্ত বৈরাগ্যের সংজ্ঞা শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয় সমূহ সকলি মাধব।

তাৎপর্য্য, এই সম্বন্ধ জ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করার নাম যুক্ত বৈরাগ্য। সদ্গুরু কৃপায় জীবের আত্ম-স্বরূপোপলব্ধিক্রমে যখন—

"মানস দেহ গেহ যা কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দ কিশোর॥
আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই॥
ধন জন গৃহ দ্বার তোমার বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া॥
তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসার ব্যয় করিব বহন॥
ভাল মন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী॥

এইপ্রকার ভাব স্ব-ভাবে পরিণত হয় তখন অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবা ছাড়া অন্য কোন কৃত্য থাকে না।

'যথা যোগ্য'—কথাটির অর্থ বুঝিতে ভুল না হয় তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ ঠাকুর আমাদিগকে নিম্নলিখিত পদ্য দ্বারা সাবধান করিয়া দিয়াছেন,—

যথাযোগ্য এই শব্দ দুইটীর মর্ম্মার্থ বুঝেলহ।
কপটার্থ লঞা যেন দেহারামী না হ'॥
শুদ্ধভক্তির অনুকূল কর অঙ্গীকার।
শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার॥
দেহযাত্রার উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজন।
বিষয়স্বীকার করি কর দেহের রক্ষণ॥

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের চরিত্র আলোচনা করিলে বিষয়টি আমাদের নিকট আরও স্পষ্টীকৃত হইতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে আমরা বাহ্য দৃষ্টিতে দ্বিবিধ আচারবান চরিত্রাদর্শ লক্ষ্য করিয়া থাকি। একদিকে ঠাকুর হরিদাস, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী অপরদিকে শ্রীবাস আচার্য্য, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরায় রামানন্দ। সকলেরই অতুলনীয় বৈরাগ্য। ঠাকুর হরিদাস ক্ষুদ্র নির্জ্জন গোফায় বাস করিতেন, দিবারাত্রিতে তিন লক্ষ নাম জপ ও কীর্ত্তন করিতেন। ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে,—

রাত্রিদিন করে তেঁহো নাম সংকীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ ॥
পরম বৈরাগ্য তাঁর, নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ ॥
দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহ দ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া ॥
কেহ যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস, কভু করয়ে চর্বণ ॥

* * *

অনন্ত রঘুনাথের গুণ কে করিবে লেখা ?
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা ॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন স্মরণে।
সবে চারিদণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে ॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥
ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনা না পরেন বসন ॥

আরও দেখিতে পাই—

প্রসাদান্ন পসারির যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি' যায় ॥
সিংহ দ্বারে গাভী-আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া-গন্ধে তৈলঙ্গী-গাই খাইতে না পারে ॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি ॥
ভিতরেতে দড় ভাত মাজি' যেই পায়।
লবণ দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায় ॥

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বৃক্ষতলে বাস, তাহাও আবার প্রত্যহ একই বৃক্ষের তলদেশে শয়ন করেন না—'এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন' করিয়া নিশাযাপন করেন। 'বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা, কভু মাধুকরী', শুষ্ক রুটি শুষ্ক ছোলা মাত্র চর্বণ করিয়া জীবন ধারণ করেন। হাতে করোঁয়া, ছিন্ন কাঁথা বহির্বাস সম্বল। অষ্টপ্রহর 'কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন উল্লাস।' ভোজন শয়নাদিতে চারি দণ্ড কাল মাত্র ব্যয়িত হয় তাহাও কোন কোন দিনে অবসর হয় না।

অন্যদিকে শ্রীবাস আচার্য্যের গার্হস্থ্য-লীলাভিনয়ের মধ্যে শ্রীভগবানের অনন্য ভক্তের যোগ-ক্ষেম বহনের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্য শ্রীবাস বহু-পরিবারযুক্ত, অথচ জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য কাহারও দ্বারস্থ হইতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহার দৃঢ় ধারণা, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা কোন না কোন রকমে মিলিবেই। তাঁহার প্রতিজ্ঞা —তিন উপবাস দিয়াও যদি অন্ন না পাওয়া যায় তাহা হইলে গলায় দড়ি দিয়া গঙ্গা গর্ভে প্রবেশ করিবেন তথাপি কাহারও বাড়ী ভিক্ষা করিতে যাইবেন না। এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, লক্ষ্মীদেবী কোন দিন হয়ত ভিক্ষা করিতে পারেন শ্রীবাসের ঘরে কোনদিন দারিদ্র্য উপস্থিত হইবে না। গীতার প্রতিজ্ঞা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"যে যে জনে চিন্তে' মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভক্ষ্য দেঙ মুঞি মাথায় বহিয়া ॥
যেই মোরে চিন্তে', নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্বসিদ্ধি মিলি তারে ॥"

আজন্ম-বিরক্ত পণ্ডিত গদাধর প্রিয় অনুচর মুকুন্দ দত্ত সমভিব্যাহারে 'অদ্ভুত বৈষ্ণব' পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি সন্দর্শনে চলিলেন। গিয়া দেখিলেন বিদ্যানিধি, রাজপুত্রের ন্যায় হিঙ্গুল-পিত্তল মণ্ডিত বিচিত্র পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট। উপরে ঝালর-মণ্ডিত দিব্য চন্দ্রাতপ—অতি সূক্ষ্ম বসনাবৃত কোমল শয্যা—চারি পার্শ্বে বৃহদায়তন কারুকার্য্য শোভিত উপাধান—ছোট বড় পাঁচ সাতটি ঝারি—সুরম্য ক্ষুদ্র পেটিকায় নানাবিধ তাম্বুলোপকরণ—তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত অধরে মৃদু মধুর হাস্য—দুইজন ভৃত্য ময়ূরের পাখা লইয়া সর্বক্ষণ ব্যজনে নিযুক্ত—ললাটে সুগন্ধি চন্দনের উর্দ্ধপুণ্ড্র—তাহাতে সুবাসিত ফাগু-বিন্দু দিব্যগন্ধ আমলকী দ্বারা সুসংস্কৃত চিকুর দাম—গদাধরের বিস্ময়ের অবধি নাই। মনে মনে ভাবিলেন, বেশ ত' বৈষ্ণব দেখিতে আসিলাম —ইহার কথা শুনিয়া যেটুকু ভক্তি জন্মিয়াছিল ইহাকে দেখিয়া তাহা লুপ্ত হইল। সুকণ্ঠ গায়ক মুকুন্দ গদাধরের অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া ভক্তিমহিমাসূচক ভাগবতের দুইটি শ্লোক মধুর স্বরে আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া

বিদ্যানিধি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নয়নে অপূর্ব্ব আনন্দধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, যেন গঙ্গাদেবী স্বয়ং অবতীর্ণা হইলেন। ক্রমে কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব পূর্ণরূপে উদিত হইলেন। আবার বল, আবার বল বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন—শেষে আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি। ইতস্ততঃ বিন্যস্ত বিলাস সম্ভার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া খণ্ড খণ্ড হইল—বহুমূল্য বসন ভূষণ ছিন্ন ভিন্ন হইল, পদাঘাতে দিব্য শয্যা ধূলায় ধূসরিত হইল। 'কোথা কৃষ্ণ—প্রাণের ঠাকুর কোথায় তুমি' 'তোমার এমন দয়ার অবতারে কেবল আমিই বঞ্চিত হইলাম, বলিয়া কাতর স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতে লাগিলেন—কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না—এক একবার মনে হয় অস্থিগুলি চূর্ণ হইয়া গেল। কতক্ষণ এইভাবে অতীত হইবার পর আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন—দেহে প্রাণ আছে বলিয়া মনে হয় না। এইরূপে প্রায় দুই প্রহর অন্তে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া বিদ্যানিধি উঠিয়া বসিলেন। গদাধর অনুতপ্ত হইয়া পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে বিদ্যানিধির শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ প্রিয় পার্ষদ রায় রামানন্দ—বহুমূল্য কারুকার্য্যখচিত শিবিকারোহণে গোদাবরী স্নান করিতে আসিলেন, সঙ্গে বহু লোকজন দাস-দাসী বাদ্যভাণ্ড ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই। মহাপ্রভু দেখিয়া চিনিলেন ইনি রায় রামানন্দ। রায় দেখিলেন, অসাধারণ তেজঃপুঞ্জ কলেবর অপরূপ সন্ন্যাসী, দেখিয়া সম্মুখে আসিয়া সম্ভ্রমে নমস্কার করিলেন। প্রভু বক্ষে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। অবশেষে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রায়ের মুখে প্রেমভক্তির চরম তত্ত্ব কথা শ্রবণ করিলেন। রায়ের চরিত্রে দেখিতে পাই তিনি স্ব-রচিত 'জগন্নাথ-বল্লভ' নাটক শ্রীজগন্নাথ সম্মুখে অভিনয় করাইবার জন্য দুইজন সুন্দরী তরুণী দেবদাসীকে নিভৃতে লইয়া হাব-ভাব-অভিনয়-কলা-কৌশল নৃত্য গীত শিক্ষা দিতেছেন। স্বহস্তে তাহাদিগকে স্নান করাইয়া বসন ভূষণ পরাইতেছেন, তাহাদের যত গুহ্য-অঙ্গ দর্শন স্পর্শন করিতেছেন তথাপি তাঁহার মন পাষাণসম নির্ব্বিকার। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন, এক 'রামানন্দের হয় এই অধিকার।' তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত। তাঁহার মনের ভাব তিনি ব্যতীত অপরে বুঝিতে পারে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহই নাই। রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস-জ্ঞানের তুমি সীমা।

এইসব মহৎ চরিত্র আলোচনা করিয়া আমরা কি বুঝিব? শ্রীসনাতন গোস্বামীর বৈরাগ্য শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক অথবা শ্রীদাস-গোস্বামীর বৈরাগ্য শ্রীরায় রামানন্দ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অপকৃষ্ট?—এইরূপ চিন্তা করিতে গেলে আমরা ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হইয়া চিরতরে নিরয়-গামী হইব। এইসব মহাপুরুষের চরিত্র-নিহিত শিক্ষা অনুসরণ না করিয়া যদি অনুকরণ করিতে যাই তাহা হইলেই আমাদের সর্বনাশ।

জিজ্ঞাসু হইয়া এইসকল কথা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে অভিন্ন ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় প্রকৃত সাধুকে এবং বৈরাগ্য কাহাকে বলে তাহা যথাকালে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব।

——::•::——

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ

পুরাকালে কর্ম্মকাণ্ডীয় বিপ্রগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের উদ্দেশ্যে স্বার্থপর হইয়া যজ্ঞাদিতে পশুবধ করিতেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল, যখন শাস্ত্রে পশুবধের বিধি আছে, তখন পশুবধকে কখনই অন্যায় বা পাপকর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান কালেও অনেকের ধারণা তদ্রূপ। শাস্ত্রে পশুবধের বিধান আছে সত্য কিন্তু এ প্রকার বিধান কেন হইয়াছে, ইহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য! প্রথম মুখে দেওয়া উচিত শাস্ত্রকারগণ নিশ্চয়ই নিষ্ঠুর

ছিলেন না। তাঁহারা সর্বত্র সমদর্শন করিতেন, তাঁহাদের শাস্ত্রপ্রণয়ন জীবের হিতের নিমিত্ত, সুতরাং তাঁহারা যজ্ঞাদিতে পশুহিংসার বিধান করিয়া কখনই নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দেন নাই। এখন দেখা যাউক ঐ প্রকার বিধির তাৎপর্য্য কি? বেদার্থ-তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, মায়াবদ্ধ জীবের স্ত্রীসঙ্গ, মদ্যসেবা, পশুহিংসা দ্বারা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার পিপাসা স্বভাবতঃই আছে, সুতরাং ঐসকল প্রবর্ত্তনের জন্য শাস্ত্রবিধির অপেক্ষা নাই, শাস্ত্রে উহাদের ঐসকল প্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিবার জন্য যথেচ্ছাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈধ স্ত্রীসঙ্গ, বিশেষ বিশেষ যজ্ঞে পশু-হনন এবং সুরার আঘ্রাণ বিহিত হইয়াছে। এখন দেখুন, আমাদের স্বাভাবিক হিংসাপ্রবৃত্তি সংকোচ করাই শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য কিন্তু আমাদের পক্ষে শাস্ত্রকারদিগের বচন 'উল্টা বুঝ্‌লি রাম' হইয়া গেল। আমরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণের সুযোগ করিয়া লইলাম।

ত্রেতাযুগের যুগধর্ম ছিল যজ্ঞ। তৎকালে অশ্বমেধ ও গোমেধ যজ্ঞ দ্বারা ভগবদারাধনা হইত। ঋষিগণ তৎকালে এতদূর প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন যে, যজ্ঞপশু হনন করিয়া আবার তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে কলিযুগ। এখনকার যুগধর্ম একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তন, তাহাতে আবার আমরা ধর্মচ্যুত কদাচারী সামর্থ্যহীন, আমাদের যুগধর্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা, যোগাদির চেষ্টা তথা পূর্ব ঋষিগণের অনুকরণ-চেষ্টা কতদূর সমীচীন তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এইপ্রকার হিংসা-ধর্ম্মরত জীবগণকে তাদৃশ আচরণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে ভগবৎ শক্ত্যাবেশাবতার বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়া বেদোক্ত "মা হিংসাৎ সর্বাণি ভূতানি" ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে তদধস্তনগণ বুদ্ধের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বেদবিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক, বুদ্ধদেব-প্রচারিত উপরি-উক্ত বেদবাক্যটির যথার্থ অর্থ শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্।
ফল্গূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্॥

অর্থাৎ এই হিংসাময় সংসারে জীবমাত্রেই পরস্পর হিংসাধর্মে অবস্থিত। কালকর্ম গুণাধীন বলিয়া হস্তরহিত পশুসকল হস্তযুক্ত মানবগণের হিংসার যোগ্য। পদরহিত তৃণসমূহ চতুষ্পদ পশুর ভক্ষ্য। ক্ষুদ্র জীবকে হিংসা করিয়াই মহজ্জীব বাঁচিয়া থাকে। হিংসা ব্যতীত পৃথিবীতে কাহারও জীবিত থাকিবার উপায় নাই। হিংসাধর্মে অবস্থিত জীবগণ পরস্পর কলহ, মারামারি, কাটাকাটি করিয়াই জীবনটি কাটাইয়া দেয়। কিন্তু হরিসেবায় অবস্থিত হইলেই জীবের হিংসাধর্ম হইতে মুক্তি হয়, অন্য কোন চেষ্টা দ্বারা হিংসা হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। যাঁহারা জৈনদিগের অনুগমনে নিরামিষভোজী অহিংসক বলিয়া নিজদিগকে মনে করেন, তাহারাও বস্তুতঃ হিংসাধর্ম হইতে উদ্ধার পান নাই। ভগবৎসেবাই 'অহিংসা পরম ধর্মের' একমাত্র লক্ষ্য বস্তু।

—০—

আচার ও প্রচার

আজকাল অনেকের ধারণা, ভজন সাধন নির্জ্জনেই ভাল, প্রচার করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু এরূপ বিচার ভজন বিষয়ে অনভিজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। বস্তুতঃ প্রচারই ভজন, ইহাই শাস্ত্রের একমাত্র উপদেশ। আবার আচারবান্ ব্যক্তিই প্রচার করিতে সমর্থ, আচার-বিহীন জন লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য শুকপক্ষীর ন্যায় শাস্ত্রের কয়েকটা কথা কপচাইয়া ধর্ম-প্রচারের অনুকরণ করিয়া থাকে তাহা অবশ্যই নিন্দার্হ। আমরা কখন এরূপ কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা লোলুপ ব্যক্তির এতাদৃশ আচরণের প্রশংসা করি না। আবার আনুকরণিক সম্প্রদায়ের

আচরণ দেখিয়া সত্যের অনুসন্ধানে বিরত হইতেও বলি না। আচার প্রচার এই দুইটিই পরস্পর সংশ্লিষ্ট। আচারবান্ পুরুষের আদর্শ দেখিয়া অন্য ব্যক্তি যে তাহার অনুগমন করেন তাহাই আচার্য্যের প্রচার। শাস্ত্র কি বলিতেছে শুনুন—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অতি প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"হে অর্জ্জুন, যাঁহারা আমাতে একান্ত আসক্তচিত্ত আমি যাঁহাদের প্রাণ তাঁদের কৃত্য শুন। তাঁহারা আমার নাম, রূপ ও লাবণ্যাদি অপরের নিকট কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে অপ্রাকৃত জ্ঞানের সঞ্চার করাইয়া থাকেন। এবম্বিধ ভক্তগণ সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সাধ্যাবস্থায় প্রেমানন্দ প্রাপ্ত হন। আমি খুব ভক্ত, প্রচার কার্য্য দ্বারা আমার ভজন নষ্ট হইবে, এইরূপ উৎকট ভক্তাভিমান কখনই ভাল বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব-দাস আমরা তৃণাদপি সুনীচ সুতরাং শাস্ত্র, সাধু ও গুরু-বাক্য লঙ্ঘন করিয়া হৃদয়ে উৎকট অভিমান পোষণ পূর্ব্বক কপটতার আশ্রয়ে নরকগামী হইবার পরিবর্ত্তে আনুগত্য ধর্মই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশটি একবার বিচার করুন।

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ।

* * *

প্রচারই ভজন আবার যাহারা কৃষ্ণৈকচিত্ত কৃষ্ণগত প্রাণ তাহারাই প্রচারক হইবার যোগ্য। আচারবিহীন প্রচার যেমন দৌরাত্ম্যবিশেষ-নির্জ্জন, ভজনপ্রয়াসও তদ্রূপ। নির্জ্জনভজন-প্রয়াস এবং আচারশূন্য প্রচারচেষ্টা—এই দুই প্রকার প্রাকৃত চেষ্টায় উদাসীন হইয়া কৃষ্ণৈক-শরণ হইলেই এইসকল কথা আমাদের হৃদয়ে স্বতঃ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে।

মৌনী কে ?

সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতম শ্রীবারাণসী পুরীতে অবস্থানকালে একদিন প্রাতে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিতে গিয়া একটি বিষয় আমার চিত্তকে বড়ই কৌতুহলাক্রান্ত করিল। কৌতুহলের বিষয়—একটি ভস্মমাখা জটাজুটধারী হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখে ধুনী জ্বালিয়া উপবিষ্ট। দুইপার্শ্বে দুইটি করিয়া চারিটি চেলা। সন্ন্যাসীর চতুর্দ্দিকে প্রায় দশ বার জন দর্শক দাঁড়াইয়া আছে, সন্ন্যাসীর ক্রিয়ামুদ্রা দর্শন করিতেছে। সন্ন্যাসীর এক চেলার নিকট তাহার বিশেষত্ব শুনিলাম, তিনি সম্প্রতি নাকি বদরীক্ষেত্র ব্যাসাশ্রম হইতে আসিতেছেন। খুব জ্ঞানী। প্রায় বিংশতিবর্ষ যাবৎ নাকি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন ইত্যাদি। মৌন-ব্রতীর কার্য্যাবলী দেখিয়া একটু দুঃখও হইল, হাসিও পাইল। দেখিলাম, দর্শক মণ্ডলীর কেহ বলিতেছেন, সাধুবাবা, আমার পুত্র বর্ষাবধি আমাশয় রোগে কষ্ট পাইতেছে, তাহাকে একটু ঔষধ দাও, আর কেহ বলিতেছে—আমার এক মোকদ্দমা বাধিয়াছে, আশীর্ব্বাদ কর, সেই মোকদ্দমায় যেন জয় লাভ করিতে পারি ইত্যাদি। সন্ন্যাসী কথাটি মাত্র কহিতেছেন না বটে, কিন্তু মুখ সঞ্চালনাদি ইসারা দ্বারা সকলের কথারই জবাব দিতেছেন এবং সকলকেই একটু একটু ধুনীর ভস্ম দিয়া দিতেছেন। সন্ন্যাসী দর্শনের কৌতুহল নিবৃত্তি হইলে আমি গঙ্গা স্নান করিতে লাগিলাম, আর চিন্তা করিতে লাগিলাম, "হা ভগবান, তুমি আমাদিগকে যে সকল ইন্দ্রিয় ও তত্তদিন্দ্রি-য়োচিত বৃত্তি দান করিয়াছ, তাহার কোনটিই ত' নিরর্থক নহে। ইন্দ্রিয়াধিপতি তুমি সর্বেন্দ্রিয়ে তোমার

অনুশীলনই ত' আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামের সার্থকতা। যে ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে বলপূর্বক তোমার সেবা হইতে বিমুখ করা হইল, সে ইন্দ্রিয় ত' ভ্রষ্টাচারী হইল। চক্ষু দিয়াছ মুদ্রিত করিয়া রাখিবার জন্য নহে, তোমার শ্রীবিগ্রহ এবং তোমারই নিজজনগণের রূপ দর্শন করাই ত' চক্ষুর সদ্ব্যবহার, কর্ণ দিয়াছ বধির হইয়া থাকিবার জন্য নহে, কিন্তু তোমারই কথা শ্রবণই ত' কর্ণের সদ্ব্যবহার, নাসিকা দ্বারা তোমাতে অর্পিত নির্মাল্যের ঘ্রাণ গ্রহণ, জিহ্বা দ্বারা তোমার প্রসাদ আস্বাদন ও তোমার কথা কীর্ত্তন, ত্বক্ দ্বারা তোমার ভক্তের গাত্র স্পর্শ ই ত' নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের সদ্ব্যবহার, বাক্য তোমারই গুণ কীর্ত্তনে, হস্ত তোমারই পদ সেবায়, পদদ্বয় তোমারই বসতিস্থল পরিক্রমায়—সকল ইন্দ্রিয়ই ত' তোমার সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে। তবে কেন, মনুষ্যের এ দুর্বুদ্ধি। বাক্য দ্বারা তোমার কথা কীর্ত্তন করিয়া মনুষ্য নিজে উদ্ধার পাইতে পারেন, সহস্র সহস্র জীবকেও উদ্ধার করিতে পারেন। ইহাই ত' যথার্থ পরোপকার। যুগপৎ নিজ-মঙ্গল এবং অন্যের মঙ্গলবিধান—ইহা ত' তোমারই নাম সংকীর্ত্তনে হইতে পারে। আমি এইরূপ চিন্তাভারাক্রান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখি আমার পূর্বপরিচিত একজন ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী তিনজন ব্রহ্মচারীসহ উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগের সৌম্য শান্ত স্নিগ্ধ শ্রীমূর্তি অবলোকন করিয়া আমার হৃদয়ে বড়ই উৎসাহের সঞ্চার হইল। আমি তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি পূর্বক ত্রিদণ্ডিপ্রবরের পাদপ্রান্তে উপবেশন করিলাম। ত্রিদণ্ডিবর আমার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কহিলাম, প্রভো, "আপনার কৃপায় সকলই কুশল বটে, কিন্তু আজ আমি একটি বিষয় মীমাংসার জন্য বড়ই কৌতুহলাবিষ্ট হইয়াছি। আপনাদিগকে দেখিতে পাই আপনারা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু কতকগুলি সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাই তাহারা আদৌ কথা বলে না। ইহার কারণ কি ? মৌন-ব্রতের কথা কি শাস্ত্রে আছে ?

সন্ন্যাসীবর আমার কথায় প্রীত হইয়া কহিলেন, বড় উত্তম কথা। মৌনব্রত শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রান-ভিজ্ঞগণ তাহার যে অর্থ করে তাহা নহে। শাস্ত্রে কৃষ্ণেতর বাক্যবেগ দমন পূর্বক অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনকেই মৌন-ব্রত বলিয়া থাকে আমি আপনার নিকট শাস্ত্রোপদেশ কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবধানপূর্বক শ্রবণ করুন।

বাক্য দ্বিবিধ—পরব্যোমজাত শ্রৌত এবং ইতরব্যোম-জাত অশ্রৌত বাক্য। গুরুপারম্পর্য্যে শ্রুত সাক্ষাদ্ ভগবন্মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত বাক্য শ্রৌত এবং বদ্ধভূমিকায় অবস্থিত জীবের মনোধর্মোত্থ বাক্য অশ্রৌত। শ্রৌতবাক্য চিন্ময় ভূমিকা হইতে উত্থিত সাক্ষাৎ চিন্ময় বস্তু, পরন্তু অশ্রৌত বাক্য অচিদ্ ভূমিকা হইতে উত্থিত আবার তাহাতেই বিলীনযোগ্য অচেতন বস্তু। অশ্রৌত বাক্যই কৃষ্ণেতর বাক্যবেগ।

সেই বাক্যবেগ প্রধানতঃ ত্রিবিধ,—(১) কৃষ্ণেতর বিষয় ভোগাভিলাষীর যথেচ্ছ-ভোগপর-অনুভব-জন্য বাক্যাবলী, (২) কর্মকাণ্ডনিরত কর্মফলভোগবাদীর বাক্যাবলী ও (৩) শুষ্ক জ্ঞানকাণ্ডনিরত নির্ব্বিশেষবাদীর বাক্যাবলী।

(১) নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভোক্তৃতত্ত্ব—একমাত্র কৃষ্ণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু তাঁহারই অধীন বা কার্ষ্ণ তত্ত্ব। কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণ অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। কার্ষ্ণ জীব যখন অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা হইয়া আপনাতে কর্ত্তৃত্বারোপ পূর্বক এই সম্বন্ধজ্ঞান বিস্মৃত হন তখনই তাঁহার কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণ বস্তুতে ভোগবুদ্ধি উদিত হয়। সেই ভোগ-বুদ্ধিই মায়া বা কৃষ্ণেতর বিষয়। তৎসম্বন্ধিনী কথাই কৃষ্ণেতর বাক্যবেগ।

(২) কর্ম দুই প্রকার। যে কর্ম কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত—তাহা সেই বা ভক্তি বলিয়া অভিহিত এবং যাহা তদ্বিপরীত উদ্দেশ্যে স্বসুখ কামনামূলে অনুষ্ঠিত, তাহাই কাম্য কর্ম। এই কাম্যকর্ম্মিগণের যাবতীয় চেষ্টাই অন্যাভিলাষিতা যুক্ত। কাম্যকর্ম্মের নিত্যতা নাই। কর্ম্মী কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই কর্ম আরম্ভ করেন, উদ্দেশ্য সফল হইয়া গেলে অথবা বিফল হইলেও সেই

আরব্ধ কর্মের পুনরনুষ্ঠান জন্য তাঁহার তাদৃশ প্রয়োজনীয়তা বোধ থাকে না।

সুতরাং কর্মের যখন নিত্যতা নাই, তখন তাহার ফলেরই বা নিত্যতা কোথায়? তাঁহারা তাঁহাদের পুণ্য বা পাপকর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গ বা নরকাদি যে সকলে ফলভোগ লাভ করেন, পাপ বা পুণ্যক্ষয়ে আবার তাঁহাদিগকে সে সকল স্থান ছাড়িয়া পুনর্ম্মর্ত্যলোকে ভব হইতে হয়। যোগিগণও কর্ম্মিগণের সহিত একই পর্য্যায়ভুক্ত। তাহাদের চেষ্টাও আরোহবাদমূলা। যোগিগণ ধ্যান, ধারণা, আসন প্রাণায়ামাদি প্রাকৃত উপায় অবলম্বন করিয়া নিজ চেষ্টা বলেই অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে চাহেন। তাঁহারাও কৃষ্ণসুখান্বেষণের পরিবর্ত্তে স্বসুখান্বেষী। অতএব কর্ম্মী ও যোগী উভয়েই অশ্রৌতপন্থী বলিয়া তাহাদের বাক্যও কৃষ্ণেতর বাগ্‌বেগ।

(৩) জ্ঞানিগণ সৎ, চিৎ ও আনন্দময় ভগবত্তত্ত্বে অসম্যক্ দর্শনহেতু কেবল চিন্মাত্রবাদী হইয়া নির্ব্বিশেষবুদ্ধি সম্পন্ন। তাঁহারা শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যে মায়াবাদ আরোপ করিয়া মায়াবাদী। তাঁহারা ব্রহ্মকে মায়ার অতীত বলিয়া ঈশ্বরকে মায়াসঙ্গী করেন এবং ঈশ্বরের অবতার সকলের দেহকে মায়িক বলেন। তাঁহারা বলেন, জীবের গঠনে মায়ার কার্য্য আছে অর্থাৎ জীবের সর্বপ্রকার অহংবুদ্ধি মায়ানির্ম্মিত, সুতরাং জীব মুক্ত হইলে শুদ্ধজীব বলিয়া আর কোন অবস্থা থাকে না। মুক্তাবস্থায় জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। সুতরাং ইঁহারা সেব্য সেবক ও সেবার নিত্যত্ব স্বীকার না করিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী। অতএব ইঁহারা অশ্রৌত পন্থী বলিয়া ইহাদের বাক্যও কৃষ্ণেতর বাগ্‌বেগ।

কৃষ্ণভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি এই সকল ইতরব্যোম-জাত অশ্রৌত বাক্যবেগ সর্বতোভাবে দমন করিয়া সর্বদা সদ্‌গুরু-মুখনিঃসৃত পরব্যোমজাত শ্রৌতবাক্যের আদর করিবেন। শ্রৌতবাক্য বা কৃষ্ণকথা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন তত্ত্ব। তাদৃশ কথা নিরপরাধে শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে সাক্ষাৎ বস্তু লাভ হয়।

বাক্যবেগ দমন করা অর্থে কতকগুলি লোক বুঝিয়া বসেন বটে, কৃষ্ণকথাও বুঝি বলিতে হইবে না—একেবারে বাক্‌রোধ করিয়া বোবা হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। রোগীর রোগ দমন করাই আবশ্যক। রোগ কেন হয় বলিয়া যদি কেহ রোগীকেই মারিয়া ফেলেন, তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। ইতর কথা আদৌ কীর্ত্তন না করিয়া সর্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে হরিকথা কীর্ত্তনই যথার্থ মৌনব্রত—যথার্থ বাক্য বেগ দমন। হরিকথা কীর্ত্তনই জীবের স্বাভাবিক সুস্থাবস্থা। স্বস্বভাব বা স্বস্বরূপবৃত্তি কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত জীবই ইতর কথা বলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন, 'অন্য কথা না বলিলে চলিবে কিরূপে' এইরূপ বৃথা যুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। ভগবানের একনাম হৃষীকেশ। হৃষীক শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকপতি গোবিন্দানুশীলনই জীবের ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। বাক্‌শক্তি লাভ করিয়াছি, অনিত্য জগতের অনিত্য গতিপ্রাপণী কথা আলোচনা করিবার জন্য নহে, কিন্তু নিত্যজগতের নিত্য গতি কৃষ্ণসেবাপ্রদায়িনী কথাই কীর্ত্তনের জন্য। সুতরাং অনুক্ষণ যিনি কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করেন, তিনিই যথার্থ মৌনী।

সন্ন্যাসী ধর্মপ্রচারকের কথা শ্রবণে আমার সকল সন্দেহ মীমাংসিত হইল। কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রবল আগ্রহ জন্মিল।

সমস্যার কথা

বড় সমস্যারই কথা বটে। আমি ধামবাসী হইয়াছি, ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করি, তিলক ছাপ পরি, মালা জপও নেহাত কম হয় না—দু' এক লক্ষ রোজই করিয়া থাকি। ভাগবতও কিছু কিছু পাঠ করি, অর্চ্চনও করি। অনুষ্ঠানের ত' কোন ত্রুটিই রাখি বলিয়া মনে হয় না। তথাপি পরমহংস বাবাজী মহারাজ বলেন, 'তোর কিছু হ'বে না'। কেন যে বলেন, তা' বুঝি না। তবে বোধ হয়, তিনি তিন চারটি কারণে আমাকে ঐরূপ বলেন। তা' হোক্। দুটা চারটা দোষে বড় কিছু আসে যায় না। ভাগবত পাঠ করিয়া, কীর্তন করিয়া, কি বিগ্রহ দেখাইয়া পয়সা লওয়া এটা ত' আজকালকার গোঁসাইজীরা স্বয়ং আচরণ দ্বারা ধর্মের অঙ্গ বলিয়াই ব্যবস্থা করেন। পান তামাক খাওয়াতেও তাঁদের কোন আপত্তি নাই, কারণ তাঁহারা নিজেরাও ঐ সকল ব্যবহার করেন। একটা বিষয়ে বাহিরে একটু আপত্তি করেন বটে, কিন্তু সেটা একটু গোপনে সারিলেই তাঁহাদের আর আপত্তির কারণ হয় না —মনে হয়, তাঁহারাও গোপনে সে কার্য্য করেন নতুবা আর আমাকে প্রশ্রয় দিবেন কেন? গোঁসাইজীরা যে আদর্শ দেখান, আমি ঠিক সেই আদর্শ ত' অনুসরণ করি। তথাপি পরমহংস বাবাজী মহাশয় আমাকে দেখিতে পারেন না। আমি তাঁহার সামনে আসিলেই বিরক্ত হন। আমি উঠিয়া গেলে, আমার বসিবার স্থানে গোবর-ছড়া দিয়া থাকেন। এক একবার মনে হয় বটে, বাবাজী মহারাজ যা' বলেন, তা' শুনি না কেন। কিন্তু তাঁ'র এমনই প্রভাব, কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। সেদিন বাবাজী মহাশয় যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়াই হইবে মনে হইল, এক ভদ্রলোককে বলিতেছেন,—"দেখ, কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণভজন করিয়া আজকাল যে তোমরা চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছ, কৃষ্ণভজনটা কি এতই ছেলে-খেলার জিনিষ! সামান্য নৈতিক জীবনই যাহাদের অভাব, তাহারা যে কোন্ সাহসে ভজনরাজ্যের কথা বলিতে যায়, আমি ত' তাহা ভাবিয়াই ঠিক করিতে পাই না। কোথায় মায়িক ব্রহ্মাণ্ড আর কোথায় বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোমেরও উপরে গোলোক বৃন্দাবনের নিভৃত প্রকোষ্ঠে অবস্থিত কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষ! ষোল আনার জায়গায় সওয়া ষোল আনা ভোগ করিতে পারিলেও যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা মিটে না—সেই মানুষ চায় কিনা আবার কৃষ্ণ ভজিতে! সাহসেরও বলিহারি যাই! ভাগবত কি যে সে বস্তু? সাক্ষাদ্ ভগবদ্বিগ্রহ—ভগবানের শাব্দিক অবতার। ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ ভগবানের পাদযুগল, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ উরুদ্বয়, পঞ্চম স্কন্ধ নাভি প্রদেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধ ভুজদ্বয়, নবম স্কন্ধ কণ্ঠপ্রদেশ, দশম স্কন্ধ শ্রীমুখারবিন্দ, একাদশ স্কন্ধ ললাটদেশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ মস্তকপ্রদেশ। এই ভাগবত লইয়া বেচা কেনা? মানুষ ভোগবুদ্ধিতে রত হইয়া না করিতে পারে এমন কার্য্য নাই। কেন বাবা, পেট চালাইবার উপায় জগতে কি আর কিছু ছিল না? ভগবান্‌কে ভোগ করিতে যাওয়ার প্রবৃত্তি কেন? কীর্ত্তন করিয়া পয়সা লওয়া, শ্রীবিগ্রহ দেখাইয়া পয়সা লওয়ার প্রবৃত্তি সব ভগবানে ভোগবুদ্ধি হইতেই জাত। ভগবান্ আমাদের সকলেরই সেব্যতত্ত্ব। নিজের সুখভোগেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের সুখের জন্যই কৃষ্ণের সেবা করিতে হইবে, তাহারই নাম ভগবদ্ভজন।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

কাম আর প্রেম বাহিরে দেখিতে এক হইলেও ভিতরে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। পান, তামাক ত' সাধারণ নৈতিক বিচারেও নিষিদ্ধ। তাহাতে ভাগবত উহাকে কলিস্থানপঙ্কের অন্তর্গত বলিয়াছেন। যোষিৎসঙ্গের ত' কথাই নাই। যোষিদ্দর্শন পর্য্যন্তও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। মোট কথা কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জগতের যাবতীয় বস্তু ভগবৎসেবোপকরণ। তাহাতে ভোগবুদ্ধি করিলেই যোষিৎসঙ্গ হইয়া যাইবে। মহাজনগণ বলেন,—

তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

যাদবের বস্তু ভোগবুদ্ধিরহিত হইয়া যাদবকেই দিতে হইবে। যাদবের ভোগাবশেষে যাদবের প্রসাদ বা কৃপা-জ্ঞানে গ্রহণপূর্ব্বক কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে হইবে—উদ্দেশ্য যাদবেরই সেবা। কৃষ্ণ নিত্যপ্রভু, জীব তাঁহার নিত্যদাস, কৃষ্ণের নিত্যসেবাই জীবের একমাত্র সহজ স্বাভাবিক বৃত্তি—এই সম্বন্ধজ্ঞানরহিত ব্যক্তির পক্ষেই কৃষ্ণভজন অত্যন্ত অস্বাভাবিক বা কঠিন হইয়া পড়ে। সদ্‌গুরুকৃপায় এই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলে আর কঠিন কিছুই থাকে না। সুতরাং এত সুন্দর উপায় থাকিতে মানুষ যে কেন ভগবদ্ভজনের নাম করিয়া কপটতা করে, তাহা বুঝিতে পারি না। সোজাসুজি যদি কেহ হঠাৎ অপরাধ করিয়া বসে এবং ভগবানের নিকট সেই অপরাধ আর না করিবার ইচ্ছায় ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহা হইলে ভগবান্ তাহাকে একদিন ক্ষমা করেন, কিন্তু জানিয়া শুনিয়া ভণ্ডামি করার অপরাধ ভগবান্ কখনও ক্ষমা করেন না—ভয়ঙ্কর নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করেন। অতএব তোমরা খুব সাবধানে চলিবার চেষ্টা করিও। "লোক দেখান গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি। গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥"

বাবাজী মহাশয়ের সেদিনকার ঐ সকল কথা শুনিয়া অবধি আমার কিন্তু বড় ভয় ধরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এমনই পোড়া কপাল, বাবাজী মহাশয়ের কাছে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ মনে করি, 'আর ও সকল কাজ করিব না, মহাজনের কথা মানিয়া চলিব'। কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতে যাইতে যেমন দলে মিশি, অমনি সব ভুলিয়া যাই। যা হোক এখন কোন অন্যায় কাজ করিতে গেলে আর নিঃসন্দেহে করিতে পারি না। বুকের মধ্যে কেমন যেন দুড় দুড় করিয়া উঠে। এক এক সময়ে 'বাবাজী মহাশয়, আমায় রক্ষা কর' বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়াও উঠি। লোকে ভাবে—শেষে এ লোকটা পাগলই হয় বুঝি। দেখি, এ হতভাগোর প্রতি পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের করুণা হয় কি না। আমার জীবনটা যে অত্যন্ত ঘৃণিত—ধামে বাস যে আমার কেবল লোক দেখান মাত্র তা' এতদিনে বুঝিতেছি।

জগৎ ও ধাম

যাহা নিত্য কাল থাকে না, যাহার সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ নাই তাহাই জগৎ। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ধামের বিকৃত প্রতিফলন মাত্র সুতরাং ধামে যাহা আছে পরিদৃশ্যমান জগতে তাহাই বিকৃত রূপে লক্ষিত হয়। ধামে সেব্য বস্তু একমাত্র, অন্যান্য সকলেই তাঁহার সেবক, আর জগতে সেব্য ও সেবকের সংখ্যা বহু। শ্রীধামে সেব্য বস্তুর সুখ-সাধনই সেবকের স্বার্থ। জগতে সেব্য সেবকের স্বার্থ বিভিন্ন প্রকার। এখানে সেব্য নিজ সুখের বিঘ্নকর হইলে সেব্যের সেবা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। মোটের উপর এখানে সেব্য সেবকের নিত্যতা নাই। এস্থানে সব ব্যভিচার। পত্নী পতির সেবা করিয়া থাকে নিজের স্বার্থের জন্য। পতির স্বার্থ ও পত্নীর স্বার্থ এক নহে। পিতামাতা পুত্রকে ভালবাসিয়া থাকে, পুত্র পিতামাতার প্রতি ভক্তি করিয়া থাকে, তাহাও একেবারে স্বার্থশূন্য নহে। শ্রীধামের আচরণ এরূপ ব্যভিচারময় নহে, তথাকার ব্যবহার—

না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তার সুখ,
তার সুখ মোর তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুখ, তার হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥

চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড এই প্রতিফলিত পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তর্গত। তন্মধ্যে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্য এই সাতটী ঊর্দ্ধলোক। ফলকামনা-যুক্ত পুণ্যবান গৃহিগণ অন্তে ভূলোক ভুবলোক ও স্বর্লোকে গমন করিয়া থাকেন।

এই তিন লোকের উপরিস্থিত মহর্লোক জনলোক তপোলোক ও সত্যলোক এই চারিটী লোক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিগণের প্রাপ্য। উপরি উক্ত সপ্তলোকই অনিত্য। ইহারা সকলেই ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। এইরূপ গতি জীবের পক্ষে মন্দের ভাল। এতদ্ব্যতীত আর একশ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা মুমুক্ষু, ইহাদের প্রাপ্য স্থান ব্রহ্মলোক। এস্থলেও নির্ভয় নাই। দ্বিপরার্দ্ধ কাল গতে ব্রহ্মার আয়ু শেষ হইলে ইহাদিগকে আবার মর্ত্ত্য লোকে আসিয়া সুখ দুঃখের অধীন হইতে হয় কিন্তু যে স্থান হইতে জীবকে আর পুনরাগমন করিতে হয় না, যেখানে জড় সুখ বা দুঃখ নাই, যেখানে জন্ম জরা মৃত্যু নাই, যেখানে কেবল আনন্দ তাহাই শ্রীধাম। শ্রীধাম উপরি উক্ত কর্ম্মী যোগী বা জ্ঞানীর পক্ষে অতীব দুর্লভ। তাঁহাদের শ্রীধামে প্রবেশাধিকার নাই। ভক্তগণেরই শ্রীধামে অধিকার। শ্রীধাম ভগবানের রূপ বৈভব। ভগবান্ যেমন বদ্ধ জীবকে কৃপা করিবার জন্য প্রকৃত্যতীত রাজ্যে নিত্য অবস্থিত হইয়াও প্রাকৃত রাজ্যে অবতীর্ণ হন, আবার জড় জগতে আসিয়াও জীবের ন্যায় জড় গুণে বদ্ধ হইয়া পড়েন না শ্রীধামও তদ্রূপ। শ্রীধাম জড় জগতে বর্ত্তমান থাকিয়াও জড়ীয় দেশ কাল ও সীমায় আবদ্ধ হন না। ভগবান্ মূর্ত্তিমান হইয়াও যেমন সর্ব্বব্যাপকত্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, শ্রীধামও সেইরূপ জড় জগতে অবতীর্ণ হইয়া মায়াবদ্ধ জীবের সসীমদর্শনে সীমাবিশিষ্ট স্থান কলিকাতা, বর্দ্ধমান প্রভৃতির ন্যায় বোধ হইলেও বস্তুতঃ তাদৃশ সীমাবদ্ধ নহেন। প্রাকৃত চন্দ্র সূর্য্য জড় জগৎকে আলোকিত করে, চন্দ্র-সূর্য্যের সাহায্যে আমরা জাগতিক বস্তু দর্শন করিতে পারি, কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য শ্রীধামকে আলোকিত করিতে পারে না। জড়ালোকের সাহায্যে শ্রীধাম দর্শন হয় না। ভগবানের অঙ্গকান্তিস্বরূপ ব্রহ্মালোকের দ্বারা সেই ধাম উদ্ভাসিত। সদ্‌গুরু-কৃপায় জীবের চিৎস্বরূপগত অপ্রাকৃত জ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হইলেই অচিরেই শ্রীধামের স্বরূপ দর্শন হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীধামে জন্ম মৃত্যু নাই, কালের প্রভাব তথায় নাই, এমনকি পৃথিবীতে যে নবদ্বীপ বৃন্দাবন দ্বারকা মথুরা প্রভৃতি ধাম বর্ত্তমান, সেখানেও জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি নাই। তবে আমরা সে সব স্থানে কালের প্রভাব দেখিতে পাই কেন? জড় জগতের ন্যায় সেখানেও ত' সুখদুঃখাদি আছে। তাহার কারণ কি? ইহার উত্তর একটু কঠিন। শ্রীধামে যাহারা জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া আমাদেরই ন্যায় জাগতিক ভোগপর বুদ্ধি লইয়া বাস করেন তাঁহারা ধামবাসী নহেন। আমরা তাঁহাদিগকে ধামে বাস করিতে দেখিতেছি বটে কিন্তু তাঁহারা ধামে বাস করিয়াও ধামবাসী নহেন। এবিষয়ে মহাজনগণের সিদ্ধান্তবাক্যটী পড়িয়া বিচার করুন।

ধামমধ্যে কভু নহে জড় অবস্থিতি।
জড়বদ্ধ জীব নাহি পায় হেথা গতি॥
ধামের উপরে জড় মায়া পাতি জাল।
আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যার নাহিক সম্বন্ধ।
জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ॥
মনে ভাবে আমি আছি নবদ্বীপপুরে।
প্রৌঢ়মায়া মুগ্ধ করি রাখে তারে দূরে॥

গুরুগিরির আক্কেল সেলামী

এক গুরুঠাকুর অনেক শিষ্য-সেবক করিয়া ফেলিয়াছেন। শিষ্য-সেবকগণের নিকট আদায়ী প্রণামী দ্বারা তাঁহার সংসার বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হয়। গুরুঠাকুরটীর এক পুত্ররত্ন আছেন, তাঁহার গুণের কথা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। গুরুপুত্র এই ১৭।১৮ বৎসর বয়সের মধ্যেই সব রকম নেশা করিতে শিখিয়াছেন—পরস্ত্রী

হরণাদিও করিয়া থাকেন। একটীমাত্র গুণধর সন্তান। বাবা কিছুই বলেন না, বলেন ছেলেমানুষ সব ভাল হইয়া যাইবে। এই দেখ, আমরাই ছেলেবেলায় কি না করিয়াছি, আর এখনই বা কি ছাড়িতে পারিয়াছি। বলা বাহুল্য ঠাকুর মহাশয় মাছ মাংস পান তামাক কোনটাই বাদ রাখেন না, তবে গোপনে কাজ সারেন। গুরুগিরি ব্যবসায় আছে, বাড়ীতে নারায়ণ না রাখিলে শিষ্যেরা পাছে কিছু মনে করে, তাই তিনি একটী শালগ্রাম শিলাও রখিয়াছেন। বাড়ী থাকিতে একটু জল তুলসী আর মুড়ী বাতাসা ও ঠাকুর পূজার স্পেশাল কলা ভোগ দিয়া পূজাও সারেন, কিন্তু শিষ্যবাড়ী গেলে তাহাও হয় ত অনেক দিন জুটিয়া উঠে না। শিষ্য সেবক বাড়িতে আসিলে সেই সুযোগে কেবল ঠাকুরকে দু' একদিন অন্নভোগ দেওয়া হয়। নিজেরা আমিষ খান, ঠাকুর-ভোগের জন্য ত' আর পৃথক্ ব্যবস্থা করা যায় না? তবে শিষ্যেরা আসিলে একটু শুদ্ধভাব দেখানর প্রয়োজন কিনা, তাই ঘি, সৈন্ধব, আতপ তণ্ডুলের ব্যবস্থা হয়—অবশ্য তাহাও শিষ্যের পয়সায়!

এহেন ঠাকুর মহাশয় চলিয়াছেন আজ শিষ্যালয়ে। তাঁহার অদ্যকার চাল চলন দেখিয়া কে না বলিবে যে তিনি সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ হইতেই নামিয়া আসিতেছেন! ঠাকুর মহাশয়ের গলদেশে বেশ মোটা মোটা তুলসীর মালা, সর্ব্বাঙ্গে তিলক ছাপ, হাতে হরিনামের ঝোলা, পরিধানে পট্টবস্ত্র, গাত্রে নামাবলী, পায়ে কাপড়ের চটী জুতা, মুখে মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি, নেত্রদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত যেন কতই না ভাবে বিভোর, মধ্যে মধ্যে এক একবার 'হরি হে তোমার অদর্শনে এখন যে প্রাণ যায়'—এই বলিয়া মূর্চ্ছা—কি প্রেমোন্মত্ত অবস্থা! ঠাকুর মহাশয় এমন অবস্থাতেই এক শিষ্যবাড়ী যাইয়া উপস্থিত। চারিদিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া ঠাকুর মহাশয়কে বসিতে আসন দিল। শেষে কিছু বিশ্রামের পর পদধৌত আরম্ভ হইল। দৈব-ক্রমে একটি অর্বাচীন শিষ্য গুরুদেবের পা ধোওয়া জলটুকু রক্ষণার্থ কোন পাত্র সংগ্রহ না করিয়াই পা ধোয়াইতে আরম্ভ করিলে, গুরুদেব ত' চটিয়াই অস্থির! আঃ বেটাদের একটু আক্কেলও নাই! বলি বেটারা, এমন দুর্লভ বস্তুও কি নষ্ট করিতে হয়? তোদের কি চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে? অন্যান্য শিষ্য অমনি ওঃ, তাই ত' কি সর্বনাশ' বলিয়া যেখানে যত ঘড়া, ঘটি, গাড়ু ও গামলা ছিল লইয়া আসিয়া গুরুদেবের পা ধোয়ান জল সংগ্রহ করিল এবং মনে ঘৃণা হইলেও অন্ততঃ গুরুদেবের সামনেই তাঁহাকে দেখাইয়া দুই এক ঢোক পাদোদক পান করিল।

গুরু ঠাকুরের পাদপ্রক্ষালন লীলান্তে স্নানাদি লীলা মহাসমারোহে সমাধা হইল। গুরুদেব আসিয়াছেন, এক বস্ত্রে, স্নান করিলে ত' আর ভিজা কাপড়ে থাকিবেন না। আর শিষ্যদের পরা কাপড়ও পরিবেন না। সুতরাং তাঁহার জন্য নূতন ধূতি চাদরেরই ব্যবস্থা হইল। পরে পূজাহ্নিক লীলা। ওঃ সে কি ঘণ্টা নাড়িবার ধুম। শিষ্যদের প্রতি খুব করিয়া ধূপ ধুনা লাগাইবার হুকুম হইল। নারীগণ উলু-শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে আতপ চাউল, কলা, আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কমলানেবু প্রভৃতি ফল আসিতে লাগিল। কেহ ধূতি, চাদর, গামছা, কেহ বা টাকা পয়সা আনিয়া ফেলিতে লাগিল। একটি শিষ্য বলিয়া উঠিল, ঠাকুর মহাশয়, ঠাকুরের নৈবেদ্যের জন্য এই ফলগুলির আমান্ন করিয়া দিব? আমান্ন ফল তাঁহার কোন কাজে লাগিবে না বলিয়া ঠাকুর অমনি লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, বেটারা করিস কি? আমি মানসে সমস্ত বস্তু ভগবানকে নিবেদন করিয়া দিয়াছি। ভগবান সব গ্রহণ করিয়া আমার যেমন বস্তু তেমনি রাখিয়া দিয়াছেন। তোদের চোখ আছে যে দেখবি?" নিরীহ শিষ্যগণ চুপ করিয়া রহিল। গুরু ঠাকুর খুব খানিকটা হৈ চৈ করিয়া বলিলেন, পূজা হইয়া গেল। এইবার ভোগের জোগাড় কর্।" শিষ্যগণ ভোগের স্থানে বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া বড় বড় ডেক হাঁড়ি প্রভৃতি রাখিয়া দিয়াছে। কারণ গৃহে গুরু আসিবেন বলিয়া শিষ্যগণ এক বৃহৎ ভোজের আয়োজন করিয়াছে। অনেক লোকও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। সকলেরই ইচ্ছা গুরুদেবের স্বহস্ত পাচিত অন্ন ভক্ষণ। গুরু ছাড়া আর কেহ রাঁধিলে ত' আর চলিবে না? সুতরাং গুরুকেই রন্ধন, পরিবেশনাদি

সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে। শিষ্যগণ বহুদিন পরে গুরুদেবের প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইবে।

গুরুদেব আসিয়া আয়োজন দেখিয়াই ত' প্রমাদ গণিলেন। কি করিবেন, শিষ্যেরা প্রসাদ না পাইলে, পাছে দক্ষিণা দিতে গোলমাল করে, এই ভয়ে অতিকষ্টে ভোগ রন্ধন, ভোগ নিবেদন ও তৎপরে পরিবেশনাদি কার্য্য সমাধা করিলেন। প্রকাশ্যে শিষ্যগণের গুরুভক্তির প্রশংসা করিতে থাকিলেও কিন্তু শিষ্যদিগের গোষ্ঠী সহিত কৃষ্ণ-প্রাপ্তির ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন পূর্বজন্মে কি পাপই না করিয়াছিলাম, তাই এ গুরুগিরির শাস্তি। যাহা হউক অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর গুরুঠাকুর সামান্য কিছু মুখে দিয়া বিশ্রাম করিলেন এবং উপযুক্ত প্রাপ্য লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

পাঠকগণ ইহাকে একটি গল্প বলিয়া ভাবিবেন না। ইহা একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি, শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

উপরি উক্ত প্রবন্ধে দেখুন, দক্ষিণাটি লইয়াই শিষ্যের সহিত গুরুর সম্বন্ধ। দক্ষিণাটির সুবিধার জন্যই গুরুর শিষ্য সমীপে যত ভাগবৎ সেবা চেষ্টা প্রদর্শন। যে গুরু বাড়ীতে হয়ত সর্ব্বদাই বিষয় কর্ম্মে, অমেধ্য ভক্ষণ ও যোষিৎ-সঙ্গাদিতে রত, শিষ্যবাড়ীতে কিম্বা শিষ্য সমক্ষে সে গুরুর কপটভক্তিভাব প্রদর্শন! ইহাদের কাছে মন্ত্রগ্রহণে জীবের কি লাভ হইয়া থাকে? এক অন্ধ কখনও আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে কি? উভয়েই কূপে পতিত হয়। বুদ্ধিমান্ শ্রেয়োলাভার্থিগণ এতাদৃশ ব্যবসায়ী গুরুবর্গের করালকবল হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিয়া প্রকৃত সদ্গুরুর পদাশ্রয় করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস কেন?

একদিন মহাপ্রভু পার্ষদগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—

"করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আর কফ বাড়িল দেহেতে॥"

এইকথা বলিয়া আবার অট্ট অট্ট হাস্যও করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ কারণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে অস্থির হইলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অভিন্ন বিগ্রহ দ্বিতীয় স্বরূপ, মহাপ্রভুর অন্তরের ভাব বুঝিতে আর তাঁহার বাকী রহিল না। নিত্যানন্দ জানিলেন, শচীনন্দন কুতার্কিক, মায়াবাদী পড়ুয়া পাষণ্ডিগণের উদ্ধারার্থ ব্যাকুল হইয়াছেন, তাই সন্ন্যাসগ্রহণলীলা প্রকট করিবেন। পদ্মাবতীনন্দন যদিও গৌরসুন্দরের সমস্ত লীলাই অবগত আছেন, তথাপি আজ আর যেন স্থির থাকিতে পারিতেছেন না, ভাবিতেছেন "চৌদ্দভুবনের অধিপতি, ঈশ্বরগণেরও পরম ঈশ্বর সর্ব্বাবতারগণের অবতারী ভগবানের আবার সন্ন্যাসবেষ! সকল বিধির বিধি যিনি তাঁহার আবার সন্ন্যাসের কঠোর বিধি পালন! হায় হায়, ভক্তগণের নয়নমনোহর সে সুন্দর কেশদাম ত' আর থাকিবে না! ভক্তগণ যে কাঁদিয়া ব্যাকুল হইবে! আহা যে সুকোমল চরণকমল স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও বক্ষে ধারণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না, সেই চরণে আজ যে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইবে—যাঁহার অংশাংশাংশ কারণাব্ধিশায়ি-বিষ্ণুর ঈক্ষণেই কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ও প্রলয় সাধিত হয়, সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি সর্বজীবপ্রভু আমার আজ কিনা দীনহীন কাঙ্গালের বেশে জীবের দ্বারে দ্বারে ছুটিয়া বেড়াইবে? সে দুঃখ দেখিয়া কেমন করিয়া ধৈর্য্যধারণ করিব?" নিত্যানন্দের প্রাণ বড়ই বিকল হইয়া উঠিল। বলদেব যদিও শ্রীশ্রীরাধাভাব-বিভাবিত স্বয়ং কৃষ্ণ বিপ্রলম্ভাবতার গৌরসুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণ লীলার সমস্ত গূঢ় রহস্য অবগত আছেন, তথাপি

তিনি আজ বিষাদে নিমগ্ন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের হাত ধরিয়া নিভৃতে লইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"ভাই নিত্যানন্দ, তুমি আমার মনোভাব সকলই জ্ঞাত আছ। আমি আজ জগৎ উদ্ধার করিতে আসিলাম, আমাকে দেখিয়া কোথায় জীবকুলের বন্ধন নাশ হইবে, কিন্তু ফল হইল হিতে বিপরীত। তাহারা যখন আমাকেই মারিতে আসিল, তখন জানিলাম আমা-দ্বারা তাহাদের উদ্ধার সাধিত হইল না—আমার বিরোধ করিতে আসিয়া তাহারা কংস-জরাসন্ধ-শিশুপালাদির ন্যায় আত্মবিনাশই সাধন করিতে বসিয়াছে। হায়, হায় আমি তাহাদিগের উদ্ধারের নাম করিয়া আসিয়া আজ তাহাদিগকে সংহারই করিলাম। যাহা হউক আমি কল্যই শিখাসূত্র মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করিব, যাহারা আমাকে মারিতে চাহিয়াছে, তাহাদেরই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুক হইয়া দাঁড়াইব, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা আমাকে অন্ততঃ সন্ন্যাসী-বুদ্ধি করিয়াও দণ্ডবৎ করিবে। সন্ন্যাসীকে ত' আর মারিতে পারিবে না? আমাকে নমস্কার করিলেই তাহাদের মঙ্গল হইবে। নিত্যানন্দ, ইহাতে তুমি মনে কিছু দুঃখ ভাবিও না, তুমি আমাকে সন্ন্যাসের বিধি দাও, জগৎ যদি উদ্ধার করিবার ইচ্ছা থাকে—যাহার জন্য তোমারও আগমন, তবে আর আমাকে নিষেধ করিও না।"

গৌরসুন্দরের স্বীয় প্রেমসম্পৎপ্রদানরূপ মহাবদান্য লীলার প্রধান সহায় নিত্যানন্দ; তিনি সকলই জানেন, তথাপি মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণী শ্রবণ করিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। প্রেম গদগদ কণ্ঠে বলিলেন,—"প্রভু তুমি সর্বলোকপাল—"লোকনাথ, সকল বিধি-নিষেধেরই অধীশ্বর তুমি, আমি আর কি বিধি দিব, জগদুদ্ধারণ লীলা তুমিই উত্তমরূপে জান। তুমি যাহা করিবে, তাহাই বিধি। তথাপি প্রভু, তোমার সেবকগণকে একবার বল, তাঁহারা কে কি বলেন একবার শ্রবণ কর।" নিত্যানন্দের কথা শ্রবণ করিয়া গৌরহরি নিত্যানন্দকে বারবার আলিঙ্গন প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। নির্বাক্ নিষ্পন্দ হইয়া বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে বাহ্যস্ফূর্তি হইলে চিন্তা করিতে লাগিলেন', 'প্রভুর অদর্শনে নিমাই-গত প্রাণ আই (শচীমাতা) কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিবেন—কেমন করিয়াই বা দিবারাত্র যাপন করিবেন—আই ত' আর জীবন রাখিবেন না।" নিত্যানন্দ শচীমাতার কথা চিন্তা করিতে করিতে কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

গৌরাঙ্গের কি মধুর লীলা! "গৌরাঙ্গের মধুরলীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্মল ভেল তা'র।" একদিকে বৃদ্ধা নিমাইগতপ্রাণা শচীদেবী, আর একদিকে জগল্লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা, সংসারে তৃতীয় ব্যক্তি কেহ নাই যে অনাথা মাতা ও পত্নীর তত্ত্বাবধান করে—এমন অবস্থাতেই গৌরহরি স্থির করিয়াছেন সন্ন্যাসলীলা প্রকটনের! হতভাগ্য গৃহমেধী হৃদয়হীন মূর্খ আমরা গৌরলীলার এ ঔদার্য্য হৃদয়ঙ্গম করিব, এমন কি সৌভাগ্য আমাদের আছে? আমার মত পাষণ্ডকে উদ্ধার করিবার জন্য—অচৈতন্য আমাকে চৈতন্য প্রদান করিবার জন্য—কৃষ্ণান্বেষণ শিক্ষা দিবার জন্য—আমি 'কৃষ্ণ' বলি না, আমাকে 'কৃষ্ণ' বলাইবার জন্যই না আজ গৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলা। পাষণ্ড আমি একবারও কি বুঝিব, আমারই জন্য প্রভু আজ কতই না কাঁদিতেছেন। মায়ামুগ্ধ আমি আমার পিছু পিছু ছুটিতে প্রভু আমার কণ্টকাদিপূর্ণ ভীষণ হিংস্রজন্তু সংকুল কত বন জঙ্গলই না অতিক্রম করিতেছেন। একবারও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। প্রভু তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়তম অবধূত—চূড়ামণি, করুণার বারিধি। বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এবং তৎসঙ্গে তাঁহার প্রিয়পার্ষদ নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে আমার দ্বারে আমাকে কৃষ্ণ বলাইবার জন্যই প্রেরণ করিতেছেন? আমারই জন্য না "অক্রোধ-পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। অভিমান শূন্য হইয়া নগরে বেড়ায়। যে না বলে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি। আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি"। আমারই জন্য না আজ বিপ্রলম্ভরসরসিক শ্রীগৌরসুন্দর শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিরহ-সাগরে ভাসাইয়া চলিতেছেন? ধন্য পাষাণহৃদয় আমার, এ সকল ভাবিবার একটুও অবসর করিতে পারি না—সর্বদা মাৎসর্য্য-অনলে পুড়িয়া ছাই হইতেছি।

সজ্জনসমাজে নিবেদন

আজকাল কোথাও কিছু নাই হঠাৎ ভেক ধারণ করিয়া বাবাজী হওয়ার প্রথাটা খুব সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল বাবাজীদলের শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জন বোধ হয় 'ভেক' শব্দের তাৎপর্য্যই বুঝে না। দেশে থাকিতে হয়ত কোন স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার লইয়া বড় কলঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে অথবা হয়ত গৃহে স্ত্রী নাই, বাবাজী হইলে সেটা ত' মিলিবে ইত্যাদি নানাপ্রকার বিষয়ভোগ-স্পৃহাই তথাকথিত বাবাজীদলের হঠাৎ ভেক ধারণের কারণ। এইসকল অশিক্ষিত ভোগিসম্প্রদায় আপনাদিগের কুআদর্শে 'বাবাজী', 'বৈরাগী' ও 'ভেক' প্রভৃতি শব্দের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বিতৃষ্ণা আনয়ন করিয়াছে। ইহাদের দৃষ্টান্তে শিক্ষিত সম্প্রদায় মনে করেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়টাই বুঝি এই সকল অশিক্ষিত, কৃষ্ণাভক্ত, অভদ্র ও যোষিৎসঙ্গী লইয়া। দিনে দিনে এইরূপ বাবাজী-দলের যেরূপ প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে 'বৈষ্ণবধর্ম' সম্বন্ধে শিক্ষিত লোকের এরূপ বিকৃত ধারণা হওয়া যে বিশেষ অস্বাভাবিক তাহাও নহে। 'শ্রীচৈতন্য মুভ্‌মেণ্ট' গ্রন্থ-রচয়িতা মিঃ কেনেডী মহোদয়ও এই ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হইয়াছেন। তিনি যাহাদিগের নিকট বৈষ্ণব-ধর্মের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহারা আপনাদিগকে গোস্বামী, বৈরাগী বা বাবাজী বলিয়া পরিচয় দিলেও, তাহারা বৈষ্ণবধর্মের কোন সংবাদই রাখে না, সকলেই নানাভাবে যোষিৎসঙ্গজ দোষদুষ্ট। সুতরাং কেনেডী-প্রমুখ শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি কোন সত্য সত্য কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধাভক্তি কথা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবধর্মের সার্বজনীনত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা বদ্ধমূল হইবে—তথাকথিত বাবাজীদলের ধারণা দ্বারা গঠিত ধারণা হইতে তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইবেন। তাঁহারা বুঝিবেন, জীবমাত্রেই নিত্য কৃষ্ণদাস, নিত্যকাল কৃষ্ণসেবাই জীবের কার্ষ্ণত্ব বা বৈষ্ণবত্বের পরিচয়।

'ভেক' শব্দ 'বেষ' অথবা 'ভিক্ষু' শব্দের অপভ্রংশ, মূর্দ্ধণ্য'ষ'কে পশ্চিমদেশে 'খ' উচ্চারণ করে, তজ্জন্য 'বেষ' শব্দের উচ্চারণ সাধারণতঃ 'বেখ' স্থানে 'ভেক' বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাবতীয় আত্মেন্দ্রিয়তোষণপরা কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগতৃষ্ণারূপ অবৈষ্ণবতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণমূলা কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি-সহকারে সর্বতোভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে আত্মসমর্পণই যথার্থ বৈরাগ্য। এইরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনপর বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিই চতুর্থাশ্রমী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীরই "সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরম্" অবস্থাই পরমহংসাবস্থা বা 'বৈরাগী' অবস্থা অর্থাৎ বর্ণের চিহ্ন ও আশ্রমের চিহ্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ণবিধি ও আশ্রমবিধি মার্গে যিনি বিচরণ করেন না, তিনিই পরমহংস বা বৈরাগী। অবশ্য এই পরমহংস অবস্থায় কেহ বা বর্ণাশ্রম চিহ্ন ত্যাগ করেন, কেহ বা দৈন্য-বশতঃ তাহা নাও করিতে পারেন, তাহাতে বৈষ্ণবতার বিচার হইতে পারে না। "বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি॥" বৈষ্ণবতা বিচার বাহ্য বেষ লইয়াই যে করিতে হইবে, তাহার কোন কথা নাই। কৃষ্ণানুরক্তির প্রগাঢ়তা অনুসারে বৈষ্ণবতা। সে বিচার কৃষ্ণ এবং তাঁহার প্রিয়জন শ্রীগুরুদেবই করিয়া তদনুসারে ভজনরাজ্যে অগ্রসর করাইয়া থাকেন। পরমহংসোচিত এই বেষাশ্রয়ের তত্ত্ব না জানিয়া যে সকল অসচ্চরিত্র যোষিৎসঙ্গী একেবারে ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে যায় অর্থাৎ ক্রমপন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া হঠাৎ পরমহংস সাজিতে চায়, তাহাদিগকে রাজ-দ্বারে ছদ্মবেশী ডাকাইত বলিয়া অভিযুক্ত করাই যথার্থ ধর্মসংস্কারের উপায়। ইহারাই বৈষ্ণবসমাজে কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছে—অবাধে প্রকাশ্যে পরস্ত্রীসঙ্গ জগতে চালাইয়া দিয়াছে। কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহেই যে এই সকল ব্যক্তি কলঙ্ক আরোপণ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে সকল ব্যক্তি এই সকল বাবাজী নামধারী যোষিৎসঙ্গীকে প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের বুদ্ধিরই বা কি করিয়া প্রশংসা করা যায়? হাস্যও সম্বরণ করিতে পারা যায় না যে, এই দলের বাবাজীই নাকি শ্রীধামতত্ত্ব-

প্রচারক, কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিবার স্পর্দ্ধাকারী! যাঁহারা শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সাহিত্যিক বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করেন, তাঁহারা কোন্ ঘৃণিত স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া যে ঐ সকল অদৃশ্য, অস্পৃশ্য ও অসচ্চরিত্র-গণকে প্রশ্রয় দিয়া মাথায় তুলিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। "কে কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা তাহার সঙ্গীর পরিচয় হইতেই জানা যায়" এই প্রবাদটি কি আমরা তথাকথিত বাবাজী-সঙ্গকারী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য মনে করিয়া তাঁহাদের নিকট অপ্রীতি-ভাজন হইব?

শিক্ষিত সমাজ নিশ্চয়ই জানেন,—

"অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

—অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত হরিকথা সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় প্রাণ-বিনাশক। সুতরাং তাঁহারা যদি নিজ মঙ্গল এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর মঙ্গলপ্রার্থী হন, তাহা হইলে তাঁহারা অচিরেই স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তরূপ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্যকে অসৎসঙ্গ ত্যাগ শিক্ষা প্রদান করিবেন, ইহাই আমাদের একমাত্র বিনীত প্রার্থনা।

"অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

—০—

পোড়া মা

প্রৌঢ়া মায়াকে চলিত কথায় পোড়া মা বলে। ইনি ভগবানের স্বরূপশক্তি, সুতরাং তাহা হইতে অভিন্না। যাঁহারা সূর্য্যকে স্বীকার করেন কিন্তু তাঁহার কিরণকে স্বীকার করিতে চান না, তাহাদের বিচার যেমন অসম্পূর্ণ, ভগবান্‌কে স্বীকার করিয়াও যাঁহারা প্রৌঢ়া মায়া বা পোড়া মাকে মানিতে চান না, তাহাদের বিচারও তদ্রূপ। বৃন্দাবনে এই পোড়া মা পৌর্ণমাসী বা যোগমায়া। এই যোগমায়া দেবী কৃষ্ণলীলার প্রধান সহায়কারিণী। যোগমায়া সর্ব্বদা রাধাকৃষ্ণ-মিলনপ্রয়াসিনী। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যগত যাবতীয় লীলা যোগমায়া-স্থিতা। বৈষ্ণবগণ যোগমায়ার আশ্রয়েই কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা যোগমায়া পাদ-পদ্মে একান্ত শরণাগত। এই জন্য বৈষ্ণদিগকেই প্রকৃত শাক্ত বলা যাইতে পারে।

গৌতমীয় তন্ত্রে এই যোগমায়াকেই বৈষ্ণবমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৃন্দাবনলীলায় যিনি যোগমায়া গৌরলীলায় তিনিই প্রৌঢ়া মায়া বা পোড়া মা। জড় মায়া এই প্রৌঢ়া মায়ার ছায়া। কৃষ্ণ-বিমুখ জীবকে বিমোহিত করিয়া দণ্ড প্রদান করাই তাঁহার কার্য্য। কৃষ্ণসেবোন্মুখ জীবের সেবানন্দ বিধান করাই যোগমায়া বা পোড়া মার একমাত্র কৃত্য। তত্ত্ব বিচার করিলে জানা যায় যে, যাহারা প্রকৃত শাক্ত তাহারাই বৈষ্ণব এবং যাহারা প্রকৃত বৈষ্ণব তাহারাই শাক্ত। যাহারা নিজদিগকে শাক্ত অভিমানে বৈষ্ণব-আচার-রহিত ও ভগবদ্‌বিরোধী অথবা বৈষ্ণবাভিমানে পোড়া মা যোগমায়া বিদ্বেষী তাহারা উভয়েই জড়মায়া দ্বারা বিমোহিত। কেহ কেহ যোগমায়া বা প্রৌঢ়া মায়াকে পোড়া মা বা বিদগ্ধ জননীরূপে লক্ষ্য করেন, বস্তুতঃ তিনি প্রৌঢ়া মায়া। জড় জগৎ যেরূপ ভগবানের জড়াশক্তির পরিণতি, শ্রীধামও তদ্রূপ চিচ্ছক্তি যোগমায়ার পরিণতি। তজ্জন্য শ্রীযোগমায়াকে শ্রীধামের বা বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা হয়। যোগমায়ার ন্যায় প্রৌঢ়া মায়া শ্রীনবদ্বীপধামের অধীশ্বরী দেবী। "নাহং প্রকাশঃ সর্বত্র যোগমায়া সমাবৃতঃ" —এই গীতার বাক্যানুসারে প্রৌঢ়া মায়ের কৃপা ব্যতীত নবদ্বীপের স্বরূপ দর্শন জীবের ভাগ্যে ঘটে না। শ্রীদেবী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরেই ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর লীলা সঙ্গোপনের পর ভগবদিচ্ছায় গঙ্গা সমগ্র দ্বীপ প্লাবিত করিলে অন্তর্দ্বীপবাসিগণ কুলিয়া নবদ্বীপ রামচন্দ্রপুরে চলিয়া যান। সেই সময় তাঁহারা প্রৌঢ়া মায়াকে লইয়া গিয়া নিজ বাসস্থানের সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি শ্রীমায়াদেবী গঙ্গার পশ্চিম পারেই লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া আসিতেছেন। সে স্থান এখন পোড়া মার তলা বলিয়া বিখ্যাত।

—::০::—

পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে

কোন একটী সর্বশ্রেষ্ঠ—যাহা অপেক্ষা অধিক কিম্বা যাহার সমান কেহ নাই, এমন কোন অসমোর্দ্ধ বস্তু না পাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের আকাঙ্ক্ষার আর শেষ নাই। নিত্য নূতন আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে উদিত হইতেছে। যখন দেখি, আমি অত্যন্ত দরিদ্র, তখন মনে করি, বুঝি কিছু অর্থাগম হইলেই আমার সুবিধা হয়, অর্থ হইলে আবার মনে হয়, একটা জমিদারী হইলে মন্দ হয় না, জমিদারী হইলে একটা রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা হয়, এইরূপে ক্রমে সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হইয়াও আমাদের আশা আর মিটে না। যযাতি মহারাজাও এইরূপ অতৃপ্ত হইয়া শেষে বলিয়াছিলেন—কামোপভোগ দ্বারা কখনও কামকে শান্ত করা যাইবে না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে অগ্নি নিভিবার পরিবর্ত্তে যেমন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়াই উঠিয়া থাকে, তেমনি আমাদের স্বস্বরূপ বিস্মৃতাবস্থায় দেহ এবং মনোধর্ম্মে লিপ্ত থাকাকাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রয়োজন আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ-চরিতার্থকর বলিয়া মনে হয়, তাহাতে আকাঙ্ক্ষা মিটিবার পরিবর্ত্তে আরও দ্বিগুণরূপে বর্দ্ধিত হইয়াই থাকে। আমরা অসুখ, অতৃপ্তি ও নিরানন্দ কেহই চাহি না বটে, কিন্তু তাহাই আমাদের নিত্য সহচর হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? উত্তম বস্তু যদি কিছু থাকে, তাহার সন্ধান আমরা কেন পাই না? এ প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, আমাদের চাওয়াটা ঠিক আছে বটে, কিন্তু কি চাহিতে হয়, কিসে আমাদের সকল চাওয়ার শান্তি হয়, তাহা জানি না, যাহাদের নিকট চাই, তাহারাও সে উত্তম বস্তুর সন্ধান জানে না, সুতরাং আমাদিগকে জানাইতে পারে না, তাই আমাদের আকাঙ্ক্ষাও মিটে না। মৃত্তিকাভক্ষণকারী বালকের মাতা মিষ্টদ্রব্যের আস্বাদন জানেন, তাই তাঁহার বালককে মিষ্টদ্রব্য প্রদান করিয়া মৃত্তিকাভক্ষণজনিত ক্ষুদ্রানন্দ হইতে বালককে নিবৃত্ত করিতে পারেন। আমরা মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে যেরূপ আদর্শে লালিত পালিত হইয়া যেরূপ বস্তুর আস্বাদনে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহাতে বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ অবস্থার ধারণা অনুসারে যাহা আমাদের ভাল বলিয়া মনে হইয়াছে ও হইতেছে বা হইবে, তাহা ছাড়া আর কোন ভাল'র খবর আমরা রাখি না। অথচ আমরা যাহা আস্বাদনে প্রবৃত্ত, তাহাতে কেহই পরিতৃপ্ত নহি। আমাদের পথপ্রদর্শকগণও অতৃপ্ত হইয়া কালের করাল কবলে পতিত হইতেছেন, আমাদিগের সম্বন্ধেও তাহারাই ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছেন। তাহা হইলে আমরা কি জন্মজন্মান্তরে অতৃপ্তই থাকিয়া যাইব? অতৃপ্ত অবস্থায় দেহান্তর ঘটিলে ত' জনম মরণ মালা ঘুচিবে না? তদুত্তরে সাধু শাস্ত্র বলেন—"অতৃপ্ত থাকিবে কেন? বস্তু লাভ করিয়া তৃপ্ত হও। তোমার পুরুষানুক্রমে যে সংস্কার চলিয়া আসিতেছে, তাহাতেই যে তোমাকে বদ্ধ হইয়া তোমার উন্নতির পথ রুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা মনে করিও না। মায়াই তোমাকে ঐরূপ সংস্কার বদ্ধ করিয়া তাহার কবলে রাখিতে চায়। তুমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু স্বয়ং আস্বাদন করিয়াছেন, যাহার আস্বাদনে তুমি চির-পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে, সেই

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তুর সন্ধানপ্রদানকারী সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় কর। তিনিই তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটাইবেন। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু একমাত্র কৃষ্ণভক্তি। এ জগতে যাহাদিগকে তুমি আত্মীয় বলিয়া তাহাদের আদর্শ গ্রহণ করিতে চাও তাহারা যদি কৃষ্ণভক্তি না চায়, তাহা হইলে তোমাকেও যে সেই কৃষ্ণভক্তিহীন হইয়া অতৃপ্ত থাকিতে হইবে তাহা নহে। তোমার এ জগতের আত্মীয়েরও যাঁহারা পরমাত্মীয় সেই আত্মতত্ত্ববিৎ পূর্ব মহাজনগণের শ্রৌতপন্থা স্বীকার-পূর্বক নিজে শ্রেষ্ঠবস্তুর আস্বাদন পাইয়া তৃপ্ত হও, পরে সকলকেই তাহা প্রদান করিতে পারিবে। শ্রেষ্ঠবস্তুর আস্বাদন পাইয়া আর তোমাদের নিকৃষ্ট বস্তুর আস্বাদনে প্রবৃত্তি থাকিবে না। পূর্ব ইতিহাস ভুলিবে সকল, সেবা সুখ পেয়ে মনে।”

অতএব আর আমাদের আপাত সুখকর, পরিণামে দুঃখপ্রদ আনন্দের প্রতি লোভ করিয়া নিত্যানন্দলাভে বঞ্চিত হইয়া কাজ নাই। এতদিন যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য অনুশোচনা দ্বারা নির্ম্মলতা লাভ করিয়া আমাদিগের পূর্বতম মহাজনপথ স্বীকার করা কর্ত্তব্য। মনোধর্ম্মিগণকে আত্মীয় বলিয়া তাহাদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিলে আমাদিগকে অনন্ত দুঃখসাগরে ডুবিয়া মরিতে হইবে। গুরুব্রুবকে গুরু বলিয়া মনে করা সমূহ বিপজ্জনক। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বৃথা কুসংস্কারবশে তাহা করিয়া নিজেই যেন নিজের অনর্থ আহ্বান না করেন। মনুষ্যজন্ম বড়ই দুর্লভ—যেমন তেমন করিয়া অতিবাহিত করার জন্য ভগবান্ আমাদিগকে মনুষ্যরূপে পাঠান নাই। ভগবানের দেওয়া সুযোগ হেলায় নষ্ট করিলে আর আমরা কখনও এমন সুযোগ পাইব? সুতরাং সকলেরই সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে পর বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক, পরবস্তু লাভ হইলে ইতর তৃষ্ণা আর থাকিবে না—সাধুসঙ্গ হইলে অসাধু আর তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না—জ্ঞানচক্ষু লাভ করিলে অজ্ঞান আসিয়া আর আমাদিগের চক্ষু আবরণ করিবে না। জড়ানন্দ আসিয়া নিত্যানন্দের আস্বাদন ভুলাইতে পারিবে না।

—::•::—

আমরা বঞ্চিত

আমরা নিজের প্রশংসা শুনিবার জন্য এতই ব্যস্ত যে ক্ষণমাত্রও একটু নিন্দা সহ্য করিতে পারি না। যদি কেহ আমাকে বঞ্চনা করিবার জন্যই আমাকে আসিয়া বলেন, “মহাশয়, আপনার মত ভাল লোক আর দুনিয়ায় দু'টি দেখিতে পাই না।” আমি তখন মনে মনে আহ্লাদে আটখানা হই। মুখে অবশ্য কপট দৈন্যোক্তি করিয়া বলি, “হাঁ মহাশয়, আমার কি আর কোন যোগ্যতা আছে? আমি অত্যন্ত অধম।” কিন্তু অন্তরে ষোল আনা প্রশংসার লোভ। কেহ বঞ্চনা না করিয়া সত্য সত্যই যখন আমার মঙ্গলোদ্দেশ্যে আমার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন আর তাঁহার প্রতি আমার ক্রোধের সীমা থাকে না। যিনি জগতের মধ্যে যত বড়ই সাধু মহাত্মা থাকুন না কেন, আমার প্রশংসা না করিলে আমি তাঁহার সাধুত্বের কোন মূল্যই দিব না। আবার নিজে সহস্র ছিদ্রযুক্ত হইয়াও পরছিদ্রানুসন্ধানে আমার কিন্তু খুব উৎসাহ। আত্মস্তুতি শ্রবণে যেমন আমার আনন্দ, পরনিন্দাকরণেও ঠিক আবার তেমনই উৎসাহ। আমার বন্ধু বলিয়াও যাহারা জুটিয়াছে, তাহারাও আমার প্রকৃতি বুঝিয়া লইয়াছে। সর্ব্বক্ষণ স্তুতি করিয়া আমার যথাসর্বস্ব লুটিয়া খাইতেছে। এমনই হতভাগ্য আমরা যে, যিনি আমার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাকেই বলিতেছি—অসাধু, আর আমার কপটী অহিতাকাঙ্ক্ষীকেই বলিতেছি—সাধু।

আমাদের ভালর জন্যই যে সাধুগণ জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের কোথায় ত্রুটি হইতেছে না হইতেছে

পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন— আমাদের মঙ্গলের জন্যই যাঁহারা তাঁহাদের সকল সুখচেষ্টা বিসর্জ্জন দিয়া কি শীত কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা সকল সময়েই আমাদের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া আমাদিগকেই ভগবৎসেবায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট— যে সকল নশ্বর জাগতিক দেহ ও মনের সুখকে আমরা বড় বহুমানন পূর্ব্বক আমাদের সমস্ত জীবনটার উৎসাহ তল্লাভের জন্যই প্রদান করি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি না, সেই সকল আপাতঃ সুখপ্রতীম অথচ পরিণামে দুঃখপ্রদ সুখপ্রয়াসকে যাঁহারা অত্যন্ত হেয়—ঘৃণিত বলিয়া ত্যাগ করেন এবং আমরা যাহাতে সেই অনিত্য সুখের প্রতি ধাবিত হইয়া পতঙ্গের ন্যায় আত্মবিনাশ লাভ না করি, তজ্জন্য কত না কত প্রকারে আমাদিগকে সাবধান করেন—উন্মত্তের ন্যায় সর্বক্ষণ অসৎপথে ধাবিত আমাদিগকে ফিরাইবার জন্য যাঁহারা কত না কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছেন, সেই অহৈতুক কৃপাসিন্ধু ভগবদ্ভক্তগণের আমাদেরই মঙ্গলের জন্য শাসনবাক্য আমরা শুনিতে চাহি না, মনে করি সাধুর বুঝি আমার প্রতি ক্রোধ আছে, তাই তিনি আমাকে দেখিতে পারেন না। হায় হায়, যে সাধু ভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ মূর্ত্তিমান ভক্তিরসপাত্র ভাগবত, যে ভাগবতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্বভূতে দয়া-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্যই ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতব বা কপটতাশূন্য জীবের ত্রিতাপনাশক, পরমমঙ্গলপ্রদ ও বাস্তব বস্তুতত্ত্বজ্ঞানপ্রদীপ পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যাহার শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ অন্য শাস্ত্রের বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না রাখিয়াও ইচ্ছামত ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন, সেই গ্রন্থভাগবতাভিন্ন ভাগবত সাধুকে আমরা আমাদেরই সমশীল ব্যক্তিমাত্র জ্ঞানে আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া চিনিতে পারিলাম না, ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দৈবের বিষয় আর আমাদের কি হইতে পারে? জগতে মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ অবশ্য মৎসরতাবশে একে অন্যের স্তুতি বা নিন্দা করিয়া থাকে, কিন্তু সাধুগণের স্থান যে সে জগতে নাই—সাধুগণ যে সে জগৎ হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছেন, তাহা কি আমরা বুঝিব না? স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত জগতের অনেক লোক আমাকে স্তুতি করিতে পারে, কিন্তু সাধুগণ আমার নিকট ত' কোন বস্তুরই প্রত্যাশী নহেন। ধন বা জন সংগ্রহের লোভ যাহারা করে, তাহারা বরং দাতার চিত্তবৃত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তদনুরূপ কথা বলিতে পারে, কিন্তু সাধুগণ ত' আমাদিগের নিকট তাদৃশ কোন বস্তুর প্রয়াসী নহেন। যদি ধন জন লোভীই হইবেন, তবে আমাকে ত তিনি খুব স্তুতিই করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যে আমার অসৎ কার্য্যের প্রশ্রয় দিবেন না, আমার মঙ্গলই যে তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য, আমি তাঁহার উপর সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হই, তাহা যে তিনি লক্ষ্যই করেন না। যদি আমার নিকট হইতে তিনি কিছুমাত্র অর্থ প্রত্যাশা করিতেন, লোক-সংগ্রহই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি আমার মনে ব্যথা দিতেন না, আমার সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার সহানুভূতি থাকিত, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। তিনি শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্ত প্রচারের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভক্তিসিদ্ধান্তানুগত না হইয়া যাহারা বিপথে চালিত হইতে চায়, তাহাদিগের নিকটে তিনি সাক্ষাৎ দুষ্টের দণ্ড বিধাতারূপে প্রকটিত—নতুবা ভক্তি সিদ্ধান্ত-সম্মত পন্থানুসরণকারিজনগণের নিকট তিনি পরম শান্ত সৌম্য মধুর স্নিগ্ধ মূর্ত্তি প্রকটন করিয়া থাকেন। শ্রীনৃসিংহদেব অভক্ত হিরণ্যকশিপুর নিকটই অতি ভয়ঙ্কর উগ্র মূর্ত্তি প্রকট করেন, কিন্তু তাঁহার ভক্ত বালক প্রহ্লাদের নিকট অতি শান্ত অতি কোমল। ভগবদভিন্ন ভক্তও অভক্তের নিকট তাদৃশ ভাবাপন্ন।

জানি না, আমাদের সে সৌভাগ্য সে সুদিন কবে হইবে, যে দিন আমরা সাধুর সকল চেষ্টা আমাদেরই মঙ্গলের জন্য জানিয়া তাঁহার চরণে একান্তভাবে শরণাগত হইব, সাধুকেই আমাদের একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলিব, তোষামোদকারী কপট জন অসৎ সঙ্গ সর্বতোভাবে ত্যাগ করিব। হে গৌরসুন্দর আমাদিগকে কৃপা কর। সাধুকে চিনিবার শক্তিদান কর, সাধুর হিতচেষ্টাকে যেন আর আমরা অহিত জ্ঞান করিয়া সাধুর চরণে অপরাধ সঞ্চয় না করি। সাধুনিন্দা রূপ অপরাধ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর প্রভো!

পুতুল খেলা

বালিকারা পুতুল খেলা করে। পুতুল খেলাতেই স্বভাবতঃ তাহাদের আনন্দ; পুতুলকে তাহারা এত ভালবাসে যে, স্নান আহারাদির কথা একেবারেই ভুলিয়া যায়। কখনও বা তাহারা পুতুলের বিবাহ দেয় কনেকে বরের সঙ্গে (খেলিবার উপযোগী) ছোট পাল্কী দিয়া শ্বশুরালয়ে পাঠায়। বরের কেমন সুন্দর জরীর টোপর, জামা, জুতা, ছত্র; বরের দুধারে পাটের নির্মিত চামর দুলিতেছে, সে দৃশ্য কি সুন্দর! এই সমস্ত জাঁক-জমক দেখিলে, কাহারও মনে হয় না যে, খেলাতে আনন্দ নাই বা থাকিতে পারে না। তারপর কনের বাপের বাড়ী হইতে, বরের বাড়ী তত্ত্ব যায়, সে সমারোহ বর্ণন করিলে তোমরা আর হাসি রাখিতে পারিবে না। শ্যামাঘাসের চা'ল, গুরকীর পায়েস, মাটির সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতোয়া, জিলেপী, ক্ষীর, চৈপাতার দৈ ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে বিবাহের উৎসব সম্পন্ন করে। যিনি স্বচক্ষে এই উৎসব-ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই ইহার আনন্দ অনুভব করিতে সমর্থ—অন্যে নহে।

কিছুদিন পরে যখন ঐ বালিকা যৌবন-প্রাপ্তা হয়, তখন আর তাহার এ ধূলা খেলা ভাল লাগে না; আর পুতুলের বিবাহ দিয়া তার আনন্দ হয় না। কালক্রমে ঐ বালিকার পিতা সম্বন্ধ স্থির করিয়া যখন উপযুক্ত বরের সঙ্গে, বালিকার বিবাহ দেন, তখন ঐ বালিকা তাহার এত সাধের পুতুলগুলি সমস্ত পেটারাবদ্ধ করে, স্বামীর সঙ্গে, শ্বশুর ভবনে গমন পূর্ব্বক, স্বামী সেবা করিয়া থাকে—পুতুল খেলার আনন্দ মিথ্যা ভাবিয়া একেবারে ভুলিয়া যায়। স্বামীর সম্পর্কে শ্বশ্রূ, দেবর, ভাসুর, ননদ প্রভৃতি সকলের সেবা করিয়াই তখন তাহার আনন্দ, সেই আনন্দকেই সে সত্য বলিয়া মনে করে।

আমরা যখন ঐ অবোধ বালিকার মত এ অনিত্য সংসারে ক্ষণিক, তুচ্ছ, নশ্বর পুতুল খেলার আনন্দে এ জড়-জগতে এ মায়ার জগতে, মায়ার খেলায় উন্মত্ত হই, একেবারে মাতিয়া যাই, যখন আর আমাদের চিজ্জগতের ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না, সাধুরা কেহ পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেও সাড়া দেই না, মনের আনন্দে কেবল খেলা ধূলা লইয়াই ব্যস্ত থাকি, আমার আমার বলিয়া উন্মত্ত হই, আমার ধন, জন, ঐশ্বর্য্য! আমার রূপ, যৌবন, বিদ্যা, বাহুবল, পাণ্ডিত্য, আমার বাগান বাড়ী, সুরম্য অট্টালিকা, আমার পিতা, মাতা, আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, কুটুম্ব ইত্যাদিকে আমার আমার বলিয়া আনন্দে আত্মহারা হই, কিন্তু বুঝি না যে এ আনন্দ ঐ পুতুল খেলার মত অতি তুচ্ছ, নশ্বর, হেয় ও অনুপাদেয়, দুদিনের জন্য মাত্র, এ ক্ষণিক আনন্দে কোন নিত্য সুখ নাই, তখন আমাদের বহু ভাগ্যফলে অহৈতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীগুরুদেব, যিনি নিত্যানন্দ তত্ত্ব, সম্বন্ধ জ্ঞান-প্রদাতা, তিনি আমাদের উদ্ধারের জন্যই জগতে অবতীর্ণ হইয়া চিজ্জগতেরও একমাত্র নিত্য পতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেন। তিনি বলিয়া দেন—

একলা পুরুষ কৃষ্ণ নিত্য বৃন্দাবনে।
জীবকুল নারীবৃন্দ রমে কৃষ্ণ সনে॥

শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র নিত্য পতি; তাঁহার এবং তাঁহার পরিকরবৃন্দের সেবাই জীববৃন্দের নিত্যানন্দ লাভের একমাত্র উপায়। ইহা ব্যতীত আর জীবের দ্বিতীয় উপায় কিম্বা গতি আর নাই। জগৎ পতি কৃষ্ণ-সেবা জীবকে নিত্যানন্দ দান করিয়া থাকে ও মায়ার সেবা জীবকে অনিত্যানন্দ বা নিরানন্দ প্রদান করে।

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাঁহার পাদপদ্মে শরণাগতি লাভ করিয়া যখন আমরা এই সম্বন্ধজ্ঞান প্রাপ্ত হই, তখন আমরা গুরু কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়া ধন্য হই, জড়ানন্দের প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা আসিয়া যায়। পুতুল খেলারূপ সংসারের অনিত্য খেলায় আমাদের আর স্পৃহা থাকে না।

———

গুরুকরণ

একপ্রকার লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, "ভগবান্‌কে ডাকিতে হইবে, এ কথাটি না হয় ভাল বলিয়াই স্বীকার করা যায়, কিন্তু তাঁহাকে ডাকিতে গেলে যে আবার কাহারও অধীন হইয়া ডাকিতে হইবে তাহার কি মানে আছে? ভগবান্ তোমার আমার সকলেরই, যাহার যেমন ইচ্ছা তিনি তেমন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে পারেন, গুরুপাদাশ্রয় প্রভৃতি একটা সেকেলে কথা।" আর একপ্রকার লোক আছেন, তাঁহারা বলেন,—"গুরুকরণ ব্যাপারটা ঠিক বটে, হাতের জল শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক; তবে, গুরু-নির্ব্বাচন-কার্য্যটা আমারই ইচ্ছানুযায়ী হইবে। আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে গুরু বলিয়া মানিব, শাস্ত্রের অত ঘুরপ্যাচের মধ্যে আমি নাই।" তৃতীয় প্রকারের লোক আছেন, তাঁহাদের মতে—গুরুকরণ প্রথাটা মামুলী-ধরণের যেমন চলিয়া আসিতেছে তেমনই হইবে। গুরু-বংশে যিনিই থাকুন, তাঁহার যোগ্যতাযোগ্যতা দেখিবার দরকার নাই, মন্ত্রটা পাইলেই হইল। বার্ষিক দিয়াই আমরা খালাস।"

উক্ত তিন শ্রেণীর ব্যক্তি মুখে একেবারে 'ভগবান্ নাই' বলিয়া নাস্তিক্য মতের পরিপোষ্টা না হইলেও বস্তুতঃ কেহই ভগবান্‌কে পাইতে ইচ্ছা করেন না। ভগবান্‌কে পাইবার ইচ্ছা থাকিলে তাঁহারা ওরূপ খাম্‌খেয়ালী কথা ছাড়িয়া দিয়া মহাজনগণ যেভাবে ভগবদন্বেষণ শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শিক্ষা গ্রহণ করিতেন অর্থাৎ গুরু-পাদপদ্মাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেন। উপযুক্ত তৃষ্ণা না হইলে জলের মূল্য বুঝা যায় না, কিন্তু সেই জলই আবার মহামূল্য হয় তখন, যখন আমাদের তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতে থাকে। এই তৃষ্ণা হওয়াটা বড় সৌভাগ্যের কথা। বহু জন্মের সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইলে তবে এই তৃষ্ণার উদয় হয়। এই তৃষ্ণা উদিত হওয়ার জন্যই একদিন মহর্ষি ভরত রাজা-রহূগণকে সদ্‌গুরুপাদা-শ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা বলিতে বলিয়াছিলেন যে, "হে রহূগণ, জীব ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস যে কোন আশ্রমই অবলম্বন করুক না কেন অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি যে কোন দেবতারই উপাসনা করুক না কেন, মহাভাগবত সদ্‌গুরুদেবের চরণ-রেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত কিছুতেই জীবের ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না।" প্রহ্লাদ মহারাজও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবপ্রতি গুরু-পাদাশ্রয়ের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"যে পর্য্যন্ত গৃহব্রত কৃষ্ণবিমুখ জীব নিষ্কিঞ্চন, মহাত্মা ভগবদ্ভক্তের পাদরজোদ্বারা অভিষেক স্বীকার না করেন, সে পর্য্যন্ত সমস্ত অনর্থের অপগমস্বরূপ কৃষ্ণপাদপদ্মে তাঁহার মতি হয় না।" অবশ্য যাহারা গো-গর্দ্দভাদির ন্যায় সর্ব্বদা বিষয়েই ইন্দ্রিয় চরাইয়া বেড়ায়, কে ভগবান্, গুরু আর ভক্তিই বা কি—এ সকল কথা স্বপ্নেও জানে না এবং যাহাদের নামাপরাধ ঘটে নাই, এরূপ ব্যক্তি অজামিলাদির ন্যায় সাঙ্কেত্যাদি নামাভাসানুসারে ভগবন্নাম গ্রহণ-ফলে গুরুপাদাশ্রয় বা সাধুসঙ্গ ব্যতীতও উদ্ধার পাইতে পারে; কিন্তু যাহারা "শ্রীহরিই ভজনীয়, শ্রীগুরুদেব ভজনোপদেষ্টা এবং ভগবান্‌কে পাওয়ার উপায়ই ভজন, গুরুপাদাশ্রিত ব্যক্তিগণ পূর্ব্বে গুরুপদেশানুসারে ভজন করিয়া ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন,"—এরূপ জানিয়া শুনিয়াও বোকা সাজিয়া বলিতে চায়—"গুর্ব্বানু-গত্য আবার একটা কি জিনিষ, দীক্ষাগ্রহণাদির পরিশ্রম আবার কে সহ্য করিতে যাইবে? কোন নির্জ্জনস্থানে যাইয়া একটু ভগবানের নাম করিব, তাহাতে আবার অত বিধি-নিষেধের আবশ্যক কি?" —তাহারা গুর্ববজ্ঞা-লক্ষণরূপ মহাপরাধ হেতু ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়। জন্ম-জন্মান্তরে যদি কোন দিন তাহাদের গুরুপাদাশ্রয় করিবার সুমতি হয়, তবেই তাহারা সে অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া গুরুপাদাশ্রয়ে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারিবে। যদিও স্বরূপতঃ আমাদের দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই, তথাপি দেহাদিসম্বন্ধ জন্য কদর্য্যশীল কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণের তত্তৎপ্রবৃত্তি সঙ্কোচীকরণের জন্য সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে মন্ত্রগ্রহণের একান্ত

আবশ্যকতা আছে। গুরুদত্ত দীক্ষা-মন্ত্র জপ করিতে করিতে জপকারী তাঁহার মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ লাভ করিতে থাকেন,—বাহ্য ভোগময় জগৎপ্রতীতি হইতে নিরস্ত হইয়া অপ্রাকৃতানুভূতি ক্রমে বিশুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে ভজনীয় বস্তুর আস্বাদন করেন। প্রণবপুটিত নমস্ শব্দ-যোগে চতুর্থ্যন্তপদ দ্বারা সাধিত মন্ত্র জপ করিতে করিতে জীবের আত্মনিবেদনরূপ নমস্কার সাধিত হয়। ক্রমে চতুর্থ্যন্তপদ বা বৈয়াকরণের সম্বন্ধ-নির্ণায়ক ভাষা শিথিল হইয়া পড়িলে সম্বোধন পদদ্বারা অবাধে সেবন-যোগ্যতা লাভ হয়—

"কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হয় সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥"

'হা' কিম্বা 'হে'—এই সম্বোধনের শব্দ ভগবানের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা-জ্ঞাপক—প্রেমবাচক শব্দ। গৃহ কিম্বা বন যে কোন স্থলেই "হে হরে, হে কৃষ্ণ," বলিয়া ডাকা যাইতে পারে কিন্তু মন্ত্রজপ দ্বারা মনন ধর্ম হইতে ত্রাণ লাভ পূর্বক সম্বন্ধজ্ঞান বিশিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত এরূপ সম্বোধন শ্রীভগবানের প্রীতিজ্ঞাপক হয় না। অবিবাহিতা বালিকাকে তাহার পিতা-মাতা যখন তাহার স্বামীর সহিত পরিচিত করাইয়া দেন, তখনই না সে বালিকা 'স্বামিন্' প্রীতিভরে সম্বোধন করিতে পারে,—স্বামিসেবা করিয়া স্বামীকে আনন্দ দান করিতে পারে? জীবের পক্ষেও সেইরূপ; গুরুদেব কৃপা করিয়া যখন জীবকে সম্বন্ধ জ্ঞান প্রদান করেন, তখন জীব তাঁহার সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ জানিয়া সেবা দ্বারা ভগবৎ প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হন, তৎপূর্বে তিনিই বা কোথায় অবস্থিত আর ভগবান্ই বা কোথায় অবস্থিত অর্থাৎ জীব প্রপঞ্চে থাকিয়া প্রাপঞ্চিক অনুভূতিবিশিষ্ট আর ভগবান্ সেই প্রপঞ্চ হইতে বহুদূরে গোলোক বৈকুণ্ঠে অবস্থিত! কতকগুলি লোক সংসারের দুঃখ শোকে জর্জ্জরিত হইয়া কিম্বা একটু কৃত্রিম ভাব-প্রবণতা সহকারে 'হা হরি, হা কৃষ্ণ' প্রভৃতি বলিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জনাদি দ্বারা ভগবানের প্রতি প্রেমচেষ্টা প্রদর্শন করিতে যান। তাহা বস্তুতঃ 'প্রেম' শব্দ বাচ্য নহে, সংসার-তাপক্লিষ্ট ব্যক্তির ক্রন্দন হেতুমূলক, নির্হেতুক নহে। তবে হেতুমূলা চেষ্টা হইলেও যদি কোন কপটতা না থাকে, তবে সে ব্যক্তি গুরুপাদাশ্রয় পূর্বক ভজনক্রমাবলম্বনে কালক্রমে ভগবৎপ্রেমলাভে সমর্থ হইবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ই তাঁহাকে কেমন করিয়া পাইতে হইবে জানাইবার জন্যই জগতে গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সুতরাং ভগবদভিন্ন সর্বদেবময় গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি না করিয়া তাঁহার চরণাশ্রয়েই জীবের ভজনপথে অগ্রসর হওয়া উচিত। মায়াবদ্ধ জীব মনোধর্ম্ম চালিত হইয়া ভগবদ্দত্ত স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাকে সর্বতোভাবে গুরুদেবের নির্দেশানুযায়ী চলিতে হইবে।

গুরুকরণ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া যে যাহাকে তাহাকে গুরু করিতে হইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই। যিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববিদ্, কৃপাসিন্ধু, সুসম্পূর্ণ (অভাবগ্রস্ত নহেন), সর্ব্ব-জীবের হিতসাধনে রত, নিষ্কাম, সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ, ভক্তি-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ হইয়া শিষ্যের সমস্ত সংশয় ছেদন করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ, যিনি স্বয়ং সর্বদা হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়া শিষ্যকেও হরিসেবায় নিযুক্ত করেন, 'হরিসেবা কর' এই কথা বলা ব্যতীত যিনি শিষ্যকে অন্য কোন উপদেশ প্রদান করেন না, তিনিই গুরুদেব। গুরুদেবেরও যেমন যোগ্যতা আছে, শিষ্যেরও সেইরূপ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবুদ্ধি থাকা আবশ্যক। যোগ্যতা-বিহীন শিষ্য তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রকৃত সদ্গুরুকেও অসৎ বলিতে পারেন, এজন্য শাস্ত্রে গুরুশিষ্যের মধ্যে পরস্পর পরীক্ষার বিধান আছে। শিষ্য নিষ্কপটে হরিভজনপ্রয়াসী হইয়া গুরুগৃহে এক বৎসর বাস করিবেন। ইতি মধ্যে গুরুদেবও শিষ্যের অভিপ্রায় ও শিষ্যও গুরুদেবের তাঁহার প্রতি হরিভজন ছাড়া কোন অবান্তর উদ্দেশ্য আছে কি না জানিতে পাইবেন, অযোগ্য গুরু বা শিষ্যের অযোগ্যতা তাঁহাদের কার্যেই পরিচিত হইবে। অবশ্য শাস্ত্রে গুরুশিষ্যের এইরূপ পরীক্ষা বিধি আছে জানিয়া শিষ্য তাঁহার জড় দর্শন হেতু মহাজনের ক্রিয়ামুদ্রা বিচার করিতে যাইয়া মহাজন পাদপদ্মে অপরাধী না হইয়া বসেন আবার অসদ্গুরুর নিকট যাইয়াও প্রতারিত না হন, এজন্য গীতায় ভগবান্

বলিয়াছেন,—"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি-পূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" অর্থাৎ সততযুক্তচিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারী ব্যক্তিকে ভগবান্ অন্তরে অন্তর্য্যামী গুরুরূপে এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, যাহাতে করিয়া সে ভগবানের দ্বিতীয় প্রকট স্বরূপ মহান্ত গুরুর চরণ আশ্রয় করিতে পারে। মোট কথা ভগবান্‌কে ভজনা করিবার একান্ত ইচ্ছা থাকিলে—কোন প্রকার দুরভিসন্ধি মনে না থাকিলে ভগবান্‌ই জীবের সমক্ষে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। বদ্ধাবস্থায় মনোধর্ম্মচালিত জীব তাঁহার সমানধর্ম্মীকেই গুরু করিয়া বসেন! সুতরাং মনোধর্ম্মী জীব সাধুশাস্ত্রোপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজ ইচ্ছা মত গুরুকরণ করিতে পারেন না। করিলে অসৎকে 'সৎ' বলিবার অপরাধে তাঁহার কখনও ভগবৎ কৃপা লাভ হইবে না।

কুলগুরুর যদি শাস্ত্রোদ্দিষ্ট যোগ্যতা থাকে, তবে তিনি 'গুরু'পদবাচ্য হইতে পারেন, নতুবা কেমন করিয়া তিনি গুরু হইবেন? গুরু অর্থে শ্রেষ্ঠ বা অজ্ঞান অন্ধকার হইতে যিনি ত্রাণ করেন। গুরুদেব যদি নিজেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া অশ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট থাকেন, তাহা হইলে তাদৃশ অনধিকারী গুরুব্রুবের অনুগমনে শিষ্যের নরকই প্রাপ্য বিষয় হইবে। এক অন্ধ অন্যকে কি করিয়া পথ দেখাইবে? কুসংস্কারাপন্ন সংসারী জীবের পক্ষে এরূপ কথাগুলি বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—"পরমার্থ-গুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ" অর্থাৎ অনধিকারী ব্যবহারিক কৌলিক গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পরমার্থ গুর্ব্বাশ্রয় কর্ত্তব্য। বলিমহারাজ তাঁহার কুলগুরু শুক্রাচার্য্যকে এবং ভীষ্ম পরশুরামকে ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অসদ্ গুরু ত্যাগ জন্য কোন অপরাধ হইতে পারে না ইহা স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গুরুকরণ ভগবদ্ভজন করার জন্য, সেই ভগবদ্ভজনই যদি না হইল, তবে আর লোক দেখান গুরুকরার লাভ কি? শুদ্ধ সদ্-গুরুর অভাবে বরং অদীক্ষিত থাকিয়া চিরজীবন ভগবৎ কৃপা অপেক্ষা করা ভাল তথাপি অসদ্ গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া নরকে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। আচার্য্যের বেশ ধরিয়া সে সকল আচার্য্যব্রুব সাধুশাস্ত্রবিগর্হিত আচরণ (অর্থাৎ যোষিৎসঙ্গ, ভাগবত ও ভগবানকে পণ্যদ্রব্য করিয়া তদ্বিনিময়ে অর্থসংগ্রহ, সাধুনিন্দাদি নামাপরাধ করিতেছে) তাহাদের মুখদর্শন করাও শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"

ভোগ্য বিষয় লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেকরহিত, মূঢ়, শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতর পন্থানুগামী ব্যক্তি নামে মাত্র গুরু হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি। আমরা বারান্তরে গুরুকরণ বিষয়ে আরও বিশেষ আলোচনা করিব।

সরলতা

বহুদিনের কোন পতিত জমিতে ফসল উৎপাদন করিতে হইলে সেই জমির উর্ব্বরতা শক্তি নষ্টকারী কুবৃক্ষ-সমূহের মূলসমূহ যেমন সম্যক্ প্রকারে উৎপাটিত করিতে হয়, জমির উপর হইতে গাছগুলি টানিয়া কিম্বা কাটিয়া ফেলিলে গাছের মূল উৎপাটিত না হওয়া পর্য্যন্ত জমি কিছুতেই পরিষ্কৃত হয় না। দুই একদিন পরিষ্কৃতের ন্যায় দেখাইলেও তৎপরে আবার যেমন তেমনই হইয়া উঠে, আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রও সেইরূপ অন্যাভিলাষিতা (অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগস্পৃহা) এবং ভগবৎ-সেবা-সম্বন্ধ-বিহীন কর্ম্ম ও জ্ঞানোত্থ ক্লেশরূপ যে সকল কুবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ক্ষেত্রটীকে ভক্তিবীজ উপ্ত হওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন, সেই ক্লেশবৃক্ষের মূল ক্ষেত্র হইতে

সম্যক্ প্রকারে উৎপাটিত করা আবশ্যক, নতুবা ভক্তিবীজ উপ্ত হইলেও তাহা অঙ্কুরিত হইবে না। শাস্ত্রে এই ক্লেশবৃক্ষ উৎপাটনের ক্রমবিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

ক্লেশ তিন প্রকার—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতক প্রভৃতি—'পাপ', এই পাপ করিবার বাসনার নাম—'পাপবীজ' এবং পাপ-বাসনারও যাহা হইতে উদ্ভব, সেই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা বা স্ব-স্বরূপবিস্মৃতিই পাপবীজেরও মূল 'অবিদ্যা'। পাপ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা দূর হইতে পারে, কিন্তু পাপবাসনা বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত আবার পাপক্রিয়া সংঘটিত হয়, সুতরাং পাপবাসনারও মূল যে-কৃষ্ণবিমুখতারূপ অবিদ্যা, তাহা উৎপাটন না করা পর্য্যন্ত জীবের ক্লেশ দূরীভূত হইবার নহে। সেই কৃষ্ণবিমুখতারূপ অবিদ্যা দূর করিবার একমাত্র উপায়—পরাবিদ্যা বা কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন; কৃষ্ণভক্তিই ক্লেশঘ্নী। এই শুদ্ধভক্তির অনুশীলন শুদ্ধভক্তগণসঙ্গেই হওয়া সম্ভব। অভক্তসহ কৃষ্ণানুশীলনের সহিত ভক্তসহ কৃষ্ণানুশীলনের বাহিরে আপাততঃ কোন পার্থক্য দৃষ্ট না হইলেও পরে তাহা বেশ উপলব্ধির বিষয় হইবে। অভক্তের সমস্ত চেষ্টায় কৃত্রিমতা পরিপূর্ণ—ভগবানের সেবার নামে ভগবান্‌কে ভোগ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি। আর ভক্তের সকল চেষ্টায় অকৃত্রিম—ভগবানের সুখের জন্যই ভগবান্‌কে সেবা করা ছাড়া বিন্দুমাত্র আত্মসুখ স্পৃহা নাই। অসাধু কপটতা করিয়া সাধুর বেশ করিলেও কতক্ষণ সে নিজের বিকৃত-স্বরূপ লুকাইয়া রাখিতে পারিবে? তাহার সমস্ত কপটতা তাহার কার্য্যেই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। যশোহর জেলায় কোন গণ্ডগ্রামে এইরূপ একটি ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। এক দুষ্ট পাট্‌নী বিষয় পাইবার লোভে তাহার এক জ্ঞাতি সরিককে খুন করিয়াছিল। গ্রামবাসী ও পুলিশ কর্ম্মচারিগণের নিকট সে তাহার কৃতাপরাধ গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও ভগবদিচ্ছাক্রমে তাহার মুখের চেহারার এমন একটা বিশ্রী পরিবর্ত্তন ঘটিল যে, তাহাকে যে দেখিত সেই বলিত—'ওই বেটা খুনে আসামী'। এমন কি অজ্ঞ বালকবালিকারাও তাহাকে দেখিলে ভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিত—'ওই খুনে আসিতেছে'। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ বিশেষ কোন প্রমাণ সংগ্রহ না করিতে পারিয়া লোকটীকে ছাড়িয়া দিলেও তাহার পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল, তাহাকে সর্ব্বদাই আমরা গভীর বিষাদে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইতাম তাহার এইরূপ পরিবর্ত্তনই তাহার কৃতকর্ম্মের প্রমাণস্বরূপ হইয়াছিল। সুতরাং মানুষ যতই না কেন তাহার কপটতা ঢাকিবার চেষ্টা করুক, তাহা একদিন না একদিন প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। কপটাচারীর সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কপট শুদ্ধভক্তগণের সহিত শুদ্ধাভক্তির অনুশীলনেই কৃষ্ণবিমুখতার মূল যে অবিদ্যা তাহা বিনষ্ট হইয়া জীবহৃদয়ে উপ্ত ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইবে এবং ক্রমে তাহা বিরজা, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম ভেদ করিয়া গোলোক বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিবে।

সৎ সিদ্ধান্ত

অনেকের ধারণা যে যিনি যে মার্গই অবলম্বন করুন না কেন সকলের গন্তব্য স্থান এক। যিনি যে রাস্তা দিয়ে আসুন না কেন, সকলে সেই এক স্থানেই মিলিত হইবেন। অতএব কর্ম্মই করুন, জ্ঞানই করুন আর ভক্তিই করুন সকলেই এক স্থানে যাইবে। তবে হইতে পারে কোন রাস্তা সোজা তাতে শীঘ্রই যাওয়া যায় আর পরিশ্রমও কম হয়, আবার কোন রাস্তা কিছু বাঁকা তাতে কিছু কষ্ট হয় এবং পৌছিতেও দেরী লাগে—এই মাত্র প্রভেদ।

এই যুক্তিটী সমীচিন বলিয়া বোধ হয় না। কেন না ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য হইয়া কর্ম্মিগণ নানা দেব দেবীর উপাসনায় জ্ঞানীগণ জ্ঞান সংগ্রহে এবং যোগিগণ আসন প্রাণায়াম

প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হন। সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে উঁহারা নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করেন অর্থাৎ কর্ম্মিগণ ভুক্তি লাভ করিয়া ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্লোকে এবং নিষ্কাম কর্ম্মী জ্ঞানী এবং যোগিগণ জড় মুক্তি লাভ করিয়া মহঃ জনঃ তপঃ সত্যলোকে গমন করিয়া থাকেন। সকাম কর্ম্মিগণের পুণ্য ক্ষীণ হইলেই তাহারা মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে, জ্ঞানীযোগিগণের গতিও সেই প্রকার। তাঁহারা ব্রহ্মার আয়ুপরিমিত কাল তথায় অবস্থান করেন মাত্র, ব্রহ্মার আয়ু শেষ হইলেই আবার তাঁহাদিগকে মর্ত্ত্যে আসিয়া সুখদুঃখের অধীন হইতে হয়। শাস্ত্র বলেন—

'যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতা।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপিমাম্॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনো অর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

নানা দেবতার উপাসকগণ সেই সেই দেবতার লোক পিতৃপূজক পিতৃলোক, ভূতপূজক পৌত্তালকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু যাহারা আমার নিত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া আমারই উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকই অনিত্য। সেই সেই লোকগত জীব সকলকে পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয় কিন্তু হে কৌন্তেয় আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, তবে যে শাস্ত্রে জ্ঞানীযোগীর মুক্তির কথা শুনিতে পাও তাহার তাৎপর্য্য এই যে তাহারা যদি সাধুসঙ্গে ক্রমশঃ কেবলাভক্তি লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের অনায়াসে মুক্তি হইয়া থাকে। কর্ম্ম জ্ঞান যোগ প্রভৃতির উদ্দেশ্য যখন ভক্তি হয় তখন উহাদিগকে গৌণভক্তি বা মিশ্রভক্তি বলা হয়। মিশ্রভক্তি এবং কেবলাভক্তির ও প্রাপ্য স্থান এক নহে। অধিক কি সকল ভক্তেরও একপ্রকার গতি বা প্রাপ্য স্থান এক নহে, তবে তাহারা মুক্ত, তাঁহাদিগকে আর মর্ত্ত্য লোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

কেহ কেহ বলেন আগে শরীর রক্ষা করাই কর্ত্তব্য, শরীর রক্ষা না হইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম কে করিবে? সজ্জনগণের সিদ্ধান্ত—এই শরীর অনিত্য, যে দিন ইহার পতন হইবে সে দিন শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও আমরা ইহাকে রক্ষা করিতে পারিব না, ভগবানই একমাত্র রক্ষা কর্ত্তা এবং পালন কর্ত্তা, সুতরাং শরীর রক্ষার ছল করিয়া ইন্দ্রিয় তর্পণে মত্ত হইলে পুনঃ পুনঃ সংসার ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। এই সুদুর্ল্লভ মানব জীবন লাভ করিয়া পরমার্থের অন্বেষণই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শরীর রক্ষা গৌণ।

কেহ কেহ বলেন—একই জলকে বিভিন্ন দেশের লোক তাহাদের বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্দ্দেশ করে, যেমন ইংরাজেরা জলকে বলেন ওয়াটার, মুসলমানগণ বলেন পানি আর হিন্দুগণ বলেন জল, তদ্রূপ একই ঈশ্বরকে ইংরাজেরা বলেন গড্, মুসলমানগণ বলেন আল্লা আর বৈষ্ণবগণ বলেন বিষ্ণু, শৈবগণ বলেন শিব, শাক্তগণ বলেন মহামায়া দুর্গা কালী, গাণপত্যগণ বলেন গণেশ ইত্যাদি।

বেদ বলেন—যাতে সর্ব্বপ্রকার ভাব সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে সেই বস্তুই ভগবান্। আল্লা বা গড্ শব্দে সর্ব্বভাবের সামঞ্জস্য নাই, কোন একটী ভাব তাহাতে লক্ষিত হয় মাত্র। আল্লা শব্দে যাহা অপেক্ষা বৃহৎ শব্দ বস্তু আর নাই, কিন্তু ভগবান্ বৃহৎ হইতেও বৃহৎ এবং অণু হইতেও অণু, ইংরাজগণের গড্ শব্দেও সর্ব্বভাব ব্যক্ত হয় নাই। এতৎ সম্বন্ধে বেদের সিদ্ধান্ত—ন বৈ বাচে। ন চক্ষুংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে, প্রাণ ইত্যাচক্ষতে, প্রাণো হ্যে বৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি ইতি—বাক্য সকল, চক্ষু সকল, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনসমূহ তত্তৎ নামে অভিহিত হয় না; উহারা সকলেই 'প্রাণ'—এই নামে অভিহিত হয়, তাহার কারণ এই সকল প্রাণেরই অধীন। প্রাণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। ভগবানই সর্ব্ব দেবতার প্রাণ স্বরূপ।

———

আসল ও নকল

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস শ্রীব্রজমণ্ডলে ও শ্রীগৌড়মণ্ডলে সর্ব্ববৈষ্ণব-সমাজ-প্রণম্য—এবিষয়ে আর কোন মতভেদ নাই। সেই মহাত্মার অলৌকিক অনুভব দ্বারা নির্দ্দিষ্ট শ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুর যে শ্রেণীর লোকের বিবাদমুখে পণ্যদ্রব্য হইয়াছে, তাঁহারা কিছু তাঁহার মত ত্যাগী মহাপুরুষ নহেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ত্যাগে সিদ্ধ হওয়া আর ত্যাগীর অনুকরণে ত্যাগীর বেশ ধারণ, এক নহে। অনুকরণকারি সমাজে অনেক প্রকার কৃত্রিম অনুকরণের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও স্থলে শাখামৃগকেও বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া এক সাহেবের তাম্বুর মধ্যে চেয়ারে মনুষ্যের ন্যায় উপবেশন করিয়া খবরের কাগজ পড়িতে দেখা গিয়াছিল। খালি বোতল হইতে খালিগ্লাসে বায়ু ঢালিয়া পান করিবার অভিনয় করিতেও দেখা গিয়াছিল। তাই বলিয়া কি অনুকরণ-কারীকে খবরের কাগজ পড়িয়া উহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে বুঝা যাইবে? শুকপক্ষী নয়ন মুদ্রিত করিয়া উহার মানব-গুরুর নিকট হইতে যে শিক্ষা লাভ করিয়া অনুকরণ পদ্ধতি দ্বারা "পড় পাখী আত্মারাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" বাণী উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহার তাৎপর্য্য বিষয়ে পক্ষীবরের সহৃদয় অধিকার আছে স্বীকার করা যায় না। অনুকরণ বা কৃত্রিম পন্থা কখনই আসল জিনিষ দিতে সমর্থ হয় না। যদি বৈরাগীর বেষ জীবকে প্রকৃত প্রস্তাবে ত্যাগী করাইত, তাহা হইলে যাবতীয় পশু বসনাদি বিবর্জ্জিত হইয়া সন্ন্যাসিগণের গুরুর কার্য্য করিতে পারিত। "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যের লাঠি হেন বাজে"—প্রবাদ অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা "অনভ্যাসের ফোটা কপাল চড়চড় করে" প্রভৃতি নীতি-বাক্যের অসম্মাননা করেন, তাঁহারাই হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া আদর্শের কোন সম্বল গ্রহণ না করিয়া অবাধে অগ্রগামী হন। 'মুড়ি' ও 'মিছরি' কখনও এক জাতীয় হইতে পারে না। দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছের গল্পে তাহা প্রমাণিত আছে। মানুষকে ধাঁধা দেওয়া অতি সহজ, কিন্তু প্রকৃত মানুষকে ধাঁধা দিতে গেলে আপনাকেই ধাঁধায় পড়িয়া যাইতে হয়।

সিদ্ধ বাবাজী মহাশয় জগন্মান্য ও বাস্তব সত্যের উপাসক। তাঁহার নিষ্কিঞ্চন অনুরাগিগণ শুদ্ধভক্ত। অভক্তগণ বৈষ্ণববিদ্বেষ করিতে গিয়া যে ভক্তের হাব-ভাবের অনুকরণ করেন, তাহা কৃত্রিমতা মাত্র। আসল ও ভেজাল বা নকল কখনই এক পর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। ভাগ্যহীন জনগণ নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাক্রমে আসল ও নকলকে সমান জ্ঞান করে। এইজন্য শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ সাম্প্রদায়িক; আর মুড়ি-মিশ্রিকে সমজ্ঞানকারী, বিষ্ঠা-চন্দনকে একাকারকারী জনগণ নিজের ফাঁদে নিজেই পড়িয়া গিয়া কু-সাম্প্রদায়িক হইয়া বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া বসেন। ত্রিদণ্ডধারণ করিয়া রাবণ একদিন সীতাহরণ করিয়াছিল, শান্তিপুর কুলিয়ার 'ভক্তসজ্জায় একজন ভক্ত বিট্‌লেমী করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। কৃত্রিম অশ্রুজল ও ফোঁস ফোঁস দেখাইয়া বৈষ্ণবতার কাপট্যে আমরা যতই কেন না অনুকরণ করিয়া গান করিতে ও ঘিনি বাজাইতে যাই ও লোমহর্ষণের অভিনয় করি, তাহাতে কয়েকটা নির্ব্বোধ আমাদের চাতুর্য্যে পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারা উভয়েই "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" হইয়া তমিস্রের গহ্বরে পড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমান-কালে বৈষ্ণবগণের সহিত কপট-বৈষ্ণবতার সংগ্রাম চলিতেছে। সত্যের অবশ্যই জয় হইবে। নিত্য-সত্য-বস্তু ভগবান্ চৈতন্যদেব অক্ষুণ্ণ থাকিবেন, তাঁহার ধাম যোগপীঠ মায়াপুর অক্ষুণ্ণ থাকিবে—ইহাতে কাহারও সন্দেহ করিতে হইবে না। কৃত্রিম চেষ্টা জহুরীর কষ্টি পাথরে ধরা পড়িয়া যাইবে। যেহেতু আমাদের ন্যায় নেশাখোর জগতে অনেক আছে, তজ্জন্য ভোট আমরাই পাইব—এই নীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্প সংখ্যক উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত জনগণের নিকট আদৃত হয় না বলিয়া উহা অগ্রাহ্য করা হইবে, এরূপ নহে। কোয়াটার লেণ্টস্ ধারা-পাত-পড়া গণিতজ্ঞের নিকট আদরের বস্তু না হইলেও

উচ্চগণিতজ্ঞগণের লোভনীয় বস্তু। নির্বোধ প্রাকৃত ধন-লোভী অবান্তর উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট জনগণের নিকট প্রাচীন নদীয়া গৌড়পুর শ্রীমায়াপুরের বিপ্রালপ্সামূলে আদর না থাকিলেও ভক্তরাজের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সংস্থান কোনও দিনই কক্ষচ্যুত হইবে না। কুলিয়া সহরে ধন-দৌলতের কল-কৌশলের লোভ-মোহের অভাব নাই, তাহা সত্ত্বেও যদি মলিন জীর্ণ বসন পরিধানকারী বৈষ্ণব-সম্রাটের নির্দিষ্ট স্থানের আদর করিবার লোক পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার বিপরীত বুদ্ধিকারী জনগণের দুর্ব্বলা চেষ্টা কখনই জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিতে পারিবে না। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-মুগ্ধ জনগণ সত্যের উপাসকের নিকট আদর পাইতে পারেন না। যে কাল পর্য্যন্ত জীবের দেহ-দ্রবিণলোভ-পাষণ্ডতা প্রভৃতি ভগবন্নাম ও ভগবদ্ধামের স্বরূপোপলব্ধিতে বাধা দিবে, তৎকাল পর্য্যন্ত সত্যের উপাসনা তাহাদিগকে শত যোজন দূরে রাখিবে।

ভক্তিলাভের উপায়

আমাদের মধ্যে হয়ত অনেকেরই মনে হয়, কৃষ্ণভজন করিলেই যখন জীবের সুবিধা হয় আর না করিলেই যত অসুবিধা, তখন জীব কেন কৃষ্ণভজন করেন না? কথাটী বড়ই সুন্দর, ভাবিবারই কথা বটে। কতকগুলি জীব তাঁহাদের জাগতিক নানাপ্রকার সুখদুঃখ অভাব অভি-যোগের মধ্যে থাকিয়াও কেনই বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পাগল হন, আর কতকগুলি জীব কেনই বা সেই 'কৃষ্ণ' নামটী পর্য্যন্তও শুনিবার ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন না। ইহার কারণ কি?

ভ্রম প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয় রহিত কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ ত্রিকাল-দর্শী সাধু মহাজন ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন—ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥"—ভগবদ্ভক্তসঙ্গক্রমেই জীবের কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, সেই ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ আবার পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতি বলেই লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং সুকৃতিই জীবের কৃষ্ণপ্রাপ্তির মূল কারণ। এই সুকৃতি নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদে দুই প্রকার। যে সুকৃতদ্বারা সাধুসঙ্গ ও ভক্তি লাভ হয়, তাহা নিত্য; আর যে সুকৃত দ্বারা ভুক্তি ও নির্ব্বেদমুক্তি লাভ হয়, তাহা নৈমিত্তিক বা অনিত্য। কোন প্রয়োজন লাভার্থ কার্য্যকালে যাহার বিদ্যমানতা অথচ প্রয়োজন প্রাপ্তির পর আর যাহার বিদ্যমানতা নাই, তাহা অনিত্য এবং কার্য্যকালে ও ফল-লাভের পরও যাহার বিদ্যমানতা, তাহাই নিত্য। ভক্তি-লাভের পূর্বেও যে সকল উপায় বা সাধন অবলম্বন করা হয়, পরে অর্থাৎ সিদ্ধি কালেও তাহারই উন্নতাবস্থা পরি-লক্ষিত হয়। কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির অনুষ্ঠান গুলি ফললাভের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে, পরে আর তাহার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সুতরাং কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি সকলই নৈমিত্তিক সুকৃত; ভক্তসঙ্গ ও ভক্তিক্রিয়াসঙ্গই নিত্য সুকৃত। নৈমিত্তিক সুকৃত দ্বারা অন্যান্য গৌণফল লাভ হইতে পারে বটে কিন্তু মুখ্যফল যে কৃষ্ণপাদপদ্মে অনন্যভক্তি তাহা লাভ হয় না। জন্মজন্মান্তরে যিনি ভক্তসঙ্গজনিত নিত্যসুকৃতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই কৃষ্ণপাদপদ্মে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। "শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম্ম কৃত হয়॥" বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন করিলে যেমন শাখাপ্রশাখা সেই জল প্রাপ্ত হইয়া সজীবতা লাভ করে, মুখ্য প্রাণে আহার প্রদান করিলে যেমন সর্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, কৃষ্ণ-সেবা করিলেও সেইরূপ দেব, নর, তির্য্যক প্রভৃতি স্থাবর, অস্থাবর সকলেরই পরিতৃপ্তি লাভ হয়—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনন্যভাবে কৃষ্ণে ভক্তি করার নাম—শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা প্রথমে কোমল অবস্থায় থাকে, পরে ভক্তসঙ্গ ও ভক্তিক্রিয়াসঙ্গক্রমে দৃঢ়তা লাভ করে। ভক্তসঙ্গ ছয় প্রকারে সাধিত হয়, যথা— ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য

ভক্তকে প্রীতি পূর্ব্বক দান, ভক্তদত্ত বস্তু প্রতি গ্রহণ, স্বীয় গুপ্তকথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা, ভক্তের গুপ্তবিষয় অর্থাৎ ভজনকথা জিজ্ঞাসা করা, ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা, এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান। ভক্তসঙ্গেই ভক্তিক্রিয়া সঙ্গ হইয়া থাকে। যেমন শুদ্ধভক্তগণ হয়ত নগরকীর্ত্তন, ভাগবতপাঠ বা মহামহোৎসবের অনুষ্ঠানাদি করিতেছেন, সেই সকল ভক্তিকার্য্যে কোন প্রকারে যোগদান করিলেই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় হয়। শাস্ত্রে হরিমন্দিরমার্জ্জন, বিষ্ণুমন্দিরে তুলসীর নিকট প্রদীপ দান, হরিবাসর সম্মান প্রভৃতিকে ভক্তিক্রিয়া বলিয়াছেন। সেই ভক্তিক্রিয়া শুদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত না হইয়া ঘটনাক্রমে হইলেও সুকৃতি সঞ্চয় হয়, তবে কপটতা বা বৈষ্ণবাপরাধ ও নামাপরাধ বর্ত্তমান রাখিয়া বহু জন্ম ধরিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে কোন ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত হইবে না। নামাপরাধ না থাকিলে সঙ্কেত (অর্থাৎ অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াও যে নাম উচ্চারণ), পরিহাস (অর্থাৎ উপহাসচ্ছলে নাম উচ্চারণ) ও স্তোভ (অর্থাৎ অগৌরবের সহিত নাম উচ্চারণ) ও হেলা (অর্থাৎ অনাদর পূর্ব্বক নামগ্রহণ) সহকারে নাম গ্রহণ কালেও ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় হয়। ভক্তিক্রিয়ামাত্রেরই ভক্তিপোষক একটি শক্তি আছে! ভক্তিপোষক সুকৃতি মাত্রই নিত্যসুকৃতি। ভক্তিক্রিয়া যাহার যত শুদ্ধ-শ্রদ্ধার সহিত কৃত হইতে থাকিবে, তাঁহার এই সুকৃতি ততই বলবান্ হইয়া ক্রমে সাধুসঙ্গ ও তাহা হইতে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে।

এই নিত্যসুকৃতিলাভ ঘটনাক্রমেই হইয়া থাকে। দুষ্কৃতিবশে দুর্জাতিতে জন্ম হইলেও নিত্যসুকৃতি লাভ হইয়া হরিভজনযোগ্যতালাভে কোন বাধা নাই। জীবমাত্রেরই সুকৃতিসঞ্চয়ের যোগ্যতা আছে। একটী মূষিক এক সময়ে বিষ্ণু মন্দিরে একটী নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের তৈল মাখান পলিতা টানিতে গিয়াছিল। ঘটনাক্রমে পলিতাটির অগ্নি না নিভিয়া যেমন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, মূষিক অমনি ভয়ে পলিতাটী ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। ইহাতে মূষিকের বিষ্ণুগৃহে প্রদীপদানের একটি নিত্য সুকৃতি লাভের ফলে তাহার ভক্ত গৃহে জন্মলাভ হইয়া কৃষ্ণভক্তিলাভ হইয়াছিল। কোন ব্যাধ দৈবক্রমে শিবব্রত দিবসে উপবাস ও জাগরণ করিয়া নিত্যসুকৃতির ফলে হরিভক্তি লাভ করিয়াছিল। অবশ্য সুকৃতিলাভ কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে হইবার নহে, হঠাৎ ঘটনাক্রমেই হইয়া থাকে। জন্মজন্মান্তরে এইরূপ সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইতে হইতে জীবের সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা হয়। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতে জীবের শ্রদ্ধা ক্রমে দৃঢ় হইতে থাকে। সেই দৃঢ়তাপ্রাপ্ত অবস্থাতেই জীবের সদ্গুরু পাদাশ্রয় হইয়া থাকে। তখন শিষ্য প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে গুরুদেবের প্রদত্ত ভজনক্রিয়া করিতে করিতে অনর্থ মুক্ত হইতে থাকে, অনর্থ মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভগবৎপাদপদ্মে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই আসক্তি পর্য্যন্ত সাধন ভক্তি, পরে ভাবভক্তি, তৎপরে প্রেমভক্তি লাভ হয়।

সুতরাং কৃষ্ণভজন—একমাত্র ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিসাপেক্ষ। সেই জন্যই শুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছিলেন যে— মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণব—এই চারিটিতে স্বল্প পুণ্যবান্ ব্যক্তির কখনও বিশ্বাস হইবে না। স্বল্পপুণ্য বলিতে নৈমিত্তিক সুকৃতি, তাহা দ্বারা স্বর্গাদি অনিত্য সুখ কিম্বা আত্মবিনাশরূপ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। 'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।' সাধুসঙ্গ ভিন্ন কৃষ্ণভক্তিলাভের আর অন্য উপায় নাই। সাধুসঙ্গফলেই জীবের কৃষ্ণে অবিশ্বাস দূর হইবে, কৃষ্ণভজনই যে মানবজীবনের একমাত্র কৃত্য—অন্যান্য কৃত্য কৃষ্ণভজনের অনুকূল হইলেই তাহার মূল্য নতুবা বৃথা—এই বুদ্ধির উদয় হইবে। যেদিন হইতে জীব এই কৃষ্ণভজনকে তাহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া জানিতে পারিবে, সেদিন হইতে তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, মাৎসর্য্য বুদ্ধি আর থাকিবে না, বিশ্ব একটী শান্তির নিকেতন হইবে—নিত্যানন্দের হাট বসিয়া যাইবে। জানিনা জগতের ভাগ্যে সেদিন কবে আসিবে।

——::*::——

ওরে বাবা সাপ !

বাবা ভোলানাথ! এত উচ্চকণ্ঠে কাতরস্বরে চীৎকার করিতেছ কেন? বুঝি কি কোন তোমার অমঙ্গল ঘটিয়াছে? "ও বাবা গো! ভীষণ কালসাপ আমার সম্মুখে ফণা উঁচু করে রয়েছে। ভয়ে আমার সর্ব অঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে মুখে আর কথা সরিতেছে না! বাবা! শীঘ্র আমায় রক্ষা কর, আমায় রক্ষা কর, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়।" পিতা পুত্রের রক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি এক বড় লগুড় লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, —কোথায়ও সর্প নাই একটী নারিকেলের রশ্মি সর্পাকারে পুত্রের সম্মুখে পতিত রহিয়াছে। পিতা পুত্রের রজ্জুতে সর্পভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—পুত্র! এই ফুট জ্যোৎস্নার রাত্রিতে রজ্জু দেখিয়া তোর সর্প বোধ হইতেছে ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।

তাই বলিতেছি—জীব আত্মহারা হইয়া প্রকৃত বস্তুতে বিপরীত দর্শন করিতেছে। রজ্জুতে সর্পভ্রম, মরীচিকায় জল বুদ্ধি, জলের নীচে আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, দর্শন, ট্রেনে যাইবার কালে পথস্থ বৃক্ষ লতাদিগকে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ধাবমানবোধ যেন দিবসে জাগিয়া নিশার স্বপন দেখিতেছ। হে জীব, এই ত তোমার বুদ্ধি শক্তি এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়া ভগবদ্ভক্ত, ভগবদ্ধাম ও তাহার মূর্ত্তিকে মাপিয়া লইবার জন্য সাহসী হইয়াছ। তুমি জান না, ভগবদ্ধাম চিন্ময়, তাহার মূর্ত্তি চিন্ময় ও তাহার ভক্ত চিন্ময়, এ জড়-চক্ষুদ্বারা কখনও তাহাদের লক্ষ্য হয় না।

কিনা তুমি পাণ্ডিত্যের গর্বে, বুদ্ধির গর্বে ভগবদ্ভক্ত পরীক্ষা করিতে আসিয়া তাহাদের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া নিজে নরকের পথ পরিষ্কার করিতে উদ্যোগী হইয়াছ। জাননা কি? দোকানের খাটি মাল সোনা, রূপা, দুগ্ধ চেনা মজবুত লোকের দরকার। কিনা তুমি নিজকে বুঝদার অভিমান করিয়া বাজারের নকল সোনা ও খড়িগোলা দুধকে খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করিতেছ। তোমার ন্যায় অন্ধ ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তের বাহিরের আচার ব্যবহারে অভক্ত দেখিয়া তাহার চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিতে বসিয়াছ। ভগবদ্ভক্ত কানা নয়, খোঁড়া নয়, বোকা নয়, মূর্খ নয়, রোগগ্রস্ত নয়, নীচ-জাতি নয়, তথাপি বাহিরে ঐ সমস্ত দেখিয়া নিন্দা করিতেছ।

সোনা যদি বিষ্ঠা মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে কি তাহার গুণ নষ্ট হয়? গঙ্গা জলে যদি বিষ্ঠা ভেসে যায়, তা হ'লে কি তাহার জল অপবিত্র হয়? সে জলে কি ভগবৎ পূজা হয় না? অতএব সাবধান, ভগবদ্ভক্তকে কখন প্রাকৃত মনুষ্য বুদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে নিন্দা করিও না। শুন, শাস্ত্র কি বলিতেছেন—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।

যাহারা সজ্জন তাহারাই সজ্জনের আদর জানেন। তাই আমাদের হৃদয়েশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের ন্যায় প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কণ্ডু-রসাগ্রস্ত সনাতনপ্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন।



আড়ম্বরে ভুলো না

চাকচিক্যময় বস্তুমাত্রই কিছু স্বর্ণ নহে—একথাটি আমরা অনেক সময় মুখে বলি কিন্তু কার্য্যকালে তাহা ভুলিয়া যাই। বাহিরের আড়ম্বর দেখিয়াই আমরা আত্মহারা হইয়া যাই! ভিতরের সত্যতা অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন বোধ করি না। বাহিরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া বর্ত্তমানে আমাদের চিন্তাস্রোত একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমাদের ধারণা পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা আমাদের মত ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে না, তাদের দেশে জাতিভেদ নাই, ভারতবর্ষের মত নৈতিক ধর্ম্মেরও তত বাড়াবাড়ি নাই, স্ত্রীলোকেরা আমাদের দেশের মত পর্দ্দানসীন নয়, তাই তারা এত উন্নত হইতে পারিয়াছে, আমাদের দেশের লোক ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে অধঃপাতে গিয়াছে। 'ধর্ম্মের কাগজ' নাম শুনিয়া কোন কোন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা মশায় আপনাদের কাগজ জগতের কি উপকার সাধন করিতেছে, উহাতে কৃষি-শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান, কাব্য, অলঙ্কার কিছুই নাই, কেবল ধর্ম্ম কর ধর্ম্ম কর। আপনারাই ত জগতের অমঙ্গল সাধন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। ইংলণ্ড কি ছিল কি হয়েছে, আর ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে ভারতের কি দুর্দ্দশা হয়েছে। প্রথম মুখে কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়াই মনে হয় কিন্তু ঐ কথাগুলির মূলে কত সত্য আছে বিচার করা যাউক। বিচারটি কঠিন, গম্ভীরভাবে আলোচনা না করিলে বুঝিবার উপায় নাই। অতএব পাঠকগণ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রবন্ধটী আলোচনা করিয়া নিজেদের স্বাধীন বিচার-বৃত্তির দ্বারা বিচার করিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন। প্রথমতঃ আধুনিক জাতি মাত্রেরই জ্ঞান চক্ষু পরিস্ফুট না হওয়ায়, তাহারা ধর্ম্মতত্ত্ব জানে না, কাজে কাজেই তাহারা জড় চক্ষে যাহা দেখে তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে এবং এবং তাহারই উন্নতি সাধনে বিশেষ যত্নবান হয়, ইহা তাহাদের কালোচিত স্বভাব। বর্ত্তমানে যতই তাহারা উন্নত হইতেছে ততই তাহারা ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। যাহারা ধর্ম্মের খোঁজ লয় না, তাহারা পার্থিব উন্নতির জন্য যত্ন করিতে বাধ্য হইবে। তদ্দ্বারা পার্থিব উন্নতি কিছু করিতেও সমর্থ হইবে; কিন্তু তদ্দ্বারা জগতের লোকের অভাব অভিযোগ কতটুকু দূর হইবে বা হইতেছে সেটুকু একবার প্রত্যক্ষ করুন। জড়বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা রেলগাড়ী, ষ্টীমার জাহাজ, টেলিগ্রাফ, এরোপ্লেন প্রভৃতি নূতন নূতন জড় সম্ভোগোপকরণ আবিষ্কৃত হইয়া আমাদের জীবিতাবস্থায় কিছু উপকার সাধন করিতেছে বলিতে হইবে কিন্তু কই অভাব ত মিটিতেছে না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, সংক্রামক নানাপ্রকার ব্যাধি, ডাকাতী, যুদ্ধ ইত্যাদি ক্লেশের বরং দিন দিন বৃদ্ধিই হইতেছে, হ্রাস হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বের পণ্ডিতগণ বিশেষ গবেষণা পূর্ব্বক বিচার করিয়াছেন যে পার্থিব উন্নতি যতই হউক না কেন জীবের অভাব কোন দিন নিবৃত্ত হইবে না বরং বৃদ্ধিই হইবে। পার্থিব উন্নতির চরম পরিণতিই অবনতি। কম্পাশের কাঁটা যে দিকেই ঘুরাইয়া দেওয়া হউক না কেন উত্তর দিকেই থাকিবে। সেইরূপ পার্থিব উন্নতি যতই বৃদ্ধি হউক না কেন উহার চরম পরিণতিই অবনতি বই আর কিছু নহে। জড়-জগতের একটা সীমা আছে, সীমার শেষ পর্য্যন্ত পৌছিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে হইবেই হইবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বাদী আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে চাই না, তাই সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন—তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্য্যধঃ। তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্ব্বত্র গভীররাহসা॥—বিবেকী লোক সেই বস্তুর জন্যই যত্ন করেন, যাহা এই প্রাকৃত জগতে উচ্চ নীচ সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়াও পাওয়া যায় না। প্রাকৃত জগতে যে সুখ আছে তাহা গভীর বলযুক্ত কাল-দ্বারা চালিত হইয়া দুঃখের ন্যায় বিনা চেষ্টাতেও লাভ করা যায়।

এই প্রবন্ধটী পড়িয়া হয়ত অনেকেই ভুল বুঝিতে পারেন। তাঁহাদের মনে হইবে যে পার্থিব উন্নতি সাধনে একেবারে

উদাসীন হইয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় পরমার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হওয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সারগ্রাহি ধার্ম্মিক মহোদয়গণ কেবল চিৎপর হইয়া পার্থিব উন্নতি সাধনে বিরত থাকেন এরূপ নয়। আহার, বিহার, ব্যায়াম, শিল্পকার্য্য, বায়ুসেবন, নিদ্রা, যানারোহণ শরীর-রক্ষা, সমাজ রক্ষা, দেশভ্রমণ প্রভৃতি কার্য্য তাঁহাদের চরিত্রে যথাযোগ্য সময়ে লক্ষিত হয়। তবে তাঁহারা ঐ সকল পার্থিব উন্নতি সাধনই একমাত্র কৃত্য এরূপ মনে করেন না, কিন্তু ঐ সকল পার্থিব অর্থের সাহায্যে পারমার্থিক উন্নতি সাধনই একমাত্র মানব জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন, এইমাত্র পার্থক্য। সাধারণভাবে বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইবে যে, আমরা জগতে কয়েকটা দিনের জন্য আসিয়াছি মাত্র, কবে এই স্থান হইতে হঠাৎ চলিয়া যাইতে হইবে তাহার ঠিক নাই সুতরাং জগৎ ভগবদিচ্ছায় সুখময় হইলেও আমার তাহাতে বিশেষ কিছু লাভ নাই। এখানে কিছুদিন থাকিয়া আবার আমাকে কষ্টের রাজ্যে চলিয়া যাইতে হইবে। অতএব আমরা যতদিন বাঁচিয়া থাকি ততদিন আমাদের পার্থিব উন্নতিসহকারে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করাই একমাত্র জীবনের ব্রত হওয়া উচিত।

যুক্তির দৌড়

আমরা অনেকেই যুক্তিবাদী। আমরা যুক্তিরই প্রশংসা করি, যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দিতে পারিলে বুঝি, নতুবা বুঝিতে চাইনা। আমাদের যুক্তির নিকট অনেক সময় শাস্ত্রও হার মানে। আমরা মনে করি শাস্ত্রকারগণ আমাদের যুক্তি অবলম্বন করিয়াই শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, অতএব শাস্ত্র যদি আমার যুক্তির সহিত এক হয় তবেই শাস্ত্র। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়াই আমরা অনেক সময় বলি—এই বিশ্বকে ভগবান্ আমাদের ভোগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, এই বিশ্ব ভোগ করিবার জন্য ভগবান্ আমাদিগকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়াছেন। মদ্য, মাংস, স্ত্রী প্রভৃতি আমাদের ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে; যদি তাহাই না হইবে তবে ভগবান্ উহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন কেন? অতএব যে কয়েকদিন বাঁচিয়া থাক, ভোগ করিয়া লও;. হেঁসে নাও ছুদিন বই ত নয়।

বলিহারী যুক্তি, এইরূপ যুক্তি শুনিয়া এক শ্রেণীর লোক যুক্তিবাদীর বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। আবার অন্য শ্রেণীর লোক ইহাকেই সদ্‌যুক্তি মনে করিয়া যুক্তিবাদীর বিচারের প্রশংসা করিতেছেন। যুক্তিবাদীর বিচারটী ঠিক একচক্ষু হরিণের মত। কোন সময় একচক্ষুহীন হরিণ নদীতীরে তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণ করিত। সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, জলপথে কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা নাই। অতএব সে তাহার কাণা চক্ষুটী সর্ব্বদা নদীর দিকে রাখিত। কিন্তু সে যেদিকে বিপদের সম্ভাবনা নাই মনে করিয়াছিল, সেই দিক হইতেই বিপদ আসিয়া তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিল। আমাদের যদি বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে আমরা বিচার করিতাম—ভগবান্ আমাদিগকে ছুইটী চক্ষু দিয়াছেন, আমরা এক দিক্ মাত্র দর্শন করিব কেন? ভগবান্ একদিকে যেমন ক্ষণিক সুখকর সামগ্রী সমূহ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, আবার অপর দিকে তদ্রূপ অসংখ্য ক্লেশও সৃষ্টি করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তিনি আমাদিগকে ইহাও প্রত্যক্ষ করাইতেছেন, যে ভোগে যে পরিমাণ সুখ আছে, তাহার চতুর্গুণ দুঃখও ভোগ করিতে হইবে। অতএব সাবধান হও। ভোগ্য বস্তুর রূপে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের ন্যায় অকালে প্রাণ হারাইও না। এখানে যত হাঁসি তত কান্না, ছুদিন হাসিবে, ছু মাস কাঁদিতে হইবে। যদি তুমি সুবুদ্ধিমান হও, তবে অবশ্য

শুদিক্ বিচার করিয়া কার্য্য করিবে। ভোগে সুখ নাই একবার সমগ্র জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ভোগ করিয়া কে সুখী হইতে পারিয়াছে? ভোগ্য বস্তু যতক্ষণ না ভোগ করা যায়, ততক্ষণ মনে হয় উহাতে কতই না আনন্দ, কিন্তু ভোগ হইবামাত্রই নিরানন্দ আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিয়া বসে, ইহা প্রত্যক্ষ। তবে দেখিয়া শুনিয়াও আমরা বুঝি না কেন? তাই ভগবান্ গৌরসুন্দর আমাদিগকে বলিয়াছেন, দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল এই মন্দ—এই সব ভ্রম। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি তাহার বুদ্ধির সংকীর্ণতা হেতু যে ভাল মন্দ বিচার করে, তাহার কোনটাই ঠিক্ নহে; ভ্রমপ্রমাদাদিপূর্ণ। শাস্ত্রকারগণ আমাদের মত বিষয়-ভোগাসক্ত ছিলেন না সুতরাং তাঁহাদের বিচারে কোন প্রকার দোষ নাই নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

—::*::—

ভাই কুতার্কিক

আমি শ্রৌতপন্থী, আর তুমি ভাই কুতার্কিক; আমরা দুই ভাই মানুষের মাথায় ব'সিয়া ঘাড়ে পা দিয়ে, পৃথিবীতে বিচরণ করি। আমরা দুই ভাই বটে, কিন্তু পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই, তাই, আমাদের দুই মায়ের পরিচয় না দিলে আমরা পরস্পরকে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের মায়ের পরিচয় পূর্ব্বে মায়াবাদী ও তত্ত্ববাদীরা বলিয়া গেছেন। মায়াবাদীরা বলেন,—'জগৎ মিথ্যা, মানবজ্ঞান মিথ্যা,—ব্যবহারিক মাত্র; তর্কদ্বারাই একমেবাদ্বিতীয়ং স্থাপন করা যায়, অধ্যাসবশে অজ্ঞানের ক্রিয়া তাৎকালিক হইলেও উহাদের বাস্তব সত্তা নাই, কিন্তু লৌকিক প্রমাণের আশ্রয়ে রাবণের সিঁড়ি বাঁধনের policy-তে অগ্রসর হইয়া নির্ব্বিশেষকেই চরম বলিয়া নিজে বুঝিব ও লোককে বুঝাইব।

তত্ত্ববাদী বলেন—হরি নিত্য পরতত্ত্ব, অখিল-আম্নায়-বেদ্য বিশ্ব সত্য, জীবসমূহ ভিন্ন, জীবের তারতম্য আছে, জীবমাত্রেই বৈষ্ণব। বিষ্ণু পাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি।

সুতরাং দুই ভাইয়ের দুই মায়ের পরিচয়ে একটু তফাৎ হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্যই আমরা বৈমাত্রেয় ভাই। ভাই কুতার্কিক, আমি যে তোমাকে কুতার্কিক বলি, তুমি তোমার সেই দুর্নাম কাটাইবার জন্য আপনাকে শ্রৌতপন্থী বলিয়া গোজামিল দেও, তাহা ত তোমার আচার বিচারে ধরা পড়িয়া যায়।

তুমি তোমার চোখ, কান, নাক, জিভ ও চামড়া দিয়া যে একঘেয়ে আংশিক ধারণা লাভ কর, সেই ধারণার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া রাবণের মত সিঁড়ি বাঁধিতে গিয়া আমার উপাস্য বস্তু জগল্লক্ষ্মীকে তোমার আয়ত্তের মধ্যে একটি ভোগের বস্তু বলিয়া কল্পনা করিতে চাও এবং সেই কল্পনায় গা ভাসাইয়া তুমি কখনও কৃষ্ণ সাজিতে চাও। পরের দ্রব্য হরণ করার পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সব এক বিচার করিয়া বাউল ধর্ম প্রচার কর, ভোক্তার বেশে আপনাকে ভগবদ্‌ভোগ্য বস্তুগুলির ভোক্তা সাজাও, কখনও বা প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া নানা দেবদেবীর উপাসক হইয়া পড়, কখনও বা সমন্বয়বাদীর ভান করিয়া জগতের বোকা লোকগুলিকে ভোগা দেও, কখন বা বল যে, "পাশ-বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদা শিব" কখনও বিচার দেখাও যে, মা ও বামার মধ্যে প্রকৃত ভেদ নাই,—বদ্ধ বিচারে ভেদ মাত্র কখনও আপনাকে মুক্তাভিমানে মাতৃ-বুদ্ধি পরিহার করিয়া বিকল্পে মাতৃ বুদ্ধিতে নিজ ভোগ্য বুদ্ধি কর, আর তর্কের সাহায্যে আমার ভাল লাগে বলিয়া প্রেয়ঃপন্থী হইয়া শ্রেয়ঃপন্থী বা শ্রৌতপন্থী তোমার ভাইকে সহস্র আকারে আক্রমণ কর, কিন্তু তোমার মঙ্গল প্রার্থী ভাই প্রেম ও স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে ভাই বলিয়া যখন সম্বোধন করে, তখনই তুমি চোখ লাল করিয়া তাহাকে বোকা বলিয়া তোমার দলে টানিয়া আনিবার যত্ন কর, তোমার ভাইয়ের সহিত নানা তর্ক বিতর্ক কর, গায়ের জোরে তোমার ভাইকেও 'বাস্তব শ্রৌতপন্থী'

বলিবার পরিবর্ত্তে 'প্রচ্ছন্ন তার্কিক বলিয়া নিজের কুতর্ক প্রবৃত্তি কলঙ্কের লাঘব কর। মনে মনে তুমি বেশ জান যে, তোমার কুতর্ক চেষ্টা দ্বারা শ্রুতি-ব্যাখ্যার আবরণে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতের পোষণ করিতেছে। তোমার এই সকল ছল প্রবৃত্তি দেখিয়া আমার শ্রৌতপন্থী ভাই কুতর্ককে সম্বল মনে না করিয়া মহাজনের নিকট বেদ-ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন, তাহাতে তুমি বিষম সঙ্কটে পড়িয়া যাও, আর তোমার বিপত্তি দেখিয়া তোমার ভাই শ্রৌতপন্থীর বড়ই দয়া উপস্থিত হয় তুমি সেই দয়াকে তোমার ভাইয়ের বোকামি মনে কর।

ভাই, কুতার্কিক, আর কতকাল তোমার কুতর্কের আগ্নেয়গিরি ছাই-চাপা করিয়া রাখিবে,—পদে পদেই যে কুতর্কানল জ্বলিয়া উঠিতেছে। সবিশেষত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি ভগবদ্‌গুণকে আক্রমণ করাই তোমার কুতর্কের স্বভাব। তোমার আক্রমণ করিবার স্বভাব ছাইচাপা থাকিলেও ছাই ফুঁড়ে ধোঁয়া বাহির হয়, আর তা' থেকেই কুতর্কের বিরুদ্ধে শ্রৌতপন্থী ভাই 'ন্যায়সুধার' সাহায্যে পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" প্রভৃতি বিচার তোমাকে দেখাইয়া দিয়া তোমার কুতর্কেচ্ছামূলক ঈশ্বরনাশ-প্রবৃত্তি বা Vandalism চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, বলিয়া তোমার বেদানুগ ভাইটিকে তোমার 'বৈমাত্রেয়' অর্থাৎ তোমার নিজ জননীর সপত্ন্যুচিত ঈর্ষাভাবের সন্তান' মনে কর। তুমি কি, ভাই, এইসকল কপটতা ছাড়িয়া দিয়া সরল হইতে পার না? জ্ঞানের বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত হইলেও আমি যে তোমার একজন অংশীদার, তুমি তাহা সমন্বয়বাদের খাতিরে স্বীকার করিলেও কাজের বেলায় আমাকে বঞ্চনা কর কেন? আমার কোন সম্পত্তি নাই; তুমিই জ্ঞানের একচেটিয়া মালিক,—এ অহঙ্কার তোমার কেন? তোমার কি মনে পড়ে না যে, ভক্তি-দ্বারাই জ্ঞান লাভ হয়? 'কাটখোট্যাই' করিলে যাহা লাভ হয়, তাহা তোমার একচেটিয়া অজ্ঞান, তোমার মুখে 'নারায়ণ নারায়ণ' শব্দ, তাহাতে তিনি তোমার ধারণায় অন্য দেবগুলির সহিত এক পর্য্যায়ে গণিত হওয়ায় 'মায়াই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মই মায়া' প্রভৃতি তোমার কথাগুলি যথার্থ জ্ঞানের পরিচায়ক, না তাহার বিপরীত? 'সকল ঘট তোমার' আর 'সকল ঘট তুমি',—এই কথা বলিয়া কেন ধৃষ্টতা কর? ইহা কি "অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" এই মতের জলন্ত উদাহরণ নহে? তুমি কখনও বা 'কর্ত্তাভজা' সাজিয়া ভক্তের ভাণ দেখাও, তুমি কখনও বা আউল-বাউল-নেড়া-কর্ত্তাভজাদির বেশে তোমার ভাইয়ের সম্পত্তি লুট করিবার শয়তানি দেখাও; সেই স্বভাবটা কি নির্গুণতা? হরিই ত একমাত্র নির্গুণ, আর তোমার কল্পিত হরি ত নির্ব্বিশেষ! তুমি লোক ঠকাইবার জন্য কৃষ্ণলীলা বিশ্বাস কর না, কৃষ্ণলীলার আদর্শটি নিজেই উপভোগ করিয়া জগতে নানাবিধ কলঙ্ক আনয়ন কর।

ভাই, তুমি কেন কৃষ্ণের স্মিতাধরটি অনিত্য, বংশী-ধ্বনিটি অনিত্য, অপাঙ্গ দর্শনটি অনিত্য, কৃষ্ণের মথুরায় মাল্য লাভ ব্যাপারটি অনিত্য, রাসক্রীড়াটি অনিত্য, বলিয়া মনে কর? এইসব ধারণা যে কতগুলি নীতিরহিত মানুষের কল্পনা প্রসূত, তাহা কি তুমি জাননা। ভগবত্তা লোপ পাইয়া নির্ব্বিশেষ অবস্থাই চরম ও সকলের মূল বলিয়া তুমি যে তিনপ্রকার দুঃখ আচ্ছন্ন সংসারে মজা লুটিবার ভাণ করিতেছ, আর নিত্য শাশ্বত ভগবদ্বস্তু কৃষ্ণের লীলার অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া নিজে গোপনে সেই সকল ভোগে রত থাকিয়া পারদারিকের পরদ্রব্যাপহরণের নিন্দা অঙ্কিত করিতেছ'—ইহা কি তোমার সাধুতার পরিচয়, না আর কিছু?

তুমি নির্ব্বিশেষবাদীর সজ্জায় তর্কের জাল পাতিয়া নির্ব্বিশেষ ভাবের নিত্যত্ব-স্থাপন-বাসনায় ভগবানের উদ্দেশে ইহজগতে প্রকৃত শুদ্ধভক্তের অনুষ্ঠানসমূহকে নির্ব্বোধের চেষ্টা বলিয়া প্রতিপাদন করিবে, আর নিজে নাস্তিক সাজিয়া মুক্তবায়ু সেবনে আনন্দ উপভোগ করিবে, চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয় দ্রব্যগুলি সমস্তই লুট করিবে, আর তোমার মরিয়া যাইবার পর সেইগুলি "উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ" বলিবার ছলনা দেখাইয়া ভক্ত সাজিতে আসিবে,—এই শয়তানি কি তোমার চতুর শ্রৌতপন্থী ভাই ধরিয়া ফেলিতে পারেন না, মনে কর? তোমার এই সকল চেষ্টাজনক জ্ঞানের সম্পত্তির বন্ধক দেওয়া মাত্র।

তাহা হইলেও আমার অংশের বন্ধক দিয়া তুমি যে নিজের অসুবিধা আনয়ন করিবে,—ইহা দেখিয়া আমার কষ্ট বোধ হয়।

ভাই, তোমার অংশীদারকে তাহার অংশ হইতে বঞ্চিত করিও না; যদি করিতে যাও, তাহা হইলে তোমার বঞ্চনা ধরা পড়িয়া যাইবে। প্রকাশ্য তর্কপন্থী হইয়া ভোগীর পোষাকে মায়াবাদী যে দৌরাত্ম্য করেন, তাহাতে শুদ্ধ-ভক্তের সম্পত্তি আক্রান্ত হয়। সমন্বয়বাদের ছলনায় বিবাদপ্রিয় মার্জ্জারদ্বয়ের সম্পত্তি বিভাগ করিতে গিয়া মর্কটের যে উহাদের সম্পত্তিগ্রহণ-পিপাসা, তাহা শিশুপাঠ্য ঈশপের গল্পে লেখা আছে। তুমি আবার তাহার দ্বিতীয়-বার অভিনয়ের জন্য ব্যস্ত কেন?

তুমি কি জান না যে কৃষ্ণভক্ত তোমার চেয়ে বেশী চতুর? সে ত' তোমার মত জড় বিষয় ভোগ্য বা কর্ম্মকাণ্ডকে শুদ্ধজ্ঞানের 'সাধন' বলিয়া স্বীকার করে না! শুদ্ধজ্ঞান-সম্পত্তির অংশীদার সত্যিকার শ্রৌতপন্থী তোমার ন্যায় কপট অণুচানমানীর বিচার প্রণালী হইতে পৃথক্ হইয়া নিজের অংশে যে চিদ্বিলাস-বিচারে আবাহন করেন, তাহা কি তোমার চিন্মাত্রবাদের মায়া-মরীচিকারপ্রলোভন দ্বারা বিপথে চালাইতে পারিবে, মনে কর।

এই সকল কথা শুনিবার পরেও, ভাই কুতার্কিক, তুমি কেন তোমার বিষয়-সম্পত্তি শ্রৌতপন্থীর বিরুদ্ধে তাহাদের সম্পত্তি লুট করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নির্ণয়ের ঘূর্ণিপাকে ফেলিয়া দিলে? ঐ ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে তোমাকে নামাইয়া লইতেও আমার অংশটুকুর দখল পাইতে আমাকে খানিক উদ্বেগ পাইতে হইয়াছে। কাহারও দ্রব্য অপর ব্যক্তি জোর করিয়া গ্রহন করিয়া পালাইতে চেষ্টা করিলে তাহার পিছু পিছু ছুটিতে হয়; সুতরাং আমার অংশ নষ্ট করিবার কুপিপাসা কেন হইল ভাই?

তুমি তোমার অংশে তর্ক বিতর্কের জাহাজ লইয়া গৌরজন্মস্থানের অপরকূলে দাঁড়াইয়াছ বটে, কিন্তু আমি ত' তোমার অংশের জন্য লালায়িত নহি। আমি তোমার কুতর্ক ও জ্ঞান-গরিমার অংশ-লাভের প্রত্যাশী নহি! উহা মল মূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করিবার পর সুস্থ হইয়া আমি মহাজনের অনুগমন করিয়া এখন নিশ্চিন্ত আছি। আমার ত' কোনই চিন্তা নাই, ভাই! তাই আমি তোমার সম্পত্তিতে খাবল দিতে দৌড়াই না, আর আমার সম্পত্তিতেও ছোবল দিবার তোমার কোন অধিকার নাই। আমি নির্ম্মৎসর সাধুগণের ওয়ারিশ, তুমি তাহার প্রতিপক্ষ সূত্রে মাৎসর্য্য-সম্পত্তিতে সম্পত্তিমান্, তাহা আমি বেশ জানি; অর্থাৎ হিংসাই তোমার ধর্ম্ম, আর অহিংসাই আমার ধর্ম্ম। শ্রৌতপন্থী—হিংসাপরায়ণ, আর কপট-শ্রৌতপন্থীর বেশে তোমার ন্যায় কুতার্কিক—অহিংসক, এইরূপ ভোগাদিতে তুমি পটু হইতে পার, কিন্তু আমি তোমার 'কারচুপি' ধরিয়া ফেলিতে পারি।

আমি কখনও পরদার, পরদ্রব্য চুরি করিয়া রাবণের পক্ষ অবলম্বন করি না;—আমি আরোহপন্থী নহি,—অবতারবাদী আর তুমি—অবতার বিদ্বেষী ও অধিরোহবাদী তোমার আমার বৈমাত্রেয় ভাই সম্বন্ধ চিরদিনই আছে ও থাকিবে। গৌরহরির নির্ম্মল ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিবার জন্য তোমার যে অবৈধ প্রস্তাব, তাহাতে আমার অনুমোদন নাই বলিয়া তুমি ক্ষুব্ধ হওয়ায় তোমার সম্বল যে মৎসরতা, তাহাকে ভাল করিয়া মিষ্ট চিনি দিয়া মাখিয়া আমার কাছে যদি ঐরূপ ভেজাল চালাইতে চাও, তাহা হইলে তোমার চালাকি দেখাইয়া দিয়া হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিব; তখন লোক তোমার স্বরূপ জানিতে পারিবে। তোমার মত কোটি কোটি ঈশ্বরবিশ্বাসরহিত চেষ্টার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সম্পাদন করিবার ভার আমার আছে। সুতরাং তুমি বিশ্বের প্রলয় পর্য্যন্ত তোমার নিজ স্বভাব দেখাইয়াও আমার সম্পত্তির নিকট কখনও আসিতে পারিবে না।

কাচভাণ্ডের মধ্যে সঞ্চিত মধু পান করিবার নিমিত্ত কাচের বাহিরে থাকিয়া তোমার যে অভিনয়, তাহাতে সাধারণ লোকে তোমার ইন্দ্রজাল বিদ্যায় মুগ্ধ হইতে পারিবে, কিন্তু কোন মাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণব তোমার চাতুরীর প্রলোভনে পৃথিবী ধ্বংস হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইবে না। তাঁহারা যে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত, তাঁহারা যে 'তোমার

চৈতন্যের' গণেশের চৈতন্যের মনঃ কল্পিত চৈতন্যের' ধার ধারেন না, ভাই! এগুলি যে মহাজন বিরোধী লোকের উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র!

ভাই; আমি—শ্রীচৈতন্যের সম্পত্তি, আর তুমি শ্রীচৈতন্যের বিরোধী হইয়া 'তোমার চৈতন্যের' দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা দেখাইতে গিয়া তোমার স্বরূপের পরিচয় দিতেছ, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদাসগণের সহিত তোমার যে নিত্য বিরোধ, তাহা তুমি ভাল করিয়া স্পষ্ট ভাবেই দেখাইয়াছ। তুমি তোমাকে চৈতন্যদাস বলিয়া তোমার তুচ্ছ বাজে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে চৈতন্যদেবের কিন্তু তাহাতে সুখ হইবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অর্থাৎ সুখ কিসে হয়, তাহা কি শুনিয়াছ? ভাই কুতার্কিক, একবার শ্রীচৈতন্যবাণীটি কি আমার নিকট শুনিবে? সেই শ্রীচৈতন্যবাণীটি এই,—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

আবার বলি,—শ্রীসনাতনের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের এই উপদেশটি কি তুমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ?

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, এই বৈষ্ণবাচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

এখন আসি, এবারকার মত বিদায়। গৌরের ইচ্ছা হয় ত আবার দেখা হবে।

—:::*:::—

মহাপ্রলয়

জগতে যেন আজ এক মহাপ্রলয় উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে অনাবৃষ্টি, প্রবল বাত্যা, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সবলে সবলে, দুর্ব্বলে-দুর্ব্বলে অথবা সবলে-দুর্ব্বলে সংঘর্ষ, রাজার ব্যবহারে প্রজার অসন্তোষ আবার প্রজার ব্যবহারে রাজার অসন্তোষ, গৃহবিবাদ, বিশ্বাসঘাতকতা, সাম্প্রদায়িক কলহ, ধর্ম্মবিপ্লব, ছলে বলে কৌশলে পরস্বাপ হরণ, নারী নির্য্যাতন, ভ্রূণহত্যা, পরসুখসহিষ্ণুতা বা মাৎসর্য্য, সত্যকে অসত্য বলিয়া প্রচার চেষ্টা, শাঠ্য, কাপট্য, লাম্পট্য, প্রভৃতি বর্ত্তমান জগতের দৈনন্দিন ঘটনা হইয়া ঘোর অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত জীব-হৃদয়েই যেন একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে—সকলেই উদাসভাবে কি যেন আরও একটী ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করিতেছে—কাহারও প্রাণে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই। যাহারা এই অবস্থার মধ্যেই আবার কোন একটি আনন্দের কল্পনা করিতেছে, নৈরাশ্য আসিয়া তাহাদের সে আনন্দের স্বপ্ন সব ভাঙ্গিয়া দিয়া সেখানে নিরানন্দ আনিয়া দিতেছে। ঘোর অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে চতুর্দ্দিকে জনমানবহীন নির্জ্জন কুটিরাভ্যন্তরে একটী মাত্র ক্ষুদ্র অনুজ্জল প্রদীপ সম্বল করিয়া স্নেহাতুরা জননী যেমন তাঁহার মুমূর্ষু সন্তানের শিরঃ সন্নিধানে উপবেশন পূর্ব্বক অতীতের কত সুখময় স্মৃতির সহিত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের আশা ও নৈরাশ্য-বিজড়িত এক আনন্দ ও নিরানন্দের মিলন-সমস্যার সমাধানে অসমর্থ হইয়া অত্যন্ত উদ্বেগপূর্ণ কাল অতিবাহিত করেন, এমন সময় সন্তানের একবার মাতৃসম্বোধনে জননী যেমন স্নেহ-বিহ্বলা হইয়া কতনা আবেগভরে সন্তানের মুখ-চুম্বন করিতে যান, আবার পর মুহূর্ত্তেই সন্তানের রোগক্লিষ্ট কাতর মুখচ্ছবি দর্শনে হতভাগিনীর বুকখানি যেন ভাঙ্গিয়া ফাটিয়া চুরমার হইয়া যায়—সমস্ত আশা ভরসা শুখাইয়া যায়, সংসার-তাপ-ক্লিষ্ট বদ্ধজীবের বর্ত্তমান অবস্থাও সেইরূপ সঙ্কটাপন্ন। হতভাগ্য কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব কেবল নিরানন্দময় জড়-জগতে খুঁজিতেছে তাহার আনন্দ, কিন্তু কোথায় সে আনন্দ! নিরানন্দ আসে, ছলনা করিতে আনন্দের বেশে—বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত হইয়া বলে—'আমি আনন্দ',

পরমুহূর্তে গম্ভীর বজ্র নির্ঘোষে জানাইয়া যায়—'আমি নিরানন্দ', আসিয়াছিলাম তোমার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে—তোমাকে নরকের পথে টানিয়া লইতে। জীব তাই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—বিষম সমস্যায় প্রপীড়িত। জীবের হৃদয়ক্ষেত্রেই আজ মহাপ্রলয়কাণ্ড উপস্থিত! কোথায় শান্তি?

একদিকে পিশাচী মায়ার জন্ম-জরা-মৃত্যু-দুঃখ-শোক-ভয়পূর্ণ অজ্ঞান-তিমিরাবৃত বিকট পৈশাচিক কোলাহলময় চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক নিরানন্দ বা জড়ানন্দর রাজ্য, অন্যদিকে নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃত সমুদ্র—যে সমুদ্র মধ্যে গোপী-ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের অশোক-অভয়-অমৃত-আধার শ্রীপাদপদ্ম প্রস্ফুটিত—যাহাতে ভক্ত ভৃঙ্গকুল পরমানন্দে কৃষ্ণগুণকীর্ত্তন-মুখে কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে কৃষ্ণপাদপদ্মমধুপান-রত; সে সমুদ্রে ভাসমান জীব আর কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশজ রোগশোকাদি ভয়-হেতু নিরানন্দ-কবলিত নহেন—তিনি তখন সেই উচ্ছলিত প্রেমরসসমুদ্রের প্রতি তরঙ্গ-হিল্লোলে পূর্ণামৃতাস্বাদনরত—তাঁহার দেহ, মন ও আত্মা সর্ব্বতো-ভাবে স্নিগ্ধতাপ্রাপ্ত।

জীব এখন কোন্‌দিকে যাইবেন, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পিশাচী মায়ার প্রলোভনে মুগ্ধ একদল ভাগ্যহীন জীব এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের প্রার্থিত আনন্দের সন্ধানে রত হইয়া বহিশ্চাক্‌চিক্যময় অগ্নিসঙ্গলোলুপ পতঙ্গের ন্যায় দশাপ্রাপ্ত হইতেছেন, আর একদল সৌভাগ্যবান্ জীব মায়াকে পিছনে রাখিয়া কৃষ্ণজনের আনুগত্যে নিষ্কপটে কৃষ্ণানুসন্ধানে ছুটিতেছেন এবং নিত্যানন্দের সন্ধান লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন। জীব তাঁহার সম্মুখে প্রত্যক্‌ ও পরাক্‌ নামক এই দুইটি বিভিন্নমুখিনী গতির বিভিন্ন প্রকার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও প্রত্যক্‌প্রবণ হইবার পরিবর্ত্তে পরাক্‌প্রবণ, তাই তাঁহার সমস্যাও ঘুচিবে না—অশান্তিও কাটিবে না। তিনি চিরদিনই ঐরূপ উদাসপ্রাণে হা হুতাশ করিয়া দিনগুলি কাটাইয়া দিবেন—ঐরূপ করিতে করিতেই একদিন চিরতরে তাঁহার জীবন লীলার অবসান হইবে।

সভা-সমিতি করিয়া—সংবাদপত্রের স্তম্ভ পূর্ণ করিয়া লিখিয়া—দু' দশজন লোক দু' দশ গ্রামে ছুটিয়া—দু' দশ লক্ষ টাকার ব্যয়ে এই সারাটি বিশ্বব্যাপী হাহাকার প্রশমিত করা কি কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইবে? মহাকালের মহাপ্রলয়কালীন সংহার লীলায় হস্তক্ষেপ করিতে এমন কোন্ সমর্থ পুরুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যে, তিনি সাহসী হইতে চাহেন? এক গ্রামের এক প্রকার অভাব দূর করিতে যাইয়া শত শত গ্রামের শত শত প্রকার অভাব ঘৃত-সম্পৃক্ত অগ্নির ন্যায় ভীষণাকারই ধারণ করিবে। তবে কি মানব পরদুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন না? পরোপকার ব্রত পালন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন না? অবশ্য করিবেন। কিন্তু মানব কেবলমাত্র জীবের ক্ষণিকদুঃখ নিবৃত্তির জন্য চেষ্টাপর হইয়া 'পরোপকারী' বলিয়া নাম লইতে যাইবেন না—পরন্তু ভগবদ্বিস্মৃতি হেতু জীব যে দুঃখ অনাদিকাল হইতে বরণ করিয়া জনম-মরণমালা স্বীকার করিয়াছে, সেই চির-দুঃখের শান্তির জন্য স্বয়ং কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইয়া প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণসেবোন্মুখ করিবেন, সেই কৃষ্ণসেবাতেই জীবের পরম উপকার—পরম মঙ্গল—পরম আনন্দ নিহিত। তাহা লাভ না করা পর্য্যন্ত জীব কখনও সুখ-দুঃখের প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়া দুঃখভোগ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবেন না। জগতে তিনিই প্রকৃত পরোপকারী—স্বদেশভক্ত, যিনি নিজে "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি"—এই মহাজনবাক্য উপলব্ধিপূর্ব্বক গোলোক বৈকুণ্ঠকেই তাঁহার স্বদেশজ্ঞানে তথায় অবস্থিত হইয়া, স্বয়ং পরবস্তু যে কৃষ্ণ, তাঁহার সেবা করিতেছেন এবং অপরকেও তাদৃশ উপলব্ধি প্রদান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। নতুবা কোথায়ই বা স্বদেশপ্রীতি আর কোথায়ই বা পরোপকার?

সুতরাং কৃষ্ণভক্তিলাভেই জীবহৃদয়ের সমস্ত নিরানন্দের চরম শান্তি—মহাপ্রলয়ের পূর্ণ সাম্যাবস্থা—সমস্ত সমস্যার অবসান।

—০—

রাজনীতি

কয়েকদিন হইল আমার একজন বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "মহাশয়, আপনাদের সংবাদপত্রে-কোন রাজনৈতিক আন্দোলন ত' দেখি না। রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনা-ব্যতীত আপনাদের পত্রিকা কি সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইবে?" আমি তখন তাঁহাকে সহাস্যে উত্তর প্রদান করিলাম—মহাশয়, আমরা রাজনীতি ব্যতীত আর কোন বিষয়েরই ত' আলোচনা করি না। তবে আপনাদের রাজনীতির ধারণার সহিত আমাদের রাজনীতির ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। আপনারা 'রাজনীতি' বলিতে প্রাকৃত জগতের অন্তর্গত দু'দশটী দেশের নশ্বর কালক্ষোভ্য রাজার স্ব স্ব স্বার্থমূলে পরিচালিত পরিবর্ত্তনীয় নীতিকে বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের রাজনীতি সেরূপ সঙ্কীর্ণ ধারণা বিশিষ্ট নহে; প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্ত জগতের—নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধিপতি—সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর যে পরমেশ্বর বিষ্ণু, তাঁহার প্রবর্ত্তিত যে নীতি, তাহাই আমাদের 'রাজনীতি'। "স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ" অর্থাৎ সর্বদা বিষ্ণুর স্মরণ করাই বিধি এবং বিষ্ণুকে বিস্মৃত না হওয়াই নিষেধ—ইহাই আমাদের রাজনীতি। জীব কি করিয়া সর্বক্ষণ বিষ্ণুর স্মরণ-নীতি রক্ষা করিতে পারেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। বিষ্ণুর একান্ত ভক্তগণই বিশ্বসম্রাট্ বিষ্ণুর সেই নীতি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করেন। যাহারা উক্ত রাজনীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া রাজভোগ্য বস্তুতে হস্তক্ষেপ করিতে যায়, বিশ্বসম্রাট্ বিষ্ণুর প্রতিনিধি ভক্তগণ তাহাদিগকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া দণ্ডিত করেন। প্রাকৃত রাজা প্রাকৃত দোষ-চতুষ্টয় দুষ্ট, সুতরাং তাঁহার নীতিও ভ্রান্তি শূন্য নহে, কিন্তু অপ্রাকৃত রাজা বিষ্ণুর নীতি অভ্রান্ত নিত্য সত্য শুদ্ধ সনাতন। সেই সনাতন নীতি বা হরিভক্তিই জগতে বহুলরূপে প্রচারিত হওয়ার উদ্দেশ্যেই নদীয়া-প্রকাশের অবতরণ। সুতরাং আমাদের পত্রিকাই একমাত্র বিশুদ্ধ রাজনৈতিক।

আমাদের রাজনীতি কখনও জীবের ব্যক্তিগত স্বার্থের মূলে আঘাত করে না, কিন্তু স্বার্থগতি যে বিষ্ণু, তাঁহারই প্রীতি-মূলে তাঁহার সেবাকেই লক্ষ্য করে। এ রাজনীতির মধ্যে কোন সারল্যের অভাব বা কৌটিল্য নাই ইহা জীবের সহজ সরল স্বাভাবিক ভাব দ্বারা পুষ্ট—নিত্যনবনবায়মান আনন্দ-রস-সম্পৃক্ত। জীবের যে দিন এই রাজনীতির গভীর রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইবে, সে দিন জীব আর দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়া কৃষ্ণসেবা-বিমুখ হইবেন না।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

খাণ্ডববনের চতুর্দ্দিকে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি অগ্নির জলন্ত প্রতাপে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বন্য শূকরগণ প্রাণের ভয়ে অগ্নির হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য ইতস্ততঃ পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলেও অগ্নি বলপূর্বক তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ভস্মীভূত করিতেছে। অগ্নি ব্রাহ্মণের হবিঃ খাইয়া পীড়িত থাকায় বহুদিন অনশন জন্য অত্যন্ত বুভুক্ষিত হইয়া যেন ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় বন্য জন্তুদিগকে ভক্ষণ করিতে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। পূর্বে রোগের যাতনায় ব্রহ্মাদি দেবের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তখন তাহাদের আদেশে রোগ প্রশমনার্থ খাণ্ডব বন দহনে উদ্যত হইলেন। কিন্তু বনবাসী ঋষিগণ কলসে কলসে জল ঢালিয়া তাহাকে নির্বাপিত করিলেন। তিনি শত শত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না।

কিন্তু এবার আর রক্ষা নাই, তিনি প্রিয়তম সখা অর্জ্জুন-সহ ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন। যাঁহার শরণে অনন্ত সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যায়; যাঁহার শরণে নিখিল দুঃখরাশি বিদূরিত হইয়া যায়, আজ—অগ্নি তাঁহারই শরণে খাণ্ডব বন সুখে দহন করিতে লাগিলেন। বনবাসিগণ পূর্বের ন্যায় সকলে সমবেত হইয়া অগ্নি নির্বাপণে উদ্যত হইলেন। কত কলসে কলসে জল ঢালিলেন কিন্তু কিছুতেই অগ্নি নির্বাপিত হইল না। বনবাসিগণের কি কথা ব্রহ্মা মহেশ্বর যদি উপস্থিত হন, তাঁহাদেরও এ অগ্নি নির্বাপণের ক্ষমতা নাই। মায়াদেবী নিজ প্রভুর সেবা-বিমুখতার জন্য যেন ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় জটাজাল বিকীর্ণ করিয়া জীবদিগকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে। মায়াগ্রস্ত হইয়া জীব যে কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার পরিসীমা নাই। আমার সংসার, আমার বিষয়, আমার ধন, আমার আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি কৃষ্ণভোগ্য বস্তুকে আমার আমার বলিয়া সংসারের জলন্ত অনলে সর্বক্ষণ দগ্ধীভূত হইতেছে। রোগ, শোক, মরণ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখে যে কি কষ্ট ভোগ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই অনল নির্বাপণের জন্য কতই না ব্রত, যজ্ঞ, ধ্যান করিতেছে কিন্তু কোনক্রমেই তাহা নির্বাপিত হইতেছে না। ভোগাভিলাষী জীব শান্তিলাভের জন্য দেবতাদিগের নিকট পুত্র, ধন ঐশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া জলন্ত অনলে ঘৃত সংযোগের ন্যায় সংসারের অনল দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত করিতেছে। যোগিগণ প্রাণায়াম, কুম্ভক, রেচক, পূরক করিয়া এবং জ্ঞানিগণ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান করিয়াও এ মায়া-অনল নির্বাপিত করিতে সক্ষম হইতেছেন না। এ মায়া অনল যে সে অনল নয়, ইনি ভগবানের কিঙ্করী কৃষ্ণবিমুখ জীবদিগকে দণ্ড দিবার মানসে এ জগতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। হে জীবগণ! যদি এই জলন্ত অনল নির্বাপিত করিতে চাও, যদি শীতল জল দ্বারা দেহের উত্তাপ নির্ব্বাপিত করিতে চাও, তাহা হইলে যাঁহার চরণে অনন্ত সমুদ্র বিরাজমান, তাঁহারই পদ-জল আশ্রয় কর, তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সংসারের জলন্ত অনল নির্বাপিত করিতে সমর্থ হইবে। ভগবদ্ভক্তি-জল বিনা এই অনল নির্বাপণে আর দ্বিতীয় উপায় নাই। কর্ম্ম, জ্ঞানের আশ্রয়ে বা দেবতান্তর উপাসনা দ্বারা কখনই এ অগ্নি প্রশমিত হইবে না। ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবানের এই অপরা মায়ায় মোহিত সুতরাং তাঁহাদের ও ভগবানের আশ্রয় ব্যতিরেকে এ মায়া জয় করার সাধ্য নাই। তাই করুণাময় ভগবান্ বলিতেছেন—

দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

অতএব এই সংসার-সমুদ্র পার হইবার জন্য ভগবচ্চরণাশ্রয় আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

———

স্বাধীনতা

সমস্ত ভারতে আজ একটা স্বাধীনতার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শুধু ভারতে নয়, সমস্ত বিশ্বে প্রত্যেক জীবের মধ্যেই এই স্বাধীনতার পিপাসা পরিলক্ষিত হয়। এ পিপাসা কোথা হইতে আসে? ইহা কি পূর্বে ছিল না, এখনই মাত্র দেখা যাইতেছে? না, তাহা নয়! কোন ব্যক্তিবিশেষ আসিয়া জীবকে শিখাইয়া দেয় নাই যে, জীব তুমি স্বাধীন। স্বাধীনতা জীব মাত্রেরই স্বরূপগত স্বভাব। স্বরাট্ স্বাধীন স্বতন্ত্র পুরুষ ভগবানের অণু অংশ জীব; ভগবানের সেই স্বাধীনতার অণু অংশ জীবও পাইয়াছে; তবে ভগবান্ স্বেচ্ছাময় পুরুষ, জীব ইচ্ছাধীন মাত্র; কিন্তু মায়ার ইচ্ছাধীন নহেন; কেননা জীবস্বরূপে মায়ার কোন সংস্পর্শ নাই। ভগবান্ জীবকে যে স্বতন্ত্রতা দিয়াছেন, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার মানুষের কথা কি দেবতাগণেরও ক্ষমতা নাই, এমন কি স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত

জীবের সে স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করেন না। জীবেরই সে স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার করিবার যোগ্যতা আছে। জীব যেহেতু তাঁহার অণুত্বধর্ম্মপ্রযুক্ত মায়া দ্বারা বশীভূত হইবার যোগ্য, সেহেতু জীব তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ মায়িক ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া ভগবদ্দত্ত সে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া বসেন॥ ভগবৎ সেবাই জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার আর ভগবদ্বিমুখতা বা মায়ার সেবাই সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। এই অপব্যবহারের ফলেই জীবকে আজ মায়ার অনুগত সম্প্রদায় নানাপ্রকারে পীড়ন করিতেছে। তাই জীব এই পীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা লাভের জন্য পাগল হইয়াছেন। কিন্তু হতভাগ্যেরা বহুদিন হইতে মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ-নির্ম্মিত নিগড়ে বদ্ধ থাকিয়া মায়ার নির্য্যাতন সহ্য করিতে করিতে এমনই পাগলের মত হইয়া পড়িয়াছেন যে, ক্লেশ-মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইলেও এখনও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছেন না বা বুঝাইতে পারিতেছেন না—কি তাঁহাদের প্রার্থনীয় বিষয়, কোথায় তাঁহাদের অভাব? তাঁহারা অন্তরে বেশ অনুভব করিতে পারিতেছেন স্বাধীনতা বলিয়া যেন একটা মহামূল্য রত্ন তাঁহারা বহুদিন হইতে হারাইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের পাইতে হইবে, তাহা পাইলেই তাঁহাদের চিরশান্তি, কিন্তু কেমন করিয়া সে রত্ন তাঁহারা পাইবেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। জগতের কতকগুলি বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে রত্নটী আবিষ্কারের জন্য নানা স্বকপোলকল্পিত পন্থা অবলম্বন করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহাদিগকে আরও একটী ভয়াবহ পরাধীন দেশে লইয়া যাইতেছে। সে দেশে অধীনতা আসিয়া তাঁহাদিগের নিকট স্বাধীনতা বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ছলনা করিতেছে, সুতরাং যে কষ্ট সেই কষ্টই থাকিয়া যাইতেছে, কষ্টের লাঘব আর হইতেছে না। এখন উপায় কি? যতক্ষণ না জীব প্রাচীন সনাতন মহাজনপন্থা বা শ্রৌতপন্থানুসরণে স্বাধীনতা-রত্ন লাভের জন্য চেষ্টাপর হন ততক্ষণ তাঁহাদের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের কোন আশা নাই।

মহাজনগণ বলেন—জীব মাত্রই স্বরূপতঃ বিষ্ণুদাস বা বৈষ্ণব; বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবাই জীবের স্বরূপগত স্বাভাবিক ধর্ম, জৈবধর্ম্ম, আত্মধর্ম বা স্বাধীনতা, আর দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি জন্য সেই স্বরূপবিস্মৃতিই জীবের পক্ষে অবৈষ্ণবতা বা পরাধীনতা। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত জীবকে আর পরাধীনতার ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই স্বভাবতঃ স্বাধীনতার প্রয়াসী। এ প্রয়াস হইতে তাহাদিগকে কেহই নিরস্ত করিতে পারিবে না। একটী কীটও একমুহূর্ত্তের জন্য অপরের অধীনে থাকিতে চায় না, জোর করিয়া ধরিয়া রাখিলেও তাহার যথাসাধ্য মুক্তির চেষ্টা করিয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধিমান মানব যে সেই স্বাধীনতার জন্য পাগল হইবে, তাহাতে আর কথা কি? তবে স্বাধীনতার ছদ্মবেশধারী অধীনতার মানুষের কোন লাভ নাই। ভগবদ্বহির্ম্মুখতাই জীবের বন্ধন, এই বন্ধন হইতে নিত্যকালের জন্য মুক্ত হওয়াই জীবের প্রকৃত স্বাধীনতা।

মায়াবদ্ধ জীবই আপনাদিগকে ভগবান্ ও তাঁহার নিজজন ছাড়া অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য এই ভাবিয়া অন্যের দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু মায়ামুক্ত ভগবদ্ভক্ত জীব ভগবান্ ও তাঁহার নিজজন ছাড়া অন্য কাহারও অধীনতা স্বীকার করেন না, সুতরাং পরাধীনতা তাঁহাদিগকে কোনও ক্লেশ প্রদান করিতে পারে না। ভারত স্বাধীন হইবে সেই দিন, যেদিন প্রত্যেক ভারতবাসী দেহ ও মনের অনিত্য ধর্ম্ম ছাড়িয়া জীবাত্মার নিত্যধর্ম কৃষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইবে—কৃষ্ণের অধীন হইবে। নতুবা স্বাধীনতা বলিয়া কোন একটী প্রকৃত জিনিষ লাভ হইতে পারে না, নকলকেই আসল বলিয়া মনে হইবে মাত্র। জাগতিক ধারণার স্বাধীনতা লাভে জীবের একটী অভাব দূর হইতে আর পাঁচটী অভাবের সৃষ্টি হইবে, কোনও অভাব সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইবে না; কিন্তু মহাজন-নির্দ্দিষ্ট স্বাধীনতায় জীবের অভাব নিত্যকালের জন্য মুক্ত হইয়া যাইবে—জীব স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্যানন্দলাভে সমর্থ হইবেন। সুতরাং বুদ্ধিমান স্বাধীনতা-প্রয়াসি জনগণের পরাধীনতা হইতে

চিরকালের জন্য মুক্ত হইবার প্রয়াসই সমীচীন এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। ঐরূপ পরাধীনতা-ব্যাধির মূল কারণ যে ভগবদ্বিমুখতা, তাহা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর না হইয়া কেবল উপসর্গ দমনের চেষ্টা সুফলপ্রসূ হইবে না। নেতৃগণ নিজেরা সদ্‌গুরুর সন্নিধানে গমন পূর্বক সেই স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে সেই স্বাধীনকথা প্রচার করুন। জীব ভগবৎসেবোন্মুখ হইলেই অচিরে স্বরাজ্য ফিরিয়া পাইবেন; নতুবা কোটি কল্প ধরিয়া চেষ্টা করিলেও তাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃত-অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইবেন না।

শ্রীধাম বৃন্দাবন

বৃন্দাবন—হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান, দ্বাপরযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া গোপীগণের সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য এইস্থানে প্রতি বৎসর রাসযাত্রার সময় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু তীর্থযাত্রীর একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে। ধনী, দরিদ্র, পাপী, পুণ্যবান্, মূর্খ, পণ্ডিত, নর, নারী, শুদ্ধভক্ত, মিছাভক্ত, পতিব্রতা, বারবনিতা সকলেই এইস্থানে আগমন করিয়া অনায়াসে নিজ নিজ মনোভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও কোন প্রকার বাধা নাই। যমুনা নদীর তীরে স্থানটি অবস্থিত, জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, তাই অনেকে স্থান পরিবর্ত্তনের জন্যও এই স্থানের আশ্রয় লইয়া থাকেন। লণ্ডন, প্যারিস, কলিকাতা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানগুলিতে যে সকল ভোগের দ্রব্য আছে, এস্থানেও সেই সকল ভোগোপকরণের অভাব নাই। জড় জগতে যেরূপ নদ-নদী, পর্বত, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ আছে, এস্থানেও সেইরূপ তাহার কোনটিরই অভাব নাই। শাস্ত্র বলেন— এস্থানে সিদ্ধ ব্রজজ্ঞানীর, অষ্টাঙ্গ যোগসিদ্ধ পুরুষের অথবা শান্ত, দাস্য ও গৌরব সখ্যরসের ভক্তদিগের প্রবেশাধিকার নাই। অধিক কি পতিব্রতা শিরোমণি, নারায়ণবক্ষবিলাসিনী শ্রীদেবীরও তথায় প্রবেশাধিকার নাই। এস্থানে প্রবেশ করিলে আর জীবকে জন্ম-মৃত্যু-ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না, তথায় হিংসা নাই। কিন্তু আজ দেখি সেই নিত্যধর্মময় ক্ষেত্রে বারবনিতাগণ তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, ব্রজবাসিগণ গোপীদিগের সহিত রাধাকৃষ্ণের মধুর নৃত্য দেখিতে না পাইয়া বারবনিতার নৃত্য ও গীত শুনিয়া তৃপ্ত হইতেছেন! আবার হিংসা ধর্মের প্রাদুর্ভাব এইস্থানেই অপেক্ষাকৃত বেশী, মনে হয়, যেন কলিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে হিংসাদেবীও অন্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে ব্রজে বাস করিয়া নিজ ধর্ম্মের চরিতার্থ করিবেন। এইসব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, অহো! এই কি সেই বৃন্দাবন। যে স্থানের মহিমা বেদ বর্ণন করিতে অসমর্থ, বৃন্দাবনেশ্বরী পতিব্রতা-শিরোমণি, সর্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুতত্ত্বের আদি বলদেব নারায়ণের পূজ্যা শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা ব্যতীত যে স্থানে প্রবেশাধিকার লাভ হয় না, যে স্থানের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যকেও ধিক্কার করে, এই কি সেই বৃন্দাবন?

বৃন্দাবনতত্ত্ব

শাস্ত্রে কিরূপ বৃন্দাবনের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন শ্রবণ করুন। চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অতীত প্রদেশে কারণ সমুদ্র বা বিরজা। বিরজার পারে ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোকের নামান্তর সিদ্ধলোক। "অহং ব্রহ্মাস্মি" "সোঽহং" বাদিগণ বহু জন্মের কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যার ফলে এই ধামে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। এই স্থানটী জ্যোতির্ম্ময়। এইস্থানে জড়বৈচিত্র্য বা চিদ্বৈচিত্র্য উভয়ই নাই বলিয়া স্থানটিকে নির্ব্বিশেষ বলা হয়। ইহার উর্দ্ধদেশে বৈকুণ্ঠ। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানসম্পন্ন ভক্তগণ যোগিজ্ঞানিদুর্লভ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সাযুজ্য—এই মুক্তি চতুষ্টয় লাভ করিয়া লক্ষ্মীর সহিত পরব্যোমনাথের সেবা করিয়া থাকেন। ইহার উর্দ্ধদেশে

মথুরা ও দ্বারকা। এস্থান ঐশ্বর্য্যমিশ্র মাধুর্য্যপর ভক্তগণের উপাস্য শ্রীরুক্মিণীরমণ বাসুদেবের বিহারক্ষেত্র। তাহার পর শ্রীধাম বৃন্দাবন, এস্থানে জন্ম মৃত্যুর কথা দূরে থাকুক, তাহাদের মূল কাল এবং মায়ার তথায় অবস্থিতি নাই। বারবনিতার কথা কি—"পন্থাস্তু কোটীশতবৎসর সংপ্রগম্যা। বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাং। সোঽপ্যস্তি যৎ-প্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্য তত্ত্বে। গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি"—জ্ঞানমার্গে বা বায়ুনিরমন পন্থা যোগমার্গে কোটী শত বৎসর গমন করিয়াও যে স্থানে উপনীত হওয়া যায় না, সেই স্থানেই বৃন্দাবন।

সেই ও এই

প্রকৃতির অতীত যোগিজ্ঞানিদুষ্প্রাপ্য বৃন্দাবন এবং ব্রহ্মাণ্ডগত বৃন্দাবনে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। একই বস্তু সর্ব উর্দ্ধে এবং সর্বনিম্নে যুগপৎ বর্ত্তমান। শাস্ত্র বলেন—

"যথা ক্রীড়তি তদ্ভূমৌ গোলোকেপি তথৈব সঃ।
অধউর্দ্ধতয়া ভেদোঽনয়োঃ কল্প্যেত কেবলং॥

ভগবান্ ব্রজভূমিতে যে প্রণালীতে ক্রীড়া করেন, শ্রীগোলোকেও তদ্রূপ। ভেদ—গোলোক উর্দ্ধপ্রদেশে বিরাজমান এবং ব্রজ পরিদৃশ্যমান জগতে প্রকট।

সর্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে নাহিক নিয়ম॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।

* * *

চিন্তামণিভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥

শ্রীধাম দর্শনাধিকার

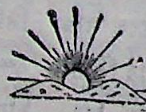
কৃষ্ণসেবা পর নেত্রেই শ্রীধাম দৃষ্ট হন; ভোগপর কামিগণ অথবা ত্যাগিগণের দ্রষ্টব্য নহেন। অহো! কবে আমাদের সেদিন হইবে, যেদিন আমরা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের গুরু পরমহংস বার্ষভানবী দয়িত দাসের কৃপায় শ্রীধামের স্বরূপ দর্শনের অধিকারী হইব। "ভাবময় বৃন্দাবন হেরিব নয়নে। সখীর কিঙ্করী হ'য়ে সেবিব দুজনে।"

ভৌম বৃন্দাবনে জন্ম মৃত্যু

ভৌম বৃন্দাবনে মায়াদেবী একটি জাল ফেলিয়া সেবা-বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণকে বৃন্দাবন দর্শনে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল বঞ্চিত জীবগণ নিজদিগকে ব্রজবাসী অভিমান করিয়া নানা প্রকার ইন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত থাকে। তাহারাই মায়িক জগতের ন্যায় জন্ম মৃত্যু ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। ইহাদের গতি অন্যাভিলাষী কর্ম্মিজ্ঞানিগণের ন্যায়ই।

ধামবাসের অর্থ

কৃষ্ণসেবাবুদ্ধির সহিত বাসই ধাম বাস। সেবাবুদ্ধিহীন ব্যক্তি ধাম বাস করিয়াও ধামবাসী নহেন। আবার সেবাবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি অন্যত্র থাকিয়াও নিত্য ধামবাসী। সেবাপরায়ণ ব্যক্তি "যে দিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলোক ভায়"—আর ভোগী বা ত্যাগীর ধামেও গৃহ-প্রতীতি হয়। তাই আজ ধামে বাস করিয়াও বার-বনিতার মুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ, তাহাদের নৃত্য দর্শন প্রভৃতি অনৈতিক ধর্ম্মের পিপাসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। শুনিতেছি—তথায় বিলাসীদিগের বিশ্বাসস্থখ-বৃদ্ধির নিমিত্ত একটি শৌণ্ডিকালয় স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। বর্ত্তমান কালোচিত বিচারে এইরূপ হওয়া উচিত, নতুবা জড় মায়ার বৈভব কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না এবং তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া চিচ্ছক্তির আশ্রয় লাভের পিপাসাও হয় না।



সভ্যতা ও অসভ্যতা

সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ আজকাল কেবল চেহারা, পোষাক-পরিচ্ছদ বা দু'এক গদ ইংরাজী জানা না জানার উপর দিয়াই লক্ষিত হয়। ইহার উপর যদি দু'দশ টাকা কি দু'দশ বিঘা জমি কাহারও থাকে, তবে তিনি যতই শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্ম করুন না কেন, আধুনিক সভ্য সমাজের একজন সভ্য না হইয়াই পারিবেন না। পথে ঘাটে চলিতে গেলে দেখিতে পাই, দু'এক গদ ইংরাজী না ঝাড়া পর্য্যন্ত আর কেহ মানুষ বলিয়াই গ্রাহ্য করিতে চাহেন না। কোন বড় লোকের বাড়ীতে বড়বাবুর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থী হইয়া গেলে, বাবু আগে চাকরকে পাঠাইয়া জানিতে চাহেন, 'দর্শন-প্রার্থী মোটরে করিয়া আসিয়াছেন কিনা, দেখিতে রূপবান্ কিনা, ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ আছে কিনা ইত্যাদি।" যদি ভৃত্য আসিয়া বাবুর ধারণানুযায়ী সভ্যতার পরিচয় প্রদান করে, তাহা হইলেই আগন্তুকের বরাত সুপ্রসন্ন, নতুবা বাহির বাড়ী হইতেই বিদায় লাভ করিতে হয়। যাঁহারা আধুনিক এটিকেট আদৌ জানেন না, সেই সেকেলে ধরণের চটিপায়, গায়ে একখানি চাদর, মাথায় শিখা, সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ কিন্তু ইংরাজী ভাষা অনভিজ্ঞ, তাঁহারা আজকালকার নব্য-শিক্ষিত বাবুদের কাছে মানুষ বলিয়াই গণ্য নহেন। জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর মদে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া যিনি অহর্নিশ কলিস্থান-পঙ্কের দাস্যে রত, যিনি গবর্ণমেন্টকে বা পাবলিক্‌কে দুই দশ হাজার টাকা ডোনেশন দিয়া, একটা রাজা বা মহারাজা কিম্বা রায় বাহাদুর প্রভৃতি খেতাব লইয়াছেন, যিনি সর্বক্ষণ পরকে উদ্বেগ প্রদানে ব্যস্ত, জীব-হিংসা-রত, নিজের সুখের জন্য পাপে যাঁহার বিন্দুমাত্র ভয় নাই, যিনি দয়াহীন, স্বার্থপর, পরসুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী, ক্রোধী, দম্ভপরায়ণ, বিষয়মদে অহক্ষণ মত্ত, হিংসা গর্ব্বই যাঁহার অলঙ্কার স্বরূপ, যিনি নিদ্রালস্য-পরবশ হইয়া সর্বদাই সুকার্য্যে বিরত—কিন্তু অকার্য্যে উদ্যোগী, প্রতিষ্ঠাশা রূপ ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণীর কুনাট্যে যিনি সর্ব্বক্ষণ মোহপ্রাপ্ত, আত্মেন্দ্রিয়সুখসাধনতৎপর হইয়া সর্বদা সজ্জন-সঙ্গবিবর্জ্জিত, যাহার চিত্ত সর্বক্ষণ অসন্তুষ্ট অতএব যিনি বাহিরে ধনবান্ বলিয়া পরিচিত হইলেও অত্যন্ত দরিদ্র, যিনি বাহিরে পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেও বন্ধ-মোক্ষ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতানিবন্ধন নিতান্ত মূর্খ, সাধু-মহাজনপন্থা উল্লঙ্ঘন-জন্য গুর্ব্ববজ্ঞারূপ ভীষণ অপরাধ বরণ-পূর্বক যিনি অশ্রৌতপন্থী, যিনি একবার ভুলিয়াও ভগবানের নাম মুখে আনেন না অথবা মুখে নাম বাহির হইলেও যাঁহার কেবলমাত্র নামাপরাধই হইয়া থাকে, যিনি চিজ্জড়সমন্বয়বাদী অথবা সত্যে মিথ্যা বা মিথ্যায় সত্য দর্শন হেতু বিবর্ত্তবাদী, যিনি যোষিৎসঙ্গী, ভগবৎ-সেবাসম্বন্ধহীন কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী, ভগবৎসেবা-ভিন্ন ইতরতৃষ্ণা-যুক্ত, সরলতা বিসর্জ্জন দিয়া কপটতাকেই যিনি একমাত্র সার বলিয়া তাহার আশ্রয় লইয়াছেন, তিনিই হইতেছেন বর্ত্তমান যুগের সভ্য মানব! আর যিনি নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণের পাদপদ্মে সর্বস্ব নিবেদন করিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎচেষ্টাপর জাগতিক লোকের প্রদত্ত মান বা অপমানে যিনি বিন্দুমাত্রও উল্লসিত বা অসন্তুষ্ট নহেন, ভগবৎসেবাসম্বন্ধ ভিন্ন জগতের লোকের সহিত যাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং যিনি জগতের লোককে তোষামোদ করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, ভ্রমাদি দোষশূন্য মহাজন-পাদাশ্রয়হেতু যিনি নিজেও তত্তদ্দোষ-দুষ্ট নহেন, সুতরাং যাঁহার সত্যে অসত্য বা অসত্যে সত্যভ্রম জন্য বিবর্ত্তবুদ্ধি নাই, হৃষীকেশের হৃষীকতোষণ ভিন্ন যাহার নিজেন্দ্রিয়তোষণে আদৌ স্পৃহা নাই, যিনি মহাজন-কথিত সর্বসদ্গুণপূর্ণ—তিনিই বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা-বাদিগণের নিকট 'অসভ্য' বলিয়া পরিচিত! ধন্য সভ্যতা ও অসভ্যতার আধুনিক ধারণা! এই বিপরীত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বর্ত্তমান জগৎ চায় তাহার উন্নতি! অসম্ভব—সম্পূর্ণ অসম্ভব।

———

ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতি

(ধর্ম্ম ও উহার উৎপত্তি :—ধর্ম্ম কত প্রকার—জীবের নিত্য ধর্ম্ম—নৈমিত্তিক ধর্ম্ম।)

ধর্ম্ম ও উহার উৎপত্তি

বস্তুর স্বভাবই বস্তুর ধর্ম্ম; ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে অগ্রে বস্তুবিষয়ক-জ্ঞান লাভের প্রয়োজন নতুবা ধর্ম্ম বিষয়ক মীমাংসা সুষ্ঠু হইবে না। বস্তুতত্ত্ব বিচারে ঈশ্বর, চেতন ও জড়—এই ত্রিবিধ পদার্থ আমরা অনাদি-কাল হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, যাহাদের ইচ্ছাশক্তি ও অনুভবশক্তি আছে তাহারা, চেতন। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি—চেতন, আর যাহাদের ইচ্ছাশক্তি নাই যথা—অগ্নি, বায়ু, জল, পৃথিবী ও আকাশ প্রভৃতি অচেতন বা জড়। ঈশ্বর এই সকল চেতন ও অচেতন বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা। জড় বস্তুর যাহার যাহা স্বভাব গুণ বা শক্তি তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যেমন জল একটি জড়বস্তু তারল্য তাহার ধর্ম্ম বা স্বভাব। জীব চেতনময় বস্তু, জড় বস্তুর ন্যায় চেতনময় বস্তুরও একটি ধর্ম্ম আছে। সে ধর্ম্মটি কি? যাহা একমাত্র চেতনেই লক্ষিত হয়, চেতন ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে লক্ষিত হয় না, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। বিশেষ বিচার করিলে দেখা যায়, জ্ঞানই চেতনময় বস্তুর স্বরূপ-পরিচয় এবং আনন্দই তাহার ধর্ম। ধর্ম্মের অভ্যুদয় কখন হইয়াছে? ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন কোন বস্তু সৃষ্ট হয় সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধর্মও সৃষ্টি হইয়া থাকে। আগে জলরূপ বস্তুটির সৃষ্টি হইল, পরে তাহার ধর্ম তারল্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নহে। চেতনময় বস্তু জীবও যখন সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার ধর্মও তখন সৃষ্ট হইয়াছে।

ধর্ম্ম কত প্রকার

সমগ্র পৃথিবীতে যতপ্রকার ধর্ম প্রচলিত আছে, সে সকল ধর্মকে পাঁচ ভাগে বিভাগ করা যায়। ১। নিত্য-সুখোদ্দেশক ধর্ম, ২। জীবের সুখ-দুঃখনাশক ধর্ম, ৩। জীবের অনিত্য সুখোদ্দেশক ধর্ম, ৪। জীবের সমষ্টি সুখ-বর্দ্ধক নৈতিক ধর্ম ও ৫। জীবের জড় সামর্থ্য-সম্বর্দ্ধক ধর্ম।

জীবের নিত্যধর্ম্ম

জীবের নিত্য সুখোদ্দেশক ধর্ম্মই জীব মাত্রেরই একমাত্র ধর্ম, অন্য চারিটী নৈমিত্তিক। নৈমিত্তিক ধর্ম পরিবর্ত্তনশীল, পরিবর্জ্জনশীল ও পরিবর্দ্ধনশীল। জীবের সহিত উহার নিত্যসম্বন্ধ নাই। বিশেষ বিচার করিলে ভগবদ্ভক্তিই জীবের নিত্য ধর্ম, ইহাই সিদ্ধান্তিত হয়। নিত্য ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলেই জীব নৈমিত্তিক ধর্মকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হন। আমরা জড়জগতে কালে যে ধর্ম্মের বিচিত্র ভাবে পরিণতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, তাহা নৈমিত্তিক। আজ পর্য্যন্ত কতপ্রকার যে নূতন নূতন ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তথাপি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিচার করিলে উহাদিগকে ঐ চারিটির অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম ও ব্রাহ্ম ধর্ম যে পরিমাণে নিত্য ধর্ম্মের উদ্দেশ করেন, সেই পরিমাণে উহাদের বিশুদ্ধতা, আর যে পরিমাণে নিত্যধর্মের প্রতিকূল, সেই পরিমাণে উহাদের হেয়তা।

নৈমিত্তিক ধর্ম্ম

নৈমিত্তিক ধর্ম যদি নিত্যধর্মের অনুকূল হয়, তাহা হইলে জীবনযাত্রানির্বাহাদি জন্য তাহাকে আদর করা যাইতে পারে। প্রতিকূল হইলে তাহা গ্রহণীয় নহে। জীবের সুখ-দুঃখনাশক ধর্মটি জীবের স্বরূপগত পরমানন্দ লাভের অত্যন্ত প্রতিকূল বলিয়াই মনে হয়। এই মতটি ভারতের নানাস্থানে গ্রীকদেশে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে এক সময় খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। সুখ-দুঃখনাশক ধর্মটি বহু আকারে লক্ষিত হইলেও বৌদ্ধধর্ম, পেসিমিসিম ও কেবলাদ্বৈতবাদ—এই তিনটি প্রধান। ব্রাহ্মধর্ম বিবেকানন্দ-প্রচারিত ধর্মে এই সুখ-দুঃখনাশক ধর্মটি যথেষ্ট প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অনিত্য সুখোদ্দেশক ধর্ম্ম নৈমিত্তিক ধর্ম্মের অন্যতম। দেহ ও মনের সহিতই এই ধর্মের সম্বন্ধ। এই ধর্মকে কর্ম্মমার্গ বলা যায়। শৈবশাক্ত গাণপত্য প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক নানা দেবদেবীর উপাসক-দিগের মধ্যে এই মতের প্রাবল্য দেখা যায়। চতুর্থ ধর্ম—সমষ্টি সুখবর্দ্ধক ধর্ম্ম। জড়বাদ, স্থিরবাদ, সমাজবাদ প্রভৃতি সমস্ত নাস্তিক ধর্ম এই ধর্ম্মের অন্তর্গত।

জীবে জড় সামর্থ-সম্বর্দ্ধক ধর্ম্ম নানা প্রকারের। অষ্টাঙ্গ-যোগ, থিয়সফি প্রভৃতি এই মতের অন্তর্গত।

নীতি—বর্ত্তমান ধারণা—স্মার্ত্তনীতি ও নিত্যধর্ম্মের পার্থক্য—সমাজ—সমন্বয় ধারণা।

নীতি

রাজনীতি, দণ্ডনীতি, বণিকনীতি, শ্রমবিভাগ, শরীর-নীতি, সংসারনীতি প্রভৃতি নীতি অনেক প্রকার। শরীর, মন ও সমাজের উন্নতি সাধনই নৈতিক ধর্মের উদ্দেশ্য। এই মতে সন্ধ্যা-বন্দনা ঈশপূজা প্রভৃতিও যথাযথ লক্ষিত হয় কিন্তু সেগুলি নিত্য ধর্মোদ্দেশক না হওয়ায় নৈমিত্তিক। এই নৈতিক ধর্মের নামান্তর স্মার্ত্তবাদ।

বর্ত্তমান ধারণা

অনেক সময় আমরা এই নীতিকেই ধর্মের সহিত গোলমাল করিয়া ফেলি। কিন্তু ধর্ম জিনিষটা একটা সাধারণ জ্ঞান বা নীতি মাত্র নহে। আমরা এই নীতিই ধর্ম—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যোগ, ব্রত, তপস্যা, কর্ম, জ্ঞান, পিতার সেবা প্রভৃতিকেই ধর্ম বলিয়া মনে করি। জীবের স্বস্বরূপগত নিত্য ধর্ম্মের নিকট ঐ কথিত নীতির হেয়ত্বই উপলব্ধি হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যতদূর উচুধাপে উঠিতে পারে, ততদূর উঠিয়া যাহাকে দূর হইতে ভাল বা মন্দ বিচার করে তাহাই লৌকিক সমাজে নীতি বলিয়া পরিচিত। দৃষ্টির কম বা বেশী অনুসারে নীতিরও কমতি বা বাড়্তি হইয়া থাকে। এই নৈতিক ধর্ম্মই বক্র গতিতে উঠা নামা করিয়া থাকে।

স্মার্ত্তনীতি ও নিত্যধর্মের পার্থক্য

নৈমিত্তিক স্মার্ত্তনীতি ইহকালে শরীর ও মনের কিয়ৎ-পরিমাণে তৃপ্তি সাধন করে তাহার ফল যৎকিঞ্চিৎকর, নিত্য ধর্মে আত্মপ্রসন্নতা লাভ হয়, তদ্দ্বারা জীবের অভাব-জনিত খেদধূলি নিত্য কালের জন্য নিবৃত্ত হইয়া আনন্দ সমুদ্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। একটি অনিত্য অপরটি নিত্য। একটি অমৃতের প্রাপক অপরটি মৃত্যুরূপ সংসারের প্রাপক। কোন কোন ধর্ম্মপ্রচারক এই নৈতিক ধর্মকেই একমাত্র ধর্ম্ম মনে করিয়া প্রচার করিয়া থাকেন—মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র ও পরিবার—এ সকল ভোগ করিবার জন্য ভগবান্ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন কিন্তু আমরা যদি তাহাদের প্রতি উদাসীন হই, তাহা হইলে আমরা আর ধার্ম্মিক বলিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিতে পারিব না। অতএব মাতা পিতা সেবার জন্য নিত্য ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। মাতা, পিতা, স্ত্রী ও পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে ধর্ম্ম হইতে পারে? এ সকল বাক্যের প্রতিকূলে নিত্যধর্মাবলম্বিগণ বলেন—ভগবানই সমগ্র ধর্মের মূল। ভগবানে ভক্তি করিলে সর্ব্ব ধর্ম্ম কৃত হয়। বৃক্ষের মূলে জল প্রদান করিলেই হয় আবার পৃথক করিয়া পত্র পুষ্প প্রভৃতিতে জল দিতে হয় না।

সমাজ

মানব মাত্রেই সামাজিক। মানব সমাজ ছাড়িয়া কোন দিন থাকিতে পারে না। সমাজ দ্বিবিধ, মুক্ত সমাজ ও বদ্ধ সমাজ। মুক্ত জীবগণ জীবন্মুক্ত ও নিত্য মুক্ত ভেদে দুই প্রকার। মুক্ত জীবের সমাজকে শাস্ত্রে দৈব সমাজ বলিয়াছেন। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বা তৎকালোচিত কোন সাময়িক ধর্মে রুচিবিশিষ্ট সমাজ এই দৈব সমাজের সহিত একত্র অবস্থান করিয়াও ভিন্ন। পূর্বোক্ত স্মার্ত্তনৈতিকগণ দৈব সামাজিকগণের ন্যায় ততোধিক সদাচারসম্পন্ন ঈশ-পূজাপরায়ণ, ভগবন্নামকীর্ত্তনকারী হইয়াও এই দৈব সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না।

সমন্বয় ধারণা

মুড়ি মিশ্রি একত্র করা, চন্দন বিষ্ঠাসম ধারণা করাই বর্ত্তমান যুগের সমন্বয় ধারণা, ম্লেচ্ছ চণ্ডালকে ব্রাহ্মণের আসনে বসিতে দেওয়ার নাম বর্ত্তমান সমন্বয়। বিষ্ণুকে অন্য দেব-দেবীর সহিত সাম্য বুদ্ধিই সমন্বয়। বস্তুতঃ উহা সমন্বয় নহে বরং তদ্বিপরীত। নিত্য ধর্ম্মেই একমাত্র সমন্বয় থাকিতে পারে, অন্য কোন নৈমিত্তিক ধর্ম্মে বা অধর্ম্মে সমন্বয় থাকিতে পারে না। নিত্য ধর্ম্মী বলেন—বিষ্ণুই সকলের মূল তাহাতেই একমাত্র সামঞ্জস্য আছে।

প্রবৃত্তে বৈষ্ণবীচক্রে সর্ববর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে বৈষ্ণবীচক্রে সর্ব্ববর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্॥

ঠাকুর তুলসীদাস বলিয়াছেন—

সব মিলকে হরিভজে তো সব একহো যাই।
অষ্টধাত্ সে পরশ লাগাওয়ে এক মুলসে বিকাই॥

দুর্দ্দৈব

আমরা বড়ই হতভাগ্য জীব। আমাদের কিছুতেই যেন আর চেতন হইবে না। চলিত কথায় বলে—"মারো আর ধরো আমি পিঠে বেঁধেছি কুলো, বকো আর ঝকো আমি কানে দিয়েছি তুলো।" মায়ার কবলে পড়িয়া কত না কত প্রকারে নির্য্যাতিত হইতেছি দেখিয়া ভগবান্ আমাদের জন্য আজ কত ব্যাকুল—আমাদেরই জন্য ভগবান্ আজ সাধু, গুরু, শাস্ত্র, শ্রীনাম ও অর্চ্চা মূর্ত্তিতে জগতে প্রকটিত হইয়া আমাদিগের প্রতি পদবিক্ষেপে—প্রতি পলকে পলকে—প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের প্রতি চেষ্টার প্রারম্ভে আমাদিগকে কত না সাবধান করিয়া বলিতেছেন—জীব, আমার কথা শ্রবণ কর, তোমাদের দেহ মনের সমস্ত ধর্ম কর্ম ছাড়িয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর—আমি তোমাদিগের সমস্ত ক্লেশ দূর করিব—যে আনন্দের আর পরিসমাপ্তি নাই, এমন নিত্য আনন্দ তোমাদিগকে দিব, আমার সেবা কর না বলিয়াই তোমাদের দুঃখ, নচেৎ আবার দুঃখ কিসের? আমার প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমি একদিন আমার সর্বগুহ্যতম যে উপদেশ—'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥' তাহা তোমাদেরই জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছি, আমার সে প্রতিজ্ঞাও কি তোমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবে না?" কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত মায়াবিমোহিত জীব আমরা ভগবানের সে কথায়ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না, বলিতেছি, "ভগবন্, আমাদের মঙ্গলজনক তোমার কোন কথা এখন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিবে না। আমরা জন্ম জন্ম তোমার সেবা-বিমুখ হইয়া কষ্ট পাইব, তাহাও বরং স্বীকার, তথাপি বর্ত্তমানে আমরা সুখাভিলাষী হইয়া যে সকল কার্য্যে ব্যাপৃত আছি, তাহা ছাড়িয়া তোমার কথা শুনিবার অবসর গ্রহণ করিতে পারিব না। আমাদের এই সংসারের অভাবগুলি মিটাইয়া লই, ছেলে পুলের জন্য দু'দশ বিঘা জমি, কিছু টাকা কড়ি সঞ্চয় করিয়া লই—তাহার পর যাহা হয় কিছু শুনিবার চেষ্টা করিব। আর ও'সকল ত' একঘেয়ে, মামুলী ধরণের কথা, উহাতে আর এমন নূতনত্বই বা কি আছে? যাহা হউক রক্তের জোর কমিলে যখন আর কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্য থাকিবে না, তখন বসিয়া বসিয়া দু'দণ্ড না হয় তোমার যাহা বলিবার আছে, বলিও, শুনিব।" আমাদের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ আবার বলিলেন—"জীব তোমাদের কপালে যে আগুন লাগিয়াছে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তথাপি বলিতেছি—'লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায়, বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ॥" হে জীব, বহু যোনি ভ্রমণ করিয়া এবার তোমাদের দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ হইয়াছে, এ জন্মটি অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। দেবতারাও পর্য্যন্ত আমাকে পাইবার জন্য এই জন্মের কামনা করিয়া থাকেন। সুতরাং আর বিন্দুমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া তোমরা এখনই তোমাদের একমাত্র পরমমঙ্গল যে আমার সেবা, তাহা লাভের জন্য যত্নবান হও। কেননা কোন্ সময়ে মৃত্যু আসিয়া যে তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। বিষয়-ভোগ তোমরা গত জন্মেও পাইয়া আসিয়াছ, পরেও যথেষ্ট পাইবে। বর্ত্তমানে একমাত্র শ্রেষ্ঠ বিষয় যে আমি, আমার সেবায় আত্মসমর্পণ কর। আমাতে একান্তভাবে শরণ লইলে তোমাদের সকল অভাব দূর হইবে। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" তোমরা এরূপ মনে করিও না যে, সকাম ত্রৈবিদ্যা উপাসকগণই কেবল সুখ পাইবে, আর আমার ভক্তগণ কেবল ক্লেশ পায়। আমার ভক্তগণের আমি ছাড়া আর চিন্তার বিষয় নাই, আমার সেবা ছাড়া তাহারা আর কিছু চাহেনা, আমাতেই তাহারা নিত্য অভিযুক্ত, তাই আমি তাঁহাদের সমস্ত অর্থ প্রদান ও তাহার সংরক্ষণও করিয়া থাকি। আমার ভক্তগণ আমার কাছে কোন বস্তুরই প্রার্থনা করে না,

তথাপি আমি তাহাদের সমস্ত অভাব পূরণ করি। বহির্মুখ লোকেই কেবল আমার ভক্তের ক্লেশ দেখে, বস্তুতঃ তাহাদের কোন ক্লেশ নাই। আমার কর্ম্মিগণের মত ভক্তেরা আমার প্রদত্ত জিনিষ ভোগও করে না, আমার প্রসাদ জ্ঞানে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করে মাত্র। সুতরাং তোমরা সকল কার্য্য ফেলিয়া আমার সেবা কর, অন্যান্য চেষ্টা আমার সেবার অনুকূল হইলেই স্বীকার কর নতুবা দূরে পরিহার কর। বর্ত্তমানে তোমাদের বদ্ধমূল কুসংস্কার-বশতঃ বহুদিনের চিন্তাস্রোতের বেগ পরিবর্ত্তন করা বিশেষ কষ্টকর হইবে সত্য, কিন্তু দু'চার দিনের অভ্যাস-ফলে সে কুসংস্কার সব দূর হইবে। আমারই নিজজন যে সাধুগণ, তাহাদের সঙ্গ কর, তাহাদের শ্রীমুখ-কীর্ত্তিত মৎকথা শ্রবণাদি কর। তাঁহাদের সঙ্গ ফলে তোমাদের মনোভাব এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে যে, তাহা তোমরা জানিতেও পারিবে না। তখন তোমাদের এমন দশা হইবে যে, পূর্ব্ব ইতিহাস স্মরণ করিতেও তোমাদের লজ্জা বোধ হইবে অথবা পূর্ব্ব জীবনের সকল কথা একবারেই বিস্মৃত হইবে। আমার সেবাই তখন তোমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হইবে। সাধু সঙ্গে শাস্ত্র বাণী শ্রবণ করিতে করিতে গুরুপাদাশ্রয় লাভ হইবে। গুরু-পাদাশ্রয়ে আমার সেবা করিতে করিতে আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিবে—তোমাদের জীবন সার্থক হইবে। এখনও সময় আছে—আমার কথা শ্রবণ কর।"

শ্রীভগবানের এত কথা শ্রবণ করিয়াও যদি আমাদের চৈতন্য না হয়, তাহা হইলে আর আমাদের উপায় কি? নিতান্ত দুর্দ্দৈব আমাদের তাই ভগবৎপাদপদ্ম-সেবাই যে আমাদের জীবনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। জানিনা আমাদের অদৃষ্টে আরও কতই না দুঃখ আছে!

বৈরাগীর কৃত্য

'বিরাগ' শব্দ ষ্ণ বা ষ্ণ্য প্রত্যয়যোগে বৈরাগ বা বৈরাগ্য, আবার 'বৈরাগ' শব্দ ইন্ প্রত্যয়যোগে বৈরাগিন্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৈরাগিন্ শব্দের প্রথমার একবচনে 'বৈরাগী'। ইহা সম্প্রদায়-বিশেষের আধুনিক কল্পিত শব্দমাত্র নহে। আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ২৪ অধ্যায়ে সনৎকুমারো 'বৈরাগী' চতুর্থঃ পুত্র এব চ" শ্লোকার্দ্ধে এবং অন্যান্য বহু প্রাচীনগ্রন্থে এই শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। জগদ্বিখ্যাত সুবৃহৎ গৌড়ীয় মঠ সংস্করণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য ৪।১০৩; ১৮।২১০; অন্ত্য ২।১১৭; ১২৪; ৩।১০৪; ৬।২২২-২২৬; ৮।১৪ শ্লোকেও 'বৈরাগী' শব্দের প্রয়োগ দ্রষ্টব্য।

'বৈরাগী' শব্দের অর্থ—উদাসীন, কৃষ্ণেতরবিষয়-বাসনা রহিত, বৈরাগ্যযুক্ত। রাগ শব্দের অর্থ আসক্তি। বদ্ধ-ভূমিকায় অবস্থিত স্বস্বরূপ বা স্বস্বভাববিস্মৃত জীবের প্রাকৃত অস্মিতা প্রবল থাকা কালে এই রাগ কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রযুক্ত হয়। ইতর বিষয় হইতে সেই রাগকে অপসারিত করিয়া ভগবদ্বিষয়ে প্রযুক্ত করার নাম বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য আছে যাঁহার তিনিই বৈরাগী। অথবা ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার নাম রাগ। সেই রাগ যাঁহার বিশেষভাবে উদয় হইয়াছে, তিনিই বৈরাগী। সলিঙ্গা-নাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরম্" এই বাক্যোদিষ্ট পরম-হংস শব্দ বৈরাগী শব্দের সহিত একই পর্য্যায়-ভুক্ত। এই পরমহংসের যে বেষ গ্রহণ তাহাই অস্মদ্দেশে অপভ্রংশ ভাষায় ভেকগ্রহণ বলিয়া বিখ্যাত। অনধিকারী অবস্থায় বর্ত্তমানে যে ভেকগ্রহণপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে ব্যভিচার উৎপন্ন হওয়াতে লোক 'বৈরাগী' কথাটীর উপরই শ্রদ্ধা শূন্য হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'নাহং বিপ্রঃ' শ্লোকে "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানু-

দাস" এই বাক্যে যথার্থ বৈরাগীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ আমি কৃষ্ণদাসানুদাস—এই বুদ্ধিতে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা রূপ ইতরতৃষ্ণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণপর বুদ্ধিতে সর্বদা একমাত্র ভোক্তৃতত্ত্ব কৃষ্ণসেবনপরা প্রবৃত্তিই যে বৈষ্ণবতা বা যথার্থ বৈরাগ্য, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। "লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখমর্ম ॥ দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজপরিজন। স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন ॥ সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেম-সেবন ॥ ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥"—ইহা অপেক্ষা বৈরাগ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় আর কি হইতে পারে। নিজের সব সুখ ছাড়িয়া কৃষ্ণসুখ হেতুই কৃষ্ণে শুদ্ধ অনুরাগ যাঁহার আছে, তিনিই ত' প্রকৃত বৈরাগ বা বৈরাগ্যবান বৈরাগী।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে দুই প্রকার বৈরাগ্যের কথা উক্ত হইয়াছে—(১) ফল্গু বৈরাগ্য ও (২) যুক্ত বৈরাগ্য। যাহাদের অন্তরে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণে ভোগবুদ্ধি বর্ত্তমান, কিন্তু বাহিরে বৈরাগী দেখাইতে গিয়া কৃষ্ণ-সম্বন্ধি বস্তুকেও প্রাপঞ্চিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া বাহাদুরী লইবার চেষ্টা, তাহারা ফল্গু, কপট বা মর্কট বৈরাগী। আর যাঁহারা কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণে ভোগবুদ্ধি রহিত হইয়া সেবা বুদ্ধিতে যথাযোগ্য বিষয় কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট বা কৃষ্ণ-কৃপা জ্ঞানে অনাসক্ত হইয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারাই যুক্ত বৈরাগী এবং মহাপ্রভুর প্রীতিভাজন।

ফল্গু বা মর্কট বৈরাগিগণ বাহিরে বৈরাগ্যোচিত পরমহংসবেষ গ্রহণ এবং কৃষ্ণসেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিলেও পূতনা রাক্ষসীর ন্যায় সর্ব্বদা কৃষ্ণকে ভোগ করিবার কু-অভিসন্ধিবিশিষ্ট। স্বরূপাদি মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদবৃন্দ মহাপ্রভুর নিকট যখন ছোট হরিদাস বর্জ্জন-ব্যাপার জানিতে চাহেন, মহাপ্রভু তখন তাঁহাদিগকে মর্কট বৈরাগীর কৃত্য বর্ণন করিয়াছিলেন,—"বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি মুঞি তাহার বদন॥ দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

বৈষ্ণব হয় গৃহস্থ হইয়া স্ত্রীপরিবারের সহিত থাকিবেন, নতুবা স্ত্রীসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইবেন! বৈরাগী হইলে আর স্ত্রীলোককে দর্শন বা সম্ভাষণ করিবার অধিকার থাকে না! অতএব বৈরাগী হইয়া যে ব্যক্তি প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, ধর্ম্মোচ্ছেদী বলিয়া মহাপ্রভু তাহার মুখ দর্শন করেন না। জড়েন্দ্রিয়ের স্বভাবই ভোগ-প্রবণতা; এমত অবস্থায় তাহাকে কোন প্রকারেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কাষ্ঠনির্মিতা নারীও যখন মুনির মন টলাইতে পারে, তখন বৈরাগী ব্যক্তির নারীর সম্বন্ধ সর্বতোভাবে ত্যাগই কর্ত্তব্য। এমন কি মাতা, ভগ্নী ও দুহিতার সহিতও নির্জনে থাকিতে শাস্ত্রে নিষেধ করেন। সাধন ভক্তির আলোচনা করিতে করিতে ভাবোদয় হইলে যে ব্যক্তির বিরক্তি জন্মে, তাঁহারই বৈরাগ্যে অধিকার। সে অবস্থা লাভ হইবার পূর্বে যাহারা 'ভেক্' গ্রহণ করে, তাহাদের নামই 'মর্কটবৈরাগী'। অনধিকারী জীবকুল অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করে। আর অতি অল্পকাল মধ্যেই ইন্দ্রিয়চালিত হইয়া স্ত্রী সম্ভাষণ করিতে যায়। ইহারা ধর্ম্মধ্বজী বা ধর্ম্মকলঙ্ক। জগৎ হইতে এই কলঙ্ক যত শীঘ্র অপসারিত হয়, সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তির তজ্জন্য যত্নবান হওয়া উচিত। বৈষ্ণবের একটী প্রধান লক্ষণই—সরলতা। কপটতা ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী। কারণ জীবাত্মার সহজ নির্ম্মল ভাবই ভক্তি, তাহাতে কোন প্রকার কপটতা মিশ্রিত থাকিতে পারে না। সুতরাং মর্কটবৈরাগী কপটিগণ কখনই প্রশ্রয়যোগ্য হইতে পারে না।

মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে স্বভোগ-ত্যাগ বা কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাপর বৈরাগ্য-প্রধান। এতাদৃশ বৈরাগ্যবিহীন ব্যক্তি কখনও মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র হইতে পারে না। শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর আচরণে তুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু জগজ্জীবকে এই বৈরাগীর কৃত্য উপদেশ করিয়াছেন।

মহাপ্রভু রঘুনাথের গৃহত্যাগের পূর্বাবস্থায় "স্থির হঞা

ঘরে যাও না হও বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব-সিন্ধুকূল॥ মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥" —এই বৈরাগ্য কথা উপদেশ করিলেন। সেই রঘুনাথ যখন আবার গৃহত্যাগ পূর্ব্বক পুরীধামে মহাপ্রভুর চরণান্তিকে অবস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর চরণসেবায় রত হইলেন, তখন ত্যক্তগৃহ বৈরাগীর যে কৃত্য তাহা এইরূপ উপদেশ করিলেন—"বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্ত্তন। মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ॥ বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা। কার্য্য সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥ বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস। পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥ বৈরাগীরকৃত্য —সদা নাম সংকীর্ত্তন। শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ॥ জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥ গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য-বার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥ অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥ বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥ দাতা ভোক্তা দোঁহার বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ। দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন॥" অন্যত্রও মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধুঃ॥"

অর্থাৎ ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয় দর্শন, স্ত্রী সন্দর্শন, বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল শিক্ষা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বর্ত্তমান তথাকথিত বৈষ্ণবক্রব ভেকধারী মর্কট বাবাজীগণই বা কোথায় আছে আর নিষ্কিঞ্চন পরমহংস সত্য সত্য বৈরাগীকুলই বা কোথায় আছেন। এখনকার কৌপীনের মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী বাবাজী চায়, স্ত্রীসঙ্গ, মাম্‌লা মোকদ্দমা, বিষয়ভোগ, নামাপরাধ, ধামাপরাধ ও বৈষ্ণব অপরাধ প্রভৃতিকেই নিষ্কিঞ্চনতা বা হরিজন বলিয়া চালাইতে—রাত্রিতে লণ্ঠন জ্বালিয়া সূর্য্য দেখিবার স্পর্দ্ধা করিতে!—স্বরূপরূপানুগত্যবিহীন কতকগুলি সভাব্রুব লইয়া সভাসমিতি দ্বারা স্বপ্রকাশ ধামের প্রকাশ করিতে!! ধন্য বাবাজীর সাহস! আর ধন্য বাবাজীর বাবাজীত্ব! শাস্ত্রে অসৎসঙ্গও যেমন বর্জ্জনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অসৎসঙ্গীর সঙ্গিগণও সেইরূপ বর্জ্জনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সুতরাং সাধু সাবধান!

লোক দেখান গোরাভজা তিলকমাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি!
গৃহ স্ত্রী ছাড়ি ভাই আসিয়াছ বন।
স্বপনেও না কর যেন স্ত্রী দরশন॥
যদি প্রণয় রাখিতে চাও গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥

ভাগবত শাস্ত্র-মর্ম্ম

ভাগবত শাস্ত্রমর্ম্ম নববিধ ভক্তি ধর্ম্ম
সদাই করিব সুসেবন।

শাস্ত্র কাহাকে বলে? মায়াবাদী রচিত গ্রন্থগুলি কখনও শাস্ত্র নামে অভিহিত হইতে পারে না, 'মায়াবাদং অসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে"—প্রভৃতি বাক্যই তাহার প্রমাণ। আবার চার্বাক-প্রমুখ নাস্তিকগণ ও তার্কিকগণ কালে উদিত হইয়া নিজ নিজ মত স্থাপন কল্পে বহু গ্রন্থ কল্পনা করিয়া সচ্ছাস্ত্রের পীড়াদায়ক হইয়াছেন। ইহাদের রচিত গ্রন্থগুলির সম্বন্ধে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র বলিয়াছেন—জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এবাচ। কপিলো

ইক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ ॥ এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তাস্তেভ্যস্তন্ত্রং ন দাপয়েৎ ।—পূর্ব্বমীমাংসা-রচয়িতা অদৃষ্টবাদী জৈমিনি ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ, নাস্তিক চার্বাক, নগ্ন; সাংখ্য দর্শন প্রণেতা কপিল (ভগবদবতার কপিল নহেন), অক্ষপাদ গৌতম—এই ছয়জন তার্কিক। এই ছয়জন তার্কিকের মতাবলম্বী পাষণ্ডিদিগকে তন্ত্র শাস্ত্র প্রদান করিবে না। মনুসংহিতা মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রেও এইরূপ তার্কিক-গণের নিন্দা শ্রবণ করা যায়। অতএব শ্রৌত পথে আচার্য-পরম্পরায় যাহা শাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহাকেই শাস্ত্র বলা যায়। সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মধ্ব মুনি স্কন্দ-পুরাণোক্ত বচন উদ্ধার পূর্বক বলিয়াছেন—

ঋগ্‌ যজুঃ সামাথর্ব্বশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকং।
মূল রামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধিয়তে ॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্র প্রকীর্ত্তিতম্‌।
অতোঽন্য গ্রন্থ বিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ ॥

—ঋক্‌, যজুঃ সাম্‌ ও অথর্ব—এই চারিবেদ মহাভারত পঞ্চরাত্র এবং মূল রামায়ণ—এই গুলিকে শাস্ত্র বলে। এ সকলের অনুকূল যে সকল শাস্ত্র তাহাও শাস্ত্র নামে অভিহিত হইতে পারে। তদ্ব্যতীত যাহা কিছু তাহা শাস্ত্র ত নহেই পরন্তু কুবর্ত্ম (অসৎমার্গ)। ব্রহ্মসূত্র এবং তাহার অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাদ্‌ ভগবন্মুখ-নিঃসৃত বেদ, সুতরাং তাহাদিগকে বেদ হইতে পৃথক্‌রূপে গণনা করিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে ॥ —শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের এবং মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক এবং গায়ত্রীর ভাষ্য স্বরূপ। এই গ্রন্থই সর্ব্বশাস্ত্রের সার বলিয়া কথিত হইয়াছে। কলিযুগ-পাবনাবতার ভগবান্‌ গৌরসুন্দর এই গ্রন্থকেই একমাত্র উপাস্য ও প্রামাণিক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত এই শাস্ত্রটী মহা-পুরাণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সর্গ বিসর্গ স্থান পোষণ উতিঃ মন্বন্তর ঈশানুকথা নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অন্তর্গত দশবিধ তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহা মহাপুরাণ। অন্যান্য পুরাণে কেবল পাঁচটী তত্ত্ব মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে সর্বশাস্ত্র-তাৎপর্য্য অবগত হইয়া অবশেষে পরম পুরুষার্থ লাভ করা যায় বলিয়া ইহার তাৎপর্য্য সদাই সুসেবন একমাত্র পরমার্থীর আস্বাদনীয় হইয়াছে।

কোন গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে গ্রন্থকর্ত্তার হৃদয়-নিষ্ঠায় পর্য্যালোচনা করাই প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা শ্রীশুকদেব। তাঁহার হৃদয়নিষ্ঠা বিচার করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের যথার্থ তাৎপর্য্য সংগৃহীত হইবে।

'স্বসুখ-নিভৃতচেতা' শ্লোকের অর্থ ও শ্রীধর স্বামীর টীকা আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, শুকদেব জন্মাবধি কৈবল্য সুখে মগ্ন ছিলেন ; কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবল্লীলা যখন তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল, তখন কৈবল্য ধৈর্য্য অপগত হইল এবং ভক্তি সুখের আবির্ভাব হইল। ঐ শ্লোকে অখিল বৃজিন শব্দে ভক্তির প্রতিকূল কর্ম্মাগ্রহতা ও উদাসীন ভাবরূপ শুষ্ক জ্ঞান। কৃষ্ণলীলায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ঐ সকল ভক্তি-প্রতিকূল কর্ম্ম ও শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানাদিতে আসক্তি দূরীভূত হইল। ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কৃষ্ণানন্দের চমৎকারিতা তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল। এস্থলে শ্রীশুকদেব গোস্বামীর ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কৃষ্ণসেবানন্দের উৎকর্ষ জ্ঞানই সম্বন্ধ, কৃষ্ণলীলা শ্রবণই অভিধেয় এবং কৃষ্ণলীলায় আকৃষ্টিই পরম পুরুষাই প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বত্রই এই বিচার দৃষ্ট হইবে। গ্রন্থকর্ত্তা ব্যাসদেবের হৃদয়নিষ্ঠা আলোচনা করিলেও আমরা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। ব্যাস সমাধিই শ্রীমদ্ভাগবতের মূল। অতএব তাহাই আলোচিত হউক। একদিন শ্রীব্যাসদেব প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপ্ত করিয়া বিষণ্ণ মনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় শ্রীপাদ নারদ গোস্বামী তদীয় আশ্রমে আগমন পূর্বক ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন বেদবিভাগ কর্ত্তা শ্রীল ব্যাসদেবকে তাঁহার বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাসদেব নিজ চিত্ত অপ্রসন্নতার বিষয় নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া স্বীয় গুরু শ্রীনারদকেই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে শ্রীনারদ বলিলেন—যে পাণ্ডিত্য, গ্রন্থ প্রণয়ন, নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা এমনকি ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা

চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হয় না। আমরা যাহা কিছু করি সকলের উদ্দেশ্য আত্মপ্রসন্নতা লাভ। তাহা যদি না হইল তবে সে সকল বৃথা। শ্রীকৃষ্ণানুশীলন দ্বারাই একমাত্র চিত্ত প্রসন্নতা লাভ হইতে পারে, অন্য কোন উপায়ে হইতে পারে না। অতএব হে ব্যাসদেব! আপনি নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিলেও বিশুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনোপযোগী গ্রন্থ মোটেই রচনা করেন নাই। অন্য গ্রন্থে যে কৃষ্ণানুশীলনের কথা, তাহা মুখ্যভাবে বর্ণিত না হওয়ায় উক্ত গ্রন্থ পড়িয়া লোকের ভ্রম হইতে পারে—অতএব বিশুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনই আত্মপ্রসন্নতালাভের একমাত্র হেতু। আপনি তদুপযোগী গ্রন্থ কীর্ত্তন করুন। শ্রীনারদের উপদেশে শ্রীব্যাসদেব প্রেমভক্তি দ্বারা মনকে সম্যক্‌রূপে সমাহিত করিয়া প্রথমে পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে ও অপকৃষ্ট আশ্রয়-প্রাপ্তা মায়াকে দৃষ্টি করিলেন। মায়ার প্রভাবে জীব মায়াতীত শুদ্ধাত্মা হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অন্তর্গত জড়জগতের অন্যতম মনে করিয়া শোক মোহাদির বশীভূত হন—ইহাও বুঝিতে পারিলেন এবং সর্ব্বজীবের দুঃখ-নিবারক সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনাত্মক, কৃষ্ণলীলাত্মক গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিলেন। কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করাই গ্রন্থকারের তাৎপর্য্য এবং শোক ও মোহনাশিনী কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তিই গ্রন্থ অনুশীলনের ফল।

ভাগবত পাঠের অধিকারী

গোস্বামি-সন্তান, প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বা দর্শনশাস্ত্রাভিজ্ঞ অথবা সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত হইলেই যে ভাগবত পাঠে অধিকার হইবে, এরূপ নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় দেবানন্দ পণ্ডিতের কথা স্মরণ করুন। তিনি এক সময় শ্রীধাম নবদ্বীপে বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ভাগবতের অধ্যাপক বলিয়া সাধারণের নিকট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তগণ কখনই তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন নাই। মায়াবদ্ধ মূঢ় লোক ভ্রমে পড়িতে পারে, কিন্তু ভক্ত ভগবানের নিকট কাহারও কোনরূপ কপটতা খাটে না। আজকাল যাঁহারা ভাগবত পাঠ করিয়া মায়ামূঢ় লোকদিগকে ভুলাইয়া নিজ উদরপূর্ত্তি করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি নিন্দাবাদ শ্রবণ করা যায়। ইহারা ভাগবতের চরণে অপরাধী। শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত-ব্যবসায়ী অপরাধীদিগকে বলিয়াছেন—

জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন॥
ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার॥

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য অবতারের অন্যতম শাব্দিক অবতার, শ্রীকৃষ্ণনাম যেরূপ অপরাধীগণ কৃত্রিম-ভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত যাহাদের উপজীবিকাস্বরূপ তাহারা বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভাগবতের তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে অসমর্থ হয়। তাহাদের ভাগবত পাঠ ভেক কোলাহল মাত্র। ভক্ত ব্যতীত অন্যের ভাগবত পাঠের কথা দূরে থাকুক, তদ্দর্শনেও সামর্থ্য নাই। ভাগবত পাঠের অধিকার নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলিয়াছেন—"মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়। ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা তপ প্রতিষ্ঠায়॥ ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান। সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥ ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যার। সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তিসার॥ সর্ব্বগুণে দেবানন্দ পণ্ডিত সমান। পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্॥ সে সব লোকের যথা ভাগবত ভ্রম॥" এ সকল বাক্যে ভাগবত পাঠের অধিকারী সুস্পষ্টভাবে কথিত হইলেও আমরা মায়াবদ্ধ জীব, আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হয় না।

ভাগবত শ্রবণের ফল

সদ্য হৃদ্যবরুধ্যতে কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রের হৃদয়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। এ কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই, বিশুদ্ধ ভক্তের চরণাশ্রয় করিয়া ভাগবত শ্রবণ করিলে আমাদের উক্ত বাক্যের যথার্থ্য উপলব্ধি হয়। অভক্ত ভক্তনামধারী অপরাধিগণের মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া আমরা প্রকৃত ফললাভে বঞ্চিত হইতেছি বলিয়া শাস্ত্রবাক্যে আমাদের বিশ্বাস দিন দিন হ্রাস হইতেছে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কতিপয় অনধিকারী উপসম্প্রদায়ী মিছাভক্ত ভাগবত-ব্যবসায়ীর দৌরাত্ম্য।

———

'জগতে সন্ন্যাসীর কার্য্য'

সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম জীবন-যাপন বা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে সাধারণ জগতের ধারণা বড়ই ভ্রান্তিপূর্ণ। লোক মনে করেন, "ধার্ম্মিক বা সন্ন্যাসী হইলেই তাঁহাদের আর ইহজগতের প্রতি কোন কর্ত্তব্য থাকিল না, তাঁহারা জগৎ ছাড়া হইয়া অবস্থান করিবেন, আমাদের সুখাসুখের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, আমাদের ভাল মন্দের বিচার আমরাই করিতে পারি, যেহেতু তাঁহারা আমাদের প্রতি আদৌ সহানুভূতি-বিশিষ্ট নহেন, সেহেতু তাঁহাদের সহিত আমাদের অসহযোগ-নীতিই অবলম্বিত হউক। অথবা জগতের বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সুতরাং তাঁহারা আর জগতের কি কাজ করিতে পারেন? তবে তাঁহারা আছেন থাকুন, আমাদের নানা কাজের পর একটু অবসরকালে না হয়, তাঁহাদের মুখে দু'চারিটা শাস্ত্রের বুলি শুনিব ইত্যাদি।" আবার সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে লোকের ধারণাও বড় অদ্ভুত অথবা লোকেরই বা আর দোষ কি দিব? জগতে ধর্মের নামে যে ভণ্ডামী চলিয়াছে, তাহাতে লোকের এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। যাঁহারা চোখ বুঁজিয়া হিমালয়ের কোন নিভৃত গহ্বরে পড়িয়া থাকেন, না হয় লোটা চিম্‌টা লইয়া, মাথায় একরাশি জটা রাখিয়া ও গায়ে ভস্ম মাখিয়া তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া বেড়ান অথবা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবুদ্ধিবশে স্নানাহ্নিক, পূজা, হোম, জপ ও গীতা ভাগবতাদি গ্রন্থের দু'চারিটা শ্লোক পাঠ করিয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিনগুলি কাটাইবার ব্যবস্থা করেন, জগতের লোক বাঁচিল কি মরিল তাহা আর দেখিবার যাঁহাদের দরকার থাকে না, জগতের লোক বলেন, তাঁহারাই সাধু সন্ন্যাসী। জগতের ধারণানুযায়ী তথাকথিত ভোগী সন্ন্যাসিগণ অবশ্য জগতের কোন মঙ্গলই করিতে পারে না; অধিকন্তু সেই সকল দেহ ও মনোধর্ম্মযাজী ধার্ম্মিক বা ধর্ম্মধ্বজিগণ ভক্তি-অনুশীলনের ছলনায় জগৎকে ভোগ কিম্বা ত্যাগ করিবার দুষ্প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া ত্যাগীর বেষ গ্রহণপূর্ব্বক লোক-বঞ্চনাই করে, আর লোকে তাহাদিগের দৃষ্টান্তেই তাঁহাদের ধারণা গঠন করিতে যাইয়া সত্যেও অসত্য ভ্রম করিয়া বসেন; কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বতম মহর্ষিগণের উপাসিত কায়-মনোবাক্যে পরাত্মনিষ্ঠারূপ ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয়-পূর্ব্বক মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবণব্রত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সেই সকল আত্মধর্ম বা ভগবদ্ভক্তিযাজী ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসিগণ জগৎকে কোনপ্রকারে ভোগ বা ত্যাগ করিবার পরিবর্ত্তে জগৎকে কার্ষ্ণবুদ্ধিতে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন, জগৎকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই তাঁহাদের জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। মায়ামুগ্ধ-জীবকুলকে মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করানই ভগবানের মনোঽভীষ্ট। যাঁহারা ভগবানের সে জীবোদ্ধারণ-সঙ্কল্প সিদ্ধ্যর্থে যত্নবান্ না হইয়া কেবল স্ব স্ব ইন্দ্রিয় তর্পণার্থ ভগবৎ সেবা চেষ্টা প্রদর্শন করেন, ভগবান্ তাঁহাদের সে চেষ্টায় আদৌ প্রীত হন না।

দেশের রাজা যেমন তাঁহার প্রতিনিধিবর্গকে রাজ্যের হিতাহিত পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত করেন, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র সম্রাট্ ভগবান্ বিষ্ণুও সেইরূপ তাঁহার ভক্ত-প্রতিনিধিগণের উপর তাঁহার অনন্ত রাজ্যের পর্য্যবেক্ষণ-ভার প্রদান করিয়াছেন। ভক্তত্রিদণ্ডিগণ—পরদুঃখদুঃখী জীবের ভগবদ্ বিমুখতা হইতে উৎপন্ন দুঃখে সর্বক্ষণ তাঁহাদের হৃদয় ব্যাকুল, তাই তাঁহারা সর্বদা কিসে জীবের নিশ্চিত মঙ্গললাভ হয়, তাহাই স্ব স্ব আচরণ দ্বারা প্রচারে নিযুক্ত। পরোপকারই সাধু-সন্ন্যাসিগণের জীবনের প্রধান ব্রত। তবে পরোপকার অর্থে তাঁহারা জীবের দেহ ও মনের তাৎকালিক কোন অভাব নিরাকরণ বলিয়া মনে করেন না, জীবের ভগবদ্বিমুখতারূপ যে অভাব, তাহারই দূরীকরণ বুঝিয়া থাকেন। তাই সাধুগণের প্রচার্য্য বিষয় কেবল কৃষ্ণভক্তি। মানুষ সুকৃতির অভাবে বর্ত্তমানে সাধু প্রচেষ্টায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না, মনে করিতেছে—'সাধু সন্ন্যাসীর আর জগতের প্রতি কি কর্ত্তব্য আছে, আমরাই দেশের মঙ্গলবিধাতা, দেশ আমাদেরই দ্বারা উপকৃত হইবে, সাধুগণও আমাদের মুখাপেক্ষী। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সাধুগণ কাহারও মুখাপেক্ষী

নহেন, তাঁহারা কেবল ভগবানেরই কৃপা মাত্র অপেক্ষা করেন। জগৎ যেদিন ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের নির্দ্দিষ্ট পন্থায় সাধুর কৃপা অপেক্ষা করিয়া চালিত হইবে, সেই দিনই প্রকৃত মঙ্গল কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবে, নচেৎ অমঙ্গলকেই মঙ্গল বলিয়া বরণ করিয়া সাধু প্রদর্শিত পন্থাকে নিন্দা করিবে।

সন্ন্যাসীর ইহ জগতের সহিত বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুগণের ন্যায় কোন সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু এই জগৎ ভগবানেরই ভোগ্য —এই বুদ্ধিতে তিনি জগতের সহিত বিশেষরূপে সম্বন্ধ বিশিষ্ট, জগৎ ছাড়া কেহ নহেন। জগতের ভাল-মন্দ বিচার একমাত্র ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীরাই করিতে পারেন, যেহেতু তাঁহারা দ্বিতীয়াভিনিবেশরূপ মনোধর্ম্ম দ্বারা চালিত হন না। মনোধার্ম্মিগণই ভদ্রাভদ্র বিচারে সমর্থ হয় না। জগতের কোন্ বস্তুটী ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইল, কোন্‌টী তাঁহার সেবা-বিমুখ হইল, ইহা পরিদর্শনের বিশেষ অধিকার তাঁহারই উপর ন্যস্ত। ভগবৎ সেবায় উন্মুখতা ও বিমুখতা লইয়াই জগতের সদসদ্বিচার। যাঁহারা সেবোন্মুখ, তাঁহারা—সৎ আর যাহারা বিমুখ—তাহারা—অসৎ। অসজ্জনগণ সাধুর নিকট দণ্ডার্হ—সজ্জনগণ প্রশংসার্হ। ভগবদ্রাজ্যের প্রজাগণ সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-প্রতিনিধি সাধুর সৎপরামর্শানুসারে চলিতে বাধ্য। তাহা না চলিলে তাহারা রাজবিদ্রোহী অতএব যমদণ্ড্য।

সুতরাং ভগবদ্ভক্তকে বাদ দিয়া জগতের কোন মঙ্গল চেষ্টা হইতে পারে না। ভক্তই জগতের মঙ্গল বিধান করিবেন। ভক্তের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া যাঁহারা জগতের মঙ্গলামঙ্গল নির্দ্ধারণ করিতে যান, তাঁহাদের কোন চেষ্টাতেই ভগবান্ সন্তুষ্ট নহেন, অধিকন্তু তাঁহারা কেবল হিতে বিপরীতই ঘটাইয়া থাকেন।

—:::—

প্রাচীনতম ঐতিহ্য

বৈষ্ণব ধর্ম্মই স্বরূপ ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবের নিত্য ধর্ম। জীব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে। এই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম কোন্ সময় কিরূপ ভাবে জীবহৃদয়ে উদিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে বিচার করিতে হইলে অগ্রে অন্যান্য অনেক বিষয় স্থির করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমরা ভারতের ইতিহাস পূর্ব মহাজনগণের বর্ণনা ও প্রাচীন গ্রন্থাবলম্বন পূর্বক যথাসাধ্য বর্ণন করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বিচার করিব স্থির করিয়াছি।

সমগ্র চেতন ও অচেতন বস্তুর আদি স্বয়ং অনাদি ভগবান্ বিষ্ণু। তিনি তাঁহার পরা ও অপরা নাম্নী প্রকৃতি দ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক চিজ্জগৎ, জৈব জগৎ ও জড় জগৎ সৃষ্টি করেন।

বিষ্ণুর অপরা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে মহত্তত্ত্ববিগ্রহ ব্রহ্মার উৎপত্তি। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব বিগ্রহ শিবের আবির্ভাব। অতঃপর ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মনঃ ইন্দ্রিয়নিচয় ও আকাশের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মনঃ ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা রাজস অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয় এবং তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভূতের উদ্ভব হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে প্রাগন্ধ যুগের ইতিহাস আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জড় জগৎ নশ্বর হইলেও সত্য, জগৎ রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির ন্যায় মিথ্যা—বিবর্ত্তবাদীর এই ধারণা সম্পূর্ণ অলীক বলিয়াই মনে হয়। জগৎকে যাহারা মিথ্যা বলিয়া ধারণা করেন শাস্ত্রে তাহাদিগের মত পাষণ্ড মত বলিয়া গর্হণ করা হইয়াছে, তবে যে কোথাও কোথাও জগৎকে মিথ্যা বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য মায়াবাদীর ধারণা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ব্রহ্মা, শিব ও দক্ষ প্রভৃতি দশজন প্রজাপতি হিন্দু শাস্ত্রে আদি জীব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু। স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা প্রসূতির সহিত দক্ষ প্রজাপতির বিবাহ হয়। ইহাঁরাই সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশের আদিম অধিবাসী। ভারত ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়—আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমে দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে একটী ক্ষুদ্র দেশ পত্তন করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। দৃষদ্বতীর বর্ত্তমান নাম কাগার। আর্য্যগণ অন্য কোন দেশ হইতে আসিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করিয়াছিলেন ইহাই প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের মত। তাঁহারা যে তৎকালোচিত সভ্যতা সম্পন্ন ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যেহেতু তাঁহারা নিজ সভ্যতার গৌরবে এতদূর গর্ব্বিত ছিলেন যে আদিম অধিবাসীদিগের প্রতি কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন করার কথা দূরে থাক্ বরং তাঁহাদিগের প্রতি তাচ্ছিল্যই প্রকাশ করিতেন। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ প্রভৃতি ঘটনা আলোচনা করিলে এ বিষয়টী স্পষ্ট জানা যাইতে পারে।

ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, তাঁহার পুত্র কশ্যপ, তৎপুত্র বিবস্বান্, বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু ও তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু। ব্রহ্মার ষষ্ঠ পুরুষে ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশের আরম্ভ হয়। ইক্ষ্বাকুরাজের সময় আর্য্যেরা ব্রহ্মর্ষি দেশে বাস করিতেন। অতি অল্পকাল মধ্যে আর্য্যগণের বংশ বিস্তার এত অধিক হইল যে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশটি অতীব সংকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, তৎকালেই তাঁহারা ব্রহ্মর্ষি দেশ সংস্থাপন পূর্ব্বক নিজ রাজ্য বিস্তার করিতে বাধ্য হইলেন। আধুনিক পণ্ডিতবর্গ বলেন—চন্দ্র প্রভৃতি কতকগুলি সুসভ্য লোক এই সময় আর্য্যশাখার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন।

স্বায়ম্ভুব মনুর অব্যবহিত পরেই অগ্নি পুত্র স্বারোচিষ মনুর আবির্ভাব। স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র উত্তম মনু। তাঁহার ভ্রাতা তামস মনু। তাঁহার অন্য ভ্রাতা রৈবত মনু। স্বায়ম্ভুব মনুর সপ্তম পুরুষে চাক্ষুষ মনু। বৈবস্বত মনু ব্রহ্মা হইতে পঞ্চম পুরুষ। সাবর্ণি মনু বৈবস্বতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি, ধর্ম্ম সাবর্ণি, রুদ্র সাবর্ণি ও ইন্দ্র সাবর্ণি—ইহারা পরবর্ত্তীকালে উদিত হইয়া ভারত ভূমির বিভিন্ন স্থানে স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কেহ বলেন ইহারা কল্পিত। চাক্ষুষ মনুর সময় সমুদ্রমন্থন হয়। বৈবস্বত মনুর সময় বামনদেবের অবতার। এই বামন দেব বলিরাজার যজ্ঞের পর ছলনা দ্বারা অসুরদিগকে বহিষ্কৃত করেন। মনুবংশের রাজাগণ ব্রহ্মাবর্ত্তের বাহিরে রাজত্ব করিতেন। তৎকালে তাঁহাদের সাংসারিক ব্যবস্থা ও বিদ্যার চর্চ্চা ভাল ছিল না। সমুদ্র মন্থন কালে অর্থাৎ চাক্ষুষ মন্বন্তরে ধন্বন্তরীর উৎপত্তি। অশ্বিনী কুমারদ্বয়ও এই সময় উদ্ভূত হন। সমুদ্র মন্থন কালে যে বিষের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা শিব পান করিয়া স্বীয় বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইসকল ইতিহাস আলোচনা করিলে তৎকালে যে চিকিৎসা বিদ্যার আলোচনা হইতেছিল ইহা অনুমিত হয়। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে এই সময় রাহু নামা অসুরকে দুই খণ্ড করিয়া রাহু ও কেতু রূপে সংস্থান করা হয়। ইহার দ্বারা তৎকালে যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইতেছিল ইহাও অনুমান করিতে হইবে। সেই সময়ের কোন লিখিত সংবাদ না থাকায় তখন অক্ষর সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

আধুনিক পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন ইক্ষ্বাকুর সময় হইতে রাজাদিগের নামাবলী পাওয়া যায়। সূর্য্যবংশীয় রাজাদের নামাবলী বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ইক্ষ্বাকু হইতে রামচন্দ্র ৬৩ পুরুষ। এই বংশের ৯৪ পুরুষে রাজা বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যু কর্ত্তৃক হত হন। ইক্ষ্বাকু হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটি ২৩৫০ বৎসর পরে ঘটনা হয় ইহাই সারগ্রাহী মহাজনবর্গের অভিমত। শাস্ত্রে চন্দ্রবংশ এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। অত্রিপুত্র চন্দ্রের বুধনামে এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র পুরূরবা, পুরূরবার পুত্র আয়ুঃ ও আয়ুর পুত্র নহুষ। বলবীর্য্যবান যযাতি নহুষের পুত্র। যযাতি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী এবং অসুররাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়া দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন। যদুর বংশে কার্ত্তবীর্য্য প্রমুখ

তপোজ্ঞান পরায়ণ ভগবদ্ভক্ত রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন। পুরুর বংশে দুষ্মন্ত পুত্র ভরত প্রমুখ রাজগণের উৎপত্তি। ইহাদের কীর্ত্তি ও বিক্রম দ্বারা সমস্ত দিগ্‌দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পুরুবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালে পৃথিবীর ভারহরণোদ্দেশে দেবতাগণ ক্ষীরোদশায়ী ভগবান বিষ্ণুর শরণাগত হন। ভগবানের আবির্ভাব হইবে বলিয়া দেবতাগণ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। বরুণদেব পুরুর বংশে শান্তনুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তনুর দুই পুত্র। চিত্রাঙ্গদ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ বিচিত্র বীর্য্য।

বিচিত্রবীর্য্যের ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র। পাণ্ডুর কুন্তী ও মাদ্রী নাম্নী দুই ধর্ম্মিষ্ঠা পত্নী ছিলেন। পাণ্ডু মুনিশাপে স্ত্রীসঙ্গ-সুখে বঞ্চিত ছিলেন। স্বামীর আদেশ-ক্রমে কুন্তী ধর্ম্মের ঔরসে যুধিষ্ঠির, পবনদেবের ঔরসে ভীম, বাসবের ঔরসে অর্জ্জুন—এই তিন পুত্র লাভ করেন এবং মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে নকুল ও সহদেব নামক দুই যমজ পুত্রের জননী হইয়াছিলেন। পিতা পাণ্ডু-কর্ত্তৃক পালিত হইয়া ইহারা ভগবদাশ্রয়ে কীর্ত্তিমান ও দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন।

এদিকে পাঞ্চাল এবং বাহ্লীক নৃপকুলও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যদুকুলসম্ভূত আহুক হইতে উগ্রসেন এবং দেবক নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দেবকের দেব-পূজ্যা দেবকী নাম্নী এক কন্যার সহিত শূরনন্দন বসুদেবের বিবাহ হয়। অতঃপর দেবতাদিগের ভূভার হরন কার্য্য সাধন এবং ভক্তদম্পতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হন। ভগবানের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বসুদেবের অপরা পত্নী রোহিণীর গর্ভে বলদেবের আবির্ভাব হয়। পাণ্ডবগণ প্রভু-রূপে, সুহৃৎরূপে, বন্ধুরূপে এবং একমাত্র গতিরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাপন্ন ছিলেন।

আর্য্যদিগের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের কলেবরও বৃদ্ধি হইল। আদৌ আর্য্যগণ ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশেই অবস্থান করিতেছিলেন। ক্রমে ব্রহ্মর্ষি দেশ অর্থাৎ যমুনা-তীর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ বলেন বৈবস্বত মনু যামুন প্রদেশে অবস্থান করিতেন। তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু প্রথমে অযোধ্যানগর পত্তন করেন। বৈবস্বত মনুর পঞ্চবিংশতি পর্য্যায়ে বিশাল রাজা কর্ত্তৃক বিশালপুরী নির্মিতা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে কথিত আছে, সূর্য্যবংশের দশম রাজা শ্রাবস্ত কর্ত্তৃক শ্রাবস্তীপুরী রচিতা হয়। এই শ্রাবস্তীপুরী উত্তর কোশলের রাজধানী অযোধ্যা হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ উত্তরে। উহার বর্ত্তমান নাম সাহেৎ মাহেৎ। বৈশালী নগর পাটনার উত্তর পূর্ব্বে প্রায় ১৪ ক্রোশ। ইহাতে বোধ হয় সূর্য্যবংশীয় রাজারা যমুনা হইতে কৌশিকী নদী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার সময় মিথিলা ও গাঙ্গ্য ভূমিকে আর্য্যাবর্ত্ত বলা হইত, কিন্তু সগর রাজার পর ভগীরথের সময় গঙ্গাসাগরান্ত ভূমিকে আর্য্যাবর্ত্ত বলা হইয়া থাকে। আর্য্যগণ আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করিলে নরকস্থ হইবেন, এইরূপে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ছিল। প্রাচীন ঐতিহ্য পাঠে জানা যায়, প্রথমে বিন্ধ্য ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানকেই আর্য্যাবর্ত্ত বলা হইত। কিন্তু সগর-বংশীয় রাজারা ম্লেচ্ছ দেশে প্রাণত্যাগ করায় ঐ স্থান পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তকে সমৃদ্ধ করিতে না পারিলে সূর্য্য-বংশের বিশেষ নিন্দা হয়, সুতরাং তদ্বংশের দিলীপ অংশুমান হইতে ভগীরথ পর্য্যন্ত রাজন্যবর্গ অনেকেই ব্রহ্মাবর্ত্তাধীশ ঋষিগণের সভাপতি ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ভূমিকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া ব্যবস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই জন্য মনুসংহিতায় পূর্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরির মধ্যবর্ত্তী দেশকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভগীরথের সময় আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের বিভাগ চলিয়া আসিতেছে।

তীর্থ নির্ণয়ে দেখা যায়, আদৌ কুরুক্ষেত্রই তীর্থ নামে অভিহিত হইত। কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্তের সন্নিকট। পরে আজমীরের নিকট পুষ্করকে তীর্থ বলা হইয়াছে। অনন্তর নৈমিষারণ্যই তীর্থ বলিয়া স্বিরীকৃত হয়। বর্ত্তমানে গঙ্গাই তীর্থ। ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষিদেশ, মধ্যদেশ, পুরাতন আর্য্যাবর্ত্ত ও আধুনিক আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত দেশের কলেবর যেরূপ বর্দ্ধিত হইল, সেইরূপ তীর্থসকলও কুরুক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত সকল বিস্তৃত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মানব-

দিগের বুদ্ধি বৃত্তিরও যেরূপ উন্নতি হইতে লাগিল ধর্মভাবও সেইরূপ উন্নত হইতে লাগিল। জীবের বুদ্ধির উন্নতিক্রমে তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবদ্‌ভাবসমূহ পরিস্ফুট হইয়া থাকে। এইজন্য জীবের অবস্থা ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন কালে বিভিন্ন অবতার সমূহের উল্লেখ দেখা যায়। ধর্ম্মভাব যেরূপ প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, তদনুযায়ী তারকব্রহ্ম নামমন্ত্রের আবির্ভাব হইতে লাগিল।

আর্য্যদিগের ব্রহ্মাবর্ত্ত স্থাপন হইতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ পর্য্যন্ত কয়েকটী বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দক্ষযজ্ঞ, দেবাসুর যুদ্ধ, সমুদ্র মন্থন, অসুরদিগকে পাতালে প্রেরণ, বেণ রাজার প্রাণ সংহরণ, ভগীরথের সাগর পর্য্যন্ত গঙ্গা আনয়ন, পরশুরামের ক্ষত্রিয়-সংহার, শ্রীরামের লঙ্কাজয়, দেবাপি ও মরু রাজার কলাপ গ্রাম গমন, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ—এই কয়টি প্রধান। এতদ্ব্যতীত আর অন্যান্য অনেক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

আর্য্যদিগের ব্রহ্মাবর্ত্ত স্থাপনের অনতিবিলম্বেই দক্ষযজ্ঞ উপস্থিত হয়। আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে ভূতনাথ রুদ্রই প্রধান ছিলেন। পার্ব্বতীয় দেশের অধিকাংশ ভূমি তাঁহার অধিকৃত ছিল। ভুটান অর্থাৎ ভূতস্থান, কুচবিহার, ত্রিবর্ত্ত (যথায় কৈলাস পরিদৃষ্ট হয়) প্রভৃতি স্থান শ্রীরুদ্রদেবের রাজ্য। আদিম অধিবাসী হইয়াও শ্রীরুদ্রদেব ভগবান্ বাসুদেবে রতি বিশিষ্ট ছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যা, গীতবাদ্য ও যুদ্ধ-বিদ্যায় তাঁহার অসীম পারদর্শিতা ছিল। আর্য্যগণ স্বভাবতঃ গর্ব্বিত ছিলেন। তাঁহারা আদিম অধিবাসীদিগকে ঘৃণা করিতেন, এমন কি তাঁহাদের সহিত কোনপ্রকার সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছা করিতেন না। কিন্তু রুদ্রদেব অসীম প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া বলে ও কৌশলে আর্য্যগণের অভিমান খর্ব্ব করিয়া দক্ষপ্রজাপতির কন্যা সতীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই পাণিগ্রহণের কিছুদিন পরে মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলে দেবতাবৃন্দ সেই যজ্ঞে আহূত ও সমবেত হন। সেই যজ্ঞে বৈষ্ণবপ্রবর শিব নিজ শ্বশুর দক্ষকে প্রত্যুত্থান দ্বারা সম্মান প্রদর্শন না করায় দক্ষ শিবের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সভা মধ্যে নানা প্রকার কুবাক্য প্রয়োগ করেন এবং 'এই ভব দেবযজ্ঞে যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। ইহার অব্যবহিত পরে শিব-অবমানন করিবার উদ্দেশ্যে 'বৃহস্পতি সব' নামক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া তৎকন্যা সতী দেহত্যাগ করেন।

শিব সেকথা শুনিয়া তাঁহার পার্ব্বত্য অনুচরবর্গের সহিত আগমনপূর্বক প্রজাপতি ও তদনুগ ব্যক্তিগণের প্রতি প্রবল অত্যাচার আরম্ভ করেন। অবশেষে প্রজাপতি ও তদনুচরবর্গ পরাস্ত হইয়া শিবকে যজ্ঞভাগ প্রদানপূর্ব্বক পার্বত্য জাতির সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হন। ইহার পর পার্বত্য জাতির সহিত ব্রহ্মর্ষিদিগের আর কোন বিবাদ হয় নাই।

তাৎকালিক নীতি

শিবের নিজ শ্বশুর দক্ষের প্রতি অসম্মান, সভামধ্যে দক্ষের শিবের প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, তৎকালে সামাজিক নীতি তত ভাল ছিল না। তথাপি বিবাহ-বিধিদ্বারা পত্নী-সংগ্রহ, পত্নীর ঐকান্তিকী স্বামী ভক্তি প্রভৃতি সামাজিক নীতিগুলি সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আমরা কিছু কিছু লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। আর্য্যগণের পার্বতীয় আদিম অধিবাসীদিগের সহিত আদান প্রদান থাকায় তৎকালে যে বর্ণ-বিভাগ হয় নাই, ইহা সহজেই অনুমান হয়।

তাঁহারা পশুর চর্ম্ম, বৃক্ষবল্কলাদি পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেন। গমনাগমনে পশুগণই তাঁহাদের বাহকের কার্য্য করিত। ইহার দ্বারা তৎকালে শিল্পবিদ্যায় তত ভাল চর্চ্চা ছিল না বলিয়া মনে হয় না।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই সাধারণের অবগতির জন্য লিখিত হইল। উপরি-উক্ত বিচার যে সকলের প্রীতিপদ হইবে তাহা বলা যায় না। ঐরূপ বিচার বিশ্বাস করিলে বা না করিলে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, উহা পাঠকের স্বাধীন বিচার বৃত্তির উপর নির্ভর করে। পারমার্থিক পণ্ডিতগণ বলেন—শিব ভগবদভিন্ন, তদীয় গুণাবতার ও অতীব প্রিয়তম সখা।

শিবের ভগবদ্ভক্তি-দৃষ্টে-ভক্তি যে জীব স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে, উহাই যে জীবের সহজাত ধর্ম্ম এবং ভক্তির প্রভাবে সমগ্র ধর্ম্ম ও জাগতিক নীতি পরাজয় স্বীকার করে, ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন।

ভক্তের ক্রিয়ামুদ্রা পণ্ডিতাভিমানী কোন ব্যক্তিই বুঝিতে পারে না। প্রজাপতি কর্ম্মী ছিলেন। তিনি প্রাকৃত দৃষ্টিতে ভক্তপ্রবর শিবের যে নৈতিক ধর্ম্মের অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, বা অসভ্য অনার্য্য জাতি বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার খর্ব দৃষ্টিরই পরিচয় মাত্র। বর্ত্তমান কালেও অনেকেই ভগবদ্ভক্তের অপ্রাকৃত চেষ্টা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কখনও তাঁহাতে বাহ্য তৃণাদপিত্বের অথবা তাহাতে পরবিদ্যা-বুদ্ধির অভাব কিংবা জন্মগত দোষ লক্ষ্য করিয়া নানা প্রকার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের দক্ষ প্রজাপতির আনুগত্য বই আর কিছু নহে। সতীর প্রতি শিবের সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাক্যও তৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

যাঁহারা 'শিবোঽহং' শিবোঽহং' বলিয়া চীৎকার করেন, তাঁহারা যদি সত্য সত্য শিবত্ব প্রাপ্ত হন, কিংবা যাঁহারা শিবের উপাসক, তাঁহারা যদি শিবের নিষ্কপট কৃপা লাভে বঞ্চিত না হন, তবে যে তাঁহারা শিবের ন্যায় ভগবদ্ভক্ত হইয়া সমগ্র জগতই জয় করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ কি?

শিবের সমসাময়িক প্রজাপতির কর্ম্মকাণ্ডীয় রুচি দেখিয়া কর্ম্মের অনাদিত্ব বিনাশিত্ব জানা যায়। কর্ম্মে লিপ্ত হইবার যোগ্যতা জীব-স্বরূপে অনুস্যূত আছে—ইহাও উপলব্ধি হয়।

ভাবুকতা ও বাস্তবসত্য

ফলভোগবাদী কর্ম্মিগণ আত্মবৃত্তি ভগবন্নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গকে 'ভাবুকতা' বলিয়া থাকেন, আর দু'দশটী লোককে অন্ন-বস্ত্র দান, দু'দশটী রোগী-শুশ্রূষা, দু'একটী চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন, রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি দেহ-মন-সম্বন্ধীয় কর্ম্মাঙ্গকে 'বাস্তব সত্য' আখ্যা দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন "ভক্ত্যঙ্গ কর্ম্মাঙ্গ দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে, ভক্ত্যঙ্গ বা ভাবুকতার স্বাধীনভাবে দাঁড়াইবার সামর্থ্য নাই, কর্মাঙ্গ বা বাস্তব-সত্যের সহিতই তাহার সমন্বয় হওয়া আবশ্যক।" কর্ম্মিগণের দেহ ও মনোধর্মে অত্যাসক্তিনিবন্ধন তাঁহারা দেহ ও মন যে জীবাত্মা কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবার যোগ্য, আত্মা দেহ-মনের অতিরিক্ত একটি বস্তু, তাহা স্বতন্ত্র পুরুষের স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত, সুতরাং একমাত্র ভগবদপেক্ষাযুক্ত-ভিন্ন অন্য-নিরপেক্ষ—দেহ ও মনের কোন ধর্মকেই আত্মা অপেক্ষা করেন না, ইহা ধারণাই করিতে পারেন না। তাই আত্মশক্তির উপর নির্ভরতা নাই বলিয়া তাঁহারা দেহ মনের অপেক্ষাযুক্ত হইয়া, আত্মবৃত্তি ভগবদ্ভক্তির সহিত দেহ-মনোধর্মের সমন্বয়-প্রার্থী হন। কিন্তু তাঁহারা যদি জানিতেন, আত্মা চিদ্বস্তু, দেহ ও মন জড়বস্তু, চিদ্‌-বস্তুর সহিত জড়ের কখনও সমন্বয় সাধিত হয় না, সজাতীয়ে সজাতীয়ে সমন্বয় হইতে পারে, তাহা হইলে আর তাঁহারা এ ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হইতেন না। তাঁহারা বুঝিতেন, দেহ ও মন আত্ম দ্বারা নিয়মিত হইয়া আত্মবৃত্তির অনুকূল কার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু দ্বৈত বুদ্ধিতে অর্থাৎ আত্ম হইতে স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই, করিলেও তাহা ভগবান্ কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইবে না।

'বাস্তব' অর্থে বস্তু-সম্বন্ধীয়। বস্তু কাহাকে বলে? যাহার নিত্যসত্তা বর্ত্তমান, তাহাই বস্তু। জগতের কোন পদার্থই সার্বকালিক সত্তা-বিশিষ্ট নহে।" একমাত্র ভগবৎ-

পদার্থই নিত্য বস্তু। শ্রীভগবান্ বলিলেন, "অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহস্ম্যহম্॥"—অর্থাৎ "এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমি ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয়-স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব সুতরাং আমারই নিত্যসত্তা বর্ত্তমান, আমিই একমাত্র বস্তু।" বস্তুর অংশই জীব ; সুতরাং জীবও বস্তুর নিত্যধর্ম-প্রাপ্ত। জীবাত্মা নিত্য হইলে জীবাত্মার বৃত্তিও নিত্য, অতএব ভক্তিরই বাস্তব সত্যত্ব। দেহ ও মন শ্রীভগবানের অপরা প্রকৃতিসম্ভূত বলিয়া দেহ-মনের ধর্ম্ম অনিত্য ; অতএব মন দ্বারা সঙ্কল্পিত এবং দেহ দ্বারা কৃত কর্মের বাস্তব সত্যত্ব নাই। তবে এই কর্ম যখন ভক্তির অনুকূল, তখন তাহা 'ভক্তি'—কর্ম্ম নহে। ভক্তির অধীনে কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া ভক্ত্যঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু কর্ম্মের অধীনে ভক্তি অনুষ্ঠিত হইয়া ভক্ত্যঙ্গ হইতে পারে না।

এখন দেখা যাউক, ভাবুকতা কাহাকে বলে ? 'ভাব' আছে যাঁহার, তিনিই ভাবুক ; ভাবুকের ভাব—ভাবুকতা। ভাবুকতা দুই প্রকার—(১) অপক্ব বা অনধিকারী ভক্তি-যোগীর অপক্ব বা কপট ভাব প্রবণতা বা ভাবের অনধিকার চর্চ্চা, আর (২) সুপক্ব বা অধিকারী ভক্তিযোগীর নিষ্কপট ভাব-চর্চ্চা। ভক্তির তিনটি অবস্থা—(১) সাধন ভক্তি, (২) ভাবভক্তি ও (৩) প্রেমভক্তি। প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ বা গুরুপাদাশ্রয়, তৎ সঙ্গে সঙ্গে ভজনক্রিয়া, তৎফলে অনর্থ নিবৃত্তি, তৎফলে নিষ্ঠা বা অবিক্ষেপে সাতত্য, তৎফলে রুচি বা বুদ্ধিপূর্ব্বিকা ইচ্ছা, তৎফলে আসক্তি বা স্বারসিকী রুচি—এই পর্য্যন্ত সাধন ভক্তি ; ইহার পর সাধ্য ভক্তি বা ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। সাধন-ভক্তি হইতে আসক্তি-ফলে যে সাধ্য রতির উদয় হয়, তাহাই 'ভাব' নামে কথিত। প্রেমের প্রথম বা অঙ্কুর অবস্থাই 'ভাব'। এই ভাবেরও আবার অঙ্কুরাবস্থা যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার "ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা, আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নাম গানে সদারুচিঃ। আসক্তিস্তদ্-গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্ বসতিস্থলে ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাত ভাবাঙ্কুরে জনে॥"—ক্ষান্তি (ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্তে কোনও প্রকার বিকার উপস্থিত না হওয়া), অব্যর্থকালত্ব (ক্ষণমাত্রও যাঁহার ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্যে ব্যয়িত হয় না), বিরক্তি (কৃষ্ণেতর বিষয়-বিতৃষ্ণা), মানশূন্যতা (উত্তম হইয়া আপনাকে তৃণাধমজ্ঞান, সর্বভূতে গুরুদর্শন), আশাবন্ধ (ভগবৎসেবা-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে দৃঢ় সম্ভাবনা, নিরুৎসাহ না হইয়া যাওয়া), সমুৎকণ্ঠা (স্বাভীষ্টসিদ্ধি-লালসা অর্থাৎ "হে ভগবন্, কোথা যাই, কোথা গেলে তোমাকে পাই"—এই অবস্থা), নাম গানে সদারুচি (এক মুহূর্ত্তও নামরসাস্বাদন ব্যতীত তিষ্ঠিতে না পারা), ভগবদ্ গুণাখ্যানে আসক্তি ও তদ্ বসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি অনুভাব সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ভাবের উৎকৃষ্ট পক্ব বা পরিণতাবস্থাই—প্রেমভক্তি। রতি গাঢ় হইলে তাহাই প্রেম, প্রেমই ভক্তির ফল বা প্রয়োজন। যাহারা এই সাধন-ক্রমে অনাদর-প্রকাশ করিয়া হঠাৎ উন্নতাধিকার লাভ করিতে যাইয়া বাহিরে কপট অশ্রু পুলকাদি চেষ্টার অভ্যাস করে, অথচ যাহাদের হৃদয় আদৌ বিকার-গ্রস্ত না হয়, সেই সকল ব্যক্তি কপট ভাবুক। আবার কতকগুলি লোক এমন নিসর্গ-পিচ্ছিল-অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট যে, সামান্য একটু দুঃখ বা সুখের উদয় হইলেই কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হয়, লোকে মনে করে ও তাহাদের নিজেদেরও মনে হয়, এইবার বুঝি তাহারা এক একজন বড় ভাবুক হইয়া পড়িল, বস্তুতঃ তাহাদের সে ভাবুকতা, কপটতা ও হৃদয়দৌর্বল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই কপটতা বা ভাবুকতার সহিত অপ্রাকৃত ভাবুকগণের প্রকৃত ভাবুকতার সমন্বয় হইতে পারে না। অপ্রাকৃত ভাবুকগণের অপ্রাকৃত ভাবচেষ্টা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাহাকে প্রাকৃত ভাবুকগণের প্রাকৃত ভাবচেষ্টার সহিত সাম্যবোধে যদি তাহা অপূর্ণ বলা হয় এবং তাহার পূর্ণতা সম্পাদন নিমিত্ত প্রাকৃত কাম্য কর্মের আবাহন করা হয়, তাহা হইলে ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ-নিবন্ধন আর কোন কালে ভগবৎস্বরূপ লাভের সম্ভাবনা থাকিবে না। প্রাকৃত ভাবুকতার বাস্তব

সত্যতা নাই, অপ্রাকৃত ভাবুকতাই বাস্তব সত্য। সুতরাং অবাস্তব বা প্রাকৃত সত্যের সহিত বাস্তব বা অপ্রাকৃতের সমন্বয় হইতে পারে না।

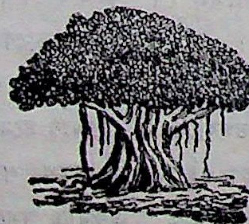
উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ভক্তি দুর্বলা নহেন, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে প্রাকৃত কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করিতে হয় না। ভক্তিই অন্য নিরপেক্ষা হইয়া জীবকে ভগবৎ পাদপদ্ম স্পর্শাধিকার দিতে পারেন। কর্ম্মের অপেক্ষা নাই বলিয়া ভক্তগণ যে নিষ্ক্রিয় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহাও যেন আবার কেহ মনে না করেন। ভক্তগণও কর্ম্ম করেন—এক আধটি ইন্দ্রিয় দিয়া নয়, সর্বেন্দ্রিয় দ্বারে, কিন্তু সে কর্ম্মের ফল-ভোগাশা ভক্তের নাই। ভক্ত কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে কৃষ্ণকর্ম্ম করেন মাত্র। তাহা কৃষ্ণসেবা বা ভক্তি। ভক্তির প্রথমাবস্থায় সাধকের প্রাপঞ্চিক অনুভূতি বর্ত্তমান থাকা-কালে তাহা কর্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা থাকিলেও প্রাপঞ্চিক প্রতীতির অপগমে অপ্রাকৃতানুভূতি ক্রমে তাহা শুদ্ধাভক্তি হইয়া থাকে।

দুঃখদূরীকরণ

পরদ্রব্যাপহরণাপরাধে রাজাদেশে রাজ-প্রতিনিধি কর্ত্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তস্করকে যেমন নির্ব্বিবাদে বিনা ওজর আপত্তিতে তাঁহার অপরাধোচিত শাস্তি বরণ করিয়া লইতে হয়, কেন সে কষ্ট পাইতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার তাহার কোন কারণ থাকে না, জিজ্ঞাসা করিলেও যেমন তাহার উত্তর সহজেই প্রদত্ত হইয়া থাকে—'তুমি অপরাধ করিয়াছ কেন?' সেইরূপ নিজকৃত ভগবদ্বিমুখতা-পরাধে অপরাধী আমরা, কেন আজ ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি, কেন আজ অন্ন বস্ত্রের জন্য আমাদিগকে হাহাকার করিতে হইতেছে, কেনই বা গৃহবিবাদোত্থ অনলে আজ আমাদিগকে দগ্ধীভূত হইতে হইতেছে, এত অশান্তি কেন আমাদের,—সে প্রশ্নের সমাধান আমাদেরই নিকট এইরূপে রহিয়াছে—"গোরা পহু না ভজিয়া মৈনু। প্রেমরতন ধন হেলায় হারাইনু। অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু। আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥ সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥ বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু। গৌর-কীর্ত্তন রসে মগন না হৈনু॥" দোষ করিবার বেলায় কোন জ্ঞান থাকিবে না, শেষে শাস্তি পাওয়ার বেলা ভগবানের উপর দোষারোপ করিয়া আপত্তি জানাইব, তাহা হইলে চলিবে কেন? যেমন কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার ফলটাও ত' তেমনই ভোগ করিতে হইবে। তবে অপরাধ করিয়াছি বলিয়া তাহার যে একেবারেই ক্ষমা নাই, তাহা নহে। ক্ষমা আছে বটে, কিন্তু ক্ষমার্হ হইতে হইবে। কেবল হাহুতাশ করিয়া ছটফট করিয়া বেড়াইলে চলিবে না। বরং যতই ইতস্ততঃ ছুটিতে থাকিব, ততই অসৎ সঙ্গরূপ বায়ু চালিত হইয়া বিষয় অনল আরও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, শেষে একেবারেই পুড়িয়া মরিব অথবা মায়া-জালে আরও জড়াইতে থাকিব। শ্রীভগবান্ সাধু শাস্ত্র গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া যেরূপে বিষয়-অনল নিভাইবার বা মায়াজাল ছুটাইবার উপায় বলিতেছেন, তাহা সাবধানে নিষ্কপটে শ্রবণ করিয়া চলিতে হইবে, নতুবা মিছামিছি উদ্‌ব্যস্ত হইলে চলিবে না। শ্রীভগবান্ শাস্ত্ররূপে বলিতেছেন—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥" "হে জীব, আমি তোমাকে সদসৎ-বিবেক প্রদান করিয়াছি, সে বিবেক সদ্ব্যবহারের স্বাধীনতাও তোমাকে দিয়াছি। তুমি ইচ্ছা করিলেই সে বিবেকের সদ্ব্যবহার করিয়া দুঃসঙ্গ সর্বতোভাবে বিসর্জ্জনপূর্বক সাধুসঙ্গ করিতে পার। সাধুগণ তোমার হিতচেষ্টা বই কোন অহিত করিবেন না। তাঁহারা তোমার মনের যে বিরুদ্ধ বিষয়ে আসক্তি, তাহা শাস্ত্র-বাক্যরূপ শস্ত্রদ্বারা সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া তোমাকে একমাত্র অসমোর্দ্ধ বিষয়-বিগ্রহ যে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত করিতে সমর্থ।" অতএব

সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে সাধুর কৃপাবলেই জীব 'নিজ তত্ত্ব অবগত হন। নিজ তত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়। কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥ কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস। তোমার চরণ ছাড়ি হৈল সর্বনাশ॥ কৃপা করি কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার। কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার॥ মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥ কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল॥ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥' সাধুসঙ্গ ভিন্ন ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াইবার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। যদি বল, "আমি এখন না খাইয়া মরিতেছি, চারিদিক হইতে অভাব আমাকে গ্রাস করিতে ছুটিয়াছে, রোগে শোকে দুঃখে আমার দেহ মন জর জর, আমার এমন অবস্থায় সাধুর দুটা কথা শুনিয়া আর আমি কি করিব? সাধু কি আমাকে খাইতে পরিতে দিবেন? না রোগ ব্যাধি সারাইয়া দিতে পারিবেন? সাধুকেই লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, সাধুই নানা অভাবগ্রস্ত, তিনি আর আমার দুঃখ কি দূর করিবেন? তাহার কাছে বসিয়া যে সময়টা নষ্ট করিব, সে সময়টা বরং অন্য কাজে লাগাইলেও অনেক উপকার পাইব।" এরূপ ধারনা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মিকা। জণ্ডিস্ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি জগৎকে হরিদাবর্ণ দেখে বলিয়া ত' আর জগৎ বস্তুতঃ হরিদ্রাবর্ণের নহে? সাধুকে প্রাকৃত জীবের মত অভাব-গ্রস্ত, রোগ-প্রপীড়িত দেখা জীবেরেই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। সাধুর অভাবে পড়িয়া লোকের দুয়ারে যাইতে হয় না। (শ্রীনন্দ মহারাজ গর্গ মুনিকে বলিয়াছিলেন, "মহদ্বিচলনং হি নৃণাং গৃহিণাং দীন-চেতসাম। নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথ কল্পতে ক্বচিৎ॥" অর্থাৎ 'হে ভগবন্ দীন চেতা গৃহীদিগের নিত্যমঙ্গল সাধনের জন্যই মহদ্ব্যক্তিগণ তাঁহাদের গৃহে গমন করিয়া থাকেন, অন্য কোন কারণে গমন করেন না—মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য্য নাই, তবু যান তার ঘর॥) আমার মত ভবকূপে পতিত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই জীবের আসক্তির বস্তু কাড়িয়া লইয়া ভগবৎ সেবায় দিবার জন্যই সাধু কৃপা করিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে ছুটিতেছেন। ভোগী আমি, দুর্দ্দৈব আমার, আমার ভোগে বাধা পড়িবে বলিয়াই তাদৃশ সাধু দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে না। সাধুই আমাদের সকল অভাব—সকল রোগ দূর করিয়া দিতে পারেন; রোগের —অভাবের মূল যে অবিদ্যা, তাহাই ধ্বংস করিয়া দেন, রোগাদির অনুভূতিই যখন থাকে না, তখন তন্নিরাকরণের চেষ্টাই বা আসিবে কেন? কৃষ্ণদাস্যই যে জীবের স্বরূপ, সেই স্বরূপের উপলব্ধি হইলে জীব কৃষ্ণসেবা ভিন্ন আর কিছু বুঝেন না,—সেবানন্দ ভিন্ন নিরানন্দ বা জড়ানন্দ তাঁহাতে আসে না। জীব তখন বলেন, ঠাকুর "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ। সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥"

সুতরাং সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য হৃদয়ে ঐক্য করিয়া অন্য আশা-ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলেই জীবের সকল দুঃখের নিবৃত্তি, নতুবা দুঃখের অবধি নাই। কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া কোন লাভ নাই। আরোহ চেষ্টার দুঃখ নিবারণ পন্থা কৃষ্ণসেবা-বিরোধ চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে।



মায়া-জয়

'সংসারের সমস্ত অভাব-অভিযোগ মিটাইয়া পরে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইব'—এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। বর্ত্তমান সুযোগ ছাড়িয়া অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশা আদৌ সদ্বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। মায়ার সংসারে মায়ার আদরের ছেলে হইয়া মায়ার মন যোগাইয়া চলিয়া মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভ পূর্ব্বক ভগবানের পাদপদ্মে যাইবার আশা একেবারেই অসম্ভব। কেন না মায়ার কার্য্যই হইতেছে জীবকে কৃষ্ণসেবা বিমুখ করিয়া রাখা—স্ব ইচ্ছায় কখনও সে আমাদিগকে কৃষ্ণের নিকট যাইবার অনুমতি দিবে না। যখন আমরা মায়ার অত্যন্ত অবাধ্য হইব—মায়াকে রাক্ষসী, প্রাণ-হন্তারক,সর্বস্ব-শোষক রূপে জানিয়া তাহাকে পিছনে ফেলিয়া 'কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর' বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিব, তখনই কৃষ্ণ জন আমার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার নিজ সাধুকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন, সাধুসঙ্গ-বলে তখন আমার মায়াপিশাচীর আবেশ কাটিয়া যাইবে, আমি কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিয়া ধন্য হইব। নতুবা আমার উদ্ধার নাই।

হতভাগ্য মানব আমরা, বিশ্বাসই করিয়া উঠিতে পারি না, মায়া আমাদিগকে অধিক সুখ প্রদান করিবে কি ভগবান্ আমাদিগকে অধিক সুখ দিতে পারিবেন। তৃষাতুর মৃগ যেমন মরীচিকা ভ্রমে উত্তপ্ত বালুকা-রাশি ভেদ করিয়া ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে প্রাণ হারায়, আমরাও আজ সেইরূপ সুখের ছদ্মবেশধারী দুঃখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া অনন্তদুঃখ রাশির মধ্যে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি। ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং এবং তাঁহার নিজজনগণ দ্বারা আমাদিগকে কত সাবধান করিয়াছেন, তাহা এতদিন আমরা শুনি নাই, তাই এবার অংশাবতাররূপে নহেন, সর্ব-অংশী সর্ব্বাবতারাবতারী স্বয়ং-ভগবান্ সাক্ষাৎ বিষয়-বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন আশ্রয়ের-ভাব অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন আমাদিগের অতি নিকটে, আমাদিগকেই উদ্ধার করিবার জন্য—আবার ছুটিতেছেন আমাদেরই পশ্চাতে, ধ্বংসের পথ হইতে ফিরাইতে আমাদিগকে। এবার প্রভুর কত দয়া। প্রভু এবার পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যে তাঁহার শরণ লইতেছে, তাহাকেই তাঁহার নিগূঢ় প্রেমভাণ্ডার লুটিতে দিতেছেন। অপরাধী হউক, নিরপরাধী হউক যে আজ একবার হে গৌরাঙ্গ, হে কৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতেছে, সে আজ আর বঞ্চিত হইয়া ফিরিতেছে না, সমস্ত অধন দূর করিয়া কৃষ্ণপ্রেমধনে তাহার পাত্র পরিপূর্ণ করিতেছে। জীবের প্রতি ভগবানের কেন আজ এত দয়া, তাহার উত্তর 'স্বেচ্ছাময় ভগবান্—ইচ্ছা তাঁহার জীবোদ্ধারণে।" শ্রীচৈতন্য এবং তদভিন্ন বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ, জগদ্গুরু শিক্ষকদ্বয়রূপে জগতে অবতীর্ণ। অনর্থযুক্ত অবস্থায়ও যাহারা তাঁহাদের অভয় পাদপদ্মে যাইয়া নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে, প্রভুদ্বয় তাহাদিগকেই অনর্থমুক্ত করাইয়া তাঁহাদের স্ব স্বরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ উপলব্ধি করাইতেছেন। বদ্ধজীব গৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় তাহাদের চিরবদ্ধদশা হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইতেছে, আর তাহাদিগকে মায়ার কবলে পড়িতে হইতেছে না। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উদার এবং ঔদার্য্যের মধ্যেই মাধুর্য্য; ঔদার্য্য-স্বরূপের লীলায় তাঁহারা অনর্থযুক্ত অমুক্ত জীবেরও সেব্য হওয়ায় তাহারাও তাঁহাদের নাম গ্রহণ ফলে অনর্থ-মুক্ত হইয়া ঔদার্য্য মাধুর্য্য উভয় লীলায় বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে। কিন্তু মাধুর্য্য প্রধান-ঔদার্য্য-স্বরূপ কৃষ্ণের উদারতা—কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও আশ্রিতগণের উপর। কৃষ্ণনাম মুক্ত-কুলেরই উপাস্য বস্তু; যাহারা গৌর-নিত্যানন্দের চরণাশ্রয়ে শিক্ষার অপ্রাপ্তিতেই সিদ্ধাভিমানে কৃষ্ণনামের সেবায় উদ্যত হইতেছে, তাহারা অনর্থকেই আবাহন করিতেছে মাত্র, কিন্তু সিদ্ধাভিমানের ছলনা ছাড়িয়া যাহারা যথার্থ আর্ত্তি-সহকারে 'হা নিতাই,' 'হা গৌর' বলিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে পড়িতেছে, প্রভু তাহাদিগকে 'নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে

অশ্রুধার'। এমন অহৈতুক কৃপাসিন্ধু গৌর-নিত্যানন্দের চরণ ছাড়িয়াও যদি আমাদিগের মতি ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে চায়, হায়, হায়, তাহা হইলে আর আমাদের গতি কি হইবে? এত দয়া যে আর কাহারও নাই। এমন নির্ঘৃণ্য, বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট, নরপিশাচ আমাদিগকে আর কে দয়া করিয়া আশ্রয় প্রদান করিবে? কে বলিয়া দিবে আমাদের, কেন আমরা পরস্পর বৃথা দ্বেষ হিংসা করিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছি—নিজেদের অমঙ্গল নিজেরাই বরণ করিয়া লইতেছি? জীবনের বহুদিনই ত' কাটিয়া গেল, 'আনন্দ' 'আনন্দ' করিয়া ত' অনেক ছুটিলাম, কিন্তু হায় একদিনের—এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি আমরা আনন্দ বলিয়া কোন বস্তু আস্বাদন করিতে পাইয়াছি? না তুচ্ছ জড়ানন্দ আমাদিগের প্রতি পদ-বিক্ষেপে বিকট অট্ট অট্ট হাস্য সহকারে নানারূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া তাহার স্বরূপ জানাইয়া দিয়াছে? তবে কি এখনও আমাদের চৈতন্য হইবে না? দয়াময় প্রভুকে ডাকিবার একটুও সাধ হইবে না? চৈতন্য-চন্দ্রের দয়া বিচার করিয়া আমরা কি একটুও চমৎকৃত হইব না? পশুর ন্যায় আহার, বিহার, শয়ন ইন্দ্রিয়-তর্পণ লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিব? তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ, কিং ন শ্বসন্ত্যুত। ন মেহন্তি ন খাদন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে? মানুষ বলিয়া গর্ব করিবার কি গুণ আমাদের আছে? আমাদেরই জন্য যে প্রভু তাঁহার নিজ নাম প্রদান করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আজ গোলোক ছাড়িয়া ধরায় আমাদেরই দ্বারে অবতীর্ণ, আমরা চাহিব না, সেই প্রভুর চরণ দু'টি বক্ষে ধরিতে? আমাদের সর্ব্বস্ব ভিক্ষা না দিয়া কি আজ প্রভুকে আমরা প্রত্যাখ্যান করিব? প্রভু আমাদের দ্বার হইতে শূন্য হস্তেই ফিরিয়া যাইবেন? আমাদের প্রাণ একটুও তাহাতে বিচলিত হইবে না? ধিক্ আমাদের ভারত ভূমিতে মনুষ্য দেহ ধারণে—ধিক্ আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি কুলশীল মানে—ধিক্—শত ধিক্ আমাদের জীবনে!!

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন॥

চৈতন্য নিত্যানন্দের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত মায়া রাক্ষসীর হস্ত হইতে নিস্তার লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

কৃষ্ণাকর্ষণ

ভক্তি বা সেবা জীবাত্মার স্বরূপগত, সহজ বা স্বাভাবিক ধর্ম; জীব সেবা না করিয়াই পারেন না। জড়বিজ্ঞান বিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, প্রত্যেক বৃহদ্ বস্তু প্রত্যেক ক্ষুদ্র বস্তুকে আকর্ষণ করে। এমন কি প্রত্যেক অণু (মোলিকিউল বা পরমাণু সমষ্টি) পর্য্যন্ত প্রত্যেক পরমাণুকে (য়্যাটম) আকর্ষণ করিয়া থাকে। বৃহৎ ও ক্ষুদ্রের মধ্যে এ আকর্ষণ না থাকিলে জগতেরই কোন অস্তিত্ব থাকিত না। অপ্রাকৃত বৈজ্ঞানিকগণও সেইরূপ বলিয়া থাকেন, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু যে ভগবান্, যাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই, যাঁহার তুলনা তিনি নিজেই, সেই অসমোর্দ্ধ ভূমা পুরুষ কর্ত্তৃকই সমস্ত স্থাবর জঙ্গম আকৃষ্ট হইতেছে। ভগবান্ সকলকেই তাঁহার পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া পাদপদ্ম-সেবানন্দ দান করেন বলিয়া তাঁহার নাম—'কৃষ্ণ'। "কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ কৃষ্ ধাতু ভূ অর্থাৎ আকর্ষণ-সত্তা বাচক 'ণ' শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দবাচক। 'কৃষ্' ধাতুতে 'ণ' প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে 'কৃষ্ণ' শব্দে পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। কৃষ্ণ নির্ব্বিশেষ নিরানন্দ কোন বস্তু নহেন, পরন্তু তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন কাল্পনিক বা অনিত্য বস্তুতে আনন্দ বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না, আনন্দই যখন জীবের লক্ষীভূত বস্তু

তখন জীব কৃষ্ণাকৃষ্ট না হইয়াই পারেন না। 'কৃষ্ণ' ও জীবের মধ্যে সর্ব্বক্ষণই আকর্ষণ বর্ত্তমান, তবে বর্ত্তমানে জীবের প্রাপঞ্চিক প্রতীতি প্রবল থাকায় জীব সেই আকর্ষণ স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তথাপি তাঁহার মনে হইতেছে, কে যেন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে যাইয়াই জীব জড়জগতের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া পড়িতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার আর সাধ মিটিতেছে না, যাহাকে তিনি আকর্ষক বলিয়া ছুটিয়া ধরিতে যাইতেছেন, সে তাঁহার আনন্দ বিধান করিতে পারিতেছে না বলিয়া সেখান হইতে আবার তিনি অন্যত্র ছুটিতেছেন। জড়জগতের অনেক বস্তুকে তিনি আকর্ষক ও নিজে তদ্দ্বারা আকৃষ্ট ভাবিয়া সেই জড় বা অসদ্ বস্তুর কত সেবা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু হায় যাহাকে সেবা করিতে যান, সেই ছাড়িয়া যায়, নতুবা নিজেকেই ছাড়িতে হয়। জীব এইরূপে সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যখন সত্য সত্য কোন সৎ বা নিত্য বস্তুর সেবা করিতে পান, তখনই তাঁহার লুপ্ত স্মৃতি পুনরায় ফিরিয়া আসে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন, কৃষ্ণই তাঁহার আকর্ষক, তিনি কৃষ্ণকর্তৃক আকৃষ্ট আর আকর্ষক ও আকৃষ্টের মধ্যে যে ব্যাপার, তাহাই আকর্ষণ বা ভক্তি। এই বুদ্ধির নামই সম্বন্ধ জ্ঞান। ভগবান্ গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে এই সম্বন্ধজ্ঞানের সন্ধান দিয়া থাকেন। সম্বন্ধজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই অভিধেয় বা সেবা-বৃত্তি, সেবার সঙ্গে সঙ্গেই তৎফলস্বরূপে প্রয়োজন লাভ বা কৃষ্ণ-প্রেমাস্বাদন। যতদিন না জীবের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, ততদিন জীব সেব্য, সেবক ও সেবা বা ভগবান, ভক্ত ও ভক্তি—এই তিনটি বিষয়ের তত্ত্ব ও তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। সেব্য, সেবক ও সেবা বিষয়ক তত্ত্বে অনভিজ্ঞ জীবগণ অসেব্য বা মায়াকে সেব্য, অসেবক বা মায়ামুগ্ধ অভক্তকে সেবক বলিয়া অসেবা বা অভক্তিকেই সেবা বা ভক্তি ভ্রমে পতিত হন। যাহাতে তাঁহাদিগকে আর ভ্রমে পড়িতে না হয়, তজ্জন্য তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিবিচার সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। আমরা ক্রমে ভক্তি সম্বন্ধে মহাজনসম্মত বিচার প্রদর্শন করিব।

—::—::—

সত্যানুসন্ধিৎসা

"আমরা আর আত্মবঞ্চিত হইব না, যাহাতে নিজের মঙ্গল হয়, তাহাই করিব, সত্য কথা আমাদের বর্ত্তমানে অপ্রীতিকর হইলেও তাহাই আমাদিগকে শুনিতে হইবে" —এইরূপ সত্যানুসন্ধিৎসা না থাকিলে জীব কখনই নিজ মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন না, মৎসরতা আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিবে—অসত্যকেই তিনি সত্য বলিয়া ভগবৎ কৃপা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইবেন। এই সত্যানুসন্ধান শিক্ষা দেওয়ার জন্যই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া সপার্ষদে স্বীয় ধামসহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বয়ং কৃষ্ণ আজ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া ছুটিয়া জীবকে তাঁহার পিছু পিছু ছুটাইতেছেন। পঙ্গু—যাহারা নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া চলিতে অসমর্থ, দয়াময় গৌরহরি তাহাদিগকেই চিদ্বল প্রদান করিতেছেন। গৌরসুন্দরের এত দয়া অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা গৌরনির্দ্দিষ্ট পন্থায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছে না, তাহারা অসত্য পথে যাইয়া আত্মবিনাশ সাধন করিতেছে। আত্মবঞ্চনা করিবার জন্য—গৌর-সুন্দরের অহৈতুকী কৃপা হইতে বঞ্চিত হওয়ার জন্য দুর্ভাগা লোকে বলিতেছেন—"গৌরাঙ্গের কথাই যে শুনিতে হইবে, তাহার মানে কি আছে, যত মত তত পথ, এক পথ দিয়া গেলেই হয়—গন্তব্যস্থান পাওয়া যাইবে।" তাঁহারা গীতার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"—এই শ্লোকটী তাঁহাদের মতের পরিপোষক বলিয়া আবৃত্তি করেন। কিন্তু গৌরসুন্দর বলিতেছেন—"আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে সে ভাবে ভজি—এমোর স্বভাবে॥"

ইহার অর্থ এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, যাহার যে ইচ্ছা তিনি সেই ভাবে চলিয়া সাক্ষাৎ ভগবৎ পাদপদ্মে সেবালাভ করিবেন। ইহা যাঁহারা বুঝেন, তাঁহাদের বোঝা ভ্রান্তিপূর্ণ। শুদ্ধভক্তের প্রাপ্য বস্তুর সহিত কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর প্রাপ্য এক হইতে পারে না। ইষ্টে স্বারসিকী বা স্বাভাবিকী রতিময়ী রাগাত্মিকা ভক্তিযাজীর স্বেন্দ্রিয়তোষণমূলা ভুক্তি বা মুক্তির পরিবর্ত্তে কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিমূলা কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণপ্রেমই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্মীর পক্ষে ভগবান্ কর্ম্মফল-দাতারূপে, যোগীর পক্ষে যোগবিভূতি বা কৈবল্য-দাতারূপে, জড়কর্ম্ম বা জড় বিধিবাদীর আত্মাকে আচ্ছাদিত চেতনরূপে জড় প্রায় করিয়া তাহার পক্ষে জড়রূপে, শূন্যবাদিগণের সত্তাকে শূন্যগত করিয়া তাহাদের নিকট শূন্য স্বরূপে এবং নির্বিশেষবাদী বা জ্ঞানীর আত্ম-বিনাশ দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ নির্বাণ মুক্তিদাতারূপে প্রাপ্য হইয়া জীবকে বঞ্চনাই করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবানের এই বঞ্চনাকে বাস্তব সত্য ভ্রমে তাহাতে আবদ্ধ থাকিয়া নিজ উন্নতি সাধনে চেষ্টা করেন, তাঁহারা বড়ই ভাগ্যহীন। বস্তুতঃ জড় কর্ম জড় জ্ঞান প্রভৃতি ভগবৎ-প্রাপ্তির সম্পূর্ণ বিভিন্ন বর্ত্ম। ভগবান্‌কে পাইবার বর্ত্ম যে একমাত্র শুদ্ধাভক্তি, তাহাই প্রচার করিতে—জীবকে কুবর্ত্ম হইতে ভক্তিবর্ত্মে টানিয়া আনিতেই গৌরসুন্দরের জগতে অবতরণ লীলা। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস-রসিকগণের তত্তৎরসোপাস্য রূপে রসের বৈশিষ্ট্য সম্পাদনই —'যে যথা মাং' শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য। যাঁহারা ভগবান্ গৌরসুন্দর অপেক্ষা বেশী পণ্ডিত হইয়া এক একটী নব নব বিধান সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহারা যে নিজের সর্বনাশ নিজেরাই সাধন করিতেছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

"আমি বড় বেশী বুঝি, সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য শুনিবার আমার এমন কি আবশ্যক পড়িয়াছে, আমার মত মানুষই ত' সাধু ও গুরু, আমার মত মানুষই ত' শাস্ত্র প্রণেতা, তাঁহারাও মানুষ, আমিও যখন মানুষ তখন মানুষের অসাধ্য কি আছে? আমিই যাহা বলিব, তাহা শাস্ত্র হইতে বাধ্য। আমিই জগৎকে শিক্ষা দিতে পারি।" ইত্যাদি দুর্বুদ্ধি যতদিন পর্য্যন্ত জীবের থাকিবে, ততদিন জীব জগতের মঙ্গল-চেষ্টার পরিবর্ত্তে জগতে নানা প্রকার অসুবিধা আনিয়া ফেলিবেন। সাধুগুরু আমার মত প্রাকৃত মানব নহেন, তাঁহারা ভগবানের নিজজন, ভগবানের মনোভীষ্ট প্রচারের জন্যই জগতে অবতীর্ণ; শাস্ত্র—ভ্রমাদি দোষদুষ্ট মনুষ্যের রচিত নহে। শাস্ত্র ভগবদ্বিমুখ জীবকে শাসন করিবার জন্য সাক্ষাৎ ভগবদ্বাণী। সাধুগণই শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে সমর্থ। সেইজন্য নিজের স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া দিয়া প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে সাধুর নিকট শাস্ত্র শ্রবণ করিতে হইবে। শাস্ত্র শ্রবণ করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র বিষয়ের সুষ্ঠু কীর্ত্তন হইতে থাকিবে। আমার বর্ত্তমান চিন্তাস্রোতের গতি ভগবৎ-সেবানন্দ-সমুদ্রাভিমুখিনী হওয়ার পরিবর্ত্তে অন্যাভিলাষ, কর্মজ্ঞানাদি আবর্জ্জনাপূর্ণ দুর্গন্ধময় বদ্ধজলাশয়ের দিকে। আমার আচার ব্যবহার প্রভৃতি সকলই আমার চিত্তপ্রবৃত্তি অনুরূপ না হইয়াই পারে না। সুতরাং আমার বর্ত্তমান অবস্থায় বদ্ধজ্ঞান লইয়া যাহা কিছু আমি বিচার করিতে যাইব, তাহাই সদ্বিচারের পরিবর্ত্তে অসদ্বিচার হইয়া যাইবে, সত্য অনু-সন্ধানের পরিবর্ত্তে নানা অসত্যের অনুসন্ধান করিয়া বসিব। গৌরসুন্দর এবং তদনুগ নিষ্কপট সাধুর বর্ত্মানুসরণ ভিন্ন জীবের সত্য-বিষয়ক অভিজ্ঞান লাভের আর অন্য দ্বিতীয় উপায় নাই।

নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসার অভাবেই জীব ভগবৎকথায় অনাদর প্রকাশ করিয়া বসেন, ভগবৎ কথাগুলি তাঁহাদের নিকট বাজে কথা (আইড্‌ল টক) মনে হয় এবং তাহা লইয়া তাঁহারা নানারূপ ঠাট্টা তামাসা করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। প্রাথমিক শিক্ষার কুফলই তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিকে ঐরূপ কুরুচিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই কুরুচি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়। সাধুসঙ্গ প্রভাবে জীব শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহাপ্রভু প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে নিত্য শুদ্ধ একমাত্র সত্য বস্তু কৃষ্ণানুসন্ধানে সমর্থ হইবেন, অচিদনুসন্ধানে রত হইয়া মহামূল্য জীবন আর বৃথা ব্যয় করিবেন না।

—:০:—

দেশবাসীর প্রতি

সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে বিশ্বের গৌরব ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র জগৎ প্রেমবন্যায় ভাসাইয়াছিলেন, তৎকালে শুধু মানব কেন, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুগণও পরস্পর ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণনাম করিতে করিতে উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছিল। তাঁহার সর্ব সমন্বয় ধর্মে হিন্দু মুসলমান নাই, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নাই, ধনী দরিদ্র নাই, মূর্খ পণ্ডিত নাই, সবল দুর্বল নাই, পাত্রাপাত্র বিচার নাই। তিনি নিজে আচরণ পূর্বক সর্ব জীবকে জানাইয়াছেন—নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য। যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥

সমন্বয় ধর্মের মূল প্রচারক অমন্দোদয় দয়ানিধি ভগবান গৌরসুন্দর নিখিল জীবকে যে কারুণ্যামৃত প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ তিন প্রকার। গৌরকৃপা নির্ম্মলা, রসদা ও সমদা। জীবাত্মা স্বরূপতঃ নির্মল, কিন্তু ধূম্র যেরূপ অগ্নিকে আবৃত করে, পার্থিব রজঃ যেরূপ দর্পণের স্বচ্ছতা আবৃত করে, সেইরূপ দুষ্পার কাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পিপাসা জীব-স্বরূপকে আবৃত করে। যাহার স্বরূপ যে পরিমাণে পার্থিব রজঃ দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত, সে সেই পরিমাণে অশুদ্ধ। অশুদ্ধ জীব স্থূল লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধি জন্য সর্ব্বদা শোক মোহাদি দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিবার পরিবর্ত্তে শূদ্র বলা হয়। গৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপায় জীবের হৃদয় মল সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, তখন তিনি বিশুদ্ধ হন এবং অপরকে বিশুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। 'গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ ॥' 'যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ ॥' (ভাগবত) প্রভৃতি গৌরভক্তবৃন্দের গুণ। বাহ্য শৌচ অশৌচ জীবের মনের ভ্রম মাত্র, অন্তঃ শৌচ প্রকৃত শৌচ। বাহ্যে শৌচ-সম্পন্ন অথচ অন্তর নির্ম্মল হয় নাই, এরূপ ব্যক্তিগণই নানা প্রকার পাপ কর্মে রত। পাপই ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মের হেতু। যিনি পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে স্মরণ করেন, তাহার বাহ্য ও অভ্যন্তর শুচি হয়। গৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবত বচন উদ্ধার পূর্ব্বক জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন—কিরাত হূণান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশা আভীর শুহ্মা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ—কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খশ প্রভৃতি জাতির হৃদয় পাপ-মল দ্বারা দূষিত। ইহারা অস্পৃশ্য এবং ব্রাহ্মণেতর জাতি। ইহারাও যদি সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপাদপদ্ম আশ্রয় করে, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইয়া যায়। আবার পক্ষান্তরে দ্বাদশগুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ভগবদ্ বহির্ম্মুখ জীব সদ্য চণ্ডালতা প্রাপ্ত হয়। এবম্বিধ ব্যক্তি অন্যকে শুদ্ধ করার কথা দূরে থাক নিজেকেও শুদ্ধ করিতে পারে না। গৌরসুন্দরের কৃপায় জীব যখন স্ব স্বরূপ উপলব্ধি করেন, তখনই বস্তুতঃ তাহার শুদ্ধি সম্পাদন হয়, তৎপূর্ব্বে হয় না।

গৌর-কৃপা রসদা—পণ্ডিতগণ বিষ্ণু মায়ায় মোহিত হইয়া শাস্ত্র লইয়া তর্ক বিতর্ক করে, তাহারা অক্ষজ জ্ঞানে শাস্ত্র বিচার করিয়া আজ যাহা স্থাপন করে তৎপর দিবসই আবার তাহা পরিত্যাগ করে। কখন লাভ পূজা বা প্রতিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া জহৎ স্বার্থ অজহৎ স্বার্থ প্রভৃতি লক্ষণা দ্বারা নিজ কল্পিত মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। শ্রীগৌরহরি-কৃপায় সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র-বিবাদ প্রশমিত হইয়া সুসিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায়। সুসিদ্ধান্ত লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত জীব শান্তি-লাভের প্রকৃত উপায় নির্ণয় করিতে না পারিয়া অন্ধকারে বস্তু হাতড়াইতে থাকে। সুসিদ্ধান্তের ফলে অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু লাভ হয়।

গৌরকৃপা সমদা। রস দ্বিবিধ—জড়রস বা ব্যবহারিক রস ও অপ্রাকৃত রস। ভোক্তাভিমানে ইন্দ্রিয়সুখে প্রমত্ত থাকার নাম জড়রস। জীব ও ভগবান্—এই দুইটী অপ্রাকৃত বস্তু। ইন্দ্রিয়তোষণ ছাড়িয়া ভগবৎসেবা, ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা এবং সমগ্র জীবের সহিত ভ্রাতৃসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের আত্যন্তিক ক্লেশ নিবৃত্তির

চেষ্টাই অপ্রাকৃত রস। এই অবস্থাতেই প্রকৃত সমন্বয় কথার প্রকৃত অর্থ বুঝা যায়। সর্ব্বভূতেষু যঃপশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ—সর্ব্বভূতে ভগবৎ সম্বন্ধ দৃষ্টি না করিলে কখনও সমন্বয় হইতে পারে না। সমন্বয় বলিতে আমরা বুঝি—পরস্পর জাতিভেদ না রাখিয়া একসঙ্গে আহার ও সামাজিক ব্যবহারাদি করা। বস্তুতঃ তাহা কি হইতে পারে? সমগ্র জগৎকে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করা জড় নীতির কৃত্য নহে। আজকাল যদিও সভা সমিতিতে ধর্ম্মের কথা কিছু কিছু আলোচনা হইতেছে, নামসংকীর্ত্তনে জগৎ ভাসাইবার কথা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা জড় নৈতিক ধর্ম্মের অন্যতম। শ্রীগৌর-সুন্দর-প্রচারিত প্রেমধর্ম হইতে অনেক দূরে। একসঙ্গে আহারাদি করিলেই যদি সমন্বয় হইত তাহা হইলে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই হয় কেন? পাণ্ডবদিগের সহিত দুর্য্যোধনাদির ভীষণ যুদ্ধ কি ভারতবাসীর স্মৃতিপথ হইতে একেবারে অপসারিত হইয়াছে? পিতাপুত্রের ঝগড়া, স্বামীস্ত্রীতে কলহ জগতে প্রতিনিয়ত হইতেছে। আজ যাহাকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতাম কা'ল তাহার নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পারি না, যে মাতা পুত্রের মুখ না দেখিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারিতেন না, আজ সেই মাতা পুত্রের মুখ দেখার কথা দূরে থাক, তাহার নাম পর্য্যন্তও শুনিতে চান না। জগতে এই ব্যাপার অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তবু আমাদের এরূপ ভ্রম হয় কেন? বোধহয় অত্যন্ত বিষয়াসক্তিবশতঃই এরূপ হইয়া থাকে। বিষয়াসক্ত জীব নিজ ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্তই যাবতীয় চেষ্টা করে, তদ্ব্যতীত ভাল জিনিষ আর কিছু আছে তাহা তাহার জানা নাই, এরূপ অবস্থায় সে যে নিঃস্বার্থ প্রেম বা সমন্বয়ের চেষ্টা করে, সেটাও তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণের সহায়ক মাত্র। হে দেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা যাহা চান আমরা তাহার বিরোধী নহি, আমাদিগকে আপনারা শত্রু মনে করিবেন না, আমরা আপনাদের সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী। আপনারা চান সমন্বয়, আপনারা চান জগতে ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিতে, আপনারা চান অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, আপনারা চান শুদ্ধি। আমরা বলি না, ঐ গুলির কোন প্রয়োজনীতা নাই। আমরা বলি হে ভাই সকল! আপনারা যাহা চান সেগুলি ভক্তির অবান্তর ফলেই হইয়া থাকে, ভক্তি হইতে ঐ গুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, ভক্তি না থাকিলে উহাদের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, ভক্তের বিনা চেষ্টাতেই ঐ গুলি আপনা হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাই আমরা বলি হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্। আপনারা হয়ত মনে করিবেন আমরা কোন সাম্প্রদায়িক ভাব লইয়া আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছি সুতরাং আমরা যাহা বলি, তাহা হয়ত অন্যের প্রিয় না হইতে পারে, অতএব আমাদের বাক্যে সমন্বয়ের সম্ভাবনা কোথায়? এজন্য আবার বিনয় সহকারে আপনাদিগের নিকট জানাইতেছি—দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য। কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি। হে সাধবঃ। সকলমেব বিহায় দূরাদ্ গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগং—আমি দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক আপনাদের পায়ে পড়িয়া শতশত কাকুতি সহকারে এইমাত্র ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা আপনাদের মনঃ কল্পিত ধারণা দ্বারা যাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ঠিক এরূপ মনে করিয়া ভ্রান্ত হইবেন না। আপনারা ঐ সকল কল্পিত মনোধর্ম্ম দূরে পরিহার করিয়া চৈতন্য চন্দ্র চরণে শরণাগত হউন। আবার বলিতেছি, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

মেষ-চর্ম্মাবৃত বৃক মেষপালের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন এক একটী করিয়া সমগ্র মেষগুলির বিনাশ সাধন পূর্বক নিজের উদর পূর্ত্তি করে, সেইরূপ মায়াদেবী নানা ছলে আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের স্বরূপ-ধর্ম্ম লুপ্ত-প্রায় করিয়া তুলে। আমাদের হৃদয়ে কত সুখাশার সঞ্চার করে কিন্তু সে সকল মায়ার প্রবঞ্চন মাত্র, 'আশা হি পরমং দুঃখম্ জানিবেন।

আমরা জগদ্গুরু গৌরাঙ্গের শরণাগত হইতে বলি কেন, তাহা একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। গৌর ভজনে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই। সমগ্রজগতে সমন্বয়-ধর্ম্ম স্থাপনের মূল মন্ত্র হইতেছে প্রীতি। প্রীতি কথাটী

জীবের নিকট এত মধুর বলিয়া বোধ হয় যে, সে প্রীতির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, এই নামটী শুনিতে চায়। জীবমাত্রেই প্রীতির বশীভূত। প্রীতির জন্য জীব প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে। প্রীতি স্বার্থাস্বার্থ দেখে না। প্রীতিই আকর্ষক; প্রীতিসূত্রে ক্ষুদ্র জীবের কথা দূরে থাক, যাহার ভ্রূভঙ্গে কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় হইতেছে সেই বিশ্বসম্রাট্ ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত বন্ধন করা যায়। জড় জগতে যে প্রীতি দেখা যায়, তাহা বিশুদ্ধ নয়, তাহা জীবাত্মাতে যে বিশুদ্ধ প্রীতি আছে, তাহারই হেয় প্রতিফলন মাত্র, এই প্রীতি-ধর্ম জগতে কে আনিয়াছেন? কে একদিন জীবের দুঃখে দুঃখী হইয়া প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়ে এই বিশুদ্ধ প্রেম-ধর্ম বিলাইয়াছিলেন? সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এই চারিযুগের মধ্যে এরূপ দয়া কে করিয়াছে? গৌরসুন্দর জগজ্জীবকে যে সমন্বয় ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছেন, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। অনভিজ্ঞ বিবেক হীন মনে করিতে পারেন, গৌরসুন্দরের প্রচারিত ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা আছে, কিন্তু যাহাদের বিচার-শক্তি আছে, তাঁহারা নিরপেক্ষ বিচার করিয়া দেখিবেন, তাঁহার ধর্ম্মই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

কাঙ্গালের ঠাকুর

অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক মহাপ্রভুকে 'কাঙ্গালের ঠাকুর', 'পতিতের আশ্রয়দাতা' প্রভৃতি বলিয়া মৌখিকই হউক কিম্বা আন্তরিকই হউক একটু সম্মান (?) করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যে 'কাঙ্গালের নাথ' বলিয়া পরিচয় দিতে চান, সেই কাঙ্গালের সম্বন্ধে তাঁহাদের কিরূপ ধারণা? কাঙ্গাল বলিতে কি তাঁহারা কেবল উচ্চকুলে জন্ম, অধিক ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য বা সৌন্দর্য্যের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকেই বুঝিয়া থাকেন? না অন্য কিছু মনে করেন? ব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত, দরিদ্র, মূর্খ বা কুরূপ ব্যক্তিই যদি তাঁহাদের মতে কাঙ্গাল হয়, আর মহাপ্রভু সেই কাঙ্গালের ঠাকুর হন, কিন্তু ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ধনী বা রূপবানের প্রতি মহাপ্রভুর কোন অধিকার না থাকে বা ব্রাহ্মণাদির মহাপ্রভুর কৃপাপ্রার্থী হওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই—এইরূপ মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ধারণা অত্যন্ত অপরাধ-দুষ্ট। কাঙ্গাল বলিতে মহাপ্রভু তাঁহাদিগকেই বুঝিয়া থাকেন, যাঁহারা কৃষ্ণেতর বিষয়-বাসনা, ভুক্তি, মুক্তি স্পৃহা, কিম্বা জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর অভিমান সম্পূর্ণ রহিত হইয়া যথাসর্ব্বস্ব মহাপ্রভুর পাদপদ্মে সমর্পণপূর্ব্বক একান্ত ভাবে শরণাগত হইয়াছেন। তাঁহারাই যথার্থ কাঙ্গাল, দীন বা মহাপ্রভুর কৃপালাভের উপযুক্ত পাত্র। মহাপ্রভু তাদৃশ ষড়ঙ্গ শরণাগতি-বিশিষ্ট কৃষ্ণপ্রেম-ধনের কাঙ্গাল ভক্তিরসপাত্র ভক্তকেই প্রেমধন প্রদান করিয়া থাকেন, শরণাগত ভক্তই মহাপ্রভুর—কাঙ্গাল। সে কাঙ্গালের মধ্যে কোন উত্তম অধম বিচার নাই।

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাই জাতি কুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

অর্থাৎ মহাপ্রভু কহিলেন, প্রাকৃত জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর ক্ষুদ্র বিচার লইয়াই তাঁহার দয়ার ধারা আবদ্ধ নহে, পরন্তু উত্তম অধম ধনী দরিদ্র মূর্খ পণ্ডিত নির্ব্বিশেষে মহাপ্রভুর দয়া সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ষিত। জীব মাত্রেই হরিভজন-যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। তাঁহাদিগকে সে

যোগ্যতা হইতে বঞ্চিত করিবার কুচেষ্টা সর্বতোভাবে গর্হণ-যোগ্য।

মহাপ্রভু 'তৃণাদপি' শ্লোকে জীবের যথার্থ দীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সর্বভূতে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ বা গুরু-বুদ্ধি সহকারে জগতের সমস্ত বস্তু কৃষ্ণ-সেবায় সমর্পণই যথার্থ দীনতার পরিচয়। এই প্রকার দীনের প্রতিই মহাপ্রভুর অধিক দয়া অর্থাৎ এতাদৃশ দীনই মহাপ্রভুর কৃপা অধিকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। অভক্ত উচ্চকুলোদ্ভূতই হউন, পণ্ডিতই হউন, ধনীই হউন আর রূপবানই হউন, তাঁহার মূল্য এক অন্ধকপর্দ্দকেরও সমান নহে।

মহাপ্রভু—পরাবরেশ্বর। পর অর্থে শ্রেষ্ঠ আর অবর অর্থে নিকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট উভয়েরই প্রভু—মহাপ্রভু শ্রীগৌর সুন্দর। মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত কাহারও অশ্রেষ্ঠত্ব কিছুই থাকে না। অত্যন্ত অপরাধীও গৌরসুন্দরের চরণাশ্রয় করিয়া সর্বজনপূজ্য পরমভক্তপদবী পাইতে পারেন।—মহাপ্রভু সমাজে-পতিত বর্ণের ব্রাহ্মণের মত পতিতকে পতিত রাখিয়া পতিতের দান গ্রহণ করেন না, কিন্তু পতিতের পাতিত্য হরণ করিয়া পতিতের যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। তিনি নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ প্রভুর প্রভু, সুতরাং কেন পতিতের পাতিত্য থাকিবে না, তাহার একমাত্র উত্তর—যেহেতু মহাপ্রভুর পতিতপাবন।

বর্ণবিচারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের মধ্যে শূদ্রকেই নিকৃষ্ট বলা হয়। কিন্তু পরমার্থ বিচারে ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তি মাত্রই শূদ্র। শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীব্যাসদেব বলিতেছেন 'ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥" অর্থাৎ শূদ্রকুলোদ্ভূত হইয়াও যাঁহারা ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা কখনও শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবত বলিয়া কীর্ত্তিত হন। জনার্দ্দনে ভক্তিহীন ব্যক্তি মাত্রেই শূদ্র; তিনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূতই হউন আর যেই হউন। ইতিহাস-সমুচ্চয়েও ভগবান্ বলিতেছেন—"ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্॥ অর্থাৎ চতুর্বেদপাঠী চৌবে ব্রাহ্মণ হইলেই যে তিনি ভক্ত হইয়া ভগবৎ প্রীতি লাভ করিবেন, তাহার কোন কারণ নাই। ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালকুলোদ্ভূত হইলেও তিনিই ভগবানের প্রিয়, তিনিই যথার্থ দান-পাত্র ও গ্রহণ পাত্র; ভক্তমাত্রেই ভগবানের ন্যায় পূজ্য। শ্রীমদ্ভাগবতও (৭।৯।৯ শ্লোকে) বলেন, দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও কৃষ্ণে মন, প্রাণ, চেষ্টা অর্থ ও প্রাণ অর্পিত অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত শ্বপচই শ্রেষ্ঠ। কেননা সেই শ্বপচকুলোদ্ভূত ব্যক্তি স্বীয় কুল পবিত্র করেন, আর প্রচুর মানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহাও পারেন না। তাহা হইলে দেখা গেল, জাতিকুলাদি লইয়া শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টের বিচার আসিতে পারে না, ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিই নিকৃষ্ট, তাহার সহিত পরমার্থী কোন প্রকারেই দেওয়া নেওয়া, গুহ্যকথা বলা ও শুনা, খাওয়া এবং খাওয়ান—এই ছয় প্রকার সঙ্গ করিবেন না। শৌরিচিন্তা-বিমুখ ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে পতিত। আর ভগবদুন্মুখ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, তিনি যে কোন কুলে উদ্ভূত হউক না কেন, তাঁহার সহিতই সর্বপ্রকার সঙ্গ বিধেয়। ইহাই দৈব বর্ণাশ্রম বিধি।

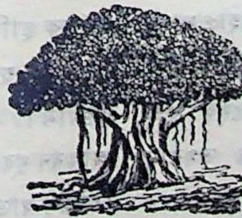
উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, 'কাঙ্গাল' বলিতে পাছে লোকে আসুর বর্ণাশ্রম বিচার আনিয়া ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণ-পূজ্য মহাভাগবতগণের চরণে কোন অপরাধ করিয়া না বসেন, এই জন্যই এত কথার অবতারণা। আজকাল শুদ্ধি অন্দোলনে কেহ কেহ দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মবিষয়ে একটু আভাস দিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা মায়াবাদাদি দোষদুষ্ট হইয়া যাইতেছে বলিয়া তাদৃশ আন্দোলনে শুদ্ধ ভক্তগণ বিশেষ প্রীতিলাভ করিতে পারিতেছেন না। যদি কোন প্রকৃত নিরপেক্ষ শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে এই আন্দোলন পরিচালিত হইত, তাহা হইলেই আনন্দের বিষয় হইত। গৌর-ভক্তগণই কাঙ্গালের প্রকৃত আদর জানেন; গৌরভক্ত না হইয়া যাঁহারা কাঙ্গাল উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কাঙ্গালের প্রতি যে টান, তাহাতে কতটুকু মৌলিকতা আছে, তাহা বিচার্য্য বিষয়। খৃষ্টান মিশনারীগণ এদেশে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া অনেক তথাকথিত কাঙ্গালকে উদ্ধার

করিয়া থাকেন এবং প্রথম প্রথম খুব সহানুভূতি ও সম্মান দেখান বটে, কিন্তু পরে ড্যাম নেটিভ বলিয়া সে সহানুভূতি ও সম্মানের মাত্রা অতিরিক্ত রূপে বাড়াইতে একটুও কুণ্ঠিত হন না। জাতিগোস্বামিগণ শূদ্রকে কাঙ্গাল বলিয়া দীক্ষা দেন বটে, কিন্তু তাহারা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়, তাহাদের হাতের জলটুকুও তাঁহারা সমাজের ভয়ে গ্রহণ করিতে চাহেন না, বলেন—"ও তোমরা মনে মনে নিবেদন করিলেই চলিবে।" দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই বিপ্রত্ব লাভ হয়, তিনি সবন যজ্ঞের অধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহাদিগকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া কিরূপ পতিতোদ্ধারণ লীলার অভিনয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। শাস্ত্রে লেখা আছে বটে, শ্বপচকুলোদ্ভূত ভক্ত ভগবানের ন্যায় পূজ্য, কিন্তু আমি মহাকুলীন, সে ভক্তের জলবিন্দু স্পর্শ দূরে থাক্ তাহার ছায়া মাত্র স্পর্শ করিব না' এই প্রকারের শুদ্ধি, যাহা বর্ত্তমান কালের গোঁসাইরা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে জগতের কি লাভ হইবে? পতিত যদি পতিতই থাকিয়া গেল, ভগবদ্ভজনে অধিকার না পাইল বা ভক্ত হইল, তবে আর শুদ্ধি কি হইল! জীবাত্মা নিত্য শুদ্ধ। তিনি পূর্ব্বে অশুদ্ধ ছিলেন, এখন আমরা তাঁহাকে শুদ্ধ করিয়া লইব, তাহা নহে। শুদ্ধি অর্থে নিত্যসিদ্ধ ভাবের পুনঃ প্রকটন, ভগবৎ কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণেই নিত্য সিদ্ধ যে ভগবৎপ্রেমা তাহার উদয় হয়। এইরূপ শুদ্ধি না চাহিয়া যদি মুচি, মেথর, মুদ্দফরাস, চাঁড়াল, হাড়ি ও ডোম প্রভৃতি নীচ জাতিকে মনে মনে যে নীচ সেই নীচই রাখিয়া লোকের নিকট নিজের উদারতা দেখাইবার জন্য সর্ব্ব সমক্ষে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করা বা তাহাদের সহিত একসঙ্গে ভোজনাদি ক্রিয়া করা হয়, তাহা হইলে সে নীচ জাতির আর লাভ হইল কি? সেজন্য আমাদের ইচ্ছা, সকলে মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া তাঁহারই আদেশ অনুসারে কার্য্য করুন, নিজেরা আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অন্যকে আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করুন, তাহা হইলে অচিরেই কৃতকার্য্য হইবেন। মহাপ্রভুর বাক্য—

অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাহা তাঁহা প্রেম-ফল দেহ যারে তারে॥
যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥

শুদ্ধজীব একমাত্র প্রেম-ফলেরই কাঙ্গাল, সেই প্রেমফল প্রদান-লীলাই কাঙ্গালের ঠাকুর মহাপ্রভুর কাঙ্গাল বা পতিতোদ্ধারণ-লীলা। মহাপ্রভুর আদেশানুসারে নিজেরা সেই ফলেরঅনুসন্ধান লাভ করিয়া জগজ্জীবকে সেই ফল বিতরণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই কাঙ্গালের ঠাকুরের মনোঽভীষ্ট সিদ্ধি, নচেৎ মুখে কাঙ্গালের ঠাকুর বলিয়া কোন লাভ নাই। নিজে প্রেমফলে কাঙ্গাল হও, অন্যকে সেইরূপ কাঙ্গাল কর। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া প্রচার করিতে গেলে কেহ আমাদের কথা শুনিবে না; নিজের স্বতন্ত্রতা গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া তবে—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।"



জীবনোপায়

কোন সাধু আসিয়া 'ভগবদ্ভজন কর' এই কথা বলিলে লোকের মনে যেন এক মহা চিন্তা আসিয়া পড়ে। লোকে ভাবেন, "তাই ত', আমার স্ত্রী পুত্রাদি পরিজনবর্গের দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ, জমি-জমা রক্ষণাবেক্ষণ, সংসারে সুখশান্তির অনুসন্ধান—সমস্তই করিতে হইবে, এখন কি আর আমার ভগবান্কে ডাকার সময় আছে? বৃদ্ধকাল আসুক, ছেলেগুলো মানুষ হোক্, এদিকেও একটু গুছাইয়া লই, তারপর না হয় দু'দিন শান্তিতে ভগবানের নাম লওয়া যাইবে। সাধুদের আর কি, পেটের চিন্তা ত' আর করিতে হয় না, মুখের কথা দু'টা বলিলেই হইল। আমাদের কি আর এখন ভক্ত হইয়া গেলে চলিবে? সকলেই যদি ভক্ত হয় তবে আর সংসার চলে কি করিয়া? শাস্ত্রের সব কথা শুনিতে গেলে কি আর কাজ চলে?"

লোকে হরিভজনটীকে এমন একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে করেন যে, তাহার জন্য ঐরূপ নানা বাজে কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া অস্থির হইয়া পড়েন। লোকের ধারণা, ভক্ত হইতে হইলেই কেমন যেন একটা কিম্ভূত কিমাকার মানুষ হইয়া পড়িতে হইবে। কিন্তু ব্যাপারই যে তাহা নহে, তাহা কি তাঁহারা বুঝিবেন না? দেহও থাকিবে, মনও থাকিবে, দেহের ক্রিয়া, মনের ক্রিয়া ও আহার বিহারাদি সমস্তই যেমন চলিয়া থাকে, তেমনই চলিবে, বাহ্যে কিছুরই পরিবর্ত্তন করার হয় ত দরকার হয় না, কিন্তু উদ্দেশ্যটা একেবারেই বদ্‌লাইয়া দিতে হয়, ইহাই বিশেষত্ব। দেহ, গেহ, ধন ও জন—সংসারের যাবতীয় বস্তু আমার ভোগের জন্য নহে, কিন্তু কৃষ্ণেরই ভোগের জন্য, কৃষ্ণকে ভোগ দিয়া, কৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ, ফেলালব বা মহাপ্রসাদই আমার প্রাপ্য বস্তু, ইহাই ভক্তের বুদ্ধি। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ অন্য সঙ্কল্প সহকারে কর্ম করিয়া অবশেষে সেই কর্ম্ম ভগবান্কে অর্পণ করিবার ভাণ দেখান, কিন্তু ভগবান্ কহিতেছেন, "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥—হে অর্জ্জুন, তুমি যাহা কর, যাহা ভোগ কর, যাহা হবন কর, যাহা তপস্যা কর, তৎসমুদায়ই আমাতে অর্পণ কর।" অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা মূলেই সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে, তাহারই নাম ভক্তি বা সেবা, সাধারণ জড়কর্ম্ম হইতে তাহা সম্পূর্ণ একটি পৃথক বস্তু। তবে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; আমি প্রপঞ্চে অবস্থান পূর্ব্বক প্রপঞ্চাতীত বস্তু কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য হাত বাড়াইতেছি,—এই ভাবটি সাধুসঙ্গক্রমে যতই আমার অপগত হইতে থাকিবে, ততই আমার ভজনোন্নতি সাধিত হইবে—শুদ্ধভক্তি অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বয়ংপ্রকাশ বিগ্রহ শ্রীবলদেবাভিন্ন গুরুদেবের কৃপাবলেই জীবের এই প্রাপঞ্চিক অনুভূতি বিদূরিত হইয়া অপ্রাকৃত অনুভূতি বা সাক্ষাৎ সেবা লাভ হইতে পারে। সর্ব্বতোভাবে গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত জীব কিছুতেই তাঁহার জড় চিন্তাস্রোতের গতি পরিবর্ত্তনে সমর্থ হইবেন না। সংসারের মধ্যে থাকিয়া কেমন করিয়া সেই সংসারকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করা যায়, তাহা গুরুপাদাশ্রিত ব্যক্তিই ভাল বুঝিতে পারেন।

ভগবদ্ভক্তি জীব মাত্রেরই স্বরূপবৃত্তি 'ভক্তি' জিনিষটি কোন অস্বাভাবিক উপায়ে অর্জ্জন করিতে হয় না। জাগতিক দৃষ্টান্তেও আমরা দেখিতে পাই, মা তাঁহার ছেলেকে বা ছেলে তাঁহার মাতাকে কোন বই পড়িয়া বা কাহারও উপদেশ মত ভালবাসিতে যান না, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে টান, তাহা আপনা হইতেই আসে; চুম্বক ও লৌহপিণ্ডের মধ্যে যে আকর্ষণ, তাহা কিছু অস্বাভাবিক একটি ব্যাপার নহে, সূর্য্যের কিরণকণ সূর্য্যকে ছাড়িয়া তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারে না, সূর্য্য ও কিরণের মধ্যে একটা নিত্য আকর্ষণ বর্ত্তমান। জগতের প্রত্যেক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর একটি আকর্ষণ খুব স্বাভাবিক। ভগবানের সহিত জীবেরও সেইরূপ স্বাভাবিক একটি আকর্ষণ বর্ত্তমান! সেজন্য জীব ভগবৎসেবা না করিয়াই পারে না। যদি বল, তবে জীব ভগবৎসেবা করেন না কেন? তাহার একটি কারণ আছে।

ভগবান্ স্বতন্ত্র পুরুষ, জীবও তাঁহার স্বতন্ত্রতার অণুঅংশ পাইয়াছেন। জড়বস্তু যেমন অপরের ইচ্ছা মত চালিত হয়, চেতনবস্তু জীব সেরূপ নহেন, তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার স্বতন্ত্রতার সুব্যবহার করিতে পারেন আবার নাও পারেন। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলেই তিনি তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অস্বাভাবিক অবস্থায় নীত হইয়া নানা ক্লেশ পাইতে থাকেন। এই ক্লেশ হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়—সাধুসঙ্গ। ভগবান্‌কে মানিব, কিন্তু ভগবানের কথা বা ভগবদভিন্ন সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য মানিব না অথবা আমার ইচ্ছামত সে বাক্যের অর্থ করিয়া লইব, এরূপ করিলে আর মঙ্গল হইবে কি করিয়া? সকলেই বলিয়া থাকেন, আমরা গীতা মানি, কিন্তু সেই গীতার প্রথম শ্লোক হইতে শেষ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্ যে কেবল বলিতেছেন, আমি সর্বমূল, আমার সেবা কর, শুধু বলা নহে, প্রতিজ্ঞা করিয়া, আবার নিজে প্রতিজ্ঞা করিলে পাছে জীবের বিশ্বাস না হয়, এজন্য ভক্তপ্রবর অর্জ্জুনকে দিয়াও প্রতিজ্ঞা করাইয়া বলিতেছেন,—'আমার সেবাকারী ভক্তের কখনও বিনাশ নাই', তাহা কি একবারও চিন্তা করিয়া থাকি? ভগবান কহিলেন—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে প্রতিজ্ঞা করিয়া বল, আমার ভক্তের বিনাশ নাই; অর্জ্জুনকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন কেন? ভগবান্ ত' বলিতে পারিতেন, "কৌন্তেয়, প্রতিজানেঽহং ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" আবার ভক্ত তাঁহার প্রিয় একথা ত' তিনি নিজেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন—"সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।" ইহার কারণ আছে, ভক্ত তাঁহার প্রিয়, একথায় ত' আর লোকের অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই, কারণ ভগবদ্বিমুখ অসুর হিরণ্যকশিপুও পর্য্যন্ত একদিন ভক্তপক্ষপাতী বলিয়া ভগবানে দোষারোপ করিয়াছে। ভগবান্ ভক্তপক্ষপাতী একথা সর্ববাদি সম্মত; কিন্তু বদ্ধজীবগণ পাছে তাহাদেরও ন্যায় ভক্তের বিনাশ আছে ভাবিয়া আর ভগবানে ভক্তি করিতে না চায়, সেজন্য ভগবান নিজ প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তার জন্য ভক্ত মুখ দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন। ভক্তের বাক্য কখনও ব্যভিচারী হয় না, ভগবান্ বরং প্রতিজ্ঞা করিয়া ভক্তবাৎসল্যহেতু ভক্তের নিকট সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে বাধ্য হন, যেমন ভীষ্মযুদ্ধে ভগবান্ অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়াও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা যে ভগবানকে অস্ত্র-ধারণ করাইব, তাহার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যেহেতু ভক্তবশ্য ভগবান—ভক্তকে কেহ অমর্য্যাদা করুক্ ইহা ভগবান সহ্য করিতে পারেন না। তাই ভগবান কহিলেন—"বহির্ম্মুখা বাদিনো বৈতণ্ডিকা মৎপ্রতিজ্ঞাং শ্রুত্বা হসিষ্যন্তি, অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা তু পাষাণরেখেবেতি তে প্রতিয়ন্তি।" অর্থাৎ "বহির্ম্মুখ কুতার্কিকগণ আমার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া হাস্য করিবে, কেননা আমি বহুবার নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু আমার প্রিয়সখা অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা পাষাণরেখার ন্যায়, সুতরাং অর্জ্জুন বলিলে সকলেই বিশ্বাস করিবে যে ভক্তের কখনও বিনাশ নাই।" লোকে সহজে অন্যের প্রত্যয়োৎপাদন করিতে না পারিয়া অনেক কষ্টের সহিতই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়া থাকে—"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তাহাতেও তোমাদের বিশ্বাস হইবে না?" ভগবানও সেইরূপ একবার নহে, বহুবার নিজে প্রতিজ্ঞা করিয়া, ভক্তকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া বলিতেছেন—'জীব, আমার সেবায় আত্মনিয়োগ কর, তোমাদের কোন অসুবিধা থাকিবে না।' তথাপি হতভাগ্য আমরা সে কথা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, আমাদের দগ্ধোদর পূর্ত্তি হইবে কি না! ভগবান্ যেন কত গরীব লোক, তিনি যেন আমার মত দু'চারটা পেটের ভরণ-পোষণের ভার লইতে পারেন না! মাতৃকুক্ষিতে যে আমার জন্য স্তন্য রাখিয়া দিয়াছিল, সে আমাকে তাহার সেবা করিতে গেলে দু'টি খাইতে দিতে পারিবে না, ইহা ধারণা করা দুর্ভাগ্যেরই পরিচয় মাত্র।

সুতরাং ভগবদ্ভজনই করিতে হইবে—সাধুর কথাই শুনিতে হইবে। আমরা যাহাতে না খাইয়া না পরিয়া মরি ইহার ব্যবস্থা করিবার জন্যই কেবল সাধুশাস্ত্র গুরু-বাক্যে ভগবদ্ভজন-কথা উদ্দিষ্ট হয় না, পরন্তু আমাদিগের উত্তম স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্যই ভগবান্ সকল ব্যবস্থা ঠিক

করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা নিজেদের উপরেই কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া দুঃখে কষ্টে জড়ীভূত হইয়া পড়ি; শরণাগতের জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন চিন্তা করিতে হয় না। ভগবান্ই সব ব্যবস্থা করিয়া দেন। 'ভক্তি' অর্থে 'কুড়েমি করা নহে, আমাদের যাবতীয় চেষ্টা কৃষ্ণার্থে পর্য্যবসিত করাই ভক্তি বা সেবা। ভগবান্ আমাদের কিছুই কাড়িয়া লন না, কেবল ইতর বস্তু হইতে আসক্তিটি কাড়িয়া লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে নিযুক্ত করেন মাত্র। অতএব আর বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতে আমাদিগকে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হইতে হইবে। উহাতেই দেশের ও দশের সমুদয় মঙ্গল নিহিত।

দুর্ভিক্ষ দমন

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥

হে ভক্তগণ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিত্য শ্রবণ করুন, নিত্য গান করুন, আনন্দ সহকারে নিত্য চিন্তা করুন। জগতের সকল কথাই একাধিকবার আলোচনায় পুনরুক্তি দোষ আসিয়া পড়ে, লোকের শ্রুতিরসায়ন হয় না, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তনে পুনরুক্তি দোষের সম্ভাবনা দূরে থাকুক— "আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।" শ্রীভগবৎ-কথা নিত্য পুরাতন, নিত্যনূতন, নিত্য হৃৎকর্ণরসায়ন সনাতন কথা। ভাগ্যক্রমে একবারও যাহার কর্ণকুহরে শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলাকথা প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের সকল মলিনতা দূরীভূত হইয়াছে—গৌরকথামৃত পান করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ উধাও হইয়া ছুটিয়াছে—কোথায় গৌরভক্তগণ কখন গৌর-গাথা কীর্ত্তন করিবেন, কখন সে মধুমাখা কথা শুনিবার সৌভাগ্য তাঁহার আসিবে, এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে। গৌর-নাম-গান-শ্রবণ-যোগ্যতা বিহীন ভাগ্যহীন মানবগণই গৌর-গাথার নিত্য-নবনবায়মান মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিরক্ত হন। ভাগ্যহীন মানব এখন ইতর কথায় ও ইতর কার্য্যে এত মত্ত যে, কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিবার সময় তাঁহাদের নাই! জগতে আজ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দমনের জন্য কত না চেষ্টা চলিতেছে—লোকের তাহাতে কতই না উৎসাহ দেখা যাইতেছে, কিন্তু হরিকথার যে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী আজ সমস্ত জগৎটিকে গ্রাস করিয়া তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বসিয়াছে, জগতের কয়টি হৃদয় সে দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য ব্যগ্র হইয়া যথার্থ হৃদয়বত্তার পরিচয় দিতেছেন? যে ভারতে যুগে যুগে ভগবান্ সপার্ষদে স্বীয় ধামসহ অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের বিনাশ এবং ধর্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছে, যে ভারতভূমিতে আজ বেশীদিনের কথা নয়, মাত্র ৪৪২ বৎসর পূর্বে স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত জগৎ নিজনাম-প্রেমবন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছেন, অদ্যাপি কোন কোন ভাগ্যবানজন যে প্রেমবন্যায় ভাসিতেছেন। যে ভারতে আজিও নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা ও শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি ভগবল্লীলাক্ষেত্র ও গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি ভগবানের বিহারস্থলীসমূহ ভগবানের শ্রীচরণরজঃ বক্ষে ধারণ করিয়া ভক্তগণকে ভগবদ্বিরহ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, যে ভারতে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপায় ভগবৎ কথার অত্যন্ত সুভিক্ষ হইয়াছে, আজ সেই ভারতে ভগবৎকথার দুর্ভিক্ষ, ইহা বলিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অথবা ভগবৎ-কথা আছে, কিন্তু সে কথায় প্রাণ নাই, সে কথার জীবন গৌরসুন্দর নহেন, সে কথার জীবন হইয়া পড়িয়াছে কনক, কামিনী, লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠাদি—সে কথায় কেবল জীবন জড়েন্দ্রিয়-তোষণ। সত্য কথার আদর নাই, থাকিবেই বা কি করিয়া? সত্যানুসন্ধিৎসাই যে জীবের

নাই। সত্য কথা শুনিবার বা জানিবার ইচ্ছা থাকিলেই ত' জীব খুঁজিবে কোথায় সত্য—কোথায় শুদ্ধভক্ত, কোথায় শুদ্ধাভক্তি, নচেৎ কোথা হইতে সে প্রয়োজন আসিবে? ভগবৎকথা কীর্ত্তনে লোকে চায় কাহার কিরূপ কণ্ঠস্বর, কাহার কিরূপ প্রাকৃত জাগতিক পাণ্ডিত্য, কাহার কিরূপ শ্রোতার মন ভুলান হাবভাবের বিচিত্রতা, কাহার পয়সা লওয়ার কৌশল সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ইত্যাদি! যে ব্যক্তি দুই চারিটা গান গাহিয়া, নানা ভাব ভঙ্গী দেখাইয়া লোকের মন মুগ্ধ করিতে পারে, সে ব্যক্তি হইতেছে আজ-কালকার বড় পাঠক, বড় কীর্ত্তনীয়া! অজ্ঞ জনসাধারণ পাঠকের বা কীর্ত্তনীয়ার ব্যক্তিগত চরিত্রের—ভক্তিকথা কীর্ত্তন-যোগ্যতার বিষয় বিচার না করিয়াই চাহে কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ! ভগবৎকথা হইয়া পড়িয়াছে বর্ত্তমান জগতের দেহযাত্রা নির্ব্বাহের একটি উপায়! যে ভগবৎকথা ভক্তিসহকারে শ্রবণ, পঠন, বিচারণপর হইয়া জীব সংসার-বন্ধন মুক্ত হওয়ার কথা কি, স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণপাদপদ্ম-সুধারসাস্বাদনে উন্মত্ত হইতে পারে, সেই ভগবৎকথা শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা কিনা জীবের নৈতিক চরিত্র সংশোধিত হওয়া দূরে থাকুক বরং সে পশুরও অধম হইয়া নিতান্ত ঘৃণ্যবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক নরকপথের যাত্রী হইয়া পড়ে! জীবের এ দুর্দ্দশার কথা বর্ণন করিতে হস্ত হইতে লেখনী শিথিল হইয়া পড়ে, চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে, বক্ষে শেলবিদ্ধ হইতে থাকে।

এখন জীবের কর্ত্তব্য কি? চারিদিকে অন্ন-জলাদির চিন্তাতেই লোক অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সমস্ত অভাব অসুবিধার মূলীভূত কারণ যে হরিকথার দুর্ভিক্ষ, তাহার বিষয় চিন্তা করিবার জন্য এমন কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির উৎসাহ দেখা যায়—জীবের কৃষ্ণবিমুখতা-দুঃখে কাহারই বা প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে? আজ ধর্ম্মের নাম করিয়া যে ব্যভিচার স্রোত জগতের বক্ষে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহার গতি রোধ করিবার জন্য এমন কোন্ মহাপ্রাণ অগ্রসর হইতেছেন? ভারতে কি তবে এমন প্রাণের অভাব হইয়া পড়িয়াছে?

যে নৈমিষারণ্যে একদিন শ্রীসূত গোস্বামী ভাগবতকথা শ্রবণ করাইবার জন্য ষষ্টিসহস্র ঋষি শ্রোতা পাইয়াছিলেন, যে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে একদিন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষ সমর্থন করিতে কোটী কোটী প্রাণ উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, যে নদীয়ায় একদিন শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও তাঁহার প্রিয় ভক্তগণের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য শ্রীমুখবাণী শ্রবণ করিবার জন্য কোট্যর্ব্বুদ নরনারী 'হা গৌর' 'হা গৌর' বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিত, যে নবদ্বীপ হইতে একদিন গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন-স্রোত প্রবাহিত হইয়া সমগ্র বিশ্ব প্লাবিত করিয়াছিল, আজ সে নৈমিষারণ্য, সে কুরুক্ষেত্র, সে নবদ্বীপ কি একেবারেই নীরব-নিস্তব্ধ, আজ সেখানে একটীও প্রাণ পাওয়া যাইবে না ভগবৎ সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত হইতে! জগৎ আজ বস্তুতঃই কি প্রাণহীন, কেননা প্রাণ থাকিলেই ত' ভক্তিকথার আচার প্রচার কার্য্য থাকিবে?

জগতে আজ এক মহা দুর্ভিক্ষ ঘোষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু জগতের এই বিপুল নৈরাশ্যের মধ্যে আবার আশাও আছে—শুষ্ক মরুভূমির মধ্যেও তৃষাতুর জীবগণের জন্য ভগবান্ মরুদ্যানেরও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন—হরিকথার অত্যন্ত দুর্ভিক্ষের মধ্যে আবার প্রচুর পরিমাণে সুভিক্ষাও আছে। এখনও শুদ্ধ গৌরভক্তগণ সমস্ত সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দূরে বিসর্জন পূর্বক গৌরসুন্দর-প্রচারিত সার্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথামৃত লইয়া জীবের দ্বারে দ্বারে ছুটিতেছেন, ভাগ্যবান্ জনগণই কেবল গৌর-ভক্তের পাদপদ্মাশ্রয়ে সে অমৃত আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতেছেন। কিন্তু গৌরভক্তগণ চাহেন, গৌরসুন্দরের আনা প্রেমবন্যায় সমস্ত বিশ্ব প্লাবন করিতে, হরিকথার দুর্ভিক্ষ সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে, তাই তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, ব্যাকুল হইয়া সকল দেশবাসীকে শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছেন, সকলে মিলিয়া হরিকথার দুর্ভিক্ষ দমনে কৃতসঙ্কল্প হইতে বলিতেছেন। ভক্তগণের এ কাতর আহ্বান যদি কাহারও মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে, তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে আসিয়া এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ভক্তগণের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করুন, ইহাই প্রার্থনা।

প্রভু কে ?

যিনি যুগপৎ নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বা পাষণ্ডদলন ও প্রেম-প্রচারণে সমর্থ, যাঁহার সমান কেহ নাই বা যাঁহা হইতে উর্দ্ধে আর কেহ নাই, যাঁহা হইতে পরতর তত্ত্ব আর কিছু নাই, যিনিই একমাত্র পরতম তত্ত্ব, যিনি সর্ব্ব যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা, যিনি সর্ব্বকারণকারণ, যিনি পূর্ব্বেও ছিলেন, পরে থাকিবেন এবং এখনও আছেন, নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ইচ্ছাধীনে চালিত হইতেছে—ব্রহ্মা আদি দেবগণ ভৃত্যরূপে সর্ব্বদা যাঁহার আদেশ পালনে রত, গ্রহগণ যাঁহার ইচ্ছামত শুভাশুভ ফল প্রদান করিতেছে, রোগ, শোক মৃত্যু ভয় যাঁহার ইচ্ছামতে চলিতে বাধ্য, যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, চন্দ্র সূর্য্য তাহাদের নিয়মিত কার্য্য করে, যিনি নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু পরমাণুতে পর্য্যন্ত অবস্থান করিলেও ভক্ত হৃদয়ই যাঁহার প্রিয় বসতিস্থল, যাঁহার নাম ভক্তবৎসল, যিনি ভক্তের নিকট কুসুম অপেক্ষাও কোমল, আবার অভক্তের নিকট বজ্র অপেক্ষাও কঠোর, যাঁহাতে যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ বর্ত্তমান, উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গ-কান্তি, পরমাত্মা যাঁহার অংশ-বিভব, সেই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরব্রহ্ম পরাৎপর পরতত্ত্ব পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র আমার প্রভুতত্ত্ব। কিন্তু যখনই আমি 'আমার প্রভু ভগবান, আমি ভগবদ্দাসানুদাস'—এই স্বরূপের কথা ভুলিয়া যাই, তখনই আমি মায়া দ্বারা গ্রস্ত হইয়া ভগবান্ ও ভগবদ্বস্তু ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি বিশিষ্ট হই, তখনই আমি অবিদ্যা দ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া প্রাকৃত অহঙ্কারবশতঃ প্রকৃতির গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে স্বীয় কার্য্য মনে করিয়া 'আমি কর্ত্তা'—'আমি প্রভু'—এইরূপ অভিমান করি। দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি করিয়া আমি আমার সমস্ত মনঃকল্পিত ধারণা ও সেই ধারণা অনুযায়ী সমস্ত কার্য্যকে সত্য বলিয়া ভ্রমে পতিত হই। অণুচৈতন্যের ধর্মবিশিষ্ট মায়াবশ-যোগ্য ভ্রম প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়-যুক্ত বদ্ধ জীব হইয়াও আমি যাহা কিছু বলি বা যাহা কিছু চিন্তা করি, তাহা নির্ভুল না হইয়াই পারে না, ইহাই আমার ধারণা। যদি কোন সাধু পুরুষ আমার ভ্রম প্রদর্শন করিতে আসেন, আমি তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া আমার ভ্রান্ত মত স্থাপন করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়ি। আমার অত্যল্প অপূর্ণ প্রাকৃত বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য লইয়া আমি যাই অতীন্দ্রিয় বস্তু ভগবৎ কথা, ভগবৎ সেবা, ভগবচ্ছাস্ত্র বিচার করিতে! নিজে সদ্গুরুপদাশ্রয়ে শ্রৌতবাণী শ্রবণের পূর্বেই প্রাকৃত পাণ্ডিত্যবলে যাই অন্যকে শ্রৌতবাণী শ্রবণ করাইতে, নিজে উপদিষ্ট না হইয়াই যাই অন্যকে উপদেশ করিতে, যাহা তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ দাম্ভিকতা ভিন্ন আর কিছুই বলেন না। আগেই পরকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা না করিয়া নিজে শিক্ষিত হইয়াই বরং অন্যের নিকট—অন্যের গুরু সাজিয়া নহে, কিন্তু জীব-মাত্রেই কৃষ্ণদাস, আমি সেই সকল কৃষ্ণদাসানুদাস—এই বুদ্ধিতে গুরু মুখশ্রুত কথা কীর্ত্তনই শ্রেয়ঃ। "আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী॥ নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে হবে অভিমান ভার। তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা না লইব পূজা কার॥" 'আমি গুরু', 'অন্যে আমার শিষ্য'—এরূপ দাম্ভিকতা সদ্গুরুর থাকে না। গুরুদেব বলেন, "পুরীষের কীটও যখন ভগবদ্দাস, তখন আমি সেই দাসের অনুদাস, কীটের উপর প্রভুত্ব করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই, জগতের সকল বস্তুই ভগবৎ-সেবোপকরণ, সেই সকল ভগবন্নৈবেদ্যের ভোক্তৃসূত্রে আমি নহি, আমি একমাত্র ভোক্তৃতত্ত্ব ভগবানের দাস সূত্রে সেই সকল উপকরণ দ্বারা ভগবৎ সেবামাত্র করিতে পারি, ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার যে প্রসাদ আমার জন্য ব্যবস্থা করেন, তাহাই অনাসক্তভাবে ভগবৎ কৃপামাত্র জ্ঞানে নিজ যোগ্যতানুসারে আবার সেব্য, ভগবানের বস্তুতে ভোগময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ, ভগবদিচ্ছার বিরোধ-চেষ্টা বা স্বেচ্ছাময় ভগবানের কার্য্য লইয়া অনধিকার চর্চ্চায় অধিকার আমার নাই।" কিন্তু যদিও আমার গুরুদেব 'আমি শ্রীভগবানের দাসানুদাস' ইহা বলিয়া বিষয় বিগ্রহ ভগবানের আশ্রিত

অভিমানে স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপন করিতেছেন, তথাপি আমি তাঁহার শিষ্য সূত্রে তাঁহাকে স্বয়ং ভগবানের প্রকাশ বিগ্রহ অভিন্ন শ্রীবলদেবরূপেই দর্শন করিব। অন্যথায় গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি আসিয়া আমার ভজন সাধন সকলই মাটি হইয়া যাইবে। শ্রীগুরুদেব—সেবক ভগবান্। তিনি আমার প্রভুতত্ত্ব, আর সেব্য শ্রীগৌরসুন্দরও আমার প্রভুর প্রভু—সেব্য ও সেবকে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ, কেহ কাহারও ছোট কিম্বা বড় নহেন।

মানুষ নিজের উপর কর্ত্তৃত্বারোপ করিতে গিয়া নিজেই তাঁহার দুঃখ কষ্টের ভোক্তা নিরাকর্ত্তা মনে করিয়া স্বকপোল কল্পিত নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াও দুঃখে কষ্টে জর্জ্জরীভূত হইতে থাকেন। জীবস্বরূপে কোন দুঃখের লেশমাত্রও নাই, আবার দুঃখদাত্রী মায়ার অস্তিত্বও তিনি নাশ করিতে পারেন না যে দুঃখ একেবারে দূর হইয়া যায়, কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য যাহাতে দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারে, এমন কোন উপায় অবলম্বন করা। সে উপায়টি কি? তাহা আর কিছুই নহে, কেবল 'আমি প্রভু' এই বুদ্ধির পরিবর্ত্তে, 'আমি ভগবানের দাস' এই বুদ্ধি লইয়া নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে সদ্গুরু-পাদাশ্রয়। ভগবান্‌কে ভুলিবার জন্যই ত' মায়াদেবী জীবকে ক্লেশ প্রদান করেন, ভগবানের পাদপদ্মে শরণ লইলে ত' আর মায়ার কিছু বলিবার অধিকার থাকে না, সুতরাং ভগবানের অতি প্রিয়তম জন যে শ্রীগুরুদেব, তাঁহাকেই যদি আমি প্রভু বলিয়া তাঁহার পাদপদ্মে মস্তক বিক্রয় করিতে পারি, তাহা হইলে আর আমার কিসের ভয়? শ্রীগুরুদেব আমার ভক্তি প্রতিকূল পাষণ্ড শত্রুগুলিকে দলন করিয়া আমাকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিবেন। প্রেম প্রচারণার্থই শ্রীগুরুদেবের জগতে অবতরণ। অতএব শ্রীগুরুদেবই আমার প্রভু—আমি গুরুদাস—ইহাই আমার একমাত্র ভরসা। গুরুদেবের দাসত্ব ছাড়িয়া প্রভুত্ব করিবার ছলে যেন মায়ার দাস হইয়া এমন দুর্লভ জীবনটিকে ব্যয় না করি, ইহাই আমার ভগবচ্চরণে একমাত্র প্রার্থনা হউক।

আমি সকলেরই উপর কিছু প্রভুত্ব প্রচার করিতে যাই বটে, কিন্তু পারিয়া উঠি কই! যাহার প্রভু বলিয়া যাহাকে আমার ইচ্ছামত ভোগ করিতে ছুটি, সেইত' আমার প্রভু হইয়া পড়ে, তাহারই ইচ্ছামত যে আমি উঠিতে বসিতে থাকি! ভগবানের বস্তুতে আমি ভোগ বুদ্ধি করিতে যাই বলিয়াইত' মায়াদেবী যিনি ভগবানেরই আজ্ঞাধীনা দাসী মাত্র, আমাকে নানাপ্রকারে শাস্তি দিয়া থাকেন। সুতরাং আমি কাহারও উপর আর প্রভুত্ব করিতে যাইব না, সকলেই কৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার প্রভু, আমি সেই কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ প্রভুর দাসানুদাস মাত্র কিন্তু অকৃষ্ণ বা অকার্ষ্ণের দাস বা প্রভু আমি নই—এই বুদ্ধিই আমার একমাত্র মঙ্গল প্রসূতি, এই বুদ্ধিই আমার একমাত্র সম্বল হউক, ইহা নষ্ট হইলেই আমার সর্বনাশ। ভগবানের প্রিয়ভক্তগণের চরণে ইহাই যেন আমি প্রার্থনা করিতে পারি—"কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর! সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হোক দূর। তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব, গুরু-অভিমান ত্যজি। তোমার উচ্ছিষ্ট পদজল-রেণু সদা নিষ্কপটে ভজি॥ অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে অধিকার দিবে তুমি। তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি কাঁদিয়া লুটিব ভুমি॥ হে ভগবন্, হে গুরুদেব, তুমিত ঠাকুর, তোমার কুকুর বলিয়া জানহ মোরে। বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে রহিব তোমার দ্বারে॥ তব নিজজন প্রসাদ সেবিয়া উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা। আমার ভোজন পরম আনন্দে প্রতিদিন হবে তাহা॥ নিজের পোষণ কভু না ভাবিব, রহিব ভাবের ভরে। তোমার সেবক তোমারে পালক বলিয়া বরণ করে॥ পূর্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল সেবা সুখ পেয়ে মনে। আমিত তোমার, তুমিত' আমার কি কাজ অপর ধনে॥"



শিবপূজায় বলিদান

বর্দ্ধমান জেলার জামালপুর নামক স্থানে এক প্রসিদ্ধ শিবালয় বর্ত্তমান। প্রতি বৎসর এই সময় তথায় বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। গত শুক্রবার শিবপূজোপলক্ষ্যে বার্ষিক উৎসবের একটি প্রধান দিবস ছিল। কয়েকদিন ধরিয়া এতদ্দেশ হইতে বহুলোককে পূজাসম্ভার হস্তে উক্ত শিবক্ষেত্রে গমন করিতে দেখা গেল। পূজা সম্ভারের মধ্যে পাঁঠাই দেখিলাম একটি বিশেষত্ব। শুনিলাম শিবকে নাকি ছাগবলি দেওয়া হইয়া থাকে! মহাদেব, যিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একজন বিশেষ ভক্ত, শ্রীমদ্ভাগবতে যিনি 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু' বলিয়া কথিত হইয়াছেন, সেই বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর পূজায় বলিদানের ব্যবস্থা, ইহা বড়ই বিস্ময়জনক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। ইহা যদি অজ্ঞ জনসাধারণের কোন কুসংস্কারের ফল হয়, তাহা হইলে শিবভক্তগণের তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বলিপ্রথা নিবারণ করা কর্ত্তব্য। আমরা জানি, অধিকাংশ স্থলে শাক্তগণও মহামায়া পূজায় বলিদান প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। একটি প্রাণের বিনিময়ে আমার কিছু সুবিধা করিয়া লওয়ার চেষ্টা যে কিরূপ ভগবৎপ্রীতি-সম্পাদন চেষ্টা, তাহা বুদ্ধিমানগণের একটু চিন্তার বিষয় হওয়া উচিৎ। যে বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব প্রত্যেক জীবকে ভগবদ্দাসস্বরূপে দর্শন করিয়া নিজেকে তাহার দাসানুদাস বলিয়া অভিমান করেন, সেই বৈষ্ণবের সম্মুখে জীবহত্যা —ইহা ভয়ঙ্কর পৈশাচিক কাণ্ড বলিয়া বিজ্ঞজনেরা মনে করেন। বৈষ্ণব কখনও জীবহিংসার প্রশ্রয় দেন না, তিনি নিজেও নিজের হিংসা করিয়া আত্মঘাতী হন না। অর্থাৎ বৈষ্ণব নিজে বিষ্ণুর সেবা করিয়া অন্য জীবকেও বিষ্ণু সেবায় নিযুক্ত করেন। জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন—ইহাই বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণব বলিতে প্রত্যেক বিষ্ণুভক্তের ইহাই কর্ত্তব্য। যাহারা জীব-হনন দ্বারা সামান্য আত্মেন্দ্রিয় তর্পণপিপাসা ছাড়িতে পারে না, তাহারা চায় ভগবান্‌কে! ধিক্ তাহাদের ভগবানকে চাওয়ার! আমার স্বচক্ষে দেখা আছে, এক গ্রামে একটি বটবৃক্ষতলকে লোকে শ্রীহরির অধিষ্ঠান বা হরিতলা বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। প্রত্যেক বৎসর অজ্ঞ লোকগুলি সেই বটবৃক্ষতলে স্মার্ত্ত, শাক্ত ও ব্রাহ্মণ ডাকিয়া হরিপূজা করায় এবং হরিকে উদ্দেশ্য করিয়া পাঁঠা বলি দেয়। বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই যে ভগবানের প্রকট ভূমি, যে ভগবান্ বিশুদ্ধসত্ত্ব-বিশিষ্ট জীবের নিকট বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক নৈবেদ্য ছাড়া অন্য কোন প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত বস্তু গ্রহণ করেন না, যে ভগবান্ পশু-পক্ষী, কীট, পতঙ্গ আদি করিয়া দেবতা মনুষ্য সকলেরই পিতা, ত্রাতা —একমাত্র শরণ্য, সেই ভগবান্ তাঁহারই সৃষ্ট, তাঁহারই পাল্য জীবগণের রক্ত খাইবেন, একথা ভাবিতেও পাষণ্ডিদিগের হৃদয় কম্পিত হয় না, ইহাই পরিতাপের বিষয়।

পূর্ব্বে নরবলি হইত। মানুষ যখন একটু সভ্য হইল, সমাজে মানুষের উপকারিতা আছে বুঝিল, তখনই নর হত্যা ছাড়িয়া দিল। মানুষ যে এখনও কতদিনে সভ্য হইয়া ছাগবলি, মহিষবলি প্রভৃতি উঠাইয়া দিবে, তাহা বলা যায় না। বলিদান প্রথা যাহাতে দেশ হইতে একেবারেই উঠিয়া যায়, তজ্জন্য প্রত্যেক পরদুঃখদুঃখী মানবের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করা আবশ্যক। বাবা, মা কখনও রাক্ষস রাক্ষসী নয় যে, তাহারা তাঁহাদেরই ছেলেগুলিকে ধরিয়া ধরিয়া খাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, এ জন্মে যাহারা যাহাকে হত্যা করিতেছে, পরজন্মে আবার তাহারা অর্থাৎ হননকারী তাহাদিগের (হত জীবগণ) কর্ত্তৃক হত হইবে। জিহ্বার লালসা তৃপ্তির জন্য বাপ মায়ের উপর 'ছেলে খাওয়া' অপরাধ আরোপ করা যে কি ভীষণ অপরাধ—কি উৎকট পিতৃমাতৃভক্তির পরিচয়, তাহা প্রত্যেক হিংসাকারীর চিন্তার বিষয় হওয়া আবশ্যক। যে জীবন আমরা দিতে পারি না, সে জীবনের উপর আমাদের কি অধিকার আছে? ভগবান্ ইচ্ছা করিলে, তাঁহার জীবকে রাখিতেও পারেন, মারিতেও

পারেন। আমরা কেন অনধিকার চর্চ্চা করিয়া আত্ম-বিনাশ সাধন করিব?

অনেক তন্ত্রশাস্ত্রে অবশ্য বলিদানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহা অসংযতজিহ্বা নিতান্ত তামস বা রাজস প্রকৃতির লোকগণের জন্য। বেদে "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বানি ভূতানি" এই বাক্যের দ্বারা পশু হিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে। মনু বলেন, "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তির লোকগণের স্ত্রীসঙ্গ, জীব-হিংসা, আসবসেবাদি প্রবৃত্তি থাকিলেও নিবৃত্তি মার্গই মহাফলজনক। মোটকথা ভূতবলি দ্বারা আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধিত হইবে বটে, কিন্তু ভগবৎপ্রীতি আদৌ লাভ হইবে না। ভগবান্ আমার ক্রন্দনও যেমন শুনিতে পারেন বলিয়া আমার মনে হয়, অন্য জীবের ক্রন্দনও তিনি সেইরূপ শুনিতে পান। আমার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিলে যেমন আমার দুঃখ হইয়া থাকে, অন্য জীবেরও সেইরূপ দুঃখানুভূতি আছে। তাহারা আমার মত স্পষ্ট বাক্যে কথা কহিতে না পারিলেও, তাহাদের ভাষায় তাহারা কত কথাই না ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া থাকে। আমার কথাটিই ভগবান্ শুনিবেন, আর সেই নিরীহ প্রাণীদের কথা কি ভগবান্ শুনিবেন না?

সুতরাং জীবগণ, এখনও সাবধান হও, আর ভগবৎ পূজার নাম করিয়া প্রানিহত্যা পাপে লিপ্ত হইও না।

—::—::—

বকরঈদ

আবার একমাসের মধ্যেই বকরঈদ্ আসিতেছে। ইহার মধ্যেই অনেকস্থলে মুসলমানগণের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সারাটি বৎসর ধরিয়া যে কিছু একটু মিল হয়, এই সময় তাহা যেন সব ভাঙ্গিয়া যায়। মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি কি বীভৎস ব্যাপারই না চারিদিকে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। আমরা সহৃদয় মুসলমান ভ্রাতৃগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন একটু নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, গো-সমাজ কেবল যে হিন্দুগণের পূজ্য তাহা নহে, পরন্তু মনুষ্য মাত্রই গো-গণের নিকট অল্পবিস্তর ঋণী, গো-সমাজ মনুষ্য মাত্রেরই পূজ্য। গাভীগণ মাতার ন্যায় দুগ্ধ দান করিয়া এবং বৃষগণ পিতার ন্যায় ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন করিয়া আমাদিগের জীবন বাঁচাইয়া রাখেন। এতদ্ভিন্ন কত না কত প্রকারে তাঁহাদের নিকট আমরা ঋণী। কি হিন্দু কি মুসলমান—সকলেরই ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, জীব মাত্রেই অন্য জীবের নিকট কোন না কোন অংশে ঋণী, সে ঋণ শোধ করিবার সামর্থ্য জীবের সাধ্যাতীত। সুতরাং সাক্ষাৎ মাতৃপিতৃস্বরূপ গাভী ও বৃষহিংসা করাত' দূরের কথা, সামান্য কীটকেও আমি হিংসা করিতে পারি না। যদি বল, "কোরাণ শরিফে গো-বধের উল্লেখ আছে, কোরাণে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ ভেদে দুই প্রকার ব্যবস্থা আছে; নিবৃত্তি মার্গে নিষেধ থাকলেও, প্রবৃত্তি মার্গে জীব বধের বিধি আছে। আমরা প্রবৃত্তি মার্গে স্থিত; সুতরাং শাস্ত্র-আজ্ঞায় জীব বধ করিলে আমাদের পাপ হয় না। আবার হিন্দুর বেদ শাস্ত্রেও ত' দেখা যায় বড় বড় মুনিগণ গোবধ করিয়াছেন।" তাহার উত্তর এই যে, বেদে গো-বধের দ্বারা যজ্ঞ করিবার যে বাক্য দেখা যায়, তাহা জরদ্গব অর্থাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধ গরু সম্বন্ধে। মুনিগণ জরদ্গব মারিয়া বেদমন্ত্রে তাহাদিগকে যুবাকারে পুনর্জ্জীবিত করিতেন। সেরূপ বধ, 'বধ' শব্দ বাচ্য হইতে পারে না। তাহা দ্বারা বরং বৃদ্ধ গরুর উপকারই হয় মাত্র। কলিকালে ব্রাহ্মণগণের সেরূপ 'শক্তি' নাই বলিয়া এখন গোমেধ যজ্ঞ আদৌ হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন—"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্। দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চবিবর্জ্জয়েৎ॥" অর্থাৎ অশ্বমেধ, গোমেধ, ভগবৎ-সেবাবুদ্ধি-বিহীন কর্ম্ম ও জ্ঞান-বিদ্ধ সন্ন্যাস (কিন্তু ত্রিদণ্ড

সন্ন্যাস শাস্ত্র-বিহিত), মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবর দ্বারা সুতোৎপত্তি— এই পাঁচটি কলিকালে নিষিদ্ধ। যাহারা জীবের প্রাণ দান করিয়া জীবের উপকার করিতে সমর্থ নহে, তাহারা কোন ক্রমেই জীব বধ করিতে পারে না। সুতরাং গোবধ আদৌ বিধি হইতে পারে না, অন্যথায় গো-অঙ্গে যত লোম, তত সহস্র বৎসর রৌরব নরক মধ্যে পচিয়া মরিতে হইবে।

যাহারা শাস্ত্রের নিবৃত্তি মার্গীয় মহাফলের কথা শ্রবণ করিয়াও প্রবৃত্তি মার্গের দোহাই দিয়া ইন্দ্রিয়তোষণের সুবিধা করিয়া লইতে চায়, তাহারা শাস্ত্রাজ্ঞা পালনের পরিবর্ত্তে অপালন জন্য ভীষণ অপরাধে পতিত হয়। অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিকে শৃঙ্খলতার মধ্যে আনিতে বিজ্ঞগণ যে সকল প্রাথমিক উপায় অবলম্বন করেন, সেই উপায়ই যে একেবারে শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে, তাহা নহে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান এমন কোন সম্প্রদায়ের কোন শাস্ত্র জগতে নাই, যাহাতে অহিংসাকে পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় নাই।

আমাদের সহিত অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোকের আলাপ আছে, তাঁহারা গো-হত্যার নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পারেন না। তাঁহারা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের বহু লোককে উক্ত জীবহিংসা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন। সকল শাস্ত্রই বলেন, যে ধর্ম্মে পরপীড়ন আছে, সে ধর্ম্মে ভগবৎ প্রেম বলিয়া কোন বস্তু নাই। ভগবান্ সর্ব্বজীবপ্রভু, তাঁহার জীবকে পীড়া প্রদান করিয়া তাঁহার প্রীতি লাভের চেষ্টা নিতান্ত অশিক্ষিতগণের পক্ষেই আদরণীয় হইয়া থাকে। জীব-হত্যা কখনই ভগবদ্ভজনের অঙ্গ হইতে পারে না। সকলেরই ভগবান্ এক বই বহু নহেন। ভগবান্‌কে পাওয়ার রাস্তাও একই ; তাহা ভগবৎপ্রীতির জন্যই ভগবৎসেবা-ব্যতীত আর কিছু নহে। ভগবৎ সেবায় মারামারি কাটাকাটি বলিয়া কোন ব্যাপার নাই। জীবাত্মার সহজ স্বাভাবিক বৃত্তিই ভগবৎ সেবা। সেবা একটি কষ্ট-কল্পনার বস্তু নহে। সেবা দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল জীবের প্রীতি উৎপাদিত হয়। সেবা দ্বারা কাহারও আনন্দ বা কাহারও নিরানন্দ হয় না। সেবায় সকলেরই আনন্দ অবস্থিত। অনেকে গো-হত্যার পরিবর্ত্তে দুম্বা, ছাগল প্রভৃতি হত্যার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন ; তাঁহাদের যুক্তি এই যে, দুম্বা বা ছাগল অপেক্ষা গো-গণ সমাজের বেশী হিতকারী। কিন্তু তাদৃশ যুক্তিও অত্যন্ত দুর্ব্বলা, তাহাতেও স্বার্থের পূতিগন্ধ বিজড়িত, তদ্দ্বারা জীব-হত্যা রূপ অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই। আমাদের কথা এই যে, কি হিন্দু, কি মুসলমান ভগবদ্ভজনের উদ্দেশ্য করিয়া কেহ কোন প্রকার জীব-হত্যা করিতে পারিবেন না। করিলে, তাহা ভগবানের প্রীতিকর হওয়ার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইয়া পড়িবে। সোজা সুজি, কে ভগবান্, কিই বা তাঁহার উপাসনা, কেই বা তাঁহার উপাসক ইত্যাদি একেবারেই না জানিয়া অনুদিত বিবেকাবস্থায় যদি কেহ কোন প্রকার পাপ কর্ম্ম করিয়া বসে, তাহা হইলে বরং তাহার ক্ষমা আছে ; কিন্তু জানিয়া শুনিয়া ভগবদুপাসনার নাম করিয়া পাপচেষ্টা কখনই ক্ষমার্হ হইতে পারে না। ভগবান্ জীবকুলের রক্ষক ছাড়া ভক্ষক নহেন। প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দিয়া তাহা দ্বারা ভগবৎসেবা করাইয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কাহারও উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া তাহার সদসৎ কার্য্যের পুরস্কার বা দণ্ডবিধানের ভার ভগবান্ আমাদিগকে দেন নাই। আমাদিগের উপর এই ভার ন্যস্ত আছে যে, আমরা নিজেরা ভগবদ্ভজন করিব ও জীবমাত্রকে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত করাইয়া তাহার উপকার সাধন করিব।

সুতরাং সহৃদয় মুসলমান ভ্রাতৃগণের প্রতি আমাদের এইমাত্র শেষ অনুরোধ, তাঁহারা যেন কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অবিচারে ভগবদুপাসনার নাম দিয়া কতকগুলি পাপাচরণের প্রশ্রয় দিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী না হন। আবার হিন্দুগণের প্রাণে ব্যথা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যদি তাঁহাদের ঐরূপ বীভৎস অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয়, তবে তাহাও বড় দুঃখের কথা, কেন না তাহাতে 'আপন নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করা' ন্যায় অবলম্বিত হয় মাত্র। হিন্দু মুসলমান একই ভগবানের সন্তান, উভয়েই জীব-স্বরূপে সৌভ্রাতৃসূত্রে আবদ্ধ। বহুদিন আমরা সেই

ভ্রাতৃভাব ভুলিয়া গিয়া নানা দুঃখে কষ্টে কালাতিপাত করিতেছি। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বাধাইয়া নিজেদের নিজস্ব বলিতে যাহা কিছু সব হারাইয়াছি। আজ আমাদের সব থাকিতে আমরা পথের ভিখারী সাজিয়াছি। ভাই সব, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আর তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া আজ শোকসন্তপ্ত হইতে চাহি না। ভাই মুসলমান, তুমি তোমার হিন্দু ভাইয়ের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা কর, ভাই হিন্দু, তুমিও তোমার মুসলমান ভ্রাতৃগণের মঙ্গল-চেষ্টা করিয়া পরস্পর সৌভ্রাতৃসূত্রে আবদ্ধ হও।

——::•::——

দয়া ও মায়া

দয়া ও মায়া শব্দ দুইটি এক পর্য্যায়ের হইলেও বৈষ্ণব সাহিত্যে উহাদের ব্যবহার ভিন্ন উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। হিংসা কথাটি ঐ দুইটিরই বিপরীত পর্য্যায়ভুক্ত। দয়া কথাটির যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে তদ্বিপরীত হিংসা কথাটিরও আলোচনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। হিংসা অর্থে জীবকে ক্লেশ প্রদান, পর-পীড়ন, পরকে উদ্বেগ দান ইত্যাদি। হিংসা একটি মহাপাপ, ইহা কে না জানে, তথাপি আমরা ঐকার্য্যে লিপ্ত হই কেন? ইন্দ্রিয় তর্পণই উদ্দেশ্য। আমরা ভোগী জীব, ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণকেই আমরা খুব বড় জিনিষ মনে করি, অপরকে পীড়া প্রদান না করিয়া অপরের ইন্দ্রিয় তর্পণের ব্যাঘাত না করিয়া কেহ কোন দিন নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে পারে না। পরিদৃশ্যমান বিশ্বে বা ভোগময় জগতে নির্ম্মৎসরতা নাই সুতরাং মৎসর ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয় কই? কাজে কাজেই আমাদিগকে হিংসা ধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। তাহা হইলে কি এই হিংসা ধর্ম্ম হইতে উদ্ধার পাইবার কোন উপায় নাই? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন— অহস্তানি সহস্তানাম্ অপদানি চতুষ্পদাং। ফল্গুনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্—এই হিংসাময় সংসারের জীব মাত্রেরই পরস্পর একে অপরের হিংসায় নিযুক্ত। কাল কর্ম্ম গুণাধীন বলিয়া হস্তরহিত পশুসকল হস্তযুক্ত মানবের হিংসার যোগ্য, পদরহিত তৃণসমূহ চতুষ্পদ পশুর ভক্ষ্য। ক্ষুদ্র জীবকে হিংসা করিয়াই মহজ্জীব বাঁচিয়া থাকে, হিংসা ব্যতীত পৃথিবীতে কাহারও জীবিত থাকিবার উপায় নাই। আমরা ধর্ম্মের ছলে প্রতিদিন কত পশু হিংসা করি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কালীপূজা, দুর্গাপূজা ও শিবপূজা প্রভৃতিতে প্রতিবর্ষ কত লক্ষ লক্ষ পশুর প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? আমরা নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের নিমিত্ত অপরকে পীড়া প্রদান করিব, সেটা তত দোষের হইবে না, কিন্তু অপরে যদি আমাকে তাহার নিজ সুখের নিমিত্ত অল্প একটা কথাও বলে, তাহাও আমি সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা অপর জাতির প্রতি দোষারোপ করি, তাহাদের প্রতি হিংসা করিবার জন্য বয়কট প্রভৃতি নানা উপায় সৃষ্টি করি, কিন্তু আমিও যে আমা অপেক্ষা ক্ষুদ্র প্রাণীকে হিংসা করিবার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত, তাহার প্রতি দৃষ্টি নাই। নিজে হিংসা ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে অপরকে হিংসাধর্ম্ম হইতে নিরস্ত করা যায় না। যখন ভারতে হিংসাধর্ম্ম প্রবল হইল, যজ্ঞে পশুহিংসা করাই ধর্ম, এইরূপ বোধ হইল, তখন অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ—এই বেদোক্ত বাণী প্রচার করিবার জন্য ভগবদবতার বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়। বুদ্ধদেব যে বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তিকালে তাহা তাঁহার অনুগতজন কর্ত্তৃক বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। মোটের উপর বৌদ্ধ ও জৈনগণ যে জীবে দয়ার আদর্শ প্রদর্শন করেন, তাহাতে প্রকৃত দয়া নাই, দয়া বলিবার পরিবর্ত্তে তাহাকে মায়া বলা যাইতে পারে। আবার কর্ম্ম মার্গে কুম্ভ, উদূখল, চুল্লী, পেষণী ও সম্মার্জ্জনী এই পঞ্চসূনা পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়স্বরূপ দেব যজ্ঞ, ঋষি যজ্ঞ,

নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে, বর্ত্তমানে নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দরিদ্র নারায়ণ সেবা, বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা উপায় সৃষ্টি হইয়াছে। এ সকলকে আমরা দয়া না বলিয়া মায়াই বলিব। কেননা উহার দ্বারা জীবের সর্বতোভাবে ক্লেশ নিবৃত্তি হয় না, কিয়ৎ পরিমাণে ইন্দ্রিয় তর্পণের সহায়তা করে মাত্র। উহা যেরূপ আপাত মধুর, পরিণামে তাদৃশ নহে। চিনি খাইতে প্রথম মুখে ভাল লাগে বটে, কিন্তু পরিণামে তাদৃশ সুফলপ্রদ নহে। নিম্ব, কালমেঘ ও কুইনাইন প্রথম মুখে আমাদের রুচিপ্রদ না হইলেও চরমে সুফলই প্রসব করিয়া থাকে। কেহ যদি নিজ স্বার্থের উদ্দেশে আমার নিকট আসিয়া আমায় স্তব স্তুতি করে, আমায় প্রশংসা করে, আমি তখন ভুলিয়া যাই; কিন্তু সে যে নিজ কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে গাধা পাকাইবার, আমার হিংসা করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে তাহা অনেক সময় আমরা বুঝিতে পারি না, আবার পক্ষান্তরে কেহ যদি যথার্থই দয়া করিতে আসে, তৎকালে হয়ত তাহার বাক্য আপাত মধুর না হওয়ায় আমরা নির্দ্দয়া বা হিংসা মনে করিয়া প্রত্যাখ্যান করি—ইহার একটির নাম মায়া আর একটির নাম দয়া। মায়ার কার্য্য মোহিত করা। মায়া জীবের বুদ্ধি আবৃত করিয়া প্রকৃত দয়া বুঝিতে দেয় না। হিংসাকেই দয়া বলিয়া ভ্রম করায়। এক কথায় যাহা আমাদের ক্ষণিক ইন্দ্রিয় তর্পণের ইন্ধন-স্বরূপিণী, তাহাই মায়া; যাহা প্রথম মুখে অরুচিকর হইলেও চরমে মঙ্গলপ্রদ ও আত্যন্তিক ক্লেশ নিবৃত্তির হেতু তাহাই দয়া। অদূরদর্শীর পক্ষে মায়াই উপাস্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পরিণাম-দর্শীর 'দয়াই' একমাত্র বরণীয়। একটি দেহ-মনের কথঞ্চিৎ তৃপ্তি সাধন করে, অপরটি আত্মার নিত্য অসীম আনন্দ বিধান করে।

—:০:—

বুদ্ধিমান কে?

মানুষ তাহার নিজের বিচার-শক্তির মোহে এতই মুগ্ধ হইয়া পড়ে যে, সে যাহা ভাল কি মন্দ বলিয়া মনে করিতেছে, তাহাই যেন হইতে হইবে, ইহাই তাহার ধারণা হইয়া পড়ে। "আমা অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ আরও জগতে আছে, আমার সিদ্ধান্ত সকলকেই যে মানিয়া লইতে হইবে, তাহার কি নিশ্চয়তা আছে?" ইহা সে মানিতেই চাহিবে না। তাহার ধারণায় যেটি আসে না, এমন কোন অলৌকিক কথা যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে সে তাহার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ে। উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে, যেহেতু ভগবান্‌কে এ প্রাকৃত চক্ষু দিয়া আমি দেখিতে পাই না, সেহেতু ভগবান্—নিরাকার; প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন দ্বারা যাঁহারা ভগবানের সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন করেন, তাঁহাদের কথা আমার বিচার-মত আমি অলীক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করি না। আমার ধারণায় যতটুকু আসে, ততটুকুই আমি বিশ্বাস করিতে চাই। ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য যে সকল কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ধারণা দিয়া বিচার করিতে গিয়া তাহা একেবারে কতকগুলি অমুর্ব্বর মস্তিকের কল্পনা শক্তি বা কবির ভাবুকতা মাত্র, বাস্তব সত্য শূন্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাই। যেহেতু সংস্কৃত ভাষায় আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ কিম্বা ভাষাভিজ্ঞ হইয়াও ভাবগ্রহণে অসমর্থ, সেহেতু গীতা ভাগবতাদি গ্রন্থগুলি আমার নিকট আদৌ আদরের বস্তু হইতে পারে না।

কর্ম্ম কাণ্ডটা আমার ভাল লাগে, কেন না সেখানে বেশ একটা ব্যবসাদারী আছে, ভগবান্‌কে যা কিছু দিব তাহার সুদ সমেত আদায় করা যাইবে। কর্ম্মের ফল

কিছু দিন ধরিয়া ভোগ করা যাইবে। জ্ঞানকাণ্ডে ভোগ-ত্যাগ বলিয়া একটা মুস্কিল থাকিলেও তাহাতে আমার কাহারও অধীন হইতে হইবে না; আমিই ব্রহ্ম হইয়া যাইতে পারিব, সাযুজ্য মুক্তি পাইয়া ব্রহ্মের সহিত লীন হইয়া যাইব, জনম মরণের পথে কাঁটা দিব। কিন্তু ভক্তিটিই আমার যত আপত্তির কথা। দিন নাই, রাত্রি নাই সকল সময় কেবল সেবা কর, তাও আবার নিজের সুখের বাঞ্ছাটুকুও অন্তরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবার জো নাই, কেবল ভগবানের সুখের জন্য ভগবানের সেবা করিতে হইবে। না খাইয়া না পরিয়া মরিব সেও স্বীকার, তথাপি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিব না, খাইতে পরিতে আমার কষ্ট হইতেছে। জগতে আমার ভোগের জিনিষ এত পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু গীতা তাহা সব তাঁহার নিজের ভোগের জন্য বলিতেছেন, আমাকে কোন জিনিষের উপর হস্তক্ষেপ করিতে দিবেন না। কাজ কর্ম্ম যাহা করিব, তাহা আবার ভোগবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া করিতে হইবে, ভোগ করিবার প্রবৃত্তি অন্তরের কোন নিভৃত কোণে থাকিয়া উঁকি মারিতে থাকিলেও গীতার দৃষ্টি সেখানে যায়! তিনি অমনি বলেন, মন্মনাভব, মদ্ভক্তোভব। শুধু সেবা করিয়া যাইবে, আর মনটি রাখিয়া আসিবে বাড়ীতে, তাহা হইলে চলিবে না, মনটিও সেবায় লাগাইতে হইবে, কায়মনোবাক্যে সেবা চাই। মোট কথা নিজের কোন স্বতন্ত্রতা রাখিবার উপায় নাই—একেবারে কুক্কুর হইয়া থাকিতে হইবে—এক মুঠা খাইয়াই হউক আর দু'মুঠা খাইয়াই হউক, লেজ নাড়িতেই হইবে। এমন কেনা গোলাম হইয়া কি আর তিষ্ঠানো যায়? কোথায় আমি আমার স্বেচ্ছামত চলিব, তাহা না হইয়া এত পরাধীন হইয়া কে থাকিতে চায়? চাই স্বাধীনতা।

আবার আর একটি কথা, ভগবান্‌কে না হয় দেখিতে পাই না, কি তাঁহার কথা শুনিতে পাই না বলিয়া ভগবানই নাই বলিয়া একরকম উড়াইয়া দিতে পারি, কিন্তু তাঁহার ভক্তগণকে যে আর পারিবার জো নাই, তাঁহারা জোর জার করিয়া যেমন তেমন করিয়াও আমাকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে চান। বড় মুস্কিলই বটে!

দুর্ব্বুদ্ধি মানুষ এইরূপ জড় বিচারপর হইয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহে না, ভগবান্‌কে সেবা করিয়া আর তাহার লাভ কি হইবে? ভগবান্ নিজে প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং অর্জ্জুনকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়াও জীবকে বিশ্বাস করাইতে পারেন নাই যে, তাঁহার সেবা করিলেই জীবের সকল অভাব মিটিয়া যাইবে। মানুষ ত' সকল সময়েই সুখলাভের আশায় ছুটিতেছে, কিন্তু দুঃখ আসিয়া তাহাকে জ্বালাতন করে কেন? নিজের চেষ্টাবলেই যদি সে সুখ সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে, তবে তাহাকে পদে পদে দুঃখই পাইতে হয় কেন? আবার না চাহিতেই বা সুখ আসিয়া পড়ে কেন? তবে কি মনে করিতে হয় না, কোন একটি অমানুষিকী শক্তি এই সুখ-দুঃখের অন্তরালে মানুষের ভাগ্যবিধাতারূপে অবস্থান করিতেছেন? মানুষ তাহা স্বীকার করিতে না চাহিলেও তাহাই ত' সে স্বীকার করিতে বাধ্য। মানুষকে সুখ-শান্তি পাইতে হইলে সেই অমানুষিকী শক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সেই শক্তিটিই ভগবানের অমন্দোদয়া দয়াশক্তি। সে শক্তি আমরা পাগলের মত যাহা চাই, তাহা দিতে চাহেন না, যাহাতে আমাদের নিত্য সুখ-শান্তি লাভ হয়, তাহার বিধান করাই সেই শক্তির কার্য্য। সেই শক্তি আমাদিগকে প্রাকৃত সুখের হেয়ত্ব বুঝাইতে যে দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার অহৈতুকী কৃপা মাত্র! যাহারা এ প্রপঞ্চের সকল দুঃখ কষ্ট সেই দয়াশক্তিরই অপার কৃপা বলিয়া সহ্য করিতে পারেন, তাঁহারাই পরা শান্তি লাভের যোগ্য হন।

ভগবানের সেই দয়াশক্তিকে বিশ্বাস করিতে না পারিলে মানুষের কিছুতেই মঙ্গল নাই। খামখেয়ালী করিয়া আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে কহিতে পারি বলিয়াই যে, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহা নহে। দোষচতুষ্টয়শূন্য তত্ত্বদর্শী সাধুগণের কথা আমাকে মানিতে হইবে। তাঁহাদের উপদিষ্ট পন্থানুসারেই আমাকে চলিতে হইবে। নতুবা আমার রক্ষা নাই। গীতায়

ভগবান্ যে আমাদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া বার বার বলিতেছেন, তোমাদের ভগবৎ সেবা ব্যতীত জীবনের অন্য কোন কৃত্য নাই, তোমরা দেহ মনের ধর্ম সব ছাড়িয়া দিয়া ভগবানের পাদপদ্মে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ কর, খাওয়া পরার কোন ভাবনা তোমাদিগকে করিতে হইবে না, আমিই তোমাদের সকল ভার লইব।"—ভগবানের সেই বাক্যের প্রতিকূলে কতকগুলি উল্টা তর্ক না করিয়া ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করাই আমাদের একমাত্র মঙ্গলের পন্থা। ভগবান্ আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া তাঁহার সেবা করাইয়া আমাদের সুখ শান্তি কিছু কাড়িয়া লইবেন না, সবই আমাদের থাকিবে, তবে তাঁহার সেবার বিনিময়ে তিনি আমাদিগকে পরা শান্তি, পরা আনন্দ দিবেন, জড়-বিষয়ে আসক্তি, যেটি আমাদের অমঙ্গল সেইটিই ভগবান্ কাড়িয়া লইয়া থাকেন। ভগবানের সেবা-বিমুখ ব্যক্তিকে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কখনই বুদ্ধিমান কহেন না। ভগবদ্ভক্তই বুদ্ধিমান্।

অতিথিসেবা

সনাতন ধর্মে যে সকল বিষয় বর্ণিত আছে, তাহার প্রত্যেকটির একটি গূঢ় অর্থ আছে। আমরা জানি বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে অতিথিসেবার আদর চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক গৃহস্থই অতিথি সেবা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। অতিথিসেবা গার্হস্থ্য জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু আজ সেই ভারতবর্ষে আর গৃহস্থের ঘরে অতিথি সেবার কোন কথা নাই। আজ আর গৃহলক্ষ্মীগণ তাহাদের নিজেদের খাদ্য অতিথিকে দিয়া সুখ বোধ করিতেছেন না। সকলেই নিজের এবং পুত্র পরিজনের ভরণ পোষণের জন্য ব্যস্ত। গৃহস্থের দ্বারে অতিথি উপস্থিত হইলে আজ আর আনন্দ নাই, বরং কঠোর বাক্য প্রয়োগে অতিথিকে তাড়াইয়া দিতে পারিলেই জঞ্জাল গেল বলিয়া একটু শান্তি লাভ করা যায়। যদি কোনদিন কোন বৈষ্ণবও আমাদের গৃহে আসেন, তাঁহাকেও তাড়াইয়া দিতে আজ আমরা কুণ্ঠিত নই। হায় ভারতবাসীর আজ এ কি পরিণাম। আমাদের নিত্য-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর যখন গার্হস্থ্য লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন, তখন তিনি আমাদের কি শিক্ষা দিলেন? তিনিও তো আজ লোক-শিক্ষার্থে বৈষ্ণব অতিথির সেবা করিলেন। গার্হস্থ্য জীবনে অতিথি বৈষ্ণবের সেবা করাই যে একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা তিনি আজ নিজের জীবনে শিক্ষা প্রদান করিলেন। অনেকে হয়ত বলিবেন যে, আমার ঘরে কিছু নাই, আমি কি দিয়া অতিথি সেবা করিব? তজ্জন্যই তো শ্রীগৌরসুন্দর যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, তিনি আজ দরিদ্রের গৃহে অবতীর্ণ। যখন জগন্নাথ মিশ্র অপ্রকট, শচীদেবীর অন্যান্য পুত্রগণ অপ্রকট, গৃহে একমাত্র নিমাই ও তাঁহার মা এবং শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী, অর্থ উপার্জ্জন করিবার লোক নাই, ঘরে এক মুঠা তণ্ডুল নাই, এমতাবস্থায় শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণব অতিথি দর্শন মাত্রেই আদরে গৃহে নিয়া কৃষ্ণের প্রসাদান্নের দ্বারা সেবা করাইতেন। একদিন ২০ জন সন্ন্যাসী গৃহে অতিথি হইলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার মাতাকে জানাইলেন। শচীদেবী গৃহে কিছু নাই বলিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিছুকাল পরেই জনৈক ব্যক্তি ২০।২৫ জনের সেবা চলিতে পারে এমন দ্রব্য সম্ভার নিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী সানন্দে সন্ন্যাসী সেবার জন্য রন্ধন করিতে গেলেন। শ্রীগৌরসুন্দর পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীদিগকে তৃপ্তি-মত ভোজন করাইলেন। এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে এই শিক্ষা দিলেন যে, বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবার জন্য অভাব কিছুরই থাকে না। দ্বাপর যুগাবসানে যিনি বলিয়াছিলেন, অনন্যচিত্ত হইয়া যিনি

আমার ভজনা করেন, তাঁহার রক্ষণোপযোগী দ্রব্য আমি নিজেই বহন করিয়া দিয়া আসি, আর আজ কিনা নিজে মহা ভাগবতের আচরণ পালনরূপ লীলাকালে তাহাই শিক্ষা দিলেন। এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীগৌরসুন্দর যে অতিথি সেবা করিলেন, তাহা কি সাধারণ লোক যেরূপ কাম্য কর্ম্মাদিরূপ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য অতিথি সেবা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ? না, শ্রীগৌরসুন্দরের অতিথি সেবা সেইরূপ নহে। সনাতন ধর্ম্মে যে অতিথি সেবার গূঢ় অর্থ আছে তাহা এই যে, আমরা বৈষ্ণব চিনিতে পারি না। তবে অতিথি সেবা করিতে করিতে যদি দৈবাৎ কোন দিন ভাগ্যক্রমে এক বৈষ্ণবের সেবা করিতে পারি, তবে সেই অজ্ঞাত সুকৃতি বলে আমাদের নিত্য মঙ্গল সাধিত হইবে। নারদ দাসী-পুত্র ছিলেন, তাঁহার মাতা যে গৃহে কার্য্য করিতেন, সেই গৃহে কোন এক সময় চাতুর্ম্মাস্যযাপনকারী কয়েকটি বৈষ্ণবের সেবা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার যেরূপ নিত্যমঙ্গল লাভ ঘটিয়াছিল সেইরূপ অজ্ঞাত সুকৃতি সকলেরই লাভ হইতে পারে, সুতরাং আদর্শ গৃহস্থের একমাত্র কর্ত্তব্য শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ আর সেরূপ আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণব দেখিতে পাইতেছি না, বৈষ্ণব-গৃহস্থের ঘরে অতিথি হইয়া প্রসাদান্ন ভোজনে যে জীবের কি মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত।

—ঃঃ—ঃঃ—

সজ্জন দর্শন

যিনি আমার মতানুযায়ী কথা বলিতে পারেন, যিনি আমার কার্য্যের এমন সমালোচনা করেন, যাহাতে আমার স্বার্থের কোন ব্যাঘাত না ঘটে, যাঁহার নিকট হইতে আমার কিছু প্রাপ্যের সুবিধা আছে, যিনি আমার দুষ্কার্য্যের কোন প্রতিবাদ করেন না বরং উৎসাহই দিয়া থাকেন, যাঁহার চোখে ধূলা দিয়া আমি আমার কার্য্য সিদ্ধি করিয়া লইতে পারি, তিনি সচ্চরিত্রই হউন আর অসচ্চরিত্রই হউন, ধার্ম্মিকই হউন বা অধার্ম্মিকই হউন, আমার নিকট তিনিই 'সজ্জন'। আর যিনি আমার কার্য্যের নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়া দোষগুণ বিচার করেন, আমার মতামতের অপেক্ষা না করিয়া সত্য কথা বলেন, তাহাতে আমার স্বার্থের ব্যাঘাত হউক না হউক, সে বিষয়ে যাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, যিনি আমার কোন কার্য্যের বাহ্যাবরণ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া আমার চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া সেই অনুসারে আমাকে দণ্ডিত বা পুরস্কৃত করেন, যিনি আমার দুষ্কার্য্যগুলির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, আমার চোখ রাঙ্গানীতে ভয় করেন না, কিম্বা আমার কপট আঁকুপাঁকু ভাব, যাহাকে আমি 'তৃণাদপি সুনীচতা' বলিয়া প্রচার করিতে চাই, দেখিয়া গলিয়া যান না, যিনি অসচ্চরিত্র ও অধার্মিক ব্যক্তির সংসর্গ হইতে অত্যন্ত দূরে থাকিয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্য সদুপদেশ বা দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন, তিনি আমার নিকট আদৌ আদৃত হইতে পারেন না, তিনি সাধু বলিয়া সাধু-সমাজে আদৃত হইলেও আমি তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করি এবং সম্মুখে আসিতে সাহস করি না বলিয়া পিছনে থাকিয়া নিন্দাবাদ করি, লোকের নিকট তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াই। তাঁহার কোন সাধুচেষ্টা আমার নিকট প্রশংসার্হ নহে।

'সজ্জন' সম্বন্ধে শুধু আমার কেন, জগতের প্রায় ষোল আনা লোকের ধারণাই এইরূপ। যেটি অসত্য বা বাহিরে সত্যের ভাণ লইয়া অন্তরে ভয়ঙ্কর কপট, সেইটিই অজ্ঞ-জনের প্রিয়, বাস্তব সত্য দর্শনের ক্ষমতাও তাহাদের নাই অথবা দেখিবার ইচ্ছাও তাহাদের মনে উদিত হয় না। 'সৎ' বলিতে যাঁহার নিত্যসত্তা বর্ত্তমান, যাহা বাস্তব সত্য ; সেই সৎ-এর যিনি সেবক বা নিজজন তিনিই 'সজ্জন'। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র সৎ বা নিত্যসত্য

বস্তু আর শ্রীভগবদ্দাসাভিমানিগণই—সজ্জন, কৃষ্ণদাস বা বৈষ্ণব। নিখিল জগতের নিখিল জীববৃন্দই সজ্জন, কিন্তু স্বরূপানুভূতির অভাব হেতু বিরূপানুভূতি-ক্রমে জীব আপনাকে অসজ্জন বা অবৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করেন। বস্তুতঃ অবৈষ্ণবাভিমান ঔপাধিক মাত্র। জীব স্বরূপতঃ আপনাকে সজ্জন বা বৈষ্ণব বলিতে বাধ্য। বিরূপগ্রস্ত অর্থাৎ দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, আত্মা যে চিদংশ সুতরাং ভগবৎসম্বন্ধ বিশিষ্ট—এই স্বরূপোপলব্ধির অভাব-প্রপীড়িত জীব নিজের পরিচয় নিজে জানিতে না পারায় সজ্জন বা বৈষ্ণব-দর্শন ক্ষমতা তাঁহার হয় না। সেইজন্যই মহাজন বলেন, 'বৈষ্ণব চিনিতে নাহি দেবের শকতি।' অসজ্জন বা অবৈষ্ণবকে তাহার সমধর্ম্মী, 'সজ্জন' বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়।

জীব এই ভ্রমের প্রশ্রয় দিয়া নিজ সর্ব্বনাশ নিজেই বরণ করিয়া লইতেছেন, সজ্জন-নিন্দা বা বৈষ্ণবনিন্দারূপ মহান অপরাধ পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছেন। 'বৈষ্ণবনিন্দা' শ্রীভগবান্ ব্যাস লিখিত। দশ নামাপরাধের অন্যতম। স্কন্দপুরাণ বলেন—"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব সংজ্ঞিতে॥ হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুদ্ধতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্। অর্থাৎ "যে সকল মূঢ় স্বরূপবিস্মৃত জীব মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া থাকে, সেই সকল ব্যক্তি পিতৃবর্গের সহিত মহারৌরব নরকে নিপতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, নিন্দা করে, দ্বেষ করে, বৈষ্ণব দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণামাদি দ্বারা অভিনন্দন না করে, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, বৈষ্ণব দর্শনে আনন্দিত হয় না—এই ছয়জনই অধঃপতিত হয়।" বৈষ্ণবাপরাধিগণের বিদ্যা, কুল, তপ, জপ সকলই বৃথা, কৃষ্ণ তাদৃশ অপরাধিগণের কোন পূজা গ্রহণ করেন না। জগতে বৈষ্ণবাপরাধিগণ যতই না কেন প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করুক কৃষ্ণকৃপা হইতে তাহারা চিরবঞ্চিত। শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলেন—"শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে! তথাপিও নাশ যায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥ ইহা না মানিয়া যে সুজন হিংসা করে। জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব দোষে মরে॥" সমস্ত শাস্ত্রই সাধুসজ্জন বা বৈষ্ণব নিন্দাকে অত্যন্ত গর্হণ করিয়াছেন। শাস্ত্রে বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণেও মহা অপরাধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন (ভাঃ ৪।৪।১৭)—কোন দুর্বৃত্ত যদি ধর্ম্মরক্ষক প্রভুর নিন্দাবাদ করিতে থাকে, আর সেই নিন্দাবাদ যদি কোন প্রকারে প্রভু-ভক্তের কর্ণমূলে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাঁহার যদি নিন্দককে মারিতে বা স্বয়ং মরিতে সামর্থ্য না থাকে, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক সে স্থান ত্যাগ করিবেন, যদি সামর্থ্য থাকে তবে পাষণ্ড নিন্দকের নিন্দাবাদ উচ্চারণকারী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া ছেদন করিবেন এবং তদনন্তর নিজেও প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। শিবহীন দক্ষ-যজ্ঞে সতী একদিন পতি-নিন্দা শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবনিন্দক পিতা দক্ষকে তিরস্কার করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক জগজ্জীবকে এই বৈষ্ণব নিন্দাশ্রবণকারীর কর্ত্তব্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবনিন্দকের কোন কালে সদ্গতিলাভ হয় না। তবে একমাত্র উপায়, "যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যা'র। পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥" নিন্দক যদি বৈষ্ণবচরণে আসিয়া নিজ দোষ স্বীকার পূর্ব্বক অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করে এবং আর কখনও অপরাধে প্রবৃত্ত না হয়, তবেই সেই নিন্দকের উদ্ধার, নতুবা আর উদ্ধার নাই। দুর্ব্বাসা মহাভাগবত মহারাজ অম্বরীষের চরণে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ অপরাধ করিয়া যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, সে উপাখ্যান অবশ্য সকলেই জানেন। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণাদি শাস্ত্রে বৈষ্ণব-নিন্দা হইতে জীবকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়াছেন। কেননা বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তী ভক্তিলতার মূল পর্য্যন্ত উপ্ড়াইয়া ফেলে।

তবে এখন কথা হইতেছে এই, যে সমস্ত ধর্ম্মধ্বজী বৈষ্ণবচিহ্ন ও বেষাদি ধারণ এবং নানা বাহ্য আড়ম্বর দ্বারা আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বা 'সজ্জন' বলিয়া পরিচিত করিতে চায়, তাহাদের অসচ্চরিত্র বা অসৎ কার্য্যের নিন্দা করিলেও কি বৈষ্ণবনিন্দাপরাধে পতিত হইতে হইবে? না, তাহা নহে, কপটীর কপটতার নিন্দা না করিয়া তাহার

প্রশ্রয় দেওয়াই বরং অপরাধের পরিচয়। যে পাপিষ্ঠেরা পাপ প্রবৃত্তিসহ বৈষ্ণবের বেষ ধারণ করিয়া বৈষ্ণবের পবিত্র সিংহাসনে আরোহণ করিবার ধৃষ্টতা করিতেছে, বৈষ্ণব-দাসগণ সে পাপিষ্ঠগণের কর্ণদ্বয় আলিঙ্গন পূর্বক তাদৃশ চেষ্টা হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া বৈষ্ণবদাসানুদাসের দাসত্ব করিবার যোগ্যতা শিক্ষা দিবেন, ইহাই বৈষ্ণব-দাসগণের 'তৃণাদপি সুনীচতা'। সজ্জন বৈষ্ণবের পদ এতটা অনাদরের নহে যে, যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিবে। 'বিষ্ণুদাস' পদবীটী একটা যে সে পদবী নহে। ব্রহ্ম আদি দেবগণ সে পদবীর জন্য নিত্যকাল বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকেন। জীব মাত্রই স্বরূপগতঃ বৈষ্ণব, যাঁহার সে স্বরূপোপলব্ধি আছে, তিনি আমাদের নিত্য প্রণম্য, যাঁহার সে উপলব্ধি নাই, যিনি বিরূপ-ধর্ম্মগ্রস্ত, তাঁহার বৈরূপ্য আমাদের নিকট নিত্য গর্হণীয়—বৈরূপ্যকে গর্হণ না করিয়া যে উৎকট বৈষ্ণব-প্রীতি প্রদর্শন, তাহা আত্ম-বিনাশেরই সেতু মাত্র। মহাভাগবতগণ অবশ্য জগতে অসজ্জন বলিয়া কাহাকেও দেখিতে পান না; তাঁহাদের কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ দর্শনের অনুকরণ করিয়া যাহারা সৎ ও সজ্জন বা কৃষ্ণ কার্ষ্ণ দর্শন করিতে যায়, তাহারা মহা-ভাগবতগণের আচরণকে উপহাস করে মাত্র! সেই অপরাধে তাহারা কখনই কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং হঠাৎ মহাভাগবত না সাজিয়া মহা-ভাগবতের আনুগত্যে সদসৎ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক এবং মহাভাগবত প্রদত্ত অধিকারানুসারে সদসতের প্রতি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই প্রকৃত সৎ ও সজ্জন দর্শন হওয়া সম্ভব, নতুবা নহে।

—::•::—

ভক্তের প্রয়াস

যিনি কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা দ্বারা কৃষ্ণসেবা রহিত জড়াহঙ্কার-ভোগরূপ সংসারাখ্য অজ্ঞান সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রাচীন মহাভাগবতগণের উপাসিত পরাত্ম-নিষ্ঠা মাত্র বেষ ধারণ করেন, তিনিই যথার্থ ভক্ত, ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু। তিনি কৃষ্ণসেবার অনুকূল ব্যতীত কোন বস্তু গ্রহণ করেন না এবং প্রতিকূল ব্যতীত কোন বস্তু ত্যাগ করেন না। যাহারা এই গ্রহণ বা ত্যাগের প্রকৃত কর্ম্ম না জানিয়া কেবল ত্যাগ বা ভোগে রত থাকিতে চায়, তাহারা হিতে বিপরীতই ঘটাইয়া থাকে। এতাদৃশ ভোগীরা যদি কোন প্রকৃত যুক্তবৈরাগ্যবান্ ভক্তকে তাঁহার কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে উপকরণ সংগ্রহ করিতে দেখে, তাহা হইলে তাহার চিত্তে মাৎসর্য্যের উদয় হয়। সে মনে করে, আমি যাহা বহু প্রয়াসেও লাভ করিয়া ভোগ করিতে পাই না আর এই ভক্ত তাহা অল্প প্রয়াসেই লাভ করিয়া আমার অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া পড়িল! কৃষ্ণসেবক যে তাঁহার আহৃত সমস্ত বস্তুই কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট সেবন করেন মাত্র, ভোগী ভক্তের সে চেষ্টা বুঝিতে পারে না। ভোগী বলে, "ভক্ত কেন কৌপীন কমণ্ডলু লইয়া বৃক্ষতল সার করিবে না, পাকাবাড়ী, ইলেক্‌ট্রিক লাইট, ফ্যান ও মোটরকার ইত্যাদি ঐশ্বর্য্য কেন সে আমাকে দিয়া দেয় না, অন্যের নিকট হইতে ভিক্ষা লইয়া সে আমার অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যশালী হইবে, আমার ভোগে বাধা দিবে, এসব আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমিই মোটর চড়িব, বৈদ্যুতিক আলোক ও পাখা প্রভৃতি ব্যবহার করিব, ভক্তকে কৌপীন কমণ্ডলু সার করাইয়া, বৃক্ষতলবাসী করাইয়া তবে আমার আর কাজ" ভোগীর এই সকল মাৎসর্য্যপর যুক্তিকে শ্রীভগবান্ খণ্ড খণ্ড করিয়া বলেন—জগতের যত কিছু উত্তমোত্তম দ্রব্য আছে, সমস্তই আমার ভক্তের প্রাপ্য, আমার ভক্ত যাহাকে যাহা কৃপা করিয়া আমার প্রসাদ বলিয়া বিতরণ করিবে, তাহাই জগতের লোকের প্রাপ্য। আমি ভক্তের প্রদত্ত দ্রব্য ভিন্ন অন্য কাহারও প্রদত্ত উৎকৃষ্ট বস্তুও গ্রহণ

করি না—"ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ"। যে বিদ্যাবধূর জীবন আমি নহি, যে বিদ্যাবধূ আমাকে স্বামী না জানিয়া ব্যভিচারিণী, তাদৃশী বিদ্যায় বিদ্বান, আমার অভক্ত চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণও আমার প্রিয় নহেন, কিন্তু যে শ্বপচ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে তোমরা অত্যন্ত ঘৃণা কর, স্পর্শের অযোগ্য বলিয়া জ্ঞান কর, সেই শ্বপচ যদি আমার ভক্ত হয়, তাহা হইলে সেই আমার প্রিয়। আমি আদেশ করিতেছি, তাহাকেই তোমাদের যা কিছু প্রীতির বস্তু আছে, তাহা অর্পণ করিবে এবং তাহার নিকট হইতে আমার প্রসাদ গ্রহণ করিবে। ভক্তকে কখনও অবমাননা করিও না, আমিও যেমন তোমাদের পূজ্য ভক্তও তেমনই পূজ্য।" ভগবদ্ভক্তই ভগবানের সমস্ত সম্পত্তির ট্রাষ্টি! ভগবান্ তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও তাঁহার সম্পত্তির ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। কেনমা ভগবদ্ভক্ত ভগবানের সমস্ত সম্পত্তি ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত না করিয়া এক অন্ধ কপর্দ্দকও নিজ সেবায় গ্রহণ করেন না। ষড়ৈশ্বর্য্যপতি গোবিন্দের বিশ্রাম স্থান ভক্তের হৃদয়ে, তখন ভক্তের নিকট ঐশ্বর্য্য থাকিবে না কি অভক্তের নিকট থাকিবে? ভগবানের ভক্তকে না দিয়া যে সকল ভোগী ভগবদ্বস্তু ভোগ করিতে যায়, ভক্তের ভগবদ্দত্ত ক্ষমতা আছে, অভক্তের নিকট হইতে তাহা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়ার। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভোক্তা ভক্ত ভগবদ্দাসসূত্রে অপরকে সে ভোক্তৃপদবী পাইতে দিবেন না, ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত।

অবশ্য প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন শরণাগত ভগবদ্ভক্তেরই জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভিক্ষা করিয়া ভগবৎ পাদপদ্মে অর্পণ করার যোগ্যতা আছে, কিন্তু যে সকল রাবণ প্রকৃতির দুর্বৃত্ত বাহ্য ভক্তের বেষ ধারণ পূর্ব্বক রামভোগ্যা জগল্লক্ষ্মীকে ভিক্ষা করিয়া লক্ষ্মীপতি শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিবার পরিবর্ত্তে নিজ ভোগের ইন্ধন করিতে চায়, সে সকল কপটাচারী ভণ্ড রাবণ অচিরেই শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। রাম-ভোগ্যা লক্ষ্মীদেবীকে কুলটার সেবায় নিযুক্ত করার স্পর্দ্ধা যে রাক্ষস করিতে পারে, রামদাসগণ জগৎ হইতে সেই রাক্ষসকুলের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলোপ না করা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। ত্রেতাযুগে দুরাত্মা রাবণ তুর্য্যাশ্রমীর বেশে সীতাহরণের প্রয়াস করিয়াছিল, এবারকার কলিযুগের রাবণ একেবারে বৈরাগী পরমহংসের বেষে সীতাহরণের মতলব করিতেছে। সেবার বোধ হয় দাড়ী গোঁফ ছিল, হাতে দণ্ড কমণ্ডলু ছিল, এবার ভণ্ড সে সব ছাড়িয়া শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের ভক্তের ন্যায় হাতে মালার ঝোলা লইয়াছে, পরিধানে কৌপীন বহির্ব্বাস রাখিয়াছে, মাথা নেড়া করিয়াছে। সুতরাং সাধু সাবধান! ভণ্ড বৈরাগী রাবণকে কেহ ভিক্ষা দিয়া শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধী হইবেন না। শ্রীভগবদ্দাসসূত্রে আপনারা সকলেই অবিলম্বে ভণ্ডের সকল ভণ্ডামী সমূলে উচ্ছিন্ন করিবার জন্য যত্নবান হউন। রাধাকৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল—এইমাত্র ভিক্ষা চাই।

আমাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য প্রভৃতি যাহার যাহা কিছু আছে, তাহা নিষ্কপটে, নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে শুদ্ধভক্তগণের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করুন, তাঁহারা সে সকল ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিবেন। 'আমরা ভগবান্‌কে দিতে পারি ভক্তের দরকার কি?' এরূপ দাম্ভিকতা থাকা অবস্থায় ভগবান্ আমাদের কোন বস্তু গ্রহণ করেন না। জানিবেন, ভক্তই ভগবানের হৃদয়, আবার ভগবানের হৃদয়ই ভক্ত; ভক্ত ছাড়া ভগবান আর কাহাকেও জানেন না, ভক্তও ভগবান্ ছাড়া আর কাহাকেও জানেন না। ভগবান্ সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া থাকিলেও ভক্তই ভগবানের সন্ধান দিয়া থাকেন। সর্ব্বক্ষণ "গৌরজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া। হরে কৃষ্ণ নাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥" অভক্তের সর্বপ্রকার সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

———

সত্যের বিক্রম

অনেকে বলেন, "মহাশয় আপনারা যাহা বলেন, তাহা সব সত্য, উহার প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই বটে, কিন্তু আপনাদের কথাগুলি এত কর্কশ, লোকের মর্ম্মভেদী হইয়া পড়ে যে, লোকে অন্তরে অন্তরে তাহা সত্য বলিয়া মানিয়াও বাহিরে ইচ্ছা করিয়াই তাহার বিরোধী হইতে চায়। আপনারা কথাগুলি একটু সুগারকোটিং করিয়া দিবেন, তাহা হইলেই আর কোন গোল থাকিবে না। লোকে আপনাদেরই কথা শুনিবার জন্য পাগল হইবে॥" তাঁহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য এই, চোরকে চোর বলিলে চোরের নিকট আমাদিগকে অপ্রীতিভাজন হইতে হয় বটে, কিন্তু চোর যাঁহার জিনিষ চুরী করিয়াছে, তাঁহার নিকট আমরা প্রীতিভাজনই হইতে পারি। চোরকে চোর না বলিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিতে লাগিলে চোরেরও চৌর্য্যাপবাদে লজ্জা ঘৃণা হয় না, অপহৃত বস্তুরও উদ্ধার সম্ভব হইবে না। একটি চোরকে লইয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত করিলে আর পাঁচটি লোকের চৌর্য্যপ্রবৃত্তি দমিত হইতে পারে। পুরাকালে চোরের প্রতি প্রাণদণ্ড বিহিত হইত। বর্ত্তমানে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যে খুনে আসামীর অপরাধের গুরুত্ব বিচারে প্রাণদণ্ডের বিধান করিতেছেন, তাহার সম্বন্ধে অনেকে রাজনীতির নিন্দা করিলেও বিজ্ঞগণ উহাই সমীচীন মনে করেন; কেননা ঐরূপ আইন না থাকিলে লোকের অপকর্ম্ম করিবার সময় মনে কোন শঙ্কা উদিত হইত না, জগতে খুন জখম, চুরী ডাকাইতী প্রভৃতি পাশবিক অত্যাচার এত বাড়িয়া উঠিত যে, লোকের জগতে বাস করাই কঠিন হইয়া পড়িত। সুগারকোটিং করিয়া কথা বলিলে অপরাধী তাহার অপরাধের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। বালক অপরাধ করিলে বালকের হিতাকাঙ্ক্ষী কর্তৃপক্ষ এক দুইবার অবশ্য বুঝাইয়া দেন যে, অপরাধ করিতে নাই। কিন্তু বালক যখন কর্তৃপক্ষের সে উপদেশ অমান্য করিয়া পুনঃ পুনঃ সেই অপরাধে প্রবৃত্ত হইতে চায়, তখন কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে এমন কঠোরভাবে শাস্তি প্রদান করেন, যাহাতে বালক আর কখনও অপরাধে প্রবৃত্ত না হয়। সুতরাং অন্যায় কার্য্যের কোন প্রকার প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। সত্য কথা অসজ্জনগণের কর্ণে কখনও মধু বর্ষণ করিতে পারে না। তাহাদের বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাই তাহাদের মঙ্গলের সেতু। মানুষ যখন মর্ম্মে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহার জড়তা ভাঙ্গে, তখনই সে তাহার কৃতাপরাধের কথা চিন্তা করিবার অবসর পায়। কোন দুষ্কর্ম করিয়া মানুষ যখন কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হয় যখন ডাক্তার আসিয়া তাহাকে তীব্র তিক্ত ঔষধাদি প্রদান, দেহে অস্ত্রোপচারাদি করিতে থাকেন, তখন সে তাহার কৃতাপরাধ সম্বন্ধে অনুশোচনা করিয়া থাকে। তাহা না হইলে অর্থাৎ ঔষধপথ্যাদির অসুবিধা না পাইলে রোগী আবার অত্যাচার করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। ঘাতেরই প্রতিঘাত হইয়া থাকে, ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে উত্তরেরই প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হয়। বৈষ্ণব জগতে আজ এত বড় একটা সাড়া পড়িয়া যাইত না, এত বড় একটা আন্দোলন চলিত না, যদি না বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি সিদ্ধ মহারাজগণের অনুগত শুদ্ধ-ভক্তগণ সত্যে অপলাপকারিগণের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান আনয়ন করিতেন। বহু দিবসাবধি শুদ্ধা ভক্তির আলোচনা না থাকায়, বিদ্ধা ভক্তির অত্যধিক প্রচলন হওয়ায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদানুগগণ যখন শুদ্ধা ভক্তিকথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন বিদ্ধভক্তদল একেবারেই পরিপন্থী হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, এসকল আবার কি নূতন কথা! শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের নাম পর্য্যন্তই লোকে জানিত না! জানিলেও তাহা যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একখানি সর্বপ্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ তদ্বিষয়ে কাহারও কোন শ্রদ্ধা ছিল না, বাঙ্গলা পয়ার পুঁথি বলিয়া অনাদৃত অবস্থাতেই পড়িয়া থাকিত। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রামাণিকত্ব জগৎ সমক্ষে প্রচার

করেন। লোকে বহুদিন ধরিয়া একটা বিষয়ে অনভ্যস্ত থাকিলে পরে সেই বিষয়টি তাহার নিকট অত্যন্ত নূতন হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রার্থিত বস্তুর সন্ধান পাইয়া পরম পুলকিত চিত্তে আসিয়া তাহা গ্রহণ করেন। বহু বহু গোস্বামী সন্তান, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী তৎকালে অতি আদরের সহিতই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন, আপনার দ্বারাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত হইবে। তাঁহারা সত্যপ্রিয় ছিলেন, তাই সত্যের আদর করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ভাগ্যবান্, নিরপেক্ষ, সত্যপিপাসু, তাঁহারা নিজ নিজ দোষ স্বীকার করিয়া তাহা হইতে সংশোধিত হইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না। বদ্ধজীব আমরা, যেকোন মুহূর্ত্তে অসৎসঙ্গপ্রভাবে অসৎ কর্ম্ম করিয়া বসিতে পারি, তাই বলিয়া কেহ সত্য কথা বলিয়া আমাদের মঙ্গল করিতে আসিলে তাহা অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি করিব, ইহা কখনই ভদ্রোচিত ব্যবহার নহে। "আপনারা যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, এইরূপ সত্য প্রচারে আমাদের কোন আপত্তি নাই, বরং সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, আমরাও সংশোধিত হওয়ার চেষ্টা করিব" ইত্যাদি সৎসাহস, সত্যের প্রতি অনুরাগ, জাতি, কুল, ধন ও মানের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিই করিয়া থাকে বই হীন করে না। নতুবা মিছামিছি মাৎসর্য্যপর হইয়া জেদ করিয়া সত্যের অবমাননা করিলে নিজের পায়ে নিজেকেই কুঠারাঘাত করিতে হয়। অসত্য প্রিয় লোকের চিত্তবৃত্তির অপেক্ষা করিয়া আমরা সত্য কথা বলিতে যাইব না, ইহাই আমাদের দৃঢ় পণ। উচিত কথা বলিতে যদি বন্ধু বিগ্‌ড়াইয়া যান, তাহাতে আমরা কোন ক্ষতি বৃদ্ধি মনে করি না। যে বন্ধু উচিত কথা না শুনিতে আসেন, তিনি আর কেমন করিয়া তাঁহার বন্ধুত্বের পরিচয় দিবেন? জগতের লোক বন্ধু বলে তাহাকে, যে তাহারই মতে মত দিয়া তোষামোদ করিতে পারে। সে বন্ধুত্বের মধ্যে ব্যবসাদারী ছাড়া আর কিছু নাই। উদাহরণ যথা, গোঁসাই ঠাকুর কথকথা করিতে গিয়া ভাগবতের 'অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ' শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গেলে, যদি সে ব্যাখ্যা কলিস্থানপঙ্ককে আসক্ত শ্রোতার মনোমত না হয়, তাহা হইলেই তাঁহাকে প্রমাদ গণিতে হইবে, সুতরাং তিনি রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিয়া খুব রসের ফোয়ারা ছুটাইলেন, শ্রোতারাও বাহবা দিল, পাওনা সম্বন্ধেও কোন গোল হইল না। ইহাতে লাভ হইল কি? বক্তাও অনধিকারী শ্রোতার নিকট অনধিকার চর্চ্চা করিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী হইলেন, শ্রোতাও রাধাকৃষ্ণ-লীলারসে প্রাকৃত বুদ্ধি আরোপ করিয়া নিজ সর্বনাশ সাধন করিলেন। এরূপ উদাহরণ জগতে কত শত যে পড়িয়া আছে, তাহার ঠিক নাই। আমরা বৃন্দাবনে বঙ্গদেশীয় এক খ্যাতনামা ভৃতক পাঠকের যে কীর্ত্তি স্বকর্ণে শুনিবার ও তাহার নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিবার দুর্ভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিতেও মুখে নিষ্ঠীবন আসে, প্রকাশ করিয়া বলাও নীতিবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই প্রকারে যে সকল গোস্বামিব্রুব, বৈরাগিব্রুব, বৈষ্ণব-নামধারিগণ বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের নামে জগতে মহা অনর্থ প্রচার করিতেছে, শুদ্ধভক্তের পদবীতে আরোহণ করিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে, গুরুবৈষ্ণবে অপরাধ করিয়া নরকগামী হইতেছে, তাহাদিগকে কি 'বাবা বাছা' বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে? সে সকল বৈষ্ণব নিন্দকের জিহ্বা বল-পূর্ব্বক টানিয়া কর্ত্তন করিয়া দেওয়াই তাহাদের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার। বৈষ্ণব নিন্দকের খোসামোদ যাহারা করিতে পারেন করুন, আমরা বৈষ্ণব নিন্দকের মুখ দর্শনও করিতে চাহি না। বৈষ্ণব নিন্দক, কৃষ্ণের অভক্ত যাহারা, তাহাদিগকে বলিবার বা বোঝাইবার জন্য আমরা ব্যস্ত নহি, তাহাদিগের অস্তিত্ব জগৎ হইতে লোপ করিবার জন্যই আমাদের প্রয়াস। তত্ত্বানভিজ্ঞ বালিশগণ যাহাতে সেই সকল বৈষ্ণবাপরাধী কৃষ্ণাভক্তের কুহকে পড়িয়া নষ্ট না হয়, তাহাদের জন্যই আমাদের শাস্ত্রচর্চ্চা, মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক শুদ্ধ পারমার্থিক পত্রের প্রচার, গ্রন্থ-প্রচার, লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া সত্য কথা কীর্ত্তন, স্থানে স্থানে মঠ ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থ ও পত্রের নির্বিঘ্ন

প্রচারের সুবিধার জন্য মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠাদির অনুষ্ঠান। আমাদের প্রচারকগণ কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট হইয়া সমগ্র ভারতে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সত্য বাণী অদম্য উৎসাহে প্রচার করিতেছেন। সহস্র সহস্র লোক আজ শুদ্ধভক্তগণের আদর্শ চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের শ্রীমুখে গৌর-নিত্যানন্দের গুণগাথা শ্রবণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। আমাদের প্রচার শুদ্ধ ভারতেই আবদ্ধ নাই। 'সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম' মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাণীর জয় ঘোষণা করিয়া ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানীতেও শুদ্ধ-ভক্তিকথা প্রচারের বিপুল আয়োজন চলিতেছে। অনেক পাশ্চাত্য দেশবাসী 'দি হারমোনিষ্ট' বা শ্রীসজ্জনতোষণী নামক মাসিক পত্রিকার গ্রাহক হইয়া নিরপেক্ষ সত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। অসত্যপ্রিয় জনগণ ছাড়া সকলেই আমাদের সত্য প্রচারের পক্ষপাতী। বৈষ্ণব নিন্দকগণ চিরকাল বৈষ্ণব নিন্দা করিয়াই নরক প্রাপ্ত হউক, আমাদের কোন কথা শুনিবার বা আমাদের কোন গ্রন্থ কি পত্রিকাদি পড়িবার স্পর্দ্ধা তাহারা না করুক, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

সত্য বাণী কর্কশ হউক, মর্ম্মন্তুদ হউক বর্ত্তমান তথা-কথিত আসুর বর্ণাশ্রমের ধ্বংসকামী হউক, ভুক্তি মুক্তি পিশাচীর নিকট ভয়ঙ্করী হউক, তাহাই আমাদের অমিত-বিক্রমে প্রচার্য্য বিষয়। সত্য চিরকালই মিথ্যার উন্নত মস্তক পদদলিত নিষ্পেষিত করিয়া সগর্বে জগতের বক্ষে বিচরণ করিবে—তাহার গতি জগতের সমুদয় শক্তি মিলিয়াও রোধ করিতে সমর্থ হইবে না।

গুর্ব্বানুগত্য

মানব যখন তাঁহার নিজের দোষগুলির প্রশ্রয় না দিয়া তাহা সংশোধন করিবার জন্য সত্য সত্যই ব্যাকুলাত্মা হইয়া পড়েন, নিজের বিদ্যা, বুদ্ধির প্রশংসায় নিযুক্ত না থাকিয়া হিতাহিতের সকল বিচার-ভার শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া কেবলমাত্র গুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা অপেক্ষা করিয়া থাকেন, তখন বলদেব শ্রীগুরুদেবই তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে চিদ্‌বল প্রদান করিয়া থাকেন, যাহার দ্বারা বলীয়ান্ হইয়া তিনি অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়ার সকল ক্ষমতাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ হইয়া নিত্য মঙ্গল লাভ করেন। শ্রীগুরুদেবে প্রপত্তি ভিন্ন মানব কখনই দোষমুক্ত হইতে পারেন না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত "আমার ভালমন্দ আমিই ভাল বুঝি অথবা শ্রীগুরুদেবও যতটুকু বুঝিবেন, আমিও তাহাই বুঝিব, তিনি আমারই ন্যায় মানুষ মাত্র" এইরূপ বুদ্ধি প্রবলা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানব ভীষণ অনর্থ সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকেন। 'গুরুদেবই আমার একমাত্র মঙ্গলবিধাতা, তাঁহার উপদিষ্ট পন্থাই আমার একমাত্র অনুসরণীয় পন্থা, তদ্ভিন্ন আমার কোন স্বতন্ত্র পন্থা নাই, গুরুদেবই আমার ভাল মন্দ সম্যক্‌প্রকারে অবগত আছেন, তাঁহাতে ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয় না থাকায়, তাঁহার উপদেশই আমার একমাত্র পালনীয়'—এইপ্রকার বুদ্ধিই আমার মঙ্গল প্রাপিকা। শুদ্ধ শরণাগতিই শ্রীভগবৎ কৃপালাভের একমাত্র উপায়।

গুরুদেব অপেক্ষা আমরা সময়ে সময়ে বেশী বুঝিতে যাইয়া যে উৎকট গুরুভক্তির পরিচয় দিতে যাই, তাহাতে আমাদের মঙ্গলের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয় মাত্র। সাধারণ মানবের ভক্তি সম্বন্ধে ধারণা—কণ্ঠদেশে তুলসীমালা, বাহুমূলে শঙ্খ চক্র ও দ্বাদশ অঙ্গে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ পূর্বক দিন রাত্রির মধ্যে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটু ঘণ্টা নাড়া কিম্বা খানিকটা মালা জপ বা দু'একটা গান গাহিলেই বুঝি ভক্তিযাজন করা হইয়া গেল। গুরুদেব যদি কৃপা করিয়া কেবল ঘণ্টা নাড়া বা মালা জপ ছাড়া অন্য কোন সেবা কার্য্যের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন, তিনি তখন ভাবেন, এ কাজটি আমার গৌণ মাত্র, মুখ্য কার্য্য হরিনাম,

এই সেবা কার্য্য ছাড়া আর একটি জিনিষ, সুতরাং কোন গতিকে এটি শেষ করিতে পারিলেই হয়। এইরূপে মানব সেবাকার্য্যের সহিত শ্রীনাম গ্রহণকে ভেদবুদ্ধি করিয়া গুরুদেবের বাক্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, হরিনাম করিতে যাইয়াও কেবল অনর্থ বরণ করেন মাত্র। শ্রীভগবন্নাম যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু নহে, কেবলমাত্র সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ই যে হরিনাম গ্রহণ করিতে পারেন, শুদ্ধ হরিনাম যাহাতে আমাদের জিহ্বায় নৃত্য করিতে পারেন, আমরা যাহাতে সম্পূর্ণরূপে অনর্থমুক্ত হইতে পারি, তজ্জন্যই যে শ্রীগুরুদেবের সকল চেষ্টা আমারই হিতকল্পে, তাহা মূর্খ মানব আমরা বুঝিতে না পারিয়া সেবাকার্য্য-গুলির প্রতি আদর প্রকাশ করি না। নির্ব্বিচারে যখন আমরা গুরুদেবের আজ্ঞা পালন করিয়া যাইব, গুরুদেব আমাদিগের উপর যে কার্য্যের ভার দেন, সেই কার্য্যকেই যখন আমরা শ্রীভগবন্নামগান, বেদপাঠ ইত্যাদি বলিয়া জানিব, সেইদিনই গুরুদেবের কৃপা বলে আমরা যথার্থ শ্রীনামপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইব। গুরুদেবের উপদেশে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্য্যন্ত মানুষের কোন-ক্রমেই নিস্তার নাই।

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিসাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাগণ কর্ত্তৃক যে যে যুক্তি অবলম্বিত হইয়া থাকে, সে সমস্ত যুক্তিতে অতি-নিপুণতা-প্রযুক্ত গুরুদেব সকল কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাগণেরই অতিশয় প্রিয়। "কৃষ্ণের কিসে সুখ হয়, কোন্‌টি কৃষ্ণভক্তি তাহা গুরুদেবই উত্তমরূপে জানেন, গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া এই বুদ্ধি অনুসারে চলিলে আর পতনের কোন আশঙ্কা থাকে না। গুরুদেবের বাক্য যে অবিচারে পালনীয়, তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ প্রেরিত গোবিন্দকে তাঁহার সেবকরূপে গ্রহণ লীলা করিলেন। গোবিন্দ আসিয়া বলিলেন, "প্রভো, আমি পুরীগোস্বামীর ভৃত্য, গোস্বামী প্রভু তাঁহার সিদ্ধি প্রাপ্তিকালে আমাকে ও কাশীশ্বরকে তোমার সেবকরূপে তোমার পদান্তিকে থাকিবার আদেশ করিয়াছেন। কাশীশ্বর তীর্থ ভ্রমণান্তে কিছুদিন পরে এখানে আসিবেন, আমি অগ্রেই আসিয়া পড়িয়াছি, আমাকে তোমার কিঙ্কররূপে গ্রহণ করিয়া শ্রীপাদপদ্ম-সেবা-সৌভাগ্য প্রদান কর।" মহাপ্রভু তখন সার্ব্বভৌম ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভট্টাচার্য্য করহ বিচার। গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার॥ তাঁহারে আপন সেবা করাইতে না যুয়ায়। গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায়॥" জীব-শিক্ষক লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু তাঁহার মুখ দিয়া সিদ্ধান্তটি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন জানিয়া সার্ব্বভৌম কহিতে লাগিলেন—"প্রভো! গুরুর আজ্ঞা হয় বলবান্। গুরু আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়ে শাস্ত্র প্রমাণ॥ পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাই পিতৃ আজ্ঞায় পরশুরাম তাঁহার মাতা রেণুকা দেবীকে শত্রুর ন্যায় নিহত করিয়াছিলেন জানিয়া শ্রীরামানুজ লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞায় সীতাদেবীকে বনে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, যেহেতু গুরুবর্গের আজ্ঞা অবিচারণীয়া। রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের বন গমন প্রসঙ্গে দেখিতে পাই —নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়া কার্য্যা মহাত্মনঃ। শ্রেয়ো হ্যেয়ং ভবত্যাশ্চ মম চৈব বিশেষতঃ॥—শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র কহিলেন—মহাত্মা গুরুদেবের আজ্ঞা আমার নির্ব্বিচার পূর্ব্বকই অনুষ্ঠেয়, ইহাতে আপনার শ্রেয়ঃ আছে, বিশেষতঃ আমারও শ্রেয়ঃ আছে। সুতরাং গুরুদেবের বাক্যে উচিতানুচিতাদি বিচার করা কর্ত্তব্য নহে।" তখন মহাপ্রভু গোবিন্দকে তাঁহার সেবকরূপে অঙ্গীকার করিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং জগদ্‌গুরু হইয়াও লোকশিক্ষা-কল্পে তাঁহার ভক্ত সার্বভৌমের মুখ দিয়া জীবকে এই শিক্ষা দিয়া গেলেন।

অবশ্য সদ্‌গুরুর আদেশই নিঃশ্রেয়ঃপ্রদ বলিয়া নির্ব্বিচারে পালনীয়, কেননা সদ্‌গুরু সদ্‌বস্তু শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা ভিন্ন কৃষ্ণসেবা-বিমুখতার কোন উপদেশ করেন না। কিন্তু তাই বলিয়া উৎপথগামী অসদ্‌গুরুর আদেশ কখনই পালনীয় নহে। বলি শুক্রাচার্য্যের, ভীষ্ম পরশুরামের, প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর ও বিভীষণ রাবণের আদেশ অমান্য করিয়াই শ্রীভগবৎ কৃপা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুদেবের আদেশ পরিপালন ভিন্ন কৃষ্ণতত্ত্বানভিজ্ঞ অথচ গুর্ব্বাভিমানী গুরু-

ক্রুবের আদেশই প্রতিপালনীয় নহে। যেহেতু যাহারা শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বিষয় সমূহকেই বহুমানন করে, তাহারা সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি যে শ্রীবিষ্ণু, তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারে না; অন্ধ যেরূপ অন্ধ কর্ত্তৃক নীত হইয়া গর্ত্তে পতিত হয় মাত্র, পথের অনুসন্ধান জানিতে পায় না, সেইরূপ বিষয় মোহান্ধ গুরুক্রুবগণের আদিষ্ট পন্থানুসরণেও আমাদের কোন মঙ্গল হওয়ার পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই হইবে। বিশেষতঃ শাস্ত্র বলেন—'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ'।—অবৈষ্ণবের যতই না কেন ভাল কথা থাক্, তাহা শ্রেয়ঃকামীর আদৌ শ্রোতব্য নহে।

সুতরাং অসদ্‌গুরুর সর্বপ্রকার অপেক্ষা ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া শত বাধা বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও প্রাণপণে নির্ব্বিচারে নিষ্কপটে সদ্‌গুরুর আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য। গুরুকৃপা-বলেই কৃষ্ণকৃপা লাভ, নতুবা স্বতন্ত্র চেষ্টায় কখনই কৃষ্ণকৃপা লভ্য হইতে পারে না।

কৃষ্ণানুশীলনে আদর্শ

যাঁহারা সাংসারিক অভাব অসুবিধার দোহাই দিয়া কৃষ্ণভজনের সময়াভাব দেখাইতে চান, শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহাদিগের শিক্ষার জন্যই সন্ন্যাস লীলা স্বীকার করিয়া দেখাইলেন, গৃহে জননী ও পত্নীকে দেখিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি না থাকিলেও, খাদ্যাদির কোন সংস্থান না থাকিলেও কৃষ্ণানুসন্ধানের জন্য উধাও হইয়া ছুটা যায়। অনেকে আপত্তি দেখান, "শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ ভগবান্, তিনি যাহা পারেন, তাহা কি আর মানুষে পারে?" তাঁহারা গৌরসুন্দরকে মুখে ভগবান্ বলিলেও তাঁহাদের এরূপ আপত্তিতে বেশ বুঝা যায়, তাঁহারা যেন মনে করেন, "শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর যেন তাঁহাদেরই মত একজন বদ্ধজীব, সংসারে থাকিলে পাছে তাঁহার ভোগপ্রবৃত্তি বাড়িয়া যায়, তাই বুঝি তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইয়াছিল!" মূর্খ লোক বুঝিতে পারে না যে, স্বয়ং ভগবানের আবার সন্ন্যাস লীলা কি জন্য? সাক্ষাৎ কৃষ্ণের আবার কৃষ্ণানুসন্ধান লীলার অর্থ কি?

মানুষ যেন একবার বুঝিয়া দেখে, গৌরসুন্দর মুক্ত বা বদ্ধজীব মাত্র নহেন, সংসারে থাকিয়া তাঁহার কৃষ্ণ অনুসন্ধান করিবার অসুবিধা, সেই জন্যই তাঁহার যে সন্ন্যাসের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা নহে, জীব-শিক্ষার জন্যই ভগবানের সন্ন্যাসবেষ ধারণ। গৌরসুন্দর শিক্ষা দিলেন, "হে জীব, তোমার কোন অসুবিধা নাই, তুমি মুক্ত, নিত্য নিরপেক্ষ, কৃষ্ণানুশীলনই তোমার জীবনের একমাত্র ব্রত। যাহাকে তুমি 'আমার আমার' বলিয়া সংরক্ষণে ব্যস্ত হইতেছ, তাহা তোমার নহে, কেহই তোমাকে কৃষ্ণানুশীলনে বাধা প্রদান করিতে পারে না, তুমি স্বতন্ত্র, কৃষ্ণ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, এস জীব তোমার সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়িয়া আমার পাদপদ্মে ছুটিয়া এস, আমি তোমাদিগকে অভয় প্রদান করিতেছি, দেহ-মনের ধর্ম্ম—সংসার ধর্ম ছাড়িবার জন্য তোমাদের কোন পাপ হইবে না, দেব, ঋষি, পিতৃগণ, আত্মীয় স্বজন, ভূত-সকল এবং অপর মনুষ্য কাহারও ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য তোমাদিগকে চিন্তিত হইতে হইবে না, আমার শরণাগত ব্যক্তির কোন ঋণপাশে বদ্ধ থাকিতে হয় না, আমি তোমাদিগকে সমস্ত ঋণ হইতে মুক্তি প্রদান করিব, নিত্য নবনবায়মান আনন্দ দান করিব। তোমরা আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত হও।" যাঁহারা "শ্রীচৈতন্যদেবের এই শিক্ষা আমার জন্য নহে, মুক্তগণের জন্য, আমাকে সংসারে পচিয়া মরিতেই হইবে" ইহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা বঞ্চিতই হইয়া গেলেন। 'আমি হরিভজনে প্রবৃত্ত হইলে, কে আমার

আত্মবর্গকে খাইতে পরিতে দিবে, কেই বা তাহাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে'—এইসকল দুর্ব্বলা চিন্তাই আমাদের উপর মায়া রাক্ষসীর প্রভাবের পরিচয়। মায়া অনবরতই জীবকে কৃষ্ণবিমুখ হইবার জন্য কুমন্ত্রণা দিতেছে! আমরা একবার ভাবিবার অবসর পাই না, "কৃষ্ণ আমার মত অনন্ত জীবকে ভরণ পোষণ প্রদান করেন, তবে যে মানুষকে অভাবে পীড়িত হইতে দেখা যায়, তাহা কেবল জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ অথবা কৃষ্ণকে স্মরণ করাইয়া দিবার উপায় মাত্র। সৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব আমার উপর অর্পিত হয় নাই, ভগবান্ই একমাত্র কর্ত্তা, নিজের উপর কোন কর্ত্তৃত্ব না রাখিয়া তাঁহার অধীনে থাকিলে সংসারের কোন অভাবে আমাদিগকে প্রপীড়িত হইতে হয় না।" ভগবান্ আমাদিগকে যে রক্ষা করিবেন, এ বিশ্বাস আমাদের কই! কৃষ্ণানুশীলনের আগেই ভয়ে অস্থির হইতেছি, আমার আত্মীয় স্বজন কি খাইবে? জীব-শিক্ষক মহাপ্রভু কি আসিয়াছিলেন, জীবগুলিকে কৃষ্ণ-ভজনে নিযুক্ত করিয়া না খাইতে দিয়া মারার জন্য! না, তাহা নয়। তিনি আসিয়াছিলেন, জীবকে আকণ্ঠ পুরিয়া মহাপ্রসাদ সেবন করাইয়া প্রপঞ্চ জয় করাইবার জন্য। সুতরাং কৃষ্ণ ভজনের পূর্ব্বেই আমাদিগকে ভাবিয়া অস্থির হইতে হইবে না যে, "কৃষ্ণকে ডাকিলে আমাদের কোন সুবিধা হইবে কি না, সংসারে থাকিতে হইবে কি সংসার ত্যাগ করিতে হইবে।" কৃষ্ণভজনকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জানিয়া শাস্ত্রে যে ভজনক্রম লিপিবদ্ধ আছে, তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। কৃষ্ণই আমার ভজনোন্নতি অনুসারে যখন যেভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করেন, আমি তখন সেইভাবেই থাকিব। এখন হইতেই ভাবিয়া চিন্তিয়া মস্তিষ্ক আলোড়িত করিব না। পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াই যদি বালক এম, এ, ক্লাসের পাঠ কেমন করিয়া পড়িবে—এই ভাবনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বালককে নিশ্চয়ই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া মূর্খ হইয়া থাকিতে হইবে। অতএব শাস্ত্রকথিত ক্রমপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমে জীবের শুদ্ধভক্তের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য। সাধুসঙ্গক্রমে কৃষ্ণভজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইলে সদ্গুরু লাভ হইয়া থাকে, সদ্গুরুর নিকট ভজনমুদ্রা লাভ করিয়া সেই ভজনক্রিয়া অনুশীলন করিতে করিতে জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে থাকে। অনর্থ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি, তৎপরে ভাব ও তৎপরে প্রেম। প্রেমলাভই সাধ্যাবস্থা। 'হরিভজন করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে, আত্মীয় স্বজনের মায়া মমতা ত্যাগ করিতে হইবে'—সাধ্যাবস্থা লাভের পূর্ব্বে এরূপ চিন্তা হইতে নিশ্চয়ই হৃদয়দৌর্বল্য আনয়ন করিবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সাধ্যাবস্থাই আমাকে লাভ করিতে হইবে —এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া আমাকে ভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। শেষে কৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। কৃষ্ণ গৃহে রাখেন কি বনে রাখেন, তাহা কৃষ্ণই জানেন, এ চিন্তায় আমার আবশ্যকতা নাই। গুরুপদিষ্ট পন্থায় কৃষ্ণানুশীলন করিতে করিতে একদিন আমাদের এমন অবস্থা আসিয়া পড়িবে, যেদিন আর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে হইবে না, জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না, 'প্রভু আমি এখন কি করিব, তখন কেবল কৃষ্ণ বলিয়া ছুটিতে হইবে, পশ্চাতের কোন কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না, কৃষ্ণের সুমধুর মুরলী-নিনাদে আমার কর্ণ সর্ব্বদা মুখরিত থাকিবে, ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বহির্ম্মুখিনী বৃত্তি অন্তর্ম্মুখিনী হইয়া সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন হইতে থাকিবে। তখন আমাকে আর সঙ্কল্প করিয়া কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে না। তখন আমি জানিব, আমার ভিতর হইতে কে যেন একজন সর্বদা আমাকে অগ্রণী করিতেছে সব ঠেলিয়া ফেলিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে উপস্থিত হইবার জন্য। তখন কেন কৃষ্ণ সেবা করিতে হয়, তাহা আমি জানিনা, কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের, আমার কৃষ্ণের সেবা আমাকেই করিতে হইবে—ইহা ছাড়া আর আমার কোন দ্বিতীয় হেতু থাকিবে না।

সুতরাং জীবের কর্ত্তব্য অনতি বিলম্বে সদ্গুরু পাদপদ্মাশ্রয় এবং গুরুপদেশমত কৃষ্ণানুশীলন। যদি বল, সদ্গুরু কে, কেমন করিয়া জানিব? উত্তর—শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে তোমার নিষ্কপট আর্ত্তি জ্ঞাপন কর, লোক দেখাইয়া নহে, সত্য সত্য তোমার অন্তর সদ্গুরু লাভের জন্য কাঁদিয়া উঠুক, তখন বুঝিবে, গৌরসুন্দর

তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই স্বয়ং প্রকাশ নিত্যানন্দ স্বরূপকে পাঠাইয়াছেন। সত্য সত্য যদি কাহারও হৃদয় ব্যাকুল হয় কৃষ্ণ ভজনের জন্য, তাহা হইলে তাঁহাদের আর গুরুপাদপদ্মলাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। ভগবান্‌কে চাহিলেই ভগবান্ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সদ্‌গুরুর সন্ধান প্রদান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণভক্তি করিতে হইলে আমার সময়াভাব হইবে না, কোন অভাব অভিযোগ আমাকে কৃষ্ণভজনে বাধা দিবে না। গৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-লীলাই প্রত্যেক জীবের কৃষ্ণানুশীলনের একমাত্র আদর্শ হওয়া আবশ্যক। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে পড়িয়া গৌরসুন্দরের আদর্শকে হীন জ্ঞান করা কথনই কর্ত্তব্য নহে। যে জিনিষটি আমার পক্ষে বর্ত্তমানে অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, সেই জিনিষটিই কালে আমার পক্ষে অত্যন্ত সম্ভব হইয়া পড়িবে। সুতরাং—

ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥

—অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের এই উপদেশ স্মরণ করিয়া জীবমাত্রেরই কৃষ্ণানুশীলনে রত হওয়া আবশ্যক।

—:০:—

দুর্ব্বলের চিন্তা

আমি অনুক্ষণ 'হা কৃষ্ণ', 'হা গৌর' ও 'হা নিতাই' প্রভৃতি বলিয়া ভগবচ্চরণে আমার গভীর আর্ত্তির পরিচয় দিতে চাই এবং কোন কোন সময় হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া লোকের চক্ষে একজন ভক্ত বলিয়াও পরিচিত হইবার ইচ্ছা করি বটে, কিন্তু তাহাতে আর সুবিধা আমার কি হইল ? লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিলেই ত' আর ভগবানকে ফাঁকি দিতে পারিব না ? বরং অপরকে বঞ্চনা করিতে যাইয়া নিজেই বঞ্চিত হইব। কপটতাশূন্য হইয়া সরলভাবে শ্রীশ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে আমার সাধ্যমত যাহা কিছু সেবা করি না কেন, তাহা অতি ক্ষুদ্র হইলেও গুরুদেব তাহা গ্রহণ করেন এবং ক্রমশঃ উৎসাহ প্রদান করেন যাহাতে আমার সেবা যোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পায়। গুরুদেবের এই উৎসাহ প্রদানকে যদি আমি আবার মনে করি, গুরুদেব আমাকে ফাঁকি দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছেন, তাহাতে গুরুদেবে সামান্য মনুষ্য বুদ্ধিরূপ অপরাধ হেতু আমার উন্নতির পথ চিরতরে রুদ্ধ হইবে। গুরুদেব যাহা আমাকে আদেশ করেন, তাহা আমার মঙ্গলের জন্যই—তাঁহার মনোঽভীষ্ট পূরণ চেষ্টা করিলে আমি বর্ত্তমানে যে সেবা আমার পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছি, পরিণামে তাহাই খুব সম্ভব হইয়া আমাকে অদম্য উৎসাহ প্রদান করিবে। অতএব গুরুদেবের আদেশ পালনে আমি যেন কখনও পরাঙ্মুখ না হই, বৈষ্ণবগণ এই কৃপা আমাকে করুন। "গুরুদেব যে সেবা ভার আমাকে দিয়াছেন, তাহা কি আমি বহন করিতে পারিব ?"—এইরূপ দুর্বলতাকে মনে স্থান না দিয়া সেবায় প্রবৃত্ত হইলে বলদেব আমাকে অমিত বল প্রদান করিবেন—বলদেবের চিহ্নল প্রাপ্ত হইলে আমি না করিতে পারিব, এমন কার্য্য নাই। অর্জ্জুন যখন শরাসন ফেলিয়া 'কৃষ্ণ আমি আর যুদ্ধ করিব না' বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করেন, ভগবান্ তখন তাহাকে বলিয়াছিলেন—

"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, হৃদয়দৌর্ব্বল্য একটি প্রধান অনর্থ, এই অনর্থ ত্যাগ করিয়া তুমি আমার আদেশ পালনে কৃতসঙ্কল্প হও, আমি তোমাকে যথেষ্ট বল প্রদান করিব।

গুরুদেবের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবুদ্ধিতে অবস্থিত হইলে কামক্রোধাদি রিপুষট্‌ক আমার নিকট কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না। আমি যতই না কেন, গুরুকৃষ্ণভক্ত বলিয়া বড়াই করি, যতক্ষণ না

'কৃষ্ণরক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ' কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেব আমাকে রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস আমার হয়, ততক্ষণ আমার ভজন সাধন চেষ্টা সকলই বৃথা। ঐ বিশ্বাসরূপ শরণাগতির অভাবই আমার হৃদ্দৌর্ব্বল্যের স্রষ্টা। হে ধামবাসি, আমাকে তোমরা এই কৃপা কর, আমি যেন গুরুদেবকে আমার পরম মঙ্গলাকাঙ্খী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি—আমার জন্য তাঁহার মঙ্গল চেষ্টায় তাঁহাকে যেন আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ না হয়। তোমাদের কৃপা ভিন্ন আমি গুরুদেব নিত্যানন্দের কৃপা পাইব না—নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত গৌরসুন্দরের কৃপা পাইব না। অতএব তোমাদের কৃপাই আমার গুরু কৃপা লাভের একমাত্র উপায়।

"দরিদ্র-নারায়ণের সেবা"

এই কথাটি আজকাল বাজারে যেন হরদম চলিতেছে। শতকরা ৯৯ জন লোক আজ এই কথাটি বিনা বিচারে বলিয়া আসিতেছে। এইরূপ বলায় যে তাহারা কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া থাকেন তাহা সুধী পাঠকগণ একটু বিচার করুন। নারায়ণ সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। দরিদ্র, যিনি অভাবগ্রস্ত। সুতরাং নারায়ণ ও দরিদ্র দুইটি বিপরীত শব্দ। এইরূপ দুইটি বিপরীত শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণরূপে কখনও ব্যবহৃত হয় না। কোন বৈয়াকরণিক, নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক কি কোন দার্শনিক পণ্ডিত কখনও এইরূপ কথা বলিতে পারেন না। সোনার পাথরের বাটী বলিলে যেরূপ কথাটি অমূলক হয় ইহাও তদ্রূপ। নারায়ণ কখনও দরিদ্র নহে, দরিদ্র কখনও নারায়ণ হয় না। জীবেরই দরিদ্র হইবার সম্ভাবনা। যখন জীব ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্‌কে ভুলিয়া দূরে অবস্থান করে, তখনই তাহার দরিদ্রতার সূচনা আরম্ভ হয়, এইরূপ ভাবে সংসার পরিভ্রমণকারী জীববৃন্দ অনাদিকাল হইতেই দারিদ্র লাভ করিয়াছে। নারায়ণ সেব্য বটে, কিন্তু যদি নারায়ণ দরিদ্র হয় তবে উহা জীবের সেব্য নহে, উহা নারায়ণ হইতে পৃথক বস্তু জানিতে হইবে। এই সংসারে যাহাদের দারিদ্র দেখিতেছি, উহারা সেই কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীব, কৃষ্ণ সেবা বিমুখ হওয়ায় জীবের ঐরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে। কৃষ্ণ সর্ব্বধনের মালিক। তাঁহার সন্তান কখনও দরিদ্র হওয়া উচিত নহে। পিতা ধনী হইলেও পুত্র যদি দুশ্চরিত্র হয় তাহার ফলে পিতার আনুগত্য ত্যাগ করে, ফলে যেমন পুত্র পিতার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারে না সেইরূপ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবও দরিদ্রতারূপ অভাবকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে। উহারা চিরদিন যে এই দরিদ্রতা ভোগ করিবে তাহাও নহে। তবে দরিদ্রতা মোচন করিবে কে? দারিদ্র যাহার মোচন হইয়াছে তিনিই তো জীবের দরিদ্রতা মোচন করিতে সক্ষম, দরিদ্র ব্যক্তি কখনও দরিদ্রের অভাব মোচন করিতে পারে না। কৃষ্ণরূপ ধন হারাইয়া যখন জীব দরিদ্র হইয়াছে, তখন কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা গুরু ব্যতীত জীবের দরিদ্রতা মোচন করিতে আর সক্ষম হইবে কে? অন্ধ ব্যক্তি যেমন অন্ধের চক্ষের অভাব দূর করিতে পারে না, তদ্রূপ একমাত্র কৃষ্ণ প্রেমধনে ধনী বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেহই জীবের দরিদ্রতা মোচন করিতে পারে না। কিন্তু আজকাল দেখিতেছি ইহার বিপরীত কতকগুলি প্রতিষ্ঠাশালী লোক এইরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। তাহারা জীবকে ভগবানের সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া ভগবানের চরণে নিত্যকালের জন্য অপরাধী হইতেছেন। তাহারা জীবের উপকার করিতে গিয়া বরং অপকারই করিয়া বসিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবে দয়া সম্বন্ধে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহা আমাদের স্মরণ করা উচিৎ, তিনি বলিলেন—

> ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্যজন্ম যার।
> জন্ম সার্থক কর করি পর উপকার॥

পর উপকার শব্দে শ্রেষ্ঠ উপকার, সে উপকার করিলে জীবের আর কোন অভাব থাকে না। সমস্ত অভাবের মূল যে অবিদ্যা, তাহার হাত হইতে মোচন করাই প্রকৃত জীবে দয়া। এইরূপ দয়া গৌরভক্তগণ ব্যতীত আর কেহ করিতে পারে না। কিন্তু আজকাল যে বহুবিধ সেবাশ্রম দরিদ্র ভাণ্ডার প্রভৃতি সঙ্ঘ দেখিতেছি তাহারা কি তবে জীবে দয়া করেন না? তাহারা দয়া করেন বটে কিন্তু তাহা জীবের অনিত্য দেহের প্রতি দয়া করা হয় বলিয়া উহার ফল অনিত্য। জীবের বহুবিধ অভাব আছে, শুধু টাকা নয় যে কিছু টাকা হইলেই তাহার অভাব দূর হইবেই। যিনি অন্ধ তাহার চক্ষুর অভাব কে মোচন করিতে পারে? পঙ্গুর পায়ের অভাব কে মোচন করিতে পারে? তাই দেখিতে গেলে জীবের দৈহিক সুবিধা ও আমরা সর্ব্ব বিষয় করিতে পারি না। কিন্তু বৈষ্ণবগণের দয়া ঐরূপ নহে। তাহাদের দয়ায় জীব নিত্যকালের জন্য সমস্ত অভাব হইতে মুক্ত হন। তাহাদের আর ত্রিতাপ ভোগ করিতে হয় না। তাহারা আজ বালক, কাল বৃদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়ের অভাব অনুভব করেন না। কখনও জ্ঞানী কখনও মূর্খ নহে। এইরূপ জাগতিক পরিবর্ত্তনতার মধ্যে আর তাহারা অবস্থান করে না। তাহারা নিত্যকালের জন্য স্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক ভগবানের সেবা করিয়া নিত্যানন্দ লাভের অধিকারী হন, তখন আর অভাব ব'লে কোন জিনিষ তাহারা জানে না। সুতরাং জীবের মঙ্গল করিতে হইলে একমাত্র কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন চাই, এতদ্ব্যতীত অন্য পথ নাই।

———

গুরুত্ব

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জগজ্জীবের কৃষ্ণবিমুখত্ব রূপ লঘুত্ব অপসারিত করিয়া কৃষ্ণোন্মুখরূপ গুরুত্ব প্রদানের জন্যই জগতে 'গুরু' রূপে অবতীর্ণ। গুরুদেব স্বয়ং কৃষ্ণসেবা করিয়া কেমন করিয়া কৃষ্ণকে সেবা করিতে হয়, জীবকে তাহা শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। তিনি জীবশিক্ষা লীলায় নিজে অভিমান করিতেছেন না—'আমি জগতের গুরু', কিন্তু 'আমি গোপীনাথ কৃষ্ণচন্দ্রের দাসানুদাস'—ইহাই তাঁহার অভিমান। গুরুদেব বলিতেছেন, অতি নগণ্য ক্ষুদ্র কীট হইতেও আমি লঘিষ্ঠ, কেননা সেই কীটও কার্ষ্ণ বস্তু। কার্ষ্ণের উপর আমার কোন প্রভুত্ব থাকিতে পারে না, কৃষ্ণই কার্ষ্ণের একমাত্র প্রভু, আমি কার্ষ্ণকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত দেখিয়াই আনন্দ লাভ করিতে পারি মাত্র, সুতরাং আমি কার্ষ্ণেরও অনুদাস। গুরুদেব এইরূপ আদর্শ দ্বারা জীবমাত্রকেই কৃষ্ণভজন করিতে ও অপরকে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত করা রূপ গুরুত্ব লাভের উপদেশ করিতেছেন। তবে গুরুদেবের জীব-প্রতি ইহাই শিক্ষা যে, শ্রীভগবদাজ্ঞায় ভগবৎ প্রীত্যর্থেই ভগবৎসেবা কর ও অন্যকে ভগবৎসেবায় প্রবৃত্ত কর। জীব মাত্রই কৃষ্ণাধীন থাকিয়া এরূপ গুরুত্ব লাভ করুন, তাহাতে কোন বিষয়-তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিবে না। জগদ্‌গুরু-লীলাভিনয়কারী স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দরও কূর্ম্মস্থানে কূর্ম্ম নামক বিপ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া জীবকে এইরূপ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥ কভু না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ। পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ॥"

আবার যখন ঐ কূর্ম্মস্থানের কুষ্ঠরোগীর লীলাভিনয়কারী বাসুদেব বিপ্রকে আলিঙ্গন করিয়া মহাপ্রভু বিপ্রের কুষ্ঠ-মোচন করিলে বিপ্র দৈন্য করিয়া কহিলেন—

"মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন-মোরে স্পর্শ' তুমি—স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হঞা।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥"

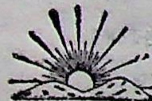
তখন মহাপ্রভু বিপ্রকে কহিলেন—

"শুন বিপ্র, কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম ॥
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥"

অন্যত্র প্রেমফলোদ্যানের মালী সাজিয়া মহাপ্রভু জীবকে বলিতেছেন—

"একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম ॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল কি আর করিব ॥
* * অতএব সব ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে ॥"

মহাপ্রভু নিজেই সর্ব্বজীবকে প্রেম ফল প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াও স্নেহ-পরবশ হইয়া প্রত্যেক জীবকে প্রেমফল আস্বাদন ও বিতরণের অধিকার প্রদান করিতেছেন। বলিতেছেন, তোমরা প্রেমিক হইয়া প্রেম বিতরণ কর, ইহাতেই আমার প্রীতি। যে সকল অর্বাচীন ব্যক্তি মহাপ্রভুর এই আদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তাহারা উৎকট গৌর-ভক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া মনে করে "আমি সর্বোত্তম বৈষ্ণব, অন্যকে কৃষ্ণভজনোপদেশ করিলে আমার গর্বরূপ ভজন নষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং আমি প্রচাররূপ গুরুর কার্য্য ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন ভজন করিব।" ইহাতে নিজেকে বৈষ্ণবাভিমান করিতে গিয়া গৌরাজ্ঞালঙ্ঘনরূপ মহা অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হয়। উৎকট ভক্তাভিমান ত্যাগ করিয়া দৈন্যের সহিত শুদ্ধ নামগ্রহণাচার ও শুদ্ধনামপ্রচার রূপ আচার্য্যের কার্য্যদ্বারা জড় প্রতিষ্ঠারূপ বিষয়তরঙ্গ প্রবল হইতে পারে না। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতি পার্ষদ মহাত্মগণের গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশ প্রদান এবং শ্রীমন্নরোত্তম, শ্রীল মধ্ব, রামানুজাদির বহু শিষ্য-করণকে ভক্ত্যঙ্গের বাধক ও বিষয়-তরঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিয়া অনেক নির্বোধলোক প্রকৃত অকিঞ্চন ভক্তগণের চরণে অপরাধী হন। তাঁহারা প্রভুর এই আদেশ সবিশেষ আলোচনা করিয়া নিজের ক্ষুদ্র গর্ব-পূর্ণ দীনাভিমান পরিত্যাগপূর্বক হরিবিমুখজনের প্রতি প্রতিশোধ না দেখাইতে গিয়া গৌরানুগত্য পূর্বক যাহাতে নিজভজন বৃদ্ধি করেন, তজ্জন্য জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের ইহাই শিক্ষা-প্রদান। এই শিক্ষানুসারে যাঁহারা আচার ও প্রচার কার্য্যে রত থাকেন, তাঁহারাই জগদ্গুরু—জগতের আর্য্য। নতুবা মহাপ্রভুর এই আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা গুরুগিরি করিতে চাহেন, অথবা দৈন্য দেখাইতে গিয়া প্রচার-কার্য্য হইতে বিরত থাকেন, তাঁহারা জগতের উপকার করিবার পরিবর্ত্তে জগতে অনর্থই আনয়ন করিয়া থাকেন। এতাদৃশ গুরুব্রুবের সংখ্যাই জগতে বড় বেশী হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা মহা-ভাগবতের আচরণগুলি অনুকরণ করিতে গিয়া নিজেকে 'বড় বিদ্বান, বড় বুদ্ধিমান, বড় পণ্ডিত, বড় সাধু' বলিয়া প্রকট করিয়া লোককে বিপথে লইয়া চলিতেছে। বুদ্ধিমান জনগণ এ সকল গুরুর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামত আচার ও প্রচার-পরায়ণ সদ্-গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব লঘুত্ব অপনোদন পূর্বক মানবজীবনের কৃষ্ণদাস্যরূপ গুরুত্ব লাভ করুন, তাহা হইলেই জগতে নিত্যমঙ্গল বিরাজ করিবে।



নৈষ্কর্ম্ম্য

যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। সেই কর্ম্মের সাধারণতঃ ত্রিবিধ বিচার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—বিকর্ম্ম, অকর্ম্ম ও কর্ম্ম। পাপ কর্ম্মকেই বিকর্ম্ম বলা হয়। বিকর্ম্ম দ্বারা নিজের, সমাজের ও জগতের অমঙ্গল হইয়া থাকে। কর্ম্ম শব্দে শুভ কর্ম্মই নির্দ্দিষ্ট হয়; এতদ্দ্বারা নিজের, সমাজের ও জগতের মঙ্গল সাধিত হয় এবং পারত্রিক স্বর্গসুখাদি লাভ হইয়া থাকে। পাপ কর্ম্ম এবং শুভকর্ম্ম উভয়বিধ কর্ম্মের অকরণই অকর্ম্ম নামে অভিহিত। বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম ত্যাজ্য এবং কর্ম্মই কৃত্য।

সেই কর্ম্ম আবার ত্রিবিধ, যথা—কাম্য, নৈমিত্তিক ও নিত্য। কামনা পূর্ব্বক যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহাকেই কাম্য কর্ম্ম কহে, যেমন—সন্তানলাভার্থে ষষ্ঠীপূজা, ধন প্রাপ্তির আশায় লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদি। নিমিত্ত হইতে জাত কর্ম্মকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলে, যেমন—অনাবৃষ্টিরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম বিধি। যজ্ঞাদির দ্বারা পুণ্য অর্জ্জিত হয় এবং সেই পুণ্যফলে পরিমিত বৃষ্টি ও শস্যাদি পরিপূর্ণভাবে উৎপন্ন হয়; তাহার ফলে জগতে দুর্ভিক্ষাদি হইতে পারে না। সন্ধ্যা, আহ্নিকাদি নিত্য-কর্ম্ম পর্য্যায়ভুক্ত। এই ত্রিবিধ কর্ম্মই কামনামূলক হইলেও তন্মধ্যে কাম্যকর্ম অধম বিধায়, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীস্থ নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের আবাহন শাস্ত্রের অনুজ্ঞা।

বিশৃঙ্খল বিকর্ম ও অকর্মকারী ভোগিগণকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত কাম্যকর্ম্মের উপদেশ এবং কাম্যকর্ম্মে অভ্যস্তজনগণকে কাম্যকর্ম্মগুলি ত্যাগ করত তদুচ্চ নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে নিযুক্ত করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"নেহ যৎকর্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদ সেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

অর্থাৎ ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম ধর্মের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত না হয়, সেই ধর্ম যাহার বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার যাহার সেই বৈরাগ্য তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতে পর্য্যবসিত না হয়, সেই ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার জীবন ধারণ বৃথা।

নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম ধর্ম অর্থাৎ পুণ্যের নিমিত্ত কৃত হয়। সেই পুণ্য নশ্বর বিধায়, ঐ কর্মদ্বয় হইতেও পরিশেষে বৈরাগ্য অর্থাৎ বিরতি কর্ত্তব্য বলিতেছেন। বিরত-কর্ম্ম পুরুষকে আবার তীর্থপদের সেবাকর্ম অর্থাৎ শ্রীভগবানে ভক্তি করিবার উপদেশ। এক কর্ম হইতে বিরত হইয়া পুনরায় শ্রীভগবানের সেবারূপ অন্য কর্মের উপদেশ কেন? শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে দৃষ্ট হয়—

"বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া সৈব ভক্তিঃ"

অর্থাৎ শাস্ত্রে শ্রীহরিকে উদ্দেশ করিয়া যে কর্মের আদেশ রহিয়াছে, তাহা কর্ম শব্দ বাচ্য নহে, তাহা ভক্তি নামে অভিহিত। শ্রীহরির প্রীত্যর্থে যে কর্ম কৃত হয়, তাহার ফল-ভোক্তা শ্রীহরি স্বয়ং, কর্মকারী নহে। এইরূপ কর্ম্ম, কর্মকারীকে কোনরূপে কর্ম্মফলরূপ রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিতে অসমর্থ। সুতরাং শ্রীভগবৎ সেবারূপ কর্ম অর্থাৎ ভক্তিই প্রকৃত নিষ্কর্ম নামে অভিহিত, নিষ্কর্মের ভাবকেই নৈষ্কর্ম্য কহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ।"

অর্থাৎ জীবগণ যাহাতে ক্রমে ক্রমে নৈষ্কর্ম্ম্যকে বরণ করিয়া সর্ব্বার্থ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তজ্জন্যই কর্ম-বিধানে নানারূপ ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে। নৈষ্কর্ম্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য যিনি এইরূপ ক্রম ক্রমে অবগত না হইয়া বিশৃঙ্খল ধারণা হৃদয়ে পোষণ করেন, তিনি কখনই নৈষ্কর্ম্য লাভে সমর্থ হন না।

জীবের স্বরূপ জ্ঞান প্রস্ফুটিত না হইলে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধ হইতে পারে না। পঞ্চভূতাত্মক নশ্বর স্থূলদেহে আত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন কর্ম্মিগণ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্মগুলিকে নিষ্কামভাবে করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া যে ধারণা পোষণ করেন, তদ্দ্বারা জীবের কর্ম-বন্ধন নষ্ট হয় না, সুতরাং তাহা নৈষ্কর্ম্য পদবাচ্য নহে। যে সমস্ত কর্ম্ম কামনা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহারা কামনাশূন্যভাবে কৃত হইলেও

ফলদানই তাহাদের স্বভাব ; যেমন—অগ্নিতে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হস্ত প্রদান করিলে অগ্নি তাহার স্বধর্ম হইতে কখনই বিরত হয় না, তদ্রূপ। সুতরাং কাম্যকর্মগুলি কামনা-শূন্যভাবে কৃত হইলেও কর্ম্মবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইতে পারে না। তবে ফলাকাঙ্ক্ষী কাম্যকর্ম-কারিগণের হৃদয় অপেক্ষা, যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা রহিতরূপ বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয় যে কিঞ্চিৎ উচ্চ একথা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিতে যে ভুল আছে, তাহা সংশোধন করা উচিৎ—হৃদয় কামনা শূন্য হইলে কাম্য কর্ম্মগুলির সংসর্গ কৃত্য বহির্ভূত হইয়া থাকে এবং শ্রীভগবৎ সেবারূপ ভক্তিই তখন তাহার কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ করিলে তিনি প্রকৃত নৈষ্কর্ম্য লাভ করিয়া কর্মফলবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন, নচেৎ নহে।

মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক অনিত্য সূক্ষ্মদেহে আবদ্ধ বুদ্ধি মুমুক্ষু জনগণ শ্রীগীতোক্ত মিথ্যাচারীর ভাব ত্যাগ করিয়াও যে কর্মসন্ন্যাস বা কর্ম্মত্যাগ করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারাও তাহাদের যথার্থ স্বরূপজ্ঞানের অভাবে তাহারা প্রকৃত নৈষ্কর্ম্য লাভে সমর্থ হন না। নৈষ্কর্ম্য নিত্য শ্রীভগবানের সেবা সম্বন্ধীয় ব্যাপার বলিয়া নিত্য বস্তু, তাহা লাভ হইলে কখনই বিচ্যুতি ঘটিতে পারে না। অনিত্য স্থূল ও সূক্ষ্মদেহদ্বয়ে আত্মবুদ্ধিযুক্ত জনগণ সেই নিত্য নৈষ্কর্ম্যের সন্ধান পাইতে পারেন না কারণ অনিত্য বস্তু দ্বারা নিত্য বস্তু কখনও প্রাপ্তব্য নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্ত-
ভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃপতন্ত্যধো-
ঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

অর্থাৎ দেবগণ কহিলেন, হে পদ্মলোচন হরি নৈষ্কর্ম্যাশ্রয়ী আপনার ভক্ত ব্যতীত, অন্যে যাহারা নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে ; আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা কৃচ্ছ্র সাধন-ফলে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মসন্ন্যাস-যুক্ত মুক্তিপদ লাভ করিয়াও আপনার সেবারূপ নৈষ্কর্ম্যকে অনাদর করা হেতু অধঃপতিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত অন্যত্র বলিয়াছেন—

নৈষ্কর্ম্যমপি অচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে

অর্থাৎ শ্রীভগবদুদ্দেশে কৃত হইলেই, তাহাকে নৈষ্কর্ম্য কহে, শ্রীভগবদ্ভাববর্জ্জিত হইলে তাহা নৈষ্কর্ম্য পদবাচ্য হইতে পারে না। অতএব ভক্তিই নৈষ্কর্ম্য, সেই নৈষ্কর্ম্যই সর্ব্বোচ্চ এবং তাহাই পরম কৃত্য, আত্মধর্ম্মানুশীলনকারী শুদ্ধভক্তগণই একমাত্র সেই নৈষ্কর্ম্যের অধিকারী। পঞ্চ-ভূতাত্মক নশ্বর স্থূল দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন বুভুক্ষু অন্যাভিলাষী ও কর্ম্মী এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহে আবদ্ধ-বুদ্ধি মুমুক্ষু জ্ঞানী নৈষ্কর্ম্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য হইতে বিচ্যুত। অতএব হে ভ্রাতৃবৃন্দ, প্রকৃত নৈষ্কর্ম্যকে আশ্রয় পূর্ব্বক সুদুর্ল্লভ মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদন কর।

—::—::—

সম্প্রদায়-প্রণালী

কতকগুলি লোক আছে, তাহারা সম্প্রদায় শব্দ শুনিবামাত্র চটিয়া উঠে। তাহারা বলিয়া থাকে যে, সম্প্রদায়-বিভাগ দ্বারা মতভেদ ও মতভেদদ্বারা ধর্ম-বিবাদ সমাজকে নষ্ট করে। তাহারা মনে করে যে সমাজের মধ্যে তাহারাই পণ্ডিত আর সকলেই নির্ব্বোধ। বস্তুতঃ তাহাদের অপেক্ষা অনেক বুদ্ধিশীল, চিন্তাশীল ও পণ্ডিত লোক সম্প্রদায় স্বীকার পূর্বক ধর্মালোচনা করিয়া থাকেন। সম্প্রদায়ের বিরোধিগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটী মত লইয়া আপনাদিগকে অসম্প্রদায়ী মনে করে। ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাহারা একটী নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে।

গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে অসম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণকে স্থূলবুদ্ধি বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণকে সম্প্রদায়গত কোন কোন সঙ্কীর্ণ মতও মানিতে হয় এবং কখন কখন স্বাধীনতার অভাবে কুফল ফলিয়া থাকে। কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে সম্প্রদায়-প্রণালীতে দোষ অপেক্ষা অনেক অধিক গুণ আছে। যাহাতে অধিকাংশগুণ তাহাতে কিছু কিছু দোষ থাকিলেও তাহা পণ্ডিতের পক্ষে আদরের বস্তু। জগতে কি এমত আছে যাহা নির্দ্দোষ? তবে কি জগতে অবস্থিতি করা পণ্ডিতের পক্ষে দূষণীয়? সুখ ও পুণ্যের সহিত যে সংসার করা যায়, তাহা কি নির্দ্দোষ? জীবের বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্মসংসারে অবস্থান ব্যতীত আর উপায় কি? পরমার্থ আলোচনা করিবার সদুপায় কি, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। সংসারে চিত্তনিবেশ করা অনায়াসে সম্ভব, ঈশ্বরে চিত্তনিবেশ করা অনেকের পক্ষে কঠিন। সংসারে অবস্থিত হইয়া আমরা জীবনযাত্রা সদুপায়ে নির্ব্বাহ করিতে করিতে একান্ত মনে পরমেশ্বরকে আরাধনা করিব এরূপ সংকল্প করিয়া যাহারা দণ্ডায়মান হন, তাঁহারা সেই উদ্দেশ্যে একটী সম্প্রদায় স্থির করেন। সম্প্রদায়ও জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সরল বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করত তাহা সকলের নিকট স্বীকার করেন। অসরল অদূরদর্শী বিতর্ক-প্রিয় ব্যক্তিগণ স্বরূপতঃ সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়া ও লোকের নিকট আপনাদিগকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তদ্দারা তাঁহারা কেবল আত্মবঞ্চনারূপ মন্দ ফল লাভ করিতেছেন।

ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলেই জানা যাইবে যে, এই পবিত্র ভারতক্ষেত্রে কখনই সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ মত ছিল না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সহিত যে পর্য্যন্ত ভারতের সংস্রব হইয়াছে, সেই অবধিই কোন কোন লোক সম্প্রদায়-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। পাশ্চাত্য ভূমিতে ধর্ম্ম তদ্দেশোপযোগী আকৃতি সহকারে বিচরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু কেহ কেহ সেই ধর্ম্মের প্রতি অনাদর করত সেই ধর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে সম্প্রদায় প্রণালীর নিন্দা করিয়াছেন। অস্মদ্দেশীয় সংকীর্ণ বুদ্ধি কয়েকজন লোক তাঁহাদের অনুগত হইয়া সম্প্রদায় নিন্দা পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের সহিত কথোপকথন, তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ ও পুস্তিকা পাঠ করিয়া অল্প বয়স হইতেই অনেকের মনে একটী এমত কুসংস্কার হয় যে, তাঁহারা সম্প্রদায় শব্দটী শুনিয়া মাত্র জ্বলিয়া উঠেন। নিজের কুসংস্কারের মূল কখনই অনুসন্ধান করেন না। যাঁহারা এরূপ সম্প্রদায় বিরোধী তাঁহাদিগের নিকট আমরা কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক অনুরোধ করি যে, একবার নিরপেক্ষ হইয়া এ বিষয়ে বিচার করিয়া দেখুন।

আমরা এ বিষয়ে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, সম্প্রদায়-প্রণালী জীবের পক্ষে নিতান্ত হিতকর। যদি কেহ পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া প্রেমফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বিশুদ্ধ ভজন-সম্প্রদায়ে অবিলম্বে প্রবেশ করুন। সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে সাধু-পদাশ্রয়, সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা, ধর্ম্মালোচনা এবং ক্রম বৈরাগ্য অনায়াসেই লাভ হইবে। যতদিন অসম্প্রদায়-বুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন জীবনান্ত তর্ক বিতর্ক করিয়াও আত্মপ্রসাদ পাইতে পারিবেন না। সম্প্রদায়স্থ কোন কোন ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া কদাচার করেন দেখিয়া সম্প্রদায় প্রণালীকে নিন্দা করা অসার লোকের কার্য্য। সম্প্রদায়ে প্রবেশ পূর্ব্বক সম্প্রদায়কে পবিত্র করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বাজারে ভাল দ্রব্য সর্ব্বদা পাওয়া যায় না এবং অনেক প্রকার কৃত্রিমতা চলিতেছে দেখিয়া বাজার সংস্কার করাই বিধেয়; কিন্তু ঐ সকল কারণের জন্য বাজার প্রণালী উঠাইয়া দিবার যিনি চেষ্টা করেন তাঁহার বুদ্ধিকে কোন প্রকারে প্রশংসা করিতে পারি না। সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্যগণ জগন্মঙ্গল বিধান করিবার জন্যই সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আধুনিক কাপুরুষদিগের প্রযত্নে যদি সম্প্রদায় দূরীভূত হয়, তাহা হইলে আর মঙ্গল কোথায়? কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, স্বার্থপরতার দ্বারা

চালিত হইয়া প্রথমাচার্য্যগণ সম্প্রদায় স্থির করেন। একথা নিতান্ত অনাদরণীয়। স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি ও অর্থ প্রাপ্তির জন্য কি পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে সম্প্রদায়-মূল পত্তন করিয়াছিলেন? যাঁহারা নির্জ্জন কুটীরে ফলমূল সেবন করিয়া জীবের মঙ্গল বিধানের জন্য স্বীয় পবিত্র সিদ্ধান্ত সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বার্থ কোথায়? অনেকেই নিজ নামও গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করেন নাই। যশাকাঙ্ক্ষাও যে তাঁহাদের হৃদয়ে ছিল না এরূপ প্রতীতি হয়। অতএব পাশ্চাত্যদেশীয় সংকীর্ণপ্রজ্ঞ পুরুষদিগের কথায় আমরা সম্প্রদায় প্রণালীকে অনাদর করিতে পারি না। বাগাড়ম্বর ও পাণ্ডিত্য ইহারা পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের বাগাড়ম্বরে তত পাণ্ডিত্য নাই। ভারতক্ষেত্রের গ্রন্থকারদিগের বাগাড়ম্বর অল্প; কিন্তু সারবত্তা অধিক। অল্পবয়স্ক যুবকগণ স্বভাবতঃ পাণ্ডিত্য অপেক্ষা বাগাড়ম্বরের পক্ষপাতী। যখন তাহারা ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন পূর্ব্বপ্রাপ্ত কুসংস্কার তাহাদিগকে, আর ছাড়িতে চাহে না। এবার সম্প্রদায় প্রণালী সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত।

সাধুসঙ্গ

বহু জন্মের সুকৃতি ফলে যখন জীবের কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করা কর্ত্তব্য—এই সদ্‌বুদ্ধির উদয় হয়, তখন তাঁহার সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। কেননা সাধুসঙ্গ ব্যতীত তাঁহার অভীষ্ট কিছুতেই সিদ্ধ হইবার নহে। সাধুসঙ্গই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের একমাত্র উপায় স্বরূপ। এই সাধুসঙ্গ ব্যাপারটি বড়ই গুরুতর। সাধুসঙ্গের উপরই জীবের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। জীবের ভাগ্য ক্রমে যদি শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ ঘটিয়া যায়, তাহা হইলেই নিস্তার, নতুবা সাধুর বেশধারী ভণ্ডসঙ্গ জুটিয়া পড়িলেই সর্ব্বনাশ। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃই জীবের দুঃসঙ্গ ঘটিয়া থাকে। "আমাকে কৃষ্ণভজনই করিতে হইবে, কৃষ্ণ-ভজন ভিন্ন আমার আর অন্য কার্য্য নাই, হে কৃষ্ণ আমাকে কৃপা করিয়া তোমার নিজজনের শ্রীচরণাশ্রয় প্রদান কর—এইরূপ নিষ্কপট আর্ত্তি ভিন্ন কখনও ভগবৎকৃপা লাভ হয় না। ঐরূপ আর্ত্তি সহকারে ভগবৎকৃপা ভিক্ষা করিতে করিতেই ভগবান্ তাঁহার নিজজনকে আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। এইরূপ আর্ত্তি ব্যতীত যাহারা ব্যবহার রক্ষা করিবার ও ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠামাত্র লইবার অথবা কনক কামিনী লাভের সুবিধার জন্য সাধুসঙ্গ করিতে যায়, তাহারা তাহাদের সমশীল ব্যক্তিকেই সাধুরূপে প্রাপ্ত হয়। সেই সাধুরা তাহাদের ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া তাহাদিগকে ধ্বংসের পথেই লইয়া চলে। এইরূপ কপট সাধুগণের হস্ত হইতে প্রকৃত কৃষ্ণভজন প্রয়াসী জনগণকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী প্রভু তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে সাধনভক্তি লহরীতে সাধুসঙ্গ ও ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন-বিধি-নির্দ্দেশক এই শ্লোকটির অবতারণা করিয়াছেন—"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে। শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥" —একই জাতীয় বাসনা দ্বারা স্নিগ্ধ অর্থাৎ গাঢ় বিশ্রম্ভাত্মক স্নেহপর অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। সেইরূপ রসিক সাধুগনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদ করিবে।

দেওয়া নেওয়া, গুহ্য কথা বলা, গুহ্য কথা শ্রবণ করা এবং খাওয়া ও খাওয়ান—এই ছয় প্রকারে 'সঙ্গ' হইয়া থাকে। সজাতীয় অর্থাৎ সমজাতীয় বাসনা-বিশিষ্ট লোকের সহিতই তজ্জাতীয় লোকের এই সঙ্গ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বিজাতীয়ের সহিত সজাতীয়ের মিলন কখনও সম্ভব হইতে পারে না। যাঁহার উদ্দেশ্য—কৃষ্ণভজন, তিনি কখনও জনৈক ব্যবহারজীবীর সঙ্গ করিয়া লাভবান হইতে পারেন না। অবশ্য সেই ব্যবহারজীবীর নিকট হইতে

যদি কিছু ভজনানুকূল্য লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আলাপ ব্যবহার করা যাইতে পারে, নতুবা ভজন-প্রাতিকূল্যের সম্ভাবনা থাকিলে তাদৃশ আলাপাদি বন্ধ করাই শ্রেয়ঃ। তবে কাহারও সহিত কোন আলাপ-ব্যবহার উল্লিখিত 'সঙ্গ' শব্দবাচ্য হয় না। সজাতীয় লোকের সন্ধান পাইলেও ভজনোন্নতি লাভের জন্য আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সিদ্ধান্তবিৎ, ভজনপরায়ণ, পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক সিদ্ধান্ত স্থাপনে সমর্থ, সমস্ত সংশয় নিরাকর্ত্তা সাধুর সঙ্গই শ্রেয়ঃ। আমা হইতে ভজন বিজ্ঞের সঙ্গ না করিয়া আমাদের নিজ নিজ অপক্ব বুদ্ধি পরিচালিত হইয়া চলিলে প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শ্রীশ্রীরূপগোস্বামী চরণের সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে এই উপদেশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া অনেকেই বিপদে পড়িয়াছেন। প্রথম প্রথম হয়ত 'কৃষ্ণভজন করাই শ্রেয়ঃ' এইরূপ একটা বুদ্ধি আমাদের মনে আসিতে পারে, মনে আসা মাত্রই যে আমরা দেহ ও মনোধর্ম্মের বন্ধন ছাড়িয়া আত্মধর্ম্ম শুদ্ধ কৃষ্ণরতি লাভ করিব এবং কেমন করিয়া কৃষ্ণকে আনন্দ দিতে হইবে, সমস্তই বুঝিয়া লইব, তেমন সৌভাগ্য বড়ই বিরল। এই অবস্থায় বিশুদ্ধ ভজনবিজ্ঞ সাধুর সঙ্গ পাইলে তাঁহার উপদেশ ক্রমে মায়াপিশাচী আমাদের নিকট হইতে পলায়ন করিবে, তখন কোন্‌টি সেবা, কোন্‌টি মায়া তাহা চিনিয়া লইতে পারিব। নতুবা মায়া কৃষ্ণভক্তির ছল ধরিয়া আমাদিগের নিকট আসিয়া আমাদিগকে ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া হয় ফলভোগবাদী কর্ম্মী, না হয় নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানী অথবা সহজিয়া, সখীভেকী, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবুদ্ধিপর গোঁসাই, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-দলভুক্ত করিয়া দিবে। এক একজন এক একটি আজগুবি সাধুশাস্ত্র-বিগর্হিত সিদ্ধান্ত করিয়া তাহাকে 'কৃষ্ণভজন' বলিয়া চালাইব এবং সেই সঙ্গে বহু দুর্ভাগ্য লোকের সর্ব্বনাশ করিব।

বর্ত্তমানে 'সাধুসঙ্গ' শব্দের অপব্যবহারে ভক্তিরাজ্যে নানা ব্যভিচার আসিয়া পড়িয়াছে। মানুষ নিজ নিজ মতের সমর্থনকারী যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই তাহার ঈপ্সিত সঙ্গ মনে করিয়া জগতে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, ফলে জগতে নানা অশান্তির উদ্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বজীবের প্রভু ভগবান্ এক বই ত' দুই নহেন, জীবগণও ত' সেই একই ভগবানের অংশ, সুতরাং জীব মাত্রেরই ধর্ম্ম এক বই দুই হইতে পারে না। চিন্ময় ভাস্কর কৃষ্ণের চিৎকণ জীবগণ কৃষ্ণের সেবা ছাড়া আর কি করিবে? ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের জীবাত্মারও যে ধর্ম্ম, ভারতের জীবাত্মারও সেই ধর্ম্ম। ভগবৎ সেবাই সকলের স্বরূপ ধর্ম্ম। জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা বশতঃ মায়ার দ্বারা গ্রস্ত হওয়ায় মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিদ্বয়ের প্রভাবে অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি দ্বারা আবৃত-স্বরূপ হইয়া প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলন কার্য্যে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে, তাই তাহাদের মনে হইতেছে, এক একজনের এক এক ধর্ম্ম। জীবগণ যদি এখন একজন নিরপেক্ষ, নির্ম্মৎসর, নিষ্কপট, শুদ্ধজীব-স্বরূপ-ধর্ম্ম-তত্ত্বাভিজ্ঞ কৃষ্ণৈকশরণ স্বভজন-বিভজন-পরায়ণ সাধুকেই তাহাদের ঈপ্সিত সঙ্গ মনে করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় পূর্বক তাঁহার উপদিষ্ট পন্থানুসরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহা হইলেই 'যত মত তত পথ' এরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র সিদ্ধান্ত ভক্তি-পন্থানুসরণ দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভে সমর্থ হইবে। শ্রীরূপানুগত্যের অভাবেই আমরা সাধুসঙ্গ-বিহীন হইয়া ভগবৎ-কৃপা লাভে বঞ্চিত হই।

অতএব দুঃসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ শ্রীরূপানুগ সাধুর সঙ্গ করিবেন। সাধু তাঁহাকে শ্রৌতপন্থা উপদেশ দ্বারা তাঁহার সমস্ত ভক্তিপ্রতিকূল পন্থানুসরণ প্রবৃত্তির মূলচ্ছেদ করিবেন। সাধুসঙ্গ ভিন্ন কেহ কখনও স্বকপোলকল্পনা প্রসূত উপায়াবলম্বনে ভগবৎ কৃপা লাভ করিতে পারে না। সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ক্রমে শ্রীভগবানের হৃৎকর্ণরসায়ন কথা আলোচিত হয়। সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে অবিদ্যা নিবৃত্তি-মার্গ স্বরূপ ভগবৎ পাদপদ্মে ক্রমে সাধন ভক্তি, ভাব ভক্তি ও শেষে প্রেম ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধ ভজনবিজ্ঞ সাধুই জীবের দুঃখে দুঃখী,

জীব-দুঃখ নিরাকরণে সেই সাধুই সমর্থ, সুতরাং তাদৃশ সাধুর পাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন করিয়া হৃদয়ের সকল ব্যথা তাঁহাকেই নিবেদন করিতে হইবে। 'আপন ভজন কথা না কহিবে যথা তথা।' অন্যের নিকট হৃদয়ের কথা বলিলে অন্যে আমার সে কথার কোন মূল্যই দিবে না, মধ্য হইতে আমিই বাচাল হইয়া পড়িব। আর যাহার তাহার নিকট কথা বলিয়া বেড়ান'র অর্থ কেবল কপটতা ব্যতীতও আর কিছুই নহে অর্থাৎ 'আমি' যে একজন ভক্ত তোমরা আমাকে ভক্ত বল' ইহাই প্রকারান্তরে বলিয়া প্রতিষ্ঠাকাঙ্খা। উহাতে হিতে বিপরীতই ঘটিয়া থাকে। অধিকারী সাধুর নিকটই নিষ্কপটে হৃদয় খুলিয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিতে হইবে, তিনিই বিদ্ধভক্তি ও শুদ্ধভক্তির পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করাইয়া আমাকে নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করিবেন। সাধুই আমার দোষগুণের বিচারকর্ত্তা। শ্রীরূপ কথিত রূপানুগ সাধুই আমাদিগকে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করাইতে সমর্থ।

—:০:—

গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য

কুলীনগ্রামী ভক্তদিগের প্রশ্নে গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য বিচারে মহাপ্রভু এই আজ্ঞা করিয়াছেন—

"প্রভু কহে বৈষ্ণব-সেবা নাম-সংকীর্ত্তন।"

এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আমরা বিচার করিয়া দেখিতেছি যে, বৈষ্ণব-সেবা গৃহস্থের পক্ষে প্রধান ধর্ম্ম। অতএব বৈষ্ণবসেবা কিরূপে হয়, তাহা বিচার করা আবশ্যক। আজকাল প্রথা এই যে, যখন যাঁহার বৈষ্ণব-সেবা করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি কোন একটী প্রভু-সন্তানকে আনাইয়া তাঁহার পূজারী টহলিয়া দ্বারা অনেক অন্ন ব্যঞ্জন পীঠা পানা প্রস্তুত করাইয়া বৈষ্ণব বলিয়া কতকগুলিকে আমন্ত্রণ করত ভোজন করাইয়া থাকেন। এরূপ কার্য্যকে আমরা বৈষ্ণব-সেবা বলিতে পারি না। নিমন্ত্রণ করিয়া একদল বৈষ্ণব আনা কেবল আত্মমর্য্যাদা মাত্র। যে বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে, তিনি কি প্রকার বৈষ্ণব তাহা কুলীনগ্রামী ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন। যথা ;—

প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম॥

একটী কৃষ্ণনাম লইলে বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্ত হয়। সেই নাম কিরূপ তাহাও চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন ;—

"এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে॥"

এইস্থলে বুঝিতে হইবে, যতদিন নামাপরাধ আছে, ততদিন নাম হয় না। কেবল নামাভাস হয়। নামাভাসের ফলে, পাপসকল ক্ষয় হয়। পাপ ক্ষয় হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়। চিত্ত নির্ম্মল হইলে নামাপরাধ অবসর পায় না। নামাপরাধ অবসর না পাইলে নিরপরাধ নাম হয়। নিরপরাধে কদাচিৎ নাম হইলেও তিনি বৈষ্ণব। সেইরূপ নিরন্তর নাম হইলে বৈষ্ণবতর হয়। হলাদিনী শক্তির উদয় হইলে বৈষ্ণবতম হয়।

এইরূপ বৈষ্ণব লইয়া গৃহস্থগণ বৈষ্ণবসেবা করিবেন। এরূপ বৈষ্ণব গৃহস্থ বা বৈরাগী হইতে পারেন। বৈষ্ণব-সেবায় আশ্রম সম্মানের আবশ্যক নাই। ভক্তির তারতম্যে বৈষ্ণবের তারতম্য। বর্ত্তমান প্রথা নিতান্ত অনিষ্টকর। একজন ছড়িদার গিয়া একশত বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ করিয়া

আসিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া বৈষ্ণবগুলি অপরাপর কার্য্য রহিত করিয়া তিলকাদি দ্বারা সজ্জীভূত হইলেন। অদ্য ভরপেট লুচি মালপোয়া পাইব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু দক্ষিণা মিলিবে—এই ধনাশয়ে ভক্তিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুগ্রন্থে।—

"ধন শিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপদ্যতে"

ইত্যাদি বাক্যদ্বারায় এই সকল কার্য্যকে ভক্তি করিয়া স্বীকার করেন নাই। এই সকল কার্য্য যদি ভক্তি না হইল অনুষ্ঠাতাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। জীব মাত্রকে যদি বৈষ্ণব বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সেবা করিলে জীবসেবা হইতে পারে। মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট নামপরায়ণ বৈষ্ণব-সেবা বলা যায় না।

আজ কাল ভেকধারী বৈষ্ণবদিগের আখড়া বলিয়া একটী ব্যাপার দেখা যায়। আখড়ায় একটী দেব সেবা থাকে। অভ্যাগত বৈষ্ণবদিগকে দেবতা-প্রসাদ বলিয়া তর্পণ করিয়া থাকেন। এ ব্যাপারটী মন্দ নহে, কিন্তু সেই আখড়াধারী বৈষ্ণবদিগকে গৃহস্থগণ নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন ও ভোজন দক্ষিণা দেওয়ার যে প্রথা হইয়া উঠিতেছে, তাহা অবৈষ্ণব ব্যবহার। বৈষ্ণব অতিশয় উপাদেয়। বৈষ্ণব জগতের বন্ধু। বৈষ্ণব গৃহে আসিলে তাঁহার সেবা করা গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবের ভোজন শয়ন ও গমনাগমনের উপকার করাই বৈষ্ণব সেবা। অভ্যাগত বৈষ্ণব আসিলে তাঁহার প্রতি যত্ন করা নিতান্ত উচিত। কিন্তু বৈষ্ণবকে ভোজন করাইয়া তাঁহার দক্ষিণা দেওয়া নিতান্ত কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত। বৈষ্ণবের দক্ষিণা নাই। বৈষ্ণবের দক্ষিণা-প্রথা ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা প্রথা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রথা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। হে ভক্তবৃন্দ! শুদ্ধ নামপরায়ণ-বৈষ্ণবকে সর্ব্বপ্রকার তর্পণ করুন! কিন্তু বৈষ্ণবের ভোজন-দক্ষিণা দিয়া বৈষ্ণব সেবাকে কর্ম্মকাণ্ডের অধম করিবেন না। নিমন্ত্রণ করিয়া অনেকগুলি বৈরাগী-বৈষ্ণবকে ভোজন করান প্রভুর মত নহে। যথা:—

বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই॥

অনিমন্ত্রিত বৈরাগী-বৈষ্ণবের নাম অভ্যাগত। ঘটনা ক্রমে সেইরূপ বৈষ্ণব দুই একটী গৃহে আসিলে, তাঁহাদের সেবা করা উচিত। ইহাতেই গৃহস্থের বৈষ্ণব-সেবা হয়। অধিক বৈরাগীকে একত্র করিলে উপযুক্ত সম্মান হয় না। তাহাতে অপরাধ হয়। নিমন্ত্রণ করিবা মাত্রই বৈষ্ণবের অভ্যাগত ধর্ম্ম থাকে না। তাহাতে সন্ন্যাসী-ভিক্ষা হয় বটে, বৈষ্ণব সেবা হয় না। যত্ন করিয়া কোন বৈষ্ণবকে গৃহে আনিয়া সেবা করিলে কোন অপরাধ হয় না। কিন্তু আড়ম্বর পূর্ব্বক অনেক বৈরাগী-বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলে অপরাধের অবসর হয়। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ এ বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া দেখিবেন। বৈষ্ণব সেবাকে নিত্য ধর্ম্ম মধ্যে গণ্য করিবেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার আশায় নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবকে সেবা করিয়া দক্ষিণাদি প্রদান করত ভক্তিবিরোধী কার্য্য করিবেন না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, এ কালটী কলিকাল। যিনি শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, কলি তাঁহার তৎকার্য্যে বাধা দিবার জন্য অনেক কুপন্থা সৃষ্টি করে। মহাপ্রভুর চরিত্র ও উপদেশ যাহা করিবেন, তাহাতে কলির অধিকার নাই।

আদর্শানুরসন

চিত্রকর যেমন কোন একটি আদর্শ তাঁহার সম্মুখে না রাখিয়া কখনও নির্ভুলরূপে তাঁহার চিত্র অঙ্কন করিতে সমর্থ হন না, সেইরূপ আমাদেরও চরিত্রচিত্র গঠন করিতে হইলে সম্মুখস্থ কোন একটি আদর্শ চরিত্রের আনুগত্য আবশ্যক হয়। আদর্শের আনুগত্য ব্যতীত কখনও আমরা গঠিত হইতে পারি না। সর্বক্ষণ সম্মুখে আদর্শ পাওয়ার জন্যই আমাদের গুরুকুলে বাস আবশ্যক, যেহেতু গুরুদেবই মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। গুরুদেবের চরিত্র বা স্বভাব—

সর্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ চেষ্টা। তাঁহার স্বভাবের অনুসরণেই জীবের নিজ স্বভাব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাকৃত জগতে যেরূপ কোন বস্তু পূর্বে ছিল না, পরে কোন আদর্শ বস্তু দেখিয়া তদনুরূপে বস্তুটি গঠন করিয়া লওয়া হয়, জীব স্বভাবের গঠন-কার্য্য সেরূপ নহে, তাহা প্রাকৃত কোন উপায়াবলম্বনে গঠন করিতে হয় না, যেহেতু তাহা জীবাত্মার নিত্য সিদ্ধভাব— নিত্যকালই বর্ত্তমান; তবে বর্ত্তমানে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহদ্বয়ের প্রতীতি-প্রাবল্যে তাহার স্ফূর্ত্তি না হওয়ায়, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই জীবস্বভাবের সাধ্যতা বা স্বস্বভাব প্রাপ্তি। কৃষ্ণ-ভক্তিই জীবের সেই সাধ্যভাবরূপ স্বভাব, সেই ভক্তি যখন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধিত হয়, তখনই তাহা সাধন-ভক্তি। শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ আনুগত্য ব্যতীত কখনও এই ভক্তির অনুশীলন বা সাধন হইতে পারে না। এই আনুগত্যে ভক্ত্যনুশীলনের অর্থ—শ্রীগুরুদেবের প্রীত্যর্থে গুরুদেবের সেবা ;—উহাই কৃষ্ণভজনের অনুকূল। কৃষ্ণ-ভজনপ্রার্থী ব্যক্তি এইরূপ অনুকূল উপায়াবলম্বন ব্যতীত কখনই ভজনোন্নতি লাভে সমর্থ হইবেন না।

অনেকে গুরুপাদাশ্রয়ের একটি অভিনয় মাত্র করিয়া গুরুপাদপদ্ম হইতে দূরে থাকিয়া একাকী গুরুদেবের আদর্শানুসরণ করিবেন বলিয়া মনে করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা প্রায়ই নিষ্ফলা হইতে দেখা যায়। কেননা মায়াপিশাচীর অনুচরগণ জীবকে একা পাইলেই প্রবল ভাবে আক্রমণ করিবে, কোমলশ্রদ্ধাবস্থায় রাক্ষসীগণের সে আক্রমণ ব্যর্থ করা মায়াবশযোগ্য জীবের পক্ষে বড় সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে। ফলে তাহাদের হস্তেই আত্মসমর্পণ করিতে হয়, তাহাতে আদর্শের অনুসরণের পরিবর্ত্তে অনুকরণটিই থাকিয়া যায়, সুতরাং গুরুদেবের প্রীতিপ্রদ হওয়ার পরিবর্ত্তে তাহা মায়াদেবীরই প্রীতিদায়ক হইয়া পড়ে। গুরুদত্ত তিলকসেবা, মন্ত্রজপ, হরিনাম-কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চন প্রভৃতি ভজনক্রিয়ার অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হয় না বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা সংসারক্ষয়ের পরিবর্ত্তে সংসার বৃদ্ধিই পাইতে দেখা যায়। সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর পাদসমীপে থাকিয়াই যখন কালাকৃষ্ণদাসের ভট্টথারীসঙ্গ বাসনা হইল, বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের মহাপ্রভু ছাড়িয়া কালিয়দহে কৃত্রিম কৃষ্ণদর্শনের সাধ হইল, ছোট হরিদাসের কৃত্রিমভাবে রায়রামানন্দের অনুকরণচেষ্টা করিতে গিয়া অন্তরে স্ত্রীসম্ভাষণ-প্রবৃত্তি জাগিল, তখন তাঁহাদিগের সৌভাগ্য হইতে কোথায় অবস্থিত আমরা, আমরা চাহি সাধুগুরুর সঙ্গ ব্যতীত সংসারে অর্থাৎ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে দূরে থাকিয়া হরিভজন করিতে! ধন্য আমাদের সাহস! তবে গুরু-পাদাশ্রয়ে বাস বলিতে যে গুরুদেব সেবোদ্দেশে অন্যত্র গমনের আদেশ করিলেও তাহা অমান্য করিয়া কেবল গুরুদেবের পা জড়াইয়াই পড়িয়া থাকিতে হইবে, তাহা নহে, গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে তাঁহারই সেবোদ্দেশে যথা তথা অবস্থানও গুরুকুলে বাস।

আমাদের গুরুকুলে বাস, মাত্র সেই কয়দিন, যে কয়দিন দীক্ষার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন না হয়। যেমন কার্য্য শেষ, অমনিই গৃহাভিমুখে দৌড়। "গুরুদেব যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকুন, তাঁহার সেবা হউক না হউক, তাহার খোঁজে আর আমাদের কি আবশ্যক, তবে গুরুদেব আমাদিগকে এই কৃপা করুন, যেন আমাদের সংসার সুখটি ষোল আনা রূপে ভোগ হয়, বৎসরান্তে এক আধ বার গুরুগৃহে যাইব, তখন গুরুদেবেরই হয়ত' আমাদিগকে শিষ্য বলিয়া চিনিয়া লইতে বেগ পাইতে হইবে। যাহা হউক পরিচয় দিব, তাহা হইলেই চলিবে, সংসার-যাত্রা চালাইতে না পারি, গুরুদেবকে বলিব, 'আমার সকল ভার এখন তোমার, তাহা হইলে আর সংসার চিন্তাও থাকিবে না অথবা সংসার স্বচ্ছল থাকে, গুরুদেবকে দু'চার টাকা প্রণামী দিয়া আসিব, তাহা হইলেই গুরুসেবা হইয়া যাইবে; আমরা সপরিবারে দীক্ষা গ্রহণ করি—হাতের জল শুদ্ধির জন্য; কিন্তু সুখের বিষয় যে, গুরুদেবকে আর কষ্ট করিয়া সে জল হাত পাতিয়া লইতে হয় না, আমরা বাড়ীতে বসিয়া তাঁহার শ্রীঅর্চ্চা মূর্ত্তিকেই ষোড়শোপচারে আমাদের শুদ্ধহস্ত-পাচিত অন্ন ভোগ দিই, আর, গুরুদেবের শ্রীঅর্চ্চা যখন গুরুদেবেরই সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তি তখন গুরুগৃহে যাইবারও আবশ্যক করে না, তাঁহার শ্রীঅর্চ্চা পূজা করিলেই তাঁহার সাক্ষাৎসেবার ফল লাভ হইবে, সাক্ষাতে

হয়ত অনেক সেবাপরাধ করিয়া বসিব, কত বকা ঝকা খাইতে হইবে, শ্রীঅর্চ্চা পূজায় আর সে সব ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হইবে না, খুব চোখ বুঁজিয়া এক মনে সকাল সন্ধ্যা বসিয়া গুরু মূর্ত্তি ধ্যান করিলেই হইবে গুরুদেবের সাক্ষাদ্দর্শন অপেক্ষা শ্রীঅর্চা মূর্ত্তিকেই সেইজন্য আমি একটু বেশীরকম ভালবাসি. কেননা গুরুগৃহে যাতায়াতের খরচটাও বাঁচিয়া যায়, সংসার কার্য্যেরও কোন ক্ষতি হয় না ইত্যাদি অনেক সুবিধা!"—ইহাই আমাদের গুরু-ভক্তির পরিচয়!

হতভাগ্য আমরা দীক্ষা বা গুরুপাদাশ্রয় ও গুরুপাদপদ্ম সেবা কাহাকে বলে, কিছুই বুঝি নাই! কি করিয়া বুঝিব? গুরুগৃহেই যে বাস করিলাম না—গুরুদেবের শ্রীমুখ-বিগলিত উপদেশামৃতসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও যে আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করিলাম না? গুরুপাদপদ্মে শরণাপত্তি ও সেবাবুদ্ধি সহকারে পরিপ্রশ্ন করিলে ত' গুরুদেব আমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন? তাহা না করিয়া যেমন দীক্ষার বাহ্যানুষ্ঠানগুলি সমাধা, অম্নি আমিও বাড়ী পানে দে ছুট! ইহাতে আর কেমন করিয়া আমাদের মঙ্গল হইবে? দীক্ষিতের প্রথম কর্ত্তব্যই হইতেছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ। কৃষ্ণকথা শ্রবণ-ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপবিষয়ক কথা শ্রবণ দ্বারা শ্রীরূপের উদয় যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্ ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণ সকলের স্ফূর্ত্তি সম্যগ্‌রূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীগুণের স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকরগণের বৈশিষ্ট্যহেতু সেবকের সিদ্ধ পরিচয়-বৈশিষ্ট্য উদিত হয়। এইরূপে নাম-রূপ-গুণ-পরিকরের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে লীলার স্ফূর্ত্তিও সম্যগ্‌রূপে হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সম্যক্ স্ফূর্ত্তির নাম দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ। এই দিব্যজ্ঞান লাভ কখনও একদিনে হইবার নহে, ইহা লাভ করিবার জন্য গুরুপাদপদ্ম-সান্নিধ্যে গুরুদেবেরই সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে তদাজ্ঞাপালনরূপ আনুগত্য করিতে হয়। হরিভজনকেই যাঁহারা জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিতে পারেন, তাঁহারা শত সহস্র বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া গুরুকুলে বাস করিবার সুবিধা করিয়া লয়েন। নিতান্ত অসুবিধা হইলে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, সেখানে থাকিয়াই গুরুদত্ত কোন সেবা-ভাব বহন দ্বারা গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট সম্পাদন করিবার যত্ন করেন। শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট স্থাপনই—শ্রীগুরুগৃহে বাস—শ্রীগুরুর আদর্শানুসরণ—স্ব-স্বরূপপ্রাপ্তি। সেই মনোঽভীষ্ট হইতেছে—সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ।

নরকই আমার ভাল লাগে

বিষ্ঠার কৃমিগুলি বিষ্ঠাতে জন্মায়, বিষ্ঠাতে পালিত ও বর্দ্ধিত হয়, বিষ্ঠা ভোজনেই আনন্দ পায়, কিছুদিন অন্তর বিষ্ঠাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হইয়া যায়। এদিক ওদিক নড়া চড়া করিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার বিষ্ঠাতেই আসিয়া জমা হয়। আমারও ঐ সমাবস্থা; কিছুই বেশী কম নাই। আমিও অসৎ সঙ্গে জন্মিয়াছি, অসৎ সঙ্গে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি, অসৎ সঙ্গেই আনন্দ পাইতেছি বলিয়া সময় সময় মনে করিতেছি; কিছুদিন অন্তে এই অসৎ দিগের মধ্যে থাকিয়াই মরিয়া যাইব, সুতরাং আমি সদ্বস্তু হইয়াও অসতের আবরণে অসদ্গতি লাভ করিতেই বাধ্য হইলাম। আমার দেহের প্রত্যেক শিরায় শিরায় অসতের অসত্য পরিপূর্ণ। তার পর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম দেহটাও অসতের প্রতিচ্ছবি। বিশেষতঃ মন তো অসৎ ছাড়া অন্য কিছুই দেখে না ও জানে না। মনটা কি প্রকারে দেহটার সুখ সুবিধা করিতে পারিবে, এই তালেই ব্যস্ত। দেহটা কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি বই তো নয়? সুতরাং মন কেবল ইন্দ্রিয়গুলির গোলামি করিতেছে, অথচ মন ভাবে, আমি দেহরাজ্যের রাজা। বেশ মন ভায়া! তোমার রাজা গিরির বালাই লইয়া যাই. আচ্ছা ভাই মন! তুমি না রাজা? আর বাকি দশটী ইন্দ্রিয়ই তোমার প্রজা? তবে তোমার প্রজাবর্গ কর্ণ, ত্বক,

চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা—ক্ষিত্যপ, তেজ, মরুদ্ব্যোম এই পঞ্চ ভূতাত্মক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বিষয়াদির দিকে তোমাকে নাকে দড়ি দিয়া—নিয়তই কি প্রকারে ঘুরাইতেছে? তুমি এমন কি একটা ভয়ানক আফিমের নেশায় পতিত হইয়াছ যে, ইহাদের দাসত্ব এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িতে পার না? তুমি রাত্র দিবা এত গাধার মত খাটিয়া ইহাদের পিছনে পিছনে ছুটিয়া বেড়াইতেছ, কই উহা দেখিয়া ত' তোমার প্রতি তাহাদের একবিন্দুও দয়া হইতেছে না? দয়া হইলে তো ছুটিই পাইতে।

আজীবন, অনন্তজীবন, এই প্রকারে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিলেও ছুটি পাওয়া যায় না, কেহ কখনও পায় নাই, পাইবেও না। "আগে ভোগী পরে যোগী বা ত্যাগী" কথাটা অশ্বডিম্বের ন্যায় সত্য। অর্থাৎ আগে ভোগী, পরে ভোগী-তর, সর্ব পরে ভোগী-তম। ক্রমে ভোগের যন্ত্র ইন্দ্রিয়বর্গ অশক্ত হয় বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অপটুতায় ভোগে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছাশক্তি বহু গুণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ দাঁত না থাকিলেও হামান দিস্তার সাহায্যে তাম্বুল গুবাক চর্ব্বণ ও ঘন ঘন কাস উপস্থিত হইলেও কাসোৎপত্তির কারণ ধূম পানের লালসা প্রবল থাকে। নাতিনী, পৌত্রবধূর সহিত পত্নী অপেক্ষাও রসিকতাপূর্ণ বাক্যের মাত্রা বাড়িয়া উঠে। মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই ভাবে দিন কয়টা কাটিয়া যায়। অতএব বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বৃদ্ধ কোন কালেই ইন্দ্রিয়বর্গের সেবা দ্বারা সংযম লাভ হইতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে বল পূর্ব্বক অনৈসর্গিক উপায়ে ইন্দ্রিয়-দমন বা ভোগত্যাগের দ্বারাও জিতেন্দ্রিয় হইতে দেখা যায় না। বরং ইন্দ্রিয় গুলিকে নষ্ট করিতে যাইয়া বহু বিপদই উপস্থিত হয়। দেহ বর্ত্তমান থাকা কালে ইন্দ্রিয় ধ্বংস হয় না, ইহা অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার, ইহা ভাল রূপে অবগত ছিলেন ঠাকুর নরোত্তম, তাই গাহিয়াছেন, "অন্য-অভিলাষ ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি, "কায় মনে' করিব ভজন"।

এই প্রকারে অনর্থ যুক্ত দুষ্ট মনকে প্রতি মুহূর্ত্তে কতই না প্রবোধ দেই; কিন্তু প্রবোধ দিলে কি হইবে? যে সরিষা দ্বারা ভূত তাড়াইবে, সেই সরিষার ভিতরেই ভূতের বাসা। যে মন দিয়া অনর্থ-পরায়ণ মনটাকে দমাইতে চাই সেই মনটাই যে চঞ্চল। সদ্গুরুর চরণে অভিগমন করিয়া মনটা যে সম্পূর্ণ ত্রাণ লাভ করে নাই, তবে আর কার কথা কে শোনে?

দেহের সহিত মনের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাতে দেহমন একধর্ম্ম (শ্রীহরিসেবা-বিমুখতা) বিশিষ্ট—উভয়েই আরাম-প্রয়াসী। সুতরাং মন নিজের আরাম সম্পাদনের নিমিত্ত দেহতেই সতত রতিশীল। ইহাতে উভয়েই আরাম বোধ করিয়া থাকে। ইহাদের যেন একবার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহা মায়াধীশের সেবা পরিত্যাগ করিয়া মায়াবশ হইলে এই প্রকার স্বরূপ বিভ্রান্তিই ঘটে—সকল দেবতার রাজা ইন্দ্রও এককালে কোন কারণ বশতঃ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া শূকর-যোনি লাভ করিয়া নিজেকে শূকরই মনে করিতে ছিলেন।

অতএব ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতেছি, জন্ম-জন্মান্তর ভরিয়া এই ভাবে চেষ্টা করিলেও দেহ মনের ধর্ম্ম প্রবলই থাকিয়া যাইবে। যে কাল পর্য্যন্ত দেহ-স্মৃতি-বিহীন সংসার-কূপে পতন-হীন সাধুদের শ্রীচরণ-পাশে সম্যক্ গমন না ঘটে, সেকাল পর্য্যন্ত এই রকম ভবঘুরের মত মাঝে মাঝে ভবসমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেই হইবে। কাম-ক্রোধের দাস হইয়া মায়া-পিশাচীর লাথি খাইয়াও মতিচ্ছন্ন অবস্থায় তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিতেই হইবে।

তার পর ইচ্ছা করিলেই সাধুসঙ্গ ঘটে না পুঞ্জীকৃত সুকৃতি চাই। লালসার মত লালসা অর্থাৎ কপটতা-বিহীন একমাত্র সরলতা-পরিপূর্ণ আর্ত্তির সহিত সাধুর চরণে নিজ দুষ্কৃতির কথা জ্ঞাপন করা চাই, তবে ত' বিষ্ণু বৈষ্ণবের কৃপা-লাভ, নরক হইতে উদ্ধার? আমর দেখি সব গুলিরই অভাব। সুকৃতি ত' নাইই। লালসাও দেহ মনের অনুগামী ভাসা ভাসা রকমের। সাধুসঙ্গ হইয়া পড়ে, তবে বিলক্ষণ, নতুবা বেশী ক্ষতি নাই। সুতরাং আমি যে নরকে সেই নরকে। এই কথাটা জানিয়াও সুবুদ্ধির উদয় হইতেছে না যখন, তখন আমার যে মতিচ্ছন্নদোষ ঘটিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? নতুবা কে বলে আমার নরকই ভাল লাগে!